









# মোড়া

উপভাস

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীদিনীপকুমার রায়

বোলা আন্তর্জাতিক লিখিত—মুরোপে তিন সপ্তাহে  
১৯২৭ সালে—বোধ করি এপ্রিল মাসে। তারপর  
উত্তরার দ্বারা বাহ্যিক প্রকাশিত হবার সময় বহু  
পরিবর্তিত।

অন্যান্য চট্টোপাধ্যায় এও সালের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্ট ওয়ার্কস্ হইতে  
প্রিন্টোবলিগন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত  
২০০১১১, কর্তৃত্বালিস্ ট্রাষ্ট, কলিকাতা

## উৎসর্গ

খুজ্জলি,

তোমার কি তাই পড়ে ঘনে—বেদিন তোমার লজোরেরি বেদে  
হঠাৎ দিলীপ চড়াও হ'ল দুখরতার ?—বেদিন তুমি বেদে  
বরণ ক'রে নিলে তাহে তোমার উদার সিংহ হাসি নিয়ে ?  
পান-বধিরে লজা দিলে তান-অধীরে কোলে টেনে নিয়ে ?

বেদিন—পড়ে ঘনে ?—বখন বলত সবাই : “দিলীপ গেল ব'লে”—  
( বলছি না যে, আজ বলে না : শুধু, সে-সব আঁককে গেছে ক'রে )—  
বলতে তুমি ব্যক্তরে : “কতজনাই গেল অধঃপাতে  
কত কিছুই ফেরে !—না-হর বরণ ক'রে গানের জগদ্রাঘে  
হ'লই ওটা অকস্মাৎ আর ঝুঁটো ;—সমাজ-বুকুটোরির ভবে  
নেই তো অত্যাধ, কেপুক না দু-একজন—না-ই রটাল সৌন্দর্যে  
নিরাপদের জ্বরধ্বনি—বাণের ঢাকা দিয়ে জলাঞ্জলি  
পড়ল না-হর পান-ফাসাদেই, না-হর নাই বা হ'ল কোকুলী  
খন্ড-পথের বসতি তরে—পান-উচাটন হোক না আনন্দাগ, \*  
অবহার্য হুয়ের-মোতে মোড়র না-হর করলই বান-বান :  
জীকসে তো চুকল সবাই—বাইরে না-হর র'লই দু-একজন :  
মনক তো অস্তিত্তি—নর, রইলই দু-একজন—উজ্জ্বল ।  
অমিল্য চাল বা চালে কে ? নর, হ'ল দু-একজন বেতাল,  
দুখরতার আত্মবশে দু-একজন হ'লই বা বেতাল ।”

এমনবারা তীধর কথা করতে কলাও কতই জেদের গড়ে !  
না-হাসিত কে—গরীছাড়ার ওকালতির সে-কিঙ্গী তড়ে ?

বহিঃ-স্বামী—প্রেম-স্বামী বর তুমি—আভিমানী মাই,  
 তুমি না পেলে তুমার তোমার—কণ জেন কি তুলতে পারি তুমি ?  
 অতুল্যকে তারপরে দুই বিরোধে দুই-কেন্দ্র করে নিতি  
 কতই অসহ্য স্বভাব আমার—প্রাণমানের আলোয় ! তোমার প্রতি  
 যে-বাস্তবী-সদৃশ মাঝে কিছুই আমার ভাবত কতই—তা কি  
 মনে পড়ে আদ্য ?—কিভেন পরিচয় হবে হাতে আমার দাবী  
 তাঁর কোনো দান থাকিলে তামো ?—রাখিনারায় করতে তুমি মই  
 কন-নিকবে ক'বে তোমার আলাপ আমার ?—যেদিন তোমা বই  
 ত্রৈক্য প্রতি আভা ফাকা ?—ভীটার তুমিই আনতে যে জোয়ার,  
 হাতে ছিলে—হাস্তদোষ, গান-বিচারে সাধাস সমজদার !

গল্পে—প্রোভা ! শিল্পে—কথক ! কোমল—সখ্যে ! কঠিন—তর্ক-রূপে,  
 ব্যথার রসিক ! সুখার নাথিক !—বড়-তুলামেও তোমার স্বতি ভনে  
 প্রবাসী একজনা জেনো । দুঃসাহসী ! আরো মনে পড়ে ?—  
 আর এক গভীর মেহের কণে বাধলে তারে কেমন চিরন্তনে ?  
 তোমার কাছে যা পেয়েছি—এ-জীবনে অনেক না-পাওয়ারই  
 করল আমার কতিপূরণ—তাই তো তোমার স্বয়ি—নন্দ-স্বয়ি !  
 জীবন-ধূলোর স্বপ্ন দেখেই বারা সিনিক—তুমি তামো  
 একজনা তুমি ! এ-ছন্দবেশ চিনলনা যে—দৃষ্টিই তাঁর মিছে !  
 বাধিততা ? ঢের হয়েছে—তোমার সাথেও, সেসব কোরো কমা,  
 জেনো বতই হোক না ধরত—তোমার প্রতি থাকবে অজেন জমা ।  
 তারি স্বীকার তরেই তুচ্ছ এ-উপহার—সব এ-প্রতিদান :  
 শুধু কি কণ তোমার প্রেমের ? বাড়াই বতই—তুণ ততই আশ ।





## অভিভাবিকা

বেলা বারোটা। সমস্ত আকাশ নীল হাসিতে উদ্ভাসিত।  
মসিরে কোরের বাগানটা জানলার কাঁক দিয়ে উকি দিচ্ছে। একটা  
চির-সবুজ গাছের মস্ত পাতার নরম আলো বলমল করছে। তার সাইনে  
জাপানী ধরনের গোল চাঁদোরার বাঁজে বাঁজে তুষার-কণার ঝিকঝিক।  
বগনের মনে পড়ে যায় শেলির—

The emerald green of leaf-enchanted beams...

হঠাৎ পদশব্দ—সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়।

আনা ও মসিরে বেনার ঘরে ঢোকেন। বগনের সুবুকের মধ্যেটা  
কেমন করে গুঠে...আনা এত রোগা হয়ে গেছে! আহা!...কিন্তু তবু  
আনার চোখে যেন একটা নতুন নৃত্যের আলো!...যেন এক-কর মস্তাবে  
সে জীবনকে তার স্বরূপে চিনে নিয়েছে। যেন...আনা হাত বাড়িয়ে  
দেয়। বগন অসহোচন সে হাতটি চুষন করে।

বুঝ হেসে বলেন : "হঠাৎ? এক মনস্তর চিঠিপত্র নেই। এমন  
যোমালুম উদ্বাও? কার তরে হে?"

আনা বলে : "নতুন বন্ধু-বান্ধবী পেলে পুরোনোদের ফুলে বাঁড়ায়  
এই-ই তো আনিনীকী চাল, মসিরে।"

বগন হাসি হাসে...

ভাগ্যক্রমে মানেং ঢোকে : "খাবার নেওয়া হয়েছে মসিরে।"

তিনজনে ভোজনাকারের দিকে চলে।



## মোলা

মসিমে কোনা আনার মোটে এক শুভ্র আঙুর কোর করেই তুলে দিয়ে বলেন : “আহা—হা, সব কোলাহলোই অমনতরো বিরোহী না কেন কীনা তো ? একটু aphrodisiaque না হ'লে তরুণীর চলে ? —বিশেষ করে যেথো এ আঙুর সেন এনেছে তোমারই জন্তে শুধু—নীল ফেঁকে । কোং দাড়ুয়ের জগবিখ্যাত আঙুর—তোমার পালের সঙ্গে পাল্লা দেয় শেরি—তা এ-তুলনার তুমি রাগই করো আর বা-ই করো ।”

আনা হেসে বলল : “কিন্তু রাগ করি বা না-করি সমান রাঙা জিনিষকে যে এ-ভাবে উদরস্থ করতে হবে তার কী মানে ? তা ছাড়া একটা কথা ভুলবেন না । আপনি যে-ভাবে পানাহারী হ'তে বলেন তা শুনে আনা ভূমিনও aphrodite থাকবে না নিশ্চয় জানবেন ।”

—“কী হবে শুনি ?”

—“Bacchante, এবং তা হ'লে তার পক্ষে আর যে-পেশাই সম্ভব হোক না কেন—মডেলগিরি যে সম্ভব হবে না এটা প্রব ।”

মুগন বলল : “কিন্তু আঙুরের এ-সংস্করণে রাতারাতি সে-রকম-বেলুনাকৃতি পরিণতির আশঙ্কা কেন আনা ? না ভৈঃ ।”

আনা ছুটো কালো আঙুর চেখে বলল : “সত্যি ভারি মিষ্টি ।”  
ক'লেই মসিমে বোনাবের পানে চোখ ফিরিয়ে বলল : “আশনার দিগ্ধটি আশনার কাছ থেকে দূরে গিয়ে কিন্তু একটা নতুন রসপ্রাণিতা শিখে এসেছেন মসিয়ে—স্বাক্ষর । উন্নতি হয়েছে বৈ কি ।”

ক'ল চোখ মিট মিট ক'রে বললেন : “শুরুগিরির গুহুতবই যে ঐ শেরি ! ধাপে ধাপে ওঠাতে হয় । পরে রঙীনকর রসেরও রসিক হবে ও, তেবো না—আরও কত রস ; কি বলো ?”

—“মানে ?”

—“সে কি একটা রস যে কিরিস্তি দেব যুখে যুখে ? ধরো না কেন

অভিত্যক্তকরই হবে।—তবে ওর সে-বুড়ির বয়সটা এখানে অসম্ভব খোঁসতাই হবে না—সে বয়সখানে।”

আনা উৎসুক ভিজ্ঞান দৃষ্টিতে কুহুর চোখের দিকে তেঁকেই করে স্বপনের দিকে তাকালো। স্বপন একটু আশ্চর্য হ'ল। আনাকে কি বুদ্ধ একটু আভ্যন্তরীণ সেননি কেন সে হঠাৎ নীল খেঁকে পারিলে এসেছে? এত সাবধানতার অর্থ কী? তার হঠাৎ কী খেয়াল চাপল, বলল : “বাঃ, তোমায় যে আমি নীলে বায়ু-পরিবর্তনে নিরে বাব—জানো না?”

আনার চোখ দুটি মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই রানিমা সে-স্থান অধিকার করল, সে বলল : “ঠাট্টা?”

স্বপন কেমন একটা ধাক্কা খেল বেন। সে কত দূরে স'রে গেছে এই মাস দেড়েক!.....নইলে এ-প্রত্যাব আনা ঠাট্টা ভেবে বলে? সে উত্তরে গভীরভাবে ভরসা দেবার আগেই মসিরে বেনার কলসেন : “ঠাট্টা মোটেই নয় শেরি। আছে সে এক পরম রমণীর গভীর রহস্য। কিন্তু তার অন্ধরমহলে ঢুকতে হ'লে আগে ঐ টাট্টুকু শেব করতে হবে—এটা মনে করিয়ে দিচ্ছি। এটা তুমি ছুঁতেই ভুলে গেছ—এমন ভোলা মেয়ে!”

আনা টাট্ট একটুকরো নিরে বলল : “কিন্তু নীলে তো আশনিষ্ট আমার সঙ্গে বাবেন কথা ছিল?”

—“আরে, তখন কি সেন এসেছিল?”

আনা কোঁকুহলী দৃষ্টিতে স্বপনের দিকে তাকালো। তার পাণ্ডুর গাল দুটিতে এবার একটু হারী গোলাপী রং মকল। স্বপনের চোখের প্যরে তবু ডাগর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বলল : “ব্যাপার কি স্বপন?”

স্বপন কুহুর দিকে তাকিয়ে শুধু একটু হাসল নীরবে। আনার

সম্ভবতঃ সন্দের পিছনে একটা চাপা স্পন্দন। তার বুকের মধ্যে এক দ্বিধা  
স্বর্ঘ্যোজ্ঞাপ জেগে ওঠে যেন।

আনা স্ট্রেট সরিয়ে দিয়ে বলল : “কখনো আমি যাবো না আর  
—বদি, এককম কাঁপা রক্ত-ফাটনের দিকে আমাকে তাকিয়ে থাকতে  
হলেন। ষাড় ব্যথা হ’য়ে যায়—মনও ভরে না। জিজ্ঞাসা করছি—  
উত্তর নেই।”

বৃদ্ধ সমস্ত সুরে ব’লে উঠলেন : “আহা হা—চটো কেন শেরি ?  
পাও পাও—এই দেখো—ও রোমান্টিকটাক্স কারুর পুরে বদি বর্ষণ  
করতেই হয় তো যোবনের asbeste-এর পুরেই করো না। আমাদের  
বুড়ো হাড়ের ওপরে আছে শুধু চামড়া যে—সইবে কেন ?” ব’লে পকেট  
থেকে দুটি টিকিট বার ক’রে আনার হাতে দিয়ে বললেন : “পড়তে  
পারছ কি রাগিনী ?—মসিমে সেন, প্রথমশ্রেণী Coupé wagon-lit  
—আর কেউ নয় এককক, শুধু তোমরা দুজনা। সে বন্দোবস্ত আমি  
করেছি। পড়েছে রাগ ?”

আনার চোখ দুটির মধ্যে থেকে আলো যেন ঠিকরে পড়ল। হাসিমুখে  
বলল : “ভেতরে ভেতরে বুঝি দুজনায় তারযোগে এইসব যড়যন্ত্র আঁটা  
হচ্ছিল ?”

বৃদ্ধ চোখ মিট মিট ক’রে বললেন : “শেরি, বুড়োকে তোমরা  
চিরদিনই হেনস্থা করো—জবুজবু ব’লে—কুলময় রসের-পথে কাঁটার-  
ব্যারিকেড ব’লে। কিন্তু তারা যে অনেক সময়ে তরুণ-তরুণীর স্বখাত  
পরিথার পুরে সাঁকোয়ও কাজ করতে পারে—এখন থেকে মানবে তো ?”

আনা মসিমে বেনোরের একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল।

বৃদ্ধ তাঁর অপর ছাড়া হাতটি দিয়ে আনার গালে দুটি টোকা মেরে  
বললেন : “মজুরি পোষাবে না শেরি এ-হাত অত ক’রে টিপে। মনটা

নবীন হ'লে হবে কি বলো, কেহটা যে হ'য়ে গেছে প্রবীণ। তার চেয়ে অল্পজ্ঞ দেখো না একবার বেয়ে-চেয়ে।”

আনা স্বপনের দিকে চেয়ে হেসে বলল : “কী স্বপন রাজি আছে? —থাকো তো দাঁও তোমারই হাত।”

বুদ্ধ বললেন : “কিন্তু সে দিকেও যে আবার এক নতুন মুক্তি আছে শেরি। বুড়োদের দেহের প্রবীণতার দরশন হাত চাইলে তার হাতই দেয়। নবীনদের বেলায় যদি হাতের সঙ্গে অস্ত্র কিছু আসে?— বিশেষত বখন নবীনা দিতে চাচ্ছেন কৃতজ্ঞতা?”

স্বপন বলল : “কৃতজ্ঞতারও অনধিকার-প্রবেশ! অপরাধ?”

—“বাঃ—তুমি ওর জন্তে নীস থেকে ছুটে এলে তরুণী আসন্নলভ্য। রোমান্টিকার সঙ্গ ছেড়ে। আবার আজই রাতে পাড়ি দিচ্ছ। এতখানি স্বার্থত্যাগের জন্তেও যদি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে—তবে করবে কিসে শুনি?”

আনা বলল : “কিন্তু এতখানি স্বার্থত্যাগের পরিবর্তে দুটো কথার কি চি'ড়ে ভিজবে?”

—“কিন্তু তোমার ও-বরদাওঁী ঠোট দুখানি কথার চৌহদ্দির বাইরে যেতে এগুবে না এই-ই বা তুমি ধ'রে নিতে গেলেন কেন শুনি?”

আনা সহাস্তে বলল : “যদি বলি এ-রকম স্থলে একজন এগুলে আর-একজন পেছোন ব'লে?”

স্বপন জোর ক'রে হেসে বলল : “বাঃ, পেছুই? মানে?”

—“ব'লে দেব তা হ'লে?”

মসিয়ারে কেনার বললেন : “তা হ'লে আধ্যাত্মিক ভারতীরদের মনোবুদ্ধে শুধু ফুলফুলের, ব'লে দেবার মতন নিষিদ্ধ ফলও ফলে—সেন?”

আনা বলল : “এবার কিন্তু ফুল সন্বেহ করলেন মসিয়ারে। এমন

অনেক কল আছে বার্ষ বর্ণচোরা—প্রায় কুলেরই কোটার গড়ে—  
নিমন্ত্রণ।”

বলন বলল : “এর তাৎপর্য ?”

আনা মসিমে বেনারের দিকে চেয়েই ঈষৎ হুঁর করে বলল : “এক  
দে ছিল বন্ধু কুল। সে একদা তার কোনো এক বান্ধবী-মধুকরীকে  
নিমন্ত্রণ করল তার ভোজনাগারে সাহচর্য বিতরণ করতে। বান্ধবী  
অনিবার্য কারণে আসতে পারলেন না। তাতে বন্ধুর বন্ধুর কুলে কলল  
অভিমান-ফল। ঐ ফলে বটে স্বাতন্ত্র্য কিন্তু এর বীজে কি ফসল ফলে  
বলতে চান ?”

বলন আশ্চর্য্যত্ব করে...বলে : “অভিমান নয়—আমি—”

মসিমে বেনার বাধা দিয়ে বললেন : “তা হ’লে তো আমার তারি  
অস্তিত্ব হ’রে গেছে সেন, তোমাকে ডেকে এনে। বাক, শোনো—তুমি  
যে ইচ্ছে করেই ঐ-ভাবে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে চেয়েছিলে সেটা আমার  
গণনার মধ্যে আসেনি ঠিক। কিন্তু যা হ’রে গেছে তার তো আর  
চারা নেই। এখন আমার বক্তব্য—যদি তুমি এ-ভার গুরুভার মনে  
করো—বা নিজেকে বিপর—”

—“আনার ভার নিয়ে আমি নিজেকে বিপর বোধ করব—গুরুভার  
—এ-কথাটা এ-ভাবে বলছেন কী বলে ?”

আনা একটু হেসে বলল : “তুমি অমন করে পালালে বলে।”

বলন এবার ঈষৎ উচ্চ স্বরে বলল : “ও সব জেরা ছেড়ে যদি  
আমাকে একটু সরলভাবে জিজ্ঞাসা করতে আনা, কেন আমি হঠাৎ  
পারিস ছেড়েছিলাম—তা হ’লে কি আমার পক্ষে একটু বেশি সুবিচার  
হ’ত না ? আর আমিও জিজ্ঞাসা করি একটা কথা। ঐ-ভাবে বার  
বার খোঁটা বেওয়ার অর্থই বা কী ? তোমরা আমার নীলে ঝগড়ার

অথবা এমন-কোনো ~~কথা~~ অপরাধ সেবে কি—বে-অপরাধ তোমার  
জন্মে কিরে আনারও দাবি হয় না ?” ঐশ্বর্য

আনা ও মসিরে বেনারের দুইবিনিসের হয়—চকিতের জন্মে !  
আনা হুত বহলে নিরে বলল : “আমাকে দাক কোরে বশন ! তুমি  
আমার জন্মে এত কষ্ট ক’রে তুহুর নীস থেকে এককথার এসে পড়লে,  
এজন্মে কোথায় তোমাকে বস্তবাস দেব—না, আরেকেরে শিতর মতন ঠাঁই  
কোলাছি।—যেন তোমার সময়, ইচ্ছা ও বদ্ধবের ‘পরে আমার দাবি  
অবিসংবাদিত !”

মসিরে বেনার আনার কাঁধে একটি হাত রেখে দ্বিধা হুত বললেন :  
“দাবি তো তুমি করোনি আনা।”

আনা ঐহৎ ধরা হুত বলল : “করেছি বৈ কি ! নইলে ওর  
এমন কথা মনেই বা হবে কেন যে ওর নীস-বাওরাটাকে আমি অপরাধ  
ব’লে গণ্য করেছি ? কী অধিকার আছে আমার এমন কথা তাববার,  
তুনি ?”

বশন লজ্জিত হুত বলল : “অধিকার, দাবি এসব বড় বড় কথা  
উড়ে এসে জুড়ে বসল কোথেকে আনা ? বদ্ধর ‘পরে বদ্ধর দাবি কি  
জাহির ক’রে তবে ~~মানুষ~~ করতে হয় ?”

মসিরে বেনার খুসি হ’য়ে বললেন : “বেশ বলেছ মনামি। সাবাস।  
বদ্ধর ‘পরে কোনো দাবিই যদি না তহিল তবে ওকে বদ্ধর বলাই বা কেন ?  
দাবির ‘পরেই সংসার চলেছে। কেবল এইটুকুর প্রতি সজ্ঞাপ থাকা—  
যে তোমার ‘পরে ওর বদ্ধবের সত্য দাবি জন্মাতে পারে তখনই যখন তুমি  
ওর দাবি স্বীকার ক’রে আনন্দ পাও, অথচ ও তাকে দাবি ভাবতে স্বত্তি  
পায় না।”

আনা হেসে বলল : “তা হ’লে আমারই জর। কেন না আমার

এ-দাবি স্বীকার করে ও আনন্দ পাক না-পাক একে দাবি বলে চেনার দরুন আমি বিবম অন্তর্ভুক্তি বোধ করছি—যদিও বলা যায় তাই বলে দাবি করতেও পেছপাও হচ্ছে না মোটেই।”

স্বপন বলল : “না, জয় আমারও। কেন না আনার এ-দাবি স্বীকার করে আমি শুধু আমক না—দ্বিধিজয়-গৌরব বোধ করছি বললেও বেশি বলা হবে না। উভয়েই অপরাধিত।”

মসিয়ে বেনার হাততালি দিয়ে বললেন : “ব্রাহ্মো। আর দুজনেই দুজনকে বধন হারিয়ে দেয় তখনই বন্ধুত্বের পাণা-গান ওঠে জন্মে।”

কাছের একটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল।

আনা বলল : “ওহো, আমার ওভারকোটটা—”

মসিয়ে বেনার বললেন : “বটে বটে। সেন—লক্ষীটি ওকে নিয়ে এ-দাবি করে? কয়েকটা জিনিষপত্র কেনা আর কি। একটা ওভারকোট ও কর্ভাস দিয়েছে।”

আনা বলল : “না না। ও বেচারী এখন একটু জিরোক। আমি একাই পারব।”

স্বপন বলল : “সে কি হয়? তুমি যে কর্কশ এখনো।”

মসিয়ে বেনার তার পিঠ চাপড়ে বললেন : “সাবাস সাবাসেদ। তুমিই পারবে ঠিক। অভিভাবকের টোন একেবারে হবহ ফুটে উঠেছে এখনই, হাতেঘড়ির দিনেই বিভাসিদ্ধি।”

তিনজনেই হেসে ওঠে।...

## ট্যান্ডিতে

• —“কতদিন পরে—মনে পড়ে স্বপন? সেদিন আর এদিন? আনার হাতটা মোটরের ঝাঁকুনিতে স্বপনের একেবারে কোলের ওপর এসে মাড়ে।

বশন নিজের মুঠোর মধ্যে তাকে টেনে নিয়ে বলল : “শুধু, কেবল একটু তফাৎ আছে এ-ছদ্মনিমের।”

—“কী ?”

—“সেদিন ট্যাক্সিতে তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলাম ভয়ে ভয়ে, আর আজ নিয়ে বাক্সি অভিভাবক হয়ে—এই।”

• —“ঐ—হুঁ।”

—“না তো কী ?”

—“অভিভাবক হয়েছিলে মাত্র তুমি একজনের, যাদের একশতাব্দের মধ্যে। এবং সে আমি নই।”

বশন লজ্জা গোপন করে চটুল হয়ে বলল : “জ্বাং।”

আনা হাসির ঢল বইয়ে দিয়ে বলল : “কুকু হাত দিয়ে বসো তো ? ধরনি সে তোমাকে আঁকড়ে লতার মতন—বেশখান্না ব্রততীর মতন ?”

—“বেস্তার ঈশ্বরদোস্তের খবর ?”

—“ম’শের, আমরা কিছু কিছু বুঝি গো বুঝি। নইলে—”

—“নইলে কী ?”

—“না, থাক।”

—“না, বসো। নইলে—?”

—“একটা চিঠিও অন্ততঃ লিখতে। একেবারে নিরাশ্রিতনী সর্বীকে নিয়ে কেউ ভূতপূরী বাস্তুবীকে ঐ-রকম বেমানুষ কুলতে পারে না। একেই বলি আমি সত্যিকার লসল অভিভাবকতা—রক্ষাবাহক।”

বশন ঈর্ষ্য লজ্জিত হয়ে বলল : “হুঁ। মোটেই—”

• “হি বহু, অন্ত জোরে মোটেই কষাটা বলা ঠিক নয়। গত উল্লাহটা উৎপত্তি হয়। বরং যদি বানিকটা কবুল করেও চেষ্টা কেতে—”



ব'লেই খেমে গেল। স্বপন কথা কইল না। ছুজন ট্যান্ডির হুদিকের জানলা দিয়ে দুধারে চেয়ে রইল খানিক।

—“খুব সুন্দরী সে,—না ?”—আনা হঠাৎ ব'লে বসে।

—“অত সুন্দরী আমি জীবনে কখনো দেখিনি।” ব'লেই একটু অস্বস্তির বোধ করে।

—“আনা একটু চুপ ক'রে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল। পরে হঠাৎ কিরে বলল : “প্রথমার চেয়েও ?”

স্বপন চুপ ক'রে থাকে।

—“বলো না।”

—“এ ধরনের কথাবার্তা আমার কেমন কেমন লাগে আনা।”

আনা এতৎসনা গায়ে মাথবার পাড়ী নয়,—সহজ হুয়ে বলল : “আজ্ঞা মানলাম।” কিন্তু একটা কথার উত্তর দেবে ? সত্যি উত্তর কিছ ?

—“কী ?”

—“একটা চিঠিও লিখলে না কেন ?”

—“আনা, এ-কথার উত্তর দিতে হ'লে—”

—“আজ্ঞা, তবে কাজ নেই।” কিন্তু আর-একটা প্রশ্নের ?

স্বপন হেসে বলল : “তোমাদের জাতের সব ভালো, কেবল ঐ এক বিষয় দোষ তোমাদের গ্রাফ-টাইটানিক শত জিরফারেও টর্পিডো হয় না—নাচতে নাচতে চলে—বতই কেন না ডুবু ডুবু হোক।”

—“এড়িয়ে গেলে শুনছি না।—অস্বস্ত একটা প্রশ্নের তো উত্তর দিতে, ভুঁমি বাধ্য।—তাকে আমার কথা বলেছিল ?”

• স্বপন বহু হুয়ে বলে : “হ্যাঁ।”

—“সে কী ভাবে নিজে ?”

স্বপন বিম্বিত হ'য়ে আনার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে : “তুমি কি ভাবছ—?”

—“আমি ভাবছি না কিছুই—আমি জানি।”

—“কী জানো?”

—“যে, চাঃ যখন তোমাকে তার অভিভাবক ক'রে রেখে এসেছিল তখন—”

—“খামলে কেন?—আমার মন চঞ্চল হয়েছিল? এই তো?”  
স্বপন জোর ক'রেই বলে : “এই তো?”

—“রাগ করছ? না স্বপন, রাগ করতে তুমি পারো, এ-সবই যে আমার অনধিকার-চর্চা, মাপ কোরো। কোন্ অধিকারে—” বলেই সে ফের চুপ ক'রে গেল।

স্বপন সহসা আঙ্গি বোধ করে। আনার মুখ ট্যান্ডির মধ্যকার ঘোরালো আলোর এমন মায়াময় দেখায়……সে তার বাহর 'পরে হাত রেখে বলে : “না জানি। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ইলাবেলের চেয়ে বেশি সত্য। তার ওপর যদি তাকে তোমার কথা ব'লে থাকি—তবে তোমাকে তার কথা বলব এ-প্রত্যাশা তোমার পুঁথই জ্ঞাত্য। এতে অধিকারের প্রশ্নই—”

—“নিশ্চয় ওঠে। মনে নেই এইমাত্র মসিচে কেনার দাবি সম্বন্ধে কী বললেন?”

—“কের উচ্ছ্বাসিনী ভঙে কথা? এ-কথা কেন তুমি বিশ্বাস করবে না শুনি যে, তোমার কাছে আমার মনের দুয়ার খুললে আমি আনন্দ পাই?”

আনার চোখ দুটি উজ্জল হ'য়ে উঠলো। একটু চুপ ক'রে থেক্বে বলল / “তা হ'লে বলা।”

বশন বলল : “তা হ’লে ট্যাক্সিটাকে একটু ঘুরে যেতে বলি—নইলে মাকশখে থেমে রসভঙ্গ হবে।”

—“বেশ।”

বশন শোকারকে ব’লে দিল—Avenue de Champs Elysees সোজা বরাবর গিয়ে Avenue de Neuilly ধরে বরাবর গিয়ে সেই নদীতে প’ড়ে তবে Louvre-এ ফিরতে। প্রায় আধঘণ্টা বেশি ভ্রমণ।—

শোকার মহা খুশি—মোট পূর্ববোরার \* মিলবে নিশ্চয়ই। খুব সোজা-সোজা মাথা নেড়ে হঠাৎ নেমে দু’ধারের সবুজ ক্রীন টেনে কামরাটিকে একটু রঙীন করে দার্বাক হলে ছুটল—একবারও ঘাড় না ফিরিয়ে। পারিসের ট্যাক্সিওয়ালা তো!

বশন প্রথম থেকেই বলল সব। কিছুই গোপন করল না—কেবল চাতুর্য প্রতি তার প্রথম দিকের ঈর্ষার ইতিহাসটুকু বাদ। চাং চ’লে আলার দিন ইসাবেলার তাকে ভাই বলা—তারপর নোকোর কীর্তি—সর্বশেষে চাতুর্যের জীবন-কাহিনী। ট্যাক্সির ছলুনিতে আনার কোমল হাতের স্পর্শ ওর মনের নিভৃত আবেগকুঞ্জে এ-স্বীকারোক্তিতে কেমন যে এক তৃপ্তির সোরড নিবিড় হ’য়ে ওঠে!...থেকে থেকে আনার জার হাতের নরম চাপ এত নরম করে দিচ্ছিল!...থেকে থেকে তার চোখের মধ্যে ব্যাথা ঔৎসুক্য দরদ—সে কত রকম ব্যক্তনা!...থেকে থেকে ঈর্ষা সারি—সাগ্রহ প্রশ্ন—সে কী গভীর অস্তিনিবেশ আনার!...বশন জানত সে-ই এক ভালো শ্রোতা। আজ দেখল মেয়েরাও বশন ঔৎসুক্য বোধ করে, কারমনোবাকো গুনতে জানে। কেবল ছেলেরা শোনে মন দিয়েই

\* Pourboire—বখশিশ।

প্রধানতঃ। মেয়েরা শোনে—বহি শোনার ভাগিদে বোব করে অবত—  
তাদের প্রাণের ভাগিদে।

বসন বার বার এটা দেখেছে ইসাবেলা, সন্ধ্যা, আনা তিনজনারই  
কেছে। শুধু তাই নয়। মেয়েদের কাছে বসন সে ছবিরের দ্বারা খুঁজে  
...এমন এক বিশেষ ধরনের ভূমি পেয়েছে...যে সে...কী বলে তার  
বর্ণনা করবে? সে যে অনির্জনীন।...মনে হলেছে পুরুষের পৌরুষ,  
বাহুবীরের কাছে বড় উচ্চ, জীবন্ত, প্রত্যক্ষ হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করে  
বহুদের কাছে মুখি তার সিকির সিকিও করে না। বহু ও বাহুবী  
—বাহুবী ও বহু—ওদের সাড়াই যে আলাদা।—একর অভাব অপর  
পূর্ণ করতে পারবে কেমন ক'রে? মনের কথা বহুও টেনে বার করতে  
জানে। কিন্তু প্রাণের—সে পারে এক বাহুবী। ইসাবেলার নানা কথা  
নানা প্রশ্ন নানা আত্মকথনে আনার সাড়া দেওয়া—এ-ও এক বিভিন্ন  
ব্যাপার নয় কি? একটা মনের নানা মিক, নানা গমক, নানা তান আলাপ  
আর—একটা মনের তারে কী রকম অল্পরপন তোলে—তা দেখে তা শুনে  
তা অল্পতব ক'রে কল্পনা ক'রে তবেই না মেলে হার্মিনির আভাষ—  
স্বরসম্পাত। মনে পড়ে : পদ্ম একদিন আর—একটা উপমা দিয়েছিল  
এ-সম্পর্কে কাহিনীতে : একটা সুরের নানা বোল হচ্ছে মেলডির একক  
সেখা—আকাধিকা। একাধিক মেলডির ষাট-প্রতিষাটে তবেই না  
কাউন্টারপয়েন্ট—তবেই না হার্মিনি। ঠিক বলেছিল সে। আজ  
এ-ট্যান্ডিতে ইসাবেলা ও সন্ধ্যাকে নিয়ে তার নানা কাহিনীর কাঁপনে  
আনার মনের কত রকম হৃদয় সোলা যে সে দেখল...অল্পতব করল—  
তা কি কুলবার? এক বিভিন্ন অনাবাদিতপূর্ণ রস উপচিত হ'য়ে উঠে  
যেন এ আত্মীর জেদীর মধ্যে। যেটনীর নামান্ত অঙ্গলবনে একই  
অল্পতবের কত রকমই না হ'বে বদলার, না? তার টুডিকতে বসে আনার

আজকালী মোনার মায়কতা এক রকম... আর আজ যেটুকু তার কাছে নিম্নের কথা কলার রস আর-এক রকম।... কী অস্বস্তি মিত্তা আর বুকের মধ্যে ঘুলে ওঠে থেকে থেকে।... এই-তো জীবন! ইলাকোর সংস্পর্শে এসে অহুত্বের বেদনা? তাতে কি? সে-সবের বেদনা দুঃখই হয়েছিল—সত্যি। কিন্তু আজ? সে কি এতে ক'রেই আনার কাছে কত বেশি চিত্তাকর্ষক হ'য়ে ওঠেনি? পল্লবের আর-একটা কথা পড়ে মনে : অভিজ্ঞতার অহুত্বের বৈচিত্র্যেই না কদমরাগে তানালেশের সৃষ্টি! তাতেই না মানস-সম্পদ আবেশ-সজ্জারের সৃষ্টি! যারা বলে চাই শুধু সরলতা, তারা জানে কী জীবনের পরিমার, উল্লাসের, পুলক-শিহরণের?—দুঃ! চাই ঐশ্বর্য—চাই জটিলতা। এ-কথা আনাকে সে বলেছিল। আনা উত্তর দিয়েছিল : “মসিয়ে বেনারও এই কথাই বলেন। প্রায়ই বলেন : গেটে মৃত্যুশব্দার বলেছিলেন—Macht doch den Fensterladen auf, damit mehr Licht hereinkomme.—জান্না খুলে দাও, আরো আলো আনুক, আরো আলো—। আজকের মাহুয বলে : আরও জটিলতার আবর্ত রচনা কর—পাকের পরে পাক, ফুরের পরে ফুর যাতে আমরা আরো চিনি নিজেদেরকে। কেননা সরল একটানা নিহন্দ জীবনেই যদি মাহুযের মুক্তি—তবে জটিলতার চালুতে একবার যাত্রারস্ত হ'লে শেষ পর্যন্ত না গড়িয়ে কেউ থামতে চায় না কেন বলতে পারো?”

ঈশন একটু ম্লান হেসে বলেছিল : “আর চাইলেই কি পারে।”

আনা বলেছিল : “ঠিক। চাংতোমাকে সেদিন মিথ্যা বলেনি যে আমরা আধীন শুধু দেখতে। আসলে আমরা নেপথ্যের লক্ষ শক্তির খেলার পুতুল। নইলে পরীর প্রাসাদ নিম্নে ছায়খার হয় কেন বলো জীবন-পথে প্রতিধ্বনি কাকে? ইন্দ্রপুরীর প্রতিষ্ঠা ভূমিকম্পের ওপরেই কেন হয় নিত্য নিত্য?”

## বিপ্লবতালগ

বিভার্ড কুশেতে আনার ও স্বপনের 'কুশে-লি' টেরে প্রথম ক'রে  
 দিয়ে ট্রেনের বাগিশ ও বিছানা বিছিয়ে দিয়ে কমানী গার্ড মন্থর হেসে  
 বে রকম অর্থপূর্ণভাবে স্বপনের দিকে তাকালো তার ব্যঙ্গনা আর হাই  
 হোক না কেন স্বার্থক যে নয় এ নিশ্চয়। স্বপন কটু ক'রে তাকে  
 একেবারে কুড়ি হ্রী পূরবোরার দিগে কেল্ল। দাতা-কর্ণর তৃষ্ণি আকাজ  
 করতে পারে বৈ কি সে আক।

গার্ড একগাল হেসে বলল : "যদি কাল তোরে কি আজ রাতেই  
 দরকার হয় মসিয়ে, তবে এই থকটাটি শুধু একবার বাজালেই হবে। বত  
 রাতে কিবা বত তোরেই হোক না কেন—সব আমি 'কুশে'তেই দিয়ে  
 বাব। রেক্তর' গাড়িতে মাঝামের কট ক'রে যেতে হবে না।"

স্বপন ঈষৎ হেসে ধস্তবাদ দিয়ে তাকে বিদায় দিল। রূপচাঁদ...

আনা বলল : "তারি অন্তায় করলে।"

—“কী ক'রে?”

—“অত বেশি বখশিশ দিগে। তোমাদের মত ধনী বিশেষীয়াই তো  
 পারিসের পথে ঘাটের সব কর্মচারীদের অকর্ম্মা করে। বিশেষ ক'রে  
 আমেরিকানদের দাক্ষিণ্যের ফলে এমনই হয়েছে যে ওরা বখশিশ না  
 পেলে এক পা এগুতে চায় না। অথচ বদনাম হয় শেবটার ক্রান্তের  
 একার।”

—“উঃ! তোমার এ-দেশান্ত্রাণা মুক্তি তো কৈ আগে কোনেদিন  
 ধরেনি?”



—“কথাটি না। আমি অভিভাবক, কন জেনা।”

আনা হেসে কেল : “উঃ! বড় চাল বে! আচ্ছা—কি বলল কুপি একটু—কেননা এটা ঠুড়িরো নয়।”

বলতে না বলতে স্বপন বেরিয়ে এসে করিডোরে দাঁড়ালো—কুপের নীল ক্রীনটা টেনে দিবে।

• •

—“আসতে পারো এখন।”

স্বপন ঢুকে কুপের দরজা বন্ধ ক’রে দিল। আনার দিকে চেয়েই বলল : “এ কী! ড্রেসিং গার্ডিন প’রে ব’সে? আমি বলি—বুঝি হাত-শেমিজ প’রে শুয়ে পড়ছে।”

—“ট্রেন না ছাড়লে শুতে পারে মাচুন?”

—“খুব পারে—কিশব আসন্নরাত্রি।”

—“ও কিছু না। একটু জল এনে দেবে?—নির্মল বারি।” স্বপন বেরিয়ে গেল।.....

আনা ঢক ঢক ক’রে প্রায় এক গেলাস জল খেয়ে কেল। কিছু তবুও ট্রেন ছাড়বার বাঁশি বাজে না। আনা কাল : “নাঃ আগেই শুয়ে পড়তে হ’ল দেখছি।”

স্বপন উদ্বিগ্ন হয়ে তার কপালে কের হাত রেখে বলল : “হঁ। অর বৈ কি। কী হবে?”

আনা হেসে কাল : “তা-ও জানব আমি?—বাক্ বাঁচা দেল। শেখটার ছাড়ল ট্রেনটা। আমি তাবছিলায় আজ লাক্সরতি বুঝি ম্যাটকর্ষেই কুপেতে বন্ধ হ’য়ে জোড়ো রোমান্সের মহলা



দিতে হয়।" স্বপন হাসল...অস্বস্তিকর হাসি। ক্রোশে অর! যদি  
বাড়ে—যদি.....

\* \*

স্বপন নিজের বিছানার ওপর থেকে নিজের দামী সীলকিন কবলটি  
আনার ওপর বিছিয়ে দিয়ে সযত্নে ধারগুলো শুষ্ক দিলো চামড়ার  
তোষকের নিচে।

—“ও কী করছ ?”

—“নাঃ, কাঁপছ যে।”

—“ও কিছু না, এখনুনি খেমে যাবে—তা ব’লে আমার কবলটা—”  
কলতে কলতে কাঁপুনি বেড়ে উঠল। স্বপন তাড়াতাড়ি তার বিছানার  
উপরকার দুটি কবলের একটি কবল আনার ওপর ঢেকে দিলো।”

—“কী হচ্ছে শুনি ? রাতে তোমাকে বুকি ঘুমুতে হবে না—না  
তোমার শীতে কাঁপুনি ধরলে—”

—“আমার বাকি ঐ একটা কবলেই হবে। যদি নিতান্ত শীত করে  
আমার কার ওতারকোটটি মায়ে কে ?”

—“না না—সে হবে না। এ কবলটি নাও je vous en prie—  
implo—” \*

—“চুপ—কথাটি নয়। বাজে তর্ক রেখে আমার কথার উত্তর দাও :  
খুব শীত করছে ?”

—“না, ধন্যবাদ, একটু কমছে। দুটো কবলেও যদি না কমে—  
বন্ধুকে বকিত করে—”

\* “অস্বস্তিকর করি তোমাকে বিভ্রান্তি।”

—“কে-র?—শোনো, আর-একটা কল দেব কি? সজি বলছি আমার শুধু ওভারকোটই চলেবে।”

—“না না না:। এবার বিব্রোহ করব কি—সজিতাবি কতিভাবকের ডেকি-জাহাজ দেব টর্পিডো ক’রে।”

—“আচ্ছা আচ্ছা—” বশন হাসল।...

—“কী?”

—“বিশেষ কিছু না।”

—“তবু?”

—“মাথাটা কেমন ব্যথা করছে।”

—“একটু আন্পিগ্নি দেব? ড্র্যাগি?” গার্ডের বোতামে হাত দেয়।

—“ড্র্যাগির দরকার নেই—শুধু আন্পিগ্নিনেই হবে।”

বশন তার হ্যাণ্ডব্যাগটা থেকে আন্পিগ্নি বার ক’রে আনাকে খাইয়ে দিল।.....

—“কাপুনি তো কমছে না জানা? নাও আমার এ কলটা—  
অল্পরোধ—je vous en prie.”

—“কে-র? সারারাত তুমি শীতে হি হি করলে বুঝি—”

—“আমাদের রক্তে এত সুব্যাকরণ জমাট হ’য়ে আছে—যে ভাঙিয়ে খাওয়া চলে—উটের পিঠের পিণ্ডের মতন।”

—“এপাতী ম’ শেতালিয়ে!” †

† Epatant, mon chevalier—সাবাস বীরপুরুষ!

স্বপন হেসে বল : “ভাই সই। কিন্তু মোহাই তোমার, বীভূনারীর মতন কখনটা নাও। সত্যি বলছি আমি কতদিন ছিনে ওভারকোট চাপিয়ে ঘুমিয়েছি—”

আনা চক্ষের নিম্নেবে উঠে বলল : “আমি কখনো শোবো না— শোবো না—শোবো না।”

—“বাপরে—থাক থাক। শোও—শোও—আর কখনের কথা তুলব না—হ’ল ?”

আনা হেসে শুলো। স্বপন আলো নিভিয়ে দিল।...

\*  
\*  
\*

—“স্বপন !” হঠাৎ ঘরের চাপা সবুজ বিজলি বাতিটা জলে ওঠে। স্বপন চমকে ওঠে :

—“কী ? কষ্ট হচ্ছে ?” বলতে বলতে উঠে বসে।

—“না—অরটা বোধ হয় কমছে। মাথাধরাও। আশ্পিরিনে উপকার হয়েছে। আর-একটু জল দেবে ?”

স্বপন জল দিল। গার্ড একটা কাঁচের ফ্লাস্ক-এ করে জল বেঁধে গিয়েছিল।

—“কিন্তু তুমি ঘুমোওনি এখনো ?”

—“মোটো এগারটা। বারটার আগে আমি শুই ?”

—“আমি কি ইলাকো দেয়ানো যে জানব ?”

স্বপন অগ্রতিত হ’য়ে বলল : “কী যে সব তোমাদের ঠাট্টা ! শোও তো এখন কাজলামি হচ্ছে।”

• —“আমার ঘুম পারনি যে—বাঃ।”

—“তবে কী পেয়েছে ?”

—“কথা।”

—“বলিযের কি সাথে বিশ্বয় প্রকাশ করেছিলেন গোণা মেয়েকে কিসে করতে চায় না এমন অর্ধাচীনও আছে জগতে ? বাপ্—বাপ্—জর ছাড়তে না ছাড়তে কল্ কল্ কল্ কল্ ।”

—“আ—হা । বেম হেলেরা সবই গুহাবাসী মৌনীবারা ।”

• বপন হেসে বলল : “তুমি শেনা তুল করেছ আনা । তোমার স্বপ্ন মডেলিপনা নয়—উকিলিপনা ।”

—“সই । কিন্তু গল্প করবে এবার একটু বরদীপনা জেবে ।”

—“না । তোমার জর—শোও ।”

—“দেখ কপালে হাত দিয়ে—বার হচ্ছে, কখন জর ছেড়ে গেছে ।”  
ব’লে বপনের হাত টেনে আনা নিজের কপালে রাখল ।

—“আম্পিরিনের জর ।”

—“এখানে বোসো তবে আমার পাশে । একটু গল্প করো ।”

—“গল্প কি ও-ভাবে করা যায় ?”

—“যায় ।—আচ্ছা, গল্প যদি না করতে চাও—হু-একটা প্রেমের সত্য উত্তর দাও, দেবে ?”

—“সাদা কাগজে সই ?”

—“কতি কি ? মনে সেই তুমি আজই বলেছ—আমার জন্তে বিপর তুমি হ’তেই পারো না ।”

বপন হাসে : “সাথে তোমাকে বলছিলাম তোমার আসল রূপটি উকীলার—কোকিলার নয় ?”

—“ও-রকম করে আমার প্রসঙ্গে এড়ানো ? আবি বা কলম ভায় সোজা উত্তর দেবে কি না ? বোলো ।”

—“সেটা কি প্রশ্ন তার ওপর নির্ভর করে না কি ?”

—“বা—ও, আমাকে তুমি বিশ্বাস করো না।” ব’লে আনা ঠোঁট ফুলিয়ে পাশ কিয়ে গেল।

অপন হেসে বলল : “আচ্ছা দেব দেব। এমন নির্ভরভাবে কিরিতও না মু’খানি।”

আনা বালিশে মুখ গুঁজে উগুড় হ’য়ে শুয়ে বলল : “না, কাজ নেই। আমি চরতো তোমাকে এমনই অনাস্থা সব প্রশ্ন করতাম—”

অপন সাহস ক’রে হঠাৎ ঠাট্টার ভরে বলল : “তুমি আমার সঙ্গে আজ এমন ব্যবহার করছ যেন আমরা দুজনে প্রণয়ী প্রণয়িনী।”

আনা তার রাগ ভুলে পাশ কিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বলল : “আচ্ছা যদি হতামই তা হ’লে সাক্ষী সত্যি কি থু—ব মর্দাহত হতেন? কিংবা ইসাবেলা?”

—“এই-ই ছিল তোমার প্রশ্ন?”

—“না—সে আর-একটা প্রশ্ন। কিন্তু এ-প্রশ্নের উত্তরই দাও আগে।”

—“ও—রে। তার মানে তুমি একটার স্থলে দুটো প্রশ্ন ক’রে নিতে চাও এই কিকিরে।”

—“যদি চাই-ই—তা হ’লে কি সাংঘাতিক উকিলিপনা হ’লে পড়ে সেটা?”

—“তা নয়। তবে অত জনিতা করলে নিরীহ মানুষের মনে ভয় একটু হয়ই। বান্ধবীকে ভয় নেই ব’লেই যে জেরাকারিণীকেও ভয় নেই তা ভো সাব্যস্ত হয় না?”

আনা হেসে বলল : “তুমি যতটা নিরীহ সাজতে চাও তুমি ঠিক ততখানিই নিরীহ কি না সে-বিষয়ে আমার বিলকণ সন্দেহ আছে ন’ শেভালিয়ে!”

অপন হেসে বলল : “বে-লোক জীবনে একজন মেয়েরও দরদর নয়

করেছে—তা তাকে বিয়ে ক'রেই হোক বা না-বিয়ে ক'রেই হোক—  
সে-লোক ঠিক অনায়াসে ফুলের মতনই নিরীহ হ'য়ে গেল এ-কথা বললে কি  
তোমার সন্দেহ ঘন হ'য়ে উঠবে, না কিংক ?”

আনা হঠাৎ গভীর হ'য়ে তর্জনী তুলে শাসিয়ে বলল : “তুমি আমার  
প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না কিন্তু, মনে রেখো ।”

• —“দিতাম যদি অরের ঘোরে ফুল বকছ না এ-সবকিছু অকাটা প্রেমাম  
দিতে পারতে ।”

—“বা—ও ।” ব'লে আনা ফের পাশ ফিরে গেল ।

স্বপন হেসে বলল : “আচ্ছা আচ্ছা—এবার উত্তর দেব—কথা  
দিচ্ছি । অমন মান ক'রে মুখ কিরিও না মানমরী ! কেনো  
এদিকে ।”

আনা মুখ কিরিয়েই বলল : “ফেরালে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে  
কথা দাও আগে ।”

—“দিচ্ছি—সাধ্য সাধনা ক'রে ।”

আনা মুখ কিরিয়ে হেসে কেলল : “মা তৈঃ—প্রশ্ন করব না—  
দিলাম বর ।”

—“উঃ—যেন না দিলেই আমি গিরেছিলাম আর কি ?”

—“কেন রাগাচ্ছ আমাকে ? তা হ'লে করব কিন্তু প্রেম । আর শুধু  
সন্ধ্যা সবকিছুই নয় ।”

—“করো না যার সবকিছুই হচ্ছে । আমি ভরাই না ।”

—“আচ্ছা । তা হ'লে আমার প্রেম করি কিন্তু । দোষ নেই ।  
প্রথমে—প্রথমবার সবকিছু । বলোতো বন্ধু—তুমি আমি রাতের গাড়ীতে  
এ-রকমভাবে নির্জন কুপেতে একসঙ্গে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করেছি জানতে  
পারলে তোমার প্রিয়তমা মর্দাহত হবেন কি না ? মানে স্বদেশিনীটি ।”

অশ্বন একটু গভীর হ'য়ে গেল। বলল : "এ-কথার উত্তর দেওয়া মুখিল।"

—"কেন?"

—"কারণ—মিলে তুমি হুজুমে ভাববে বসেশিনীকে আমি বাড়িয়ে বলছি—যেমন সবাই বলে স্ত্রীর সখকে।"

আনা হেসে বলল : "স্বামীর স্ত্রী-স্ততি সখকে তোমার ধারণা শুনলে আর কিছু না হোক, অন্ততঃ ক্রান্তের সবাই একটু বুকে বল পেতো অশ্বন। কিন্তু, বাক সে-কথা। আমি তোমার কোনো কথা বাড়ানো কথা মনে করব না, কথা মিছি। অকুণ্ঠে বলো তার সখকে যা বলতে চাও।"

অশ্বন সুর একটু নামিয়ে বলল : "সে সত্যিই একটু অদ্বুত গোছের মেয়ে আনা। প্রেম-সখকে তার ধারণা সত্যিই যেমন একরকম তেমনি নতলি গোছের। সে আমার গত মেলে কি লিখেছে শুনবে? না—এখন তোমার ধুমোনা উচিত। একে তোমার জর হয়েছিল—আজ জুমাও, কাল বলব।"

কোটুলে আনার মুখ যেন দীপ্ত হ'য়ে উঠল। বলল : "আমার জর সত্যি ছেড়ে গেছে—এই দেখ—জুলজুল ক'রে বাম হচ্ছে।" বগল ওপরের একটি কবল ফেলে দিয়ে অশ্বনের দুটি হাতই নিজের কপালে রাখল।

—"তাই তো। হিপ্ হিপ্ হরে আশ্পিরিন!"

—"হরে রেখে বলো না—কী চিঠি লিখেছে সে। আমি কাউকে কবল না।"

অশ্বন হেসে বলল : "কাউকে বলোই বা কি?—সে তো আমার শুভ প্রেমস্বিনীও নয় সেন্ত্যাগিনী পলাতকাও। না—কলহিনী নাম রটাবার মুখ নেই।"

আনিত হইল। কল : “কুমি যে ভারি সুখকৌতুহলই উঠেছে দেখছি  
হাসিলে।”

—“হবে না ? কীকাজকে ?”

—“যদি বলি সৈনিক-বংশোদ্ভূত—নীল-প্রবাসিনী হেলেন-নরনা ?”

—“তা হ’লে শুধু বলব—কুমি বাই হও—কুলনাকমা নও।”

• —“যথা ?”

—“যথা : এ-বিষয়ে কোনো বংশোদ্ভবাই তোমার কাছেও আসতে  
পারেন না।”

—“অজ্ঞান। কিন্তু বাজে কথা দিয়ে আসল কথাটা চাপা দিতে  
দিচ্ছি নে : বলো, কি লিখেছে সে।”

—“উঃ, স্বীকৃতির কোতুলক কী নাছোড়বন্দ !”

—“যাও। চাই না শুনতে।” ব’লে আনা ফের পাশ ফিরে গেল।

—“আহা চটো কেন ? ঠাট্টাও বোঝ না। শোনো—আমি বাস  
চিঠিটাই অজ্ঞান ক’রে প’ড়ে শোনাচ্ছি।”

আনা বিদ্রাবেগে মুখ ফেরাল, বলল : “চিঠিটা কি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে  
বোঝো নাকি কষ্টমালা ক’রে ?”

এ-কথার উত্তর না দিয়ে হেসে তার ছোট্ট আত্মশে-কেস খুলে চিঠিটা  
বের ক’রে পড়তে আরম্ভ করল। একটু একটু ক’রে প’ড়ে থামে ও  
অজ্ঞান করে।.....

## বিতর্ক

• পড়া শেষ হ’লে আনা ধানিক চূপ ক’রে বসিল ; পরে বলল : “ভারি  
মিষ্টি তো তোমাদের ভাবা ! অনেকটা কলসীধের মতন আবার।”

—“মুন্সির নিজের ভক্তি ?”



আনা কথো উঠে বলল : “মোটাই না। সত্যিই আমার ভারি আশ্চর্য লাগছিল—হানে হানে উচ্চারণ পদ্ধতির সত্যি। তোমাদের ত ম, ও চক্কবিল—কী রকম আশ্চর্য করাসী উচ্চারণের মতন। ইংরাজী বা জার্মানের কাছ দিয়েও যায় ?”

বপন হেসে বলল : “সাদৃশ্য শুধু ঐটুকু ?”

আনা বলল : “না। ভ্রামলিনী খবলিনীর ওপর ছড়াটির মধ্যের ককাসী রসিকতার আমেজ হবহ।”

—“কেবল যা একটু বাড়াবাড়ি আছে ওর ফিলসফির মধ্যে।”

—“মোটাই না—অকরে অকরে সত্য।”

—“কেমন করে ? যুরোপে কি ভ্রামচর্চের এ লোকের একটা বিষয় নেই বলতে চাও ?”

—“আজই বলছিলো না—নীলের হোটেল থেকে সে যে পুস্তকের সঙ্গে সুন্দরী ককাসিনীর প্রীতি দেখে ইসাবেলা বলেছিল যে তার চোখে একটুও অসন্ত তেকেনি ?”

—“ইসাবেলার কথা আলাদা—”

—“একটুও না। ল্যাটিন জাতের যে-কোনো মেয়ের মধ্যেই ঐ কথা। ভ্রাতাদের মধ্যেও—বর্ণধেব নেই।”

—“কিন্তু ধর টিউটন বা অ্যাংলোসাক্সন ?”—

—“ওদের মেয়েদের মধ্যেও নেই বোধ হয়। অন্ততঃ অনেক স্থলেই যে নেই এ নিশ্চয়। ইসাবেলা খুব ঠিক কথাই বলেছিল যে অনেক ক্ষেত্রেই বয়ঃ উলটো : ভ্রাতাদের প্রতি যেভাঙ্গিনীর টান বয়ঃ বেশি।”

—“কিন্তু ভ্রাতাদের প্রতি বা Yellow-perilএর প্রতি যুরোপের জাপক বিষমুখতার কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ।”

—“মোটাই না। কিন্তু আমরা তো এখন সমস্তাটির রাষ্ট্রগত বা

জাতিগত ব্যাপকতার বিচার করছিলেন না, করছিলেন ওর বৌদগত সত্যের। 'আমার বক্তব্য ছিল—একিক দিনে দেখতে গেলে বৈশাদৃশ্যই যে অনেক সময় বেশি টানে এ একটা অত্যন্ত জানা ডাক্তারি সত্য। সন্ধ্যার ছড়াটি তাই নতীর হয়েছে।'

বশন হেসে বলল : "অ্যাডমিরেশন যে কবেই উঠে পড়ায় উঠছে সেটা ~~বতাব-বতাবী~~!"

—"সত্যি, তাকে দেখতে এত ইচ্ছে করছে আর।"

বশন চুপ করে থাকে।

আনা হঠাৎ বলল : "তাকে তার ক'রে লাগে না মীনে আসতে।"

বশন হো হো করে হেসে ফেলল : "সাথে কি আর মেয়েমানুষকে বিধাতা মেয়েমানুষ নামে ডেকেছেন।"

আনা রাগতঃ হুয়ে বলল : "কেন একেবারে তারি অসম্ভব প্রত্যয় করেছে।"

—"নর? কলকাতা থেকে নীসে আসা কি হুয়ের কথা নাকি?"

—"শক্তটা কী শুনি? তোমরা ধনী—তোমার স্ত্রী পালা নব্যা—নইলে এ-ধরনের কবিতা আসত না কলমে। আমি যদি এক কথায় তোমার মতন দুদিনের আলাপীর সঙ্গে একেবারে একলা পারিল থেকে নীসে পাড়ি দিতে পারি তা হ'লে তার পক্ষে নিরাপদে কলকাতা থেকে হুয়েগে আসা কি এতই অকল্পনীয়?"

—"বাঃ—দুজনের কথটা বেনালুম তুলেই বাজ।"

—"আজকের দিনে তাতে বিপর কতটুকু—যদি টাকা থাকে? তা ছাড়া, যে-ভরপী এ-ভাবে হুয় থেকে বাবীকে কড়ে আঙুলের ওপর ঘোরাতে পারে সে কিছুর না কেনে ম্যাডামসকারে রক্তনা হ'লেও হুজির কন্ডলের জোরে গল্ফবল সেঁচিতে পারবে এ অব।"

—“বাপু! একটা কবিতা পড়েই? আজ! ভক্ত: তোমার  
কথা শুনা তাকে আমি জানাব। যেয়েও ভক্তাধীন। কে বলতে পারে—  
তোমাকে বর দিতে ছুটে আসবে না?”

আনা হাসিমুখে বলল : “বেশ বলেছ।” বলেই নিজের কপালে  
স্বপনের হাত ফের রেখে বলল : “দেখ, এত হাসি গলে আমার জর  
বোধ হয় ছেড়ে গেল। ঘাম হচ্ছে। তোমার সীলকিন কঞ্চলটা সরিয়ে  
নেও এবার। কেমন, এখন তো আর আপত্তি নেই?”

—“নেই? বিলকণ! তা হ'লে অভিব্যক্তি হওয়া কেন বেকায়দা?  
—না না আনা, ঠাট্টা না—ঐ কঞ্চল মুড়ি দিয়েই এখন ঘুমোতে হবে।  
আর রাত করাও না। শুভরাত্রি।” বলেই দিল আলো নিভিয়ে।

## দ্বিধার দোলায়

পাশে তরুণী। গাড়ী হ হ শব্দে চলেছে। স্বপন ওভারকোটটা  
মুড়ি দিয়ে শোর। কিন্তু ঘুম আসে কই?...মাঝে মাঝে আনার  
নিঃশ্বাস গ্রন্থাস ও উল্লেখ তোলে যে কত রকম চিন্তার ঢেউ!...  
কত কী ভাবনা!...এ কী রকম অবস্থা! একে রোমান্টিক না বললে  
রোমান্স বলা দাবে কাকে? পরশুই ইজিপ্ট বাজিল না? আর আজ  
কত ছোট ছোট ঘটনাই যে জীবনের গতিপ্রবাহকে বড় বড় মোড়ের  
দিকে কিরিয়ে দেয়!...কিন্তু—

কার তার হঠাৎ ওর স্বপ্নে এসে তার করল অতিক্রম? ইসাবেলার  
হাত থেকে পরিচয় পেতে-না-পেতে আবার এ কী অবতন হলো দেখি?...  
সে হালো আপন মনে : চাঁদের কাহিনী মনে পড়ে—পালিয়ে অস্বস্তিক  
—ও কী হল—এ বুঝেই জগতে? শান্তির নিরাশা কোলে চিহ্নিত

যে অসম্ভব আনন্ডনিসম—এ-মুগে। নইলে থাকে এড়িয়ে চলার ভয়ে তার এত প্রবৃত্তি, এত বিবেক-বংশন, এত চেষ্টা, এত আবেগ—শেষটার পালিয়ে-আত্মরক্ষার প্রয়াস—সে কি এ-ভাবে কিরে আসত? চাঁদের চাকার উপমা মনে পড়ে যায়।—যে-মুহুর্তে তার সর্বোচ্চ কিছুটা তাবে মূলোর আর ভয় নেই—সেই মুহুর্তেই তাকে নিশানা করতে হয় এই ধলোকেই। নির্ভর মুক্তি? হায় কবিকল্পনা!

ভাবতে ভাবতে মনটা সাধনার রাগে রঙিয়ে ওঠে।...আত্মপ্রসাদ। সঙ্গে একটা নিবিড় কারুণ্য, একটা রক্ষণা-বেকনের অস্বকৃতি, একটা অনিশ্চয়ের সার্থকতা। কী মধুর এ তৃপ্তি! হঠাৎ মনে পড়ে ফুলশস্যার রাঙাটি—যেদিন কণ্ঠগদ্য সন্ধ্যাকে সে চুষনে চুষনে ছেয়ে দিয়েছিল!... সন্ধ্যা সে-আবেশের সঙ্গেও ছিল না কি এই ধরনেরই একটা তৃপ্তির রেশ—অসহ্য-সহ্যী পৌরুষ-গর্ভ? অসহ্য—কেননা তার আগেই তার কানে এসেছিল সন্ধ্যার একটা ফুলফুল নাকি ধারাপ। তার বাবা সেজ্ঞত আপত্তিও করেছিলেন প্রথমটায়। কিন্তু একথা শুনে সে আরও আরবার ধরে যে এই মেয়ে নইলে কিরেই করবে না। অথচ এ দুই অস্বকৃতির মধ্যে প্রভেদ কী আকাশ-পাতাল!—কিন্তু সত্যই কি প্রভেদ এর গভীর? কে জানে? ভেবে ফুলকিনারা পায় না।...

\* \*

দূর—আশঙ্কা, অস্বস্তি, মোহ—এ-সব কি আবার! আনন্ড একটু সেরে উঠলেই তাকে পাকিসে ফিরিয়ে আনবে। এতে এত শত রোমান্সের প্রায়ই বা ওঠে কোথা থেকে, আর অস্বস্তি তার ফুটবে এ-সবের ভেতর বা আসে কোথা থেকে? সে পাশ দিয়ে শুদ।

কিন্তু কোথায় একটা অর্ধ-ফুট বর বেন একটা অর্ধ-কীটায় মন

তাকে বিবর্তে থাকে। না পার তার দিশা—না পারে তাকে অপহৃত করতে। বেন একজটা...

কী কাজ?—সে রুখে ওঠে। সে করেছে কী শুনি? একটি অলহারা বান্ধ—নারীর, নারীর প্রতি তার বহুজনোচিত কর্তব্য বান্ধ। এ না করে তার কি উপায় ছিল? তবু একটা 'কিছু' জানে—সেই অস্বস্ত কীটা। শুধুই কি বহুজনোচিত কর্তব্য?—এউৎসাহ কি অবিমিশ্র বহুজনোচিত কর্তব্যপালনের উৎসাহ? পরোপকার?

তার পরেই তার মনে পড়ে আজ ট্যান্ডিতে আনার সঙ্গে তার বোলাগুলি এত কথা। ইসাবেলার কথা সে-ও শুনতে চাইল কেমন সহজ দাঁকিতে—আর স্বপ্নমণ্ড বলল কেমন সাগ্রহে!...সর্বোপরি আজকের রাতের একজটলাপ? ওরা পরস্পরের আরো কাছে স'রে আসেনি কি অজান্তে? না, আনার কথাবার্তা অহুযোগ কৃতজ্ঞতা—এ-সবের মধ্যে বহুজনের সরল স্বাক্ষরের বাড়ি আর কিছুই পারনি সে?—বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে?

কিছু যদি পেয়েই থাকে—সে ফের রুখে ওঠে—যদি একটু কোমলভাব এর মধ্যে এসে থাকেই—কোমলভাব কথাটা সে বার বার উচ্চারণ করে—তা হ'লে তাতে কী এত ভাগবত অন্তর্ভুক্ত হ'রে গেছে শুনি? অস্বস্তির মধ্যে তরুণ বয়সে এ সবুজ মাথুখটুকুকে বাদ দিলে জীবন মরুভূমি না হ'রে পারে? ইসাবেলার কালকের কথা মনে পড়ে যায়—“তোমরা বড় বাড়াবাড়ি করো স্বপ্নমণ্ড—এ-সব ব্যাপারে একটু-আধটু তুলচুক নিয়ে।”

কিছু—সন্ধ্যা? তার শত চোঁটা সন্ধ্যাও কেবলই মনের মধ্যে সন্ধ্যার প্রায় ওঠে। বাড়াবাড়ি করতে হ'ত না যদি সন্ধ্যা না থাকত। যেখানে হু'পকই স্বাধীন সেখানে ক্রীণালিন্দু ঢলে—কিছু যেখানে একশক বাধা

হঠাৎ তার মনের কোণে এ-প্রশ্ন জেগে ওঠে আর-এক মুহূর্তে :  
ধরো আনার সঙ্গে তার আজকের সব কথাবার্তা কি সে সন্ধ্যাকে  
খোলাখুলি লিখতে পারে? যদি একথাবার্তার মধ্যে ঘোবের কিছুই  
না থাকে—বাড়াবাড়ি কিছুই না হ'য়ে থাকে—তবে না পুরুর কেন?  
কিন্তু পারে কি? প্রেমের একটা দাবি তো বনিষ্টতার?—এবং বনিষ্টতার  
কী?—প্রেমানন্দের কাছে গোপন কিছুই রাখতে না-চাওয়া নয়  
কি? দুঃ—প্রথমটা—এ-চেঁচে সে ভাবতেই চায় না। কিন্তু তবু না  
ভেবেও যে পারে না। ভাবতে-ভাবতে মনের কোণে সব সংশয় বেশ তবু  
তো একটু একটু ক'রেও কাটে। আনার আজকের আলাপ যে  
প্রেমালাপেরই অগ্রদূত এ-বিষয়ে সংশয়-পোষণ করার আর পথ কই?  
তাই না খোলাখুলি সন্ধ্যার কাছে আনা সম্বন্ধে সব কথা লেখা চলে না।

কিন্তু চলে-না-ই বা কেন? সন্ধ্যার প্রেমপত্র তো খোলাখুলি আনার  
কাছে পড়তে তার বাধল না! তবে অন্য ক্ষেত্রেই বা বাধে কেন?—  
হায় রে, বাধে কেন?—

হঠাৎ ঘুমের ঘোরে আনা কি-বেন বলল। সে কান পেতে শোনে।  
এ কী! আনা তার নাম করছে! ঘুমের ঘোরে! হয়তো তাকেই স্বপ্ন  
দেখছে!!! তার বুকের হৃদয় উদ্বেল হ'য়ে ওঠে।

হঠাৎ আনার একটি অনাবৃত বাহু তার কণ্ঠে এসে ঠেকে।... সে তড়িৎ-  
স্পৃহেৎ স'রে যায়। তার হৃদয়ের মধ্যে মুহূর্তে বিদ্যুতের তাল ওঠে বেজে।

• •

হঠাৎ আনার কান্ডরোক্তি শুনে কের চমকে ওঠে।

—“কী আনা?”—মুহূর্তে বিদ্যুৎ দিগ্ধ স্তম্ভতার ফেটে পড়ে।...

—“আমার কের এর এল কেন মনে হচ্ছে। মাথাটা বড় ধবোঁহ।”

—“টিপে দেব ?” স্বপন সেই সবুজ বাতিটার লুইচ টেপে ।

—“ন—ন—মনামি শের, বেসি ।” \*

এখন কোমল কণ্ঠ তাকে আনা কখনো ‘প্রিয়বন্ধু আমার’ বলে সম্বোধন করেনি । তার কণ্ঠস্বরে যেন আর্দ্রতা, ক্লান্ততা, মাধুর্য—উপছে পড়ছে ।

স্বপনের রক্তের মধ্যে নিবিড় হ’য়ে ওঠে কারুণ্য, সমবেদনা, কোমলতা । ওভারকোটটা গায়ে দিয়ে উঠে ব’সে আনার বার্ষের শিররে ব’সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে । কপালটা ফের যেন একটু বেশি গরম !

—“এ কী আনা ? ফের অর এসেছে যে খুব ? গা যে পুড়ে বাচ্ছে ?”

—“ও কিছু নয় ।” একটু থেমে মৃদুস্বরে আনা বলল : “বছর দুই আগে একবার আঁদোলনীনে বেড়াতে গিয়ে ভীষণ ম্যালেরিয়ায় ভুগি মাস ছয়েক । তার পর থেকে অর আমার স্বপনই হয় একটু বেশিই হয় । ওতে ভাববার কিছু নেই ।—তোমার হাত কী চমৎকার ঠাণ্ডা কিন্তু ! শীত কণ্ঠে না তো ? তার কণ্ঠস্বরে কোমলতার নির্ঘাস ভরা যেন !

—“না না । দেখছ না আমার গায়ে ওভারকোট ।”

—“তুমি এত ভালো মনামি শের—বেচারি !”

স্বপনের মনের মধ্যে অসুস্থতার জোয়ার ওঠে কুলে । সে তার ঝাড় মাথা টিপে দিতে দিতে বলে : “আচ্ছা গো আচ্ছা—হয়েছে । এখন সুসোবার চেষ্টা করবে কি একটু ?”

আনা তার একটা হাত নিজের হুঁচাতের মধ্যে টেনে নিয়ে নিজের পালে কপালে ঘাড়ে কণ্ঠে রাখতে লাগল : আঃ—। কী ঠাণ্ডা !”

• •

\* Non—non mon ami cher, merci—না না প্রিয় বন্ধু আমার, ধন্যবাদ

হঠাৎ চোখ মেলে আনা বলল : “হয়েছে—এবার তুমি বুঝোও স্বপন।”  
 স্বপন অবিধে ক’রে মাটিতে কখনটা বিছিয়ে ব’সে ওর মাথা টিপে দিচ্ছিল।  
 —“আচ্ছা গো আচ্ছা। আমার ঘুমের ভাবনা রেখে নিজের ঘুমের  
 চরকার তেল দেবে কি একটু?”

আনা ম্লান হাসে। আবছা সবুজ আলোর ওর মুখখানি কী সুন্দরই  
 দেখায়!...কঠিন অনাবৃত। হৃদয় নয় বাহু কখনের বাইরে।  
 এক হাত স্বপনের কোলে—আর এক হাত স্বপনের করতলে—মুজিত।  
 স্বপনের দিকেই পাল ফিরে শুয়ে। মাঝে মাঝে এমন ক’রে তাকায়!...  
 স্বপনের বুকের কত কাছে ওর মাথা! কয়েকগাছি চূর্ণালক শুভ্র গ্রীষ্মের  
 টেনের ঝাঁকুনিতে অল্প কাঁপে...কঠোর ঠিক মাঝখানে একটি সরু সোনার  
 হারে বাধা একটি লকেট।...কী মোহময় দেখায় ওর এ-নিষরা অরতাপিতা  
 মর্জি! ঠিক যেন বিশ্বকর্তার একটি ছবি!—নির্ভরের। ছবি...ছবি...  
 ছবিই বটে—স্বপন ভাবে।...

আনার খাস-প্রখাস মহর দীর্ঘজন্ম হ’য়ে আসে। ঘুমিয়ে পড়েছে।...  
 তখনও দেহ তালে তালে ওঠে পড়ে।...দেহের কত রেখা...স্বপন একদৃষ্টে  
 দেখে চেয়ে। কিন্তু সে-দৃষ্টিতে আর মানি নেই একটুও। সে তার  
 সমগ্র চেতনা দিয়ে একটি ছবি দেখছিল।—সত্যিই ছবি।—একটি  
 নির্ভরশীল অসহায় চিত্রাপিতা সুন্দরী তরুণী। তার বুকের মধ্যে তৃপ্তি  
 উপ্ছে পড়ে একটা গর্ভ...আবেশ...মাদকতা...



আনার চিবুক অবধি কখনটা ভালো ক’রে সঙ্গর্পণে টেনে দিয়ে সে  
 চারদার শুঁজে দিলো তোবকের নিচে। তারপর সবুজ ছোট আলোটি  
 মিলসা নিবিয়ে।



পাকী ফুলতে ফুলতে চলে। পাশে আনার নিয়মিত হ্রস্ব দীর্ঘনিশ্বাস  
ওঠে পড়ে...

## গ্রাস

স্বপন নীচে আনাকে নিয়ে গেল না। নীচে এ-সময়ে এত ভিড়  
সোজা গিরে উঠল গ্রাসে Hotel Beau Sejour-এ।

ছোট্ট হোটেলটি,—কিন্তু যেমন সুন্দর তার বাগান তেমনি উপভোগ্য  
তার নির্জনতা। গ্রাসের প্রায় শেষ প্রান্তে। এখানে লোকচলাচলও  
খিন্ন হ'য়ে এসেছে একটু। সামনের সৈকত ধপধপে সাদা। সকালে  
ঝিকঝিক ঝিকঝিক করে এমন!... আনা দেখে অরের তাড়সেও খুঁসি হ'য়ে  
ওঠে। স্বপন তাতে এমন এক গৌরবের হিম্মত বোধ করে... যেন  
এ-হোটেলের আবেষ্টনী তার নিজেরই সৃষ্টি!...

ঠিক সমুদ্রের সামনেই ওদের ছুটি ঘর। পাশাপাশি। প্রতি ঘরের  
সামনে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যালকনি। আনা এতে আরও খুঁসি হ'য়ে উঠল।  
অরের বেদনাও যেন ও ভুলে গেল সামনের স্তম্ভ আন্তরনের দৃষ্টি।  
স্বপনকে বক্তব্য দিয়ে বলল : “কী সুন্দর হোটেলটি!”

পুলক-উল্লসিত্তে আনাকে তার বিছানার বেশ পরিপাটি ক'রে  
ভইয়ে দিয়ে ও ডাক্তার ডাকতে পাঠালো। তার শেষরাত্রের দিকে  
অরটা একটু কমলেও—এখনো মুখচোখ বেশ রাতা।

—“ডাক্তার না-আসা পর্যন্ত কাছে বোসো স্বপন।”

স্বপনের এত ভালো লাগে এ সহজ হাবির দূর। এ তো অস্বাভাবিক  
কি—আবেশ। আবেশও সময়ে সময়ে কী মধুর লাগে!... স্বপন তার  
পাশে উঠে নিজের ঘোটা শীলকিন কবলটা বিছিয়ে দিলো—হঠাৎ।

—“ও কী করছ ? আমার কি এখনো শীত করছে না কি ?”

—“আহা—কেবল তর্ক করো কেন কনো তো ? ডাক্তার আসছেন—ততক্ষণ পর্য্যন্তও কি মস্তব্য দেওয়া স্থগিত থাকতে পারে না তোমার পারে কখন দেওয়া সম্ভবে ?” স্বপন তার মাথার হাত বুলাতে থাকে।...

\* \*

হঠাৎ আনা বলল : “আহা বেচারী ! একটা পথের মেয়ের জন্তে—”

—“খামবে একটু ? কেমন বোধ করছ ?”

—“বুকের মধ্যে কি রকম যেন ক’রে উঠছে থেকে থেকে। তারি তারি লাগছে—ব্যথার মতন। নইলে আর সব ভালোই।”

স্বপন আরও ভয় পেয়ে গেল।...

\* \*

ডাক্তার যখন এলেন তখন সন্ধ্যা প্রায় হুটা। আনার বুক পিঠ পরীক্ষা ক’রে তার সামনে হেসে বললেন : “কিছু না—একটু ইনফ্লুয়েন্স মতন। তার ওপর এতটা শব্দ দুর্বল শরীরে টেনে আসা—ওঠা নামা”—ইত্যাদি ! বাইরে এসে স্বপনকে বললেন : “এখানকার সবচেয়ে বড় হাট-শোপালিট ডাক্তার সিরেয়াকে কাল কনসালটেশনে ডাকা ভালো বোধ হয়।”

স্বপন শুকনুখে বলল : “ভয়ের কারণ আছে নাকি ?”

—“কিন্তু পারছি না, যা হুসুফে একটা আরগার—কিন্তু ডাক্তার সিরেয়াকে কনসালট না ক’রে কিছু করতে চাই না। মাদামের কথাটা মূরিসি হয়েছিল কি ?”

—“হ্যাঁ হাসি ভিনেক আসে।”

ডাক্তার সাহেবের মুখ আরও অন্ধকার হ’য়ে গেল।

—“কী?” স্বপনের ঘর ভেবে কঁপে ওঠে।

—“কিছু না। কাল সকালেই ডাক্তার সিয়েরাকে নিয়ে আসব  
তা হ’লে?”

—“নিশ্চয়। জিজ্ঞাসা করছেন কেন একথা?”

ডাক্তার বললেন : “তীর কী-টা একটু চড়া।”

স্বপন উচ্চাত্তর হাসি হাসল : “তা’তে কি?”

ডাক্তার উদ্ভাসিত হেসে মাথা নেড়ে বিদায় নিলেন। বিদেশী সুদর্শন  
মুখটির বেশভূষা যে আশাশ্রম তা বুঝতে তাঁর বিশেষ বিলম্ব হয়নি।  
টাইপিনটির হীরেটি সহজে দৃষ্টিই এড়ায় না কারুর—এত বড় হীরে।  
হঠাৎ স্বপনের কি মনে হয়। ডাক্তার সাহেব মোটরের পাদানীতে উঠবেন  
—এমন সময় ঘ’রে ফেলে : “শুধুন, ডাক্তার সিয়েরাকে এখুনি ডেকে  
আনতে পারেন না?”

—“পারি,—তীর বাড়িও খুব কাছে। কেবল—”  
“সন্ধ্যায় তাঁর কী-টা—”

—“ডবল দিলে হবে না? না-হয় তিনটে?”

ডাক্তারের মুখে হাসির চাপা সৌন্দামিনী খেলে গেল। লোকটা  
জহরী!

• •

আনার ঘরে প্রায় আধঘণ্টা ঘ’রে তাকে পরীক্ষা করে ডাক্তার

সিয়েরা স্বপনের ঘরের ঘোরে ঢোকা মারলেন।

—“আমুন।...কী দেখলেন?”

—“ওঁকে জানাবেন না—তবে আপনার সঙ্গে রাখা দরকার যে যদিও এ-সবটা বিশেষ কিছু নয়—কিন্তু হঠাৎ কোনো আঘাত বা মানসিক উৎকর্ষ বা প্রবল উত্তেজনার খুবই কারণ দিকে বেরিয়ে যেতে পারে।”

স্বপন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল : “কেন খুঁজি নি বা নিউক্লিয়ার তর নেই তো ?”

—“সে তর তত নেই। আসল তর ওঁর পারমাণবিক অবস্থার ক্ষেত্র।  
তখনকার যেমিঞ্জাইটিস হয়েছিল। মনঃকষ্টও—না ?”

—“খুব বেশিই গেছে”—স্বপন খুব একটু নিচু ক’রে বলে।

—“সেইটোতেই যা খেয়েছেন—খুব অল্প হ’য়ে গিয়েছে তাতে ওঁর  
স্বাস্থ্যও নষ্ট। কোনোরকম উত্তেজনা বাতিল না হয়। হ’লে হঠাৎ মূর্ছা  
হ’তে পারে—আর দৃশ্যপটও একটু ভুল হয়ে আসে। তাই বিশেষ ক’রে  
দরকার ওঁকে সাধ্যমত প্রকৃত রাখা—উষ্ম উৎকর্ষ থেকে যতদূর সম্ভব  
বাঁচিয়ে রাখা।—কিন্তু অত তর পাবার কিছু নেই। রোগিনীর দেহবস্ত্রও  
বিকল হয়নি, রক্তেরও জোর আছে। তা ছাড়া এখানকার হাওয়াও  
খুব ভালো। শুধু দেখবেন খুব শান্তি—মনের শান্তি বাতিল নাহান পান।  
মনটাকে যতটা পারেন প্রকৃত রাখবেন। জর—ও কিছুই না। কালই  
ছেড়ে যাবেন।”

## দায়িত্ব

আনার জর সত্যিই তার পরমিত ছেড়ে গেল।

কিন্তু স্বপন তাকে বেরিয়ে দিল না তার বেরিয়ে চাওয়া সত্ত্বেও।  
এমন কি বাইরে বাগানেও না। সন্ত-অতিভাবকি চাল। আনা সঙ্গে  
বলে : “ওঁকে তোমাদের গুরুত্বাতির ভাবার বলে চাল এক ইয়া  
লাইক টাই—না স্বপন ? নাও খাটিয়ে নাও গুরুত্বাতির।”

বপন বলে : “করি কী হলো ? নে নিজে অনুভব—তোমার—  
ভালো একটু সহজবোধ্য মতো—পাগলকে ভেলভেট-বোড়া দেয়ালওয়ালা  
ঘরে রাখে কোনো তো ?”

কেন দুজনের মধ্যে ললিত পরিহাস ও কথা-কাটাকাটি চলে। বপনের  
বুক থেকে যেন পাখর নেমে যায়।

আনা শেষে হাস ক’রে বলে : “যদি বেশি বাড়াবাড়ি কর তা হ’লে  
মকেল কিন্তু দড়ি ছিঁড়ে বলে রাখছি।”

বপন হেসে বলে : “তোমার মনিবাগ-রূপ খুঁটি যে এখানে—  
আমার তদারক—দড়ি ছিঁড়ে বাবে কোথায় বল ?”

আনা কণ্ঠে উঠে বলে : “ঈ—শু—যেন—” কিন্তু কী বলবে খুঁজে  
পায় না।

দুজনেই হেসে ওঠে।

এমনি ক’রে চটুল গল্প ও হাস্যপরিহাসের মধ্যে আনা দুমিনেই ওঠে  
হুহু হ’য়ে।

## বিচিত্র

জীবন ? বিচিত্র বই কি। কোথায় ছিল সে আর কোথায় আনা  
—মাত্র দুদিন আগে। কে ভেবেছিল—বিশেষও ও হবে অভিভাবক ?  
—আর একবার নয়—দু-তবার !...ইসাবেলা আর কোথায় ? নানা  
রকম করনা-করনা করে। আশ্চর্য্য দুমিনেই আবার সে কতখানি দূরে  
প’রে গেছে ! আর আনা ফের হ’য়ে উঠেছে—এত বাস্তব ! এই কি  
ছিল সন্ত-পরিচিতি—দুদিন আগে ?

আবার সঙ্গে কত আশা-বাশে গরই মা হর। মাঝে মাঝে সে কিছুই আশ্চর্য হইতে গঠে যে এক সময়ে এক বাক্যে যেহেনি পড়ের মতো মনু হলে হইতে যেতে পারে সে।...সময়ের যেন পাখা উঠিলে। যেখানে যেখানে জিন-তার দিন কেটে যায়।

সময়ের হাতবার ও গজালালে আবার মহা আনন্দ। একটু একটু করে তার ক্রমে মোটের এখানে ওখানে বেরতে আনন্দ করে। কারণ আনা এখনও বেশিকণ হাঁটতে পারে না। ডাক্তার সিরেবাক বলেন হাঁটা বেশি ভালো নয়—কারণ ওর হাড়, হুসহুস, মাথা সবই এখনো দুর্বল—জেনেরাল এস্টেপনের পরে অনেক দিন সাবধানে থাকতে হয়। যখন সাবধানে থাকে কিন্তু অল্প কার্যেও। কথাবার্তা কে জানে কখন কোন্ দিকে মোড় নেয়?

আনার মনে এতে কোথায় যে রাগে!...মাঝে মাঝে ট্রোট হুলির অভিমানে অভিনয় করে। কিন্তু যখন তা-ও পারে রাগে না—পাখ কাড়িয়ে যায়। আনা তাতে আরো আহত হয়—কিন্তু বোধে।...আরও সুকিল এই যে, এ-এসক তোলাও কঠিন। এ-নতুন পারিপাখিকের মধ্যে কোথায় যে একটা দুই বাধা—গরমিলের অস্বাভাব্য!...মেহের মধ্যে এক এক রকম ব্যথা মাঝে মাঝে দেখা যায় না যার স্থান নির্দেশ করা বড় কঠিন?—যেন লাঠি হাতে করে অন্ধকারে চলে—আগে লাঠি কেলে তারপর পদক্ষেপ।...আরও বিশদ এই যে, একটু একটু করে ও যে দুই হক্ষে, ওর প্রহরতার মধ্যেও একটা দুই অস্বাভাব্যের টুকরো যেখ উড়ে এসে জুড়ে বলে থেকে থেকে, ও সে-মেহের আরম্ভন ফুলছেই দিন দিন... ইলাকেলার সঙ্গে কিন্তু ঠিক এ-রকমটা হয়নি। সে যে ছিল লক্ষ্য হাওয়া। সেব জব্দে কি? তা ছাড়া ইলাকেলার কেনে একটা সুবিধাও ছিল—সেখানে স্থায়ী ব্যক্তি ছিল যে। যখনই সত্যিই সময়ে সত্যি

ইচ্ছে হয় যদি চাং থাকত আক। আর ইসাবেলা। তা হ'লে নিশ্চয় ওদের সবছটা চের সহজ নির্মণ হ'য়ে উঠত, নয় ? অবশ আনাকে একা পাওয়ার মধ্যে এমন একটা সহকতাও ছিল যে...

আনার পরিচর্যা করতেও তার এত ভালো লাগে !...সে-সময়ে মনে হয় আনাকে একলা পেয়ে ভালোই হয়েছে, তৃতীয় ব্যক্তির সান্নিধ্যে কুষ্ঠা বাড়ত বই কমত না। আনাকে নিয়ে যখন তখন বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, প্রাতঃস্নেহকালে পাশাপাশি দুটি মাথা ছাতার নিচে রেখে দেহ রোদ্রে মেলে দিয়ে বিশ্রান্তলাপ ; কোনো দ্রষ্টব্য স্থান আনার দেখার ইচ্ছে হ'তে না হ'তে বাজাকল্লভের মতন পূর্ণ করা—আরও কত কী ছোটখাট রম্য কাইকরমাস খাটা। কয়েক দিন আগের নীলের ভৌগোলিক পরিচয়ও তার তারি কাজে আসে এখন। সে খুব বিজ্ঞভাবে সাধারণ দিয়ে তাকে নিয়ে বার মটিকার্ণোতে, মনাকোতে, বোলিরো-তে। কখনো বা সমুদ্রের মধ্যে পালে ছা লা জেতে-তে নিয়ে বায় নাচ দেখতে। কখনো বা সাবধানে খুব ভয়া নিরামিষ গোছের নাচ নাচতে। ইসাবেলার কল্যাণে ও-এক নতুন রসবোধের ইঞ্জির বিকশিত হয়েছে যে তার দেহের রোমে রোমে। অবশ ইসাবেলার সঙ্গে বতটা নিঃশব্দভাবে নাচতে পারত—আনার সঙ্গে চোঁটা ক'রেও ততটা অকুণ্ঠ হ'তে পারে কই ?...

একজ্ঞ কোনো সন্ধ্যায় আনার চোখ তাকে অহুস্ত তিরস্কার করলে পরদিন তার প্রারম্ভিত করত হয় আবার ঘটা ক'রে। যেমন দৃষ্টান্তে প্রথম হ'লে সাধনের শীতল নীলাবৃত্তে গিয়ে ডুব দিয়ে আসা—অল্প সঁতার কেটে। এতে আনা বড় খুসি। কখনো বা কয়েকটা ব্যান্তনামা এসেলের কারখানায় নিয়ে যাওয়া। দামী এসেল কিনে দেওয়া। সে তো কলাই বেশি ! তাতে আনার রাগ করা ?—আহ, সেটুকুই না অবিভব্যের উল্লাস, অপব্যয়ের সার্থকতা !... কখনো বা ইংরাজি থিয়েটারে

ওকে শকুন্তলা অভিনয় দেখানো—রাশি রাশি বিজ্ঞ কাখা সন্দেশ ।  
বতটা পারে বৈচিত্র্যের আনন্দ ওকে দেওয়া । মাঝে মাঝে এ-সবে ওদের  
এত আনন্দে কাটে ।...

—কিন্তু তবু সে অস্বস্তির ভাবটা তো কই কাটে না একেবারে ?  
শান্তি তো আসে না ?—বয়ঃ সময়ে সময়ে আনার কৃতজ্ঞ চাহনি, চলতে  
চলতে বাহুর বা করতলের বৃহৎ চাপ, ধস্তবাস্ত, নীরব আবেগ, মিষ্ট হাসি  
—তাকে বেশ একটু সন্দেশ চকলই ক'রে তোলে । আনার সে মুখের  
চট্টলা ভাবটা গেছে কেটে—কিন্তু তার পরিবর্তে যে হ্রী ও মেহুরতা তার  
মুখে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল তাতে তার মনের বেলায় এক নতুন  
চাকল্যের ঢেউ তোলে যে ! স্বপন ভাবে : জীবনে চকলতার উপাদান  
কি অশেষ নাকি ? ইসাবেলার সান্নিধ্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে না  
পেতে.....



কতরকম আলোচনাই বা...কতরকম আচম্কা অসাবধানতার  
উফতা !...

একদিন হঠাৎ আলোচনাটা নরম রাখা গেল না কোনো মতেই :  
গরম হ'য়ে উঠল :

আনা জিজ্ঞাসা করল : “বলেছিলাম না—চমৎকার বই—উপট্টয়ের  
War and Peace ? না পড়লে খেদ থেকে যেত না ? বলা তো ?  
পাতাশার ছবিটা ? কী অপূর্ণ ? নয় ?”

—স্বপ্ন বইটার খুব উচ্ছ্বাসিত সুখ্যাতি করে বটে কিন্তু শেষে বলে :  
নাট্যশিল্প ছবিও চমৎকার বটে, তবে ঐ প্রিয় জায়গা থেকে অত  
আলোচনায় না বাসতে—তার বাসন্ত্য হওয়া সন্দেশে ধীরে ধীরে নাট্য



আনাতোলকে দেখতে না দেখতে নাতাশার মনে হওয়া যে ও দুজনকেই ভালোবাসে—”

আনার মুখে ওর অভ্যন্তর বিজ্ঞপের হাসি কোটে : “হর না ?”

অসম কুণ্ঠিত হয়ে বলে : “হবে না কেন ? তবে—এত অল্প সময়ের মধ্যে—”

—“মোহ যে প্রকৃতিতে বিদ্বাৎ, সরল বহু ! তার বিলিক যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কি অল্প হারী আলো চোখে পড়ে ?”

—“পড়ে কি না জানিনে । তবে মোহের বীণি বিদ্বাৎপ্রভ হ’লেও—অর্থাৎ নাতাশার অত অল্প সময়ে—চার-পাঁচবার মাত্র আনাতোলের সঙ্গে দেখা হ’তে না হ’তে তার পরম প্রেমাস্পদ প্রিন্স আত্রেকে বরখাস্ত ক’রে দেওয়াটা—বিশেষ বধন ঐ প্রিন্সকেই সে ভালোবেসেছিল গভীর ভাবে এটাই দেখানো হচ্ছে—তখন এ-ধরনের অঘটন ঘটানো নভেল হিসেবে হয়তো উৎসাহে, কিন্তু—”

—“বাস্তবতা হিসেবে নামকূর, এই তো ?” আনার ওঁঠোতে সাহসকল্প ব্যাক হাসি জুটে কুটে : “মনাখি, ইলাবেলার সঙ্গে তোমার নৌকার ঘটনাটা কি ছিল নভেলিরানা বা বাস্তবিরানা ?—না, অম্মা কোরো বশন—” আনার মুখে <sup>পূর্বের জাপত</sup> ~~কিছু~~ <sup>চিহ্ন</sup> একটু হ’য়ে ওঠে । “আমার মুখ বরাবরই এমনি আলগা জানোই তো ।—আমি ইলাবেলার দৃষ্টান্ত দিয়ে শুধু কল্পে রেখেছিলাম—মেয়েদের জীবনে অনেক কিছুই ঘটে বা আঁধারা—কেয়েরা—মিডা পুঙ্কাই—ঠাট বজার রাখতে । তাই নাতাশার মতন ভালো থেকে নিছক ভালো ভাবতে পারলে হ’য়ে উঠি হারুশ বুনি, তুলতে চাই যে হারুশ সাক্ষী কেদের মতোও এমন সব সুখী সাক্ষীর সঙ্গে গলাগলি ক’রেই প্রেমের গারকম বাজা নিজদৃষ্টিতে প্রকাশ হ’লে মতী সাক্ষীর ক’ক বাস কে কোণার ভেত—কখনো মো আদর্শবাদী !”—আনা কটাক করেই হাসে বহু বহু ।

বপন কুঠা বসন ক'রে জোর ক'রেই হেসে বলে : “অত বাঁকা না হাসলেও চলবে আনা। জীকনে আদর্শবাদ মেনে অপরাধী হ'লেও আমি নিশ্চয়ই এতটা নিকরোধ বা ভণ্ড নই যে সাধুর মধ্যে লম্পট থাকতে পারে না এমন কথা প্রচার করব। সতীর মধ্যেও অসতীর স্থান ~~নাই~~ <sup>হয়</sup> বাক্যে তাই আমি নারাজ নই। এ-ও বিশেষ ক'রে সম্প্রতি নিজেকে দিয়েই প্রমাণ দিচ্ছে যে নানা ঘটনার যোগাযোগে আমাদের নানামূর্তি এমন স্বয়ংসিদ্ধ হ'য়ে কুটে ওঠে যে তখন বোকা ভার হয়—কোনটা আমাদের আসল স্বরূপ—কোনটা বাহ্য—কিছা এ-সব বিরোধী রূপগুলোকে ভাল পাকিয়েই একটা মানুষের স্বরূপ গুড়ে ওঠে কি না।—কিন্তু সব বলা হ'য়ে গেলেও কি বলা যায় না যে সম্ভব অসম্ভবের একটা সীমা আছেই—অসম্ভব জীবনে না থাকুক—আর্টে? বিশেষ বাস্তবপন্থী উপস্থানে?”

—“বাস্তবপন্থী উপস্থানে মানে?”

—“মানে জীকনে নানা জিনিষ অসম্ভব হ'লেই কি কলবে যে বাস্তবপন্থী—realistic উপস্থানে নাটকেও তারা মজুর হবেই হবে? অসম্ভব বলে বলতে গেলে বলা যায় না কি যে জীবনে অসম্ভব রোধ ক'রেই নিজেকে জাহির করলেও শিল্পীর অসম্ভবকে অসম্ভব ক'রে আঁকলে চলবে না, করতে হবে অসম্ভবকেই সম্ভব—অসম্ভব এ-বস্তুটির বাস্তব উপস্থানে। না, বলবে এ-কথাও মানে না?”

আনা হাসল : “মানি বপন। কিন্তু সম্ভব অসম্ভবেরই কি কোনো বিচ্ছিন্ন মানসকাটি আছে? ধরো না কেন নাতাশার মধ্যে স্বভাববিরোধ আত্মবিরোধ একই সম্ভব মনে হয় আমাদের, এক মুহূর্ত হই আমরা তার চরিত্র-চিত্রণ উপভোগ করতে করতে যে টলটলকে করতে ইচ্ছা হয় : জেনারেল কুন্ডার হে কবি ব্রহ্ম!—রোসো রোসো, আমার কথা শুন হরমি : নাতাশার মধ্যে বোধ ও প্রেমের যে-বস্তু টলটল কুটিলেছেন তার মধ্যে

কোনী তোমার অসম্ভব প্রেম বলো দেখি? প্রিয় স্বামীর মহাশয় চির-স্বামী আদর্শবাহে নাতাশার মধ্যে সাক্ষী নাতাশা মহৎ নাতাশা সর্বভাষিনী নাতাশা জেগেছিল, বটে তো? বেশ। তার পরই আন্যতোলকে দেখে জাগল তার মথোকার অসতী নাতাশা উজ্জ্বলিনী নাতাশা বিদ্যাৎকলা কিন্তু কলহাশিনী নাতাশা। টলটল ছিলেন ঋষি তাই দুজনকেই করলেন স্বীকার। সমাজের ভয়ে সাধুতার প্ররোচনার তত্ত্বতার উৎকোচে সতীর খাতিরে অসতীর গলাটিপে ধরলেন না—কারণ ধরতে পারতেন না। আর এ পারতেন না বলেই না তিনি হ'তে পারলেন নিপুণ শিল্পী দ্রষ্টা ঋষি। রাগ কোরো না স্বপন, কিন্তু এ আমি জোর ক'রেই বলতে পারি তোমার মধ্যে সমাজের ভয় না থাকলে এমন নিপুণ ছবি আঁকাতে তুমি মর্দাহত হ'তে না—বা লেবেল দিতে না—“অসম্ভব”।

কিন্তু তবু স্বপন রাগী করল বৈ কি, উমা প্রকাশ পেল তার স্বরে, বলল : “মর্দাহত আমি মোটেই হইনি, ভয় নেই। হ'লে নিকোলা জুজারী রোনিয়া ও কুৎসিতা প্রার্থনারতা মারিয়াকে দেখে দুজনের প্রতিই হুকারণে টান বোধ করল এতেও সমানই মর্দাহত হতাম।”

আনা ছাড়বার পারী নয়, ছেলে বলে : “সে হওনি, কারণ প্রার্থনারতা মেয়ের মুখের দৈবীভাবে সাক্ষা দেওয়ার নিকোলার দেবত্ব সিদ্ধ সিদ্ধান্ত করতে পেল। খুসি হ'লে—লম্পট নিকোলার মধ্যেও ভালো একটা দিক আছে এ প্রমাণ হ'ল বলে। কিন্তু তা বলে উল্টো দিকে সাক্ষী নাতাশার মধ্যেও লাম্পট সমানই লুকিয়ে থাকতে পারে ভাবতে না বোঝে পারে তোমাদের? না, নারীর অসতীত্বের আয়নার তর্জী ও কতক একপতিত্বের পৌরুষের ছায়া—নির্মল হ'রে ফুটে না উঠলে মন ক্রমশ হয় পুরুষের? কিন্তু এ-ধরণের প্রেক্ষাভিত্তিক কাটিয়ে উঠলে দেখতে গেতে যে, টলটল ছিলেন শিল্পী দ্রষ্টা ঋষি—

বপন রাগ করে বলল : “কী যে তোমরা বার বার ঝবি ঝবি করে  
 আনা উল্টায়কে—শিল্পীকে ? ঝবি কাকে বলে জানো কিছু ।—বিনি  
 নির্বিক নির্মোহ—সব সংস্কার প্রেক্ষুড়িস মনোবিকারের বাইরে । উল্টায়েরও  
 প্রেক্ষুড়িস ছিল যথেষ্ট । নইলে নেপোলিয়নের হাতে কুম্বদের বেহুদ্য মার  
 খেতে খেতে মক্কা পালিয়ে মক্কা পোড়ানোকে কুম্বজাতির বীরত্বের  
 পরাকাষ্ঠা বলে জ্ঞাতিব করতেন না তিনি,—বড় গলা করে বলতে একটু  
 লজ্জাও অন্তত হ’ত যে, কুম্বরা ফরাসীদের সমান যোদ্ধা । আর এ কথা  
 বলিয়েছেন কা’কে দিয়ে ? না, মক্কা অধিকারী ফরাসী ক্যাপ্টেন র’বালকে  
 দিয়ে । এরকম শত্রুর মুখ দিয়ে ‘ব্রাভো’ বলিয়ে নেওয়া অসম্ভাব্য নয়,  
 অসত্য নয় ?—কোন্ লজ্জার অমন বিশ্বপ্রেমিক ঝবি দেশভক্তির  
 কুসলানিতে কান দিলেন ? বলিয়ে নিলেন শত্রুকে দিয়ে যে, কুম্বরা বীর্যো  
 কবাসীদের সমান—braves soldats comme nous autres ?  
 যোদ্ধা হিসেবে কুম্বরা ফরাসীদের পায়ে ক’ড়ে আঙুলের কাছে লাগত  
 নেপোলিয়নের সময়ে ? জানা আছে আনা, জানা আছে । বলা আদর্শবাদী  
 উল্টায়, শিল্পী উল্টায়—মাথা নত করে মেনে নেব । কিন্তু উল্টা ঝবি  
 যুগাবতার—ক্যামা দাও । শিল্পের সাধনায় আর যাই লাভ হোক না  
 কেন—ঝবি লাভ হয় না আনা । War and Peace এর ছত্রে ছত্রে  
 কি sickening patriotism পাও না কি ? না, ‘কুম্বরা মত্ত জাত !’  
 ‘কুম্বরা কী বেদন পালানটাই পালাল বীরের মতন !’ ‘মক্কা পুড়িয়ে কী  
 অপকৃপ কীর্তীই রেখে গেল ।’ মরি মরি । আর সব চেয়ে আশ্চর্য্য যে  
 ঝবি উল্টা উল্টায়ের কলমে বেকল যে কুম্বরাই হারিয়ে দিল নেপোলিয়নকে ।  
 মোঘে ছারাল সিংহকে !—আরে, চম্পট দিল মার খেতে খেতে নিজেরই  
 রাজ্যে—দীমান্ত থেকে মক্কা অবধি কবে কোন্ নদীতীরে নেপোলিয়নের  
 একটা আক্রমণ ছবটা ~~কুম্বরা~~ তা পাতার পর পাতা বর্ণনা করতে

লজ্জা করল না এ-হেন ঋষি পেট্রিটের ? ফরাসীদেশের মাটি যারা চক্ষে দেখল না নিজের দেশে চৌচা দৌড় দিয়ে ঘরবাড়ি পোড়ানো অবধি যাদের বীরত্বের দৌড়—একটা বুদ্ধে যারা শত্রুকে হটাতে পারল না—সাক্ষাৎ সত্যজ্ঞা ঋষি তাদের তুলনা করলেন কী ব'লে অগত্যা ফরাসী সৈনিকদের সঙ্গে ? কোন্ মুখে বীরাগ্রগণ্য নেপোলিয়নের সঙ্গে নাম করলেন পলায়মান কুটুজভের ? নেপোলিয়ানের কাছে বুদ্ধ কুটুজভ—যোদ্ধা হিসেবে ? এ-তুলনা করবার আগে ঋষি বলতে পারলেন না—‘মা ধরিত্রী লজ্জা রাখো, দ্বিধা হও—এ-জাতির বীরত্বের ওকালতি করা থেকে বাঁচাও ?’ ঋষি—জ্ঞা—যুগাবতার ! জানা আছে আনা, জানা আছে । ঋষি সবাই—কেবল ততক্ষণ যতক্ষণ জ্বাতে যা না লাগে । আমাদের দেশেও এমন ঋষি মেলে মাঠে যাটে । দুটো কবিতা লিখলাম—ঋষি, দুটো বক্তৃতা করলাম—ঋষি, দুটো স্তম্ভর নাটক নভেল লিখলাম—ঋষি ! পরমহংসদেবের সেই বরোয়া উপমা মনে পড়ে এ-সব ঋষির কথার : ‘টিয়াঁ পাখী দাড়ে ব’সে বলে রাধাকৃষ্ণ, গলা টিপে ধরলে করে ক্যা ক্যা ।’

‘আনা ওর একটা হাতের ’পরে হাত বুলোতে বুলোতে বলে : “আহা এত উয়া কেন গো ? আমি মানছি সে-সময়ে যোদ্ধা হিসেবে নেপোলিয়নের পায়ের ক’ড়ে আঙুলের কাছেও কেউ আসতে পারত না—এমন কি রণশক্তিমান তার সমকক্ষ অগতে দু-একটির বেশি জন্মায়নি এ-কথা কে না জানে ও মানে বলে ? তবে উলটোর কবজাতির সামরিকতার গন্ধে আমরা তোমার মতন রাগ করি না—মুচকে হাসি—কমা করি । কিন্তু সে ঘাই হোক—বুদ্ধবিগ্রহের ছবি আঁকবার সময় দেশভক্তি তাঁর হৃদিকে কাপসা করেছিল ব’লে এ তো আর সাবাস্ত হয় না যে, প্রেমের মোতরে ছবি আঁকবার সময়ও তাঁর হৃদে বুদ্ধ ছিল না ।

আমি বলতে চেয়েছিলাম শুধু এইটুকু যে, নাতাশাকে টলটল বে-ভাবে  
এঁকেছেন তাতে আনাতোলের মোহে প'ড়ে শ্রদ্ধা জ্বালিয়ে অত  
ভালোবাসা সবেও ছাড়টা তার পক্ষে অসম্ভব তো মনে হয়ই না—বরং  
মনে হয় এরূপ ক্ষেত্রে এমন না-হওয়াই অসম্ভব ছিল। মনে হয়, প্রতি  
জ্বালালো সত্যী মেয়ের মধ্যেও সবটুকু যে নির্ভেজাল সত্যী নয় এটা আমরা  
দেখতে চাই না ব'লেই পাই না দেখতে—কিন্তু টলটল দেখতে শিখেছিলেন  
ব'লেই দেখেছিলেন।” বলতে বলতে আনার কর্তৃক গাঢ় হ'য়ে উঠল  
আপনা আপনিই, স্বপনের চোখে চোখ রেখে একটু চুপ ক'রে থেকে সে  
বলল : “স্বপন, আজ আমি তোমাকে এর চেয়ে বেশি খুলে বলতে  
পারলাম না ব'লে কনা কোরো।”

স্বপনের পজরে রক্তস্রোত ঘেন আছড়ে পড়ে হঠাৎ।

—“মানে—?”

—“মানে—একদিন হয়তো বুঝবে স্বপন—স্বপন—” ওর কর্তৃ প্রায়  
রুদ্ধ হ'য়ে আসে “বুঝবে মানুষ কোন অবস্থায় যে কী করতে পারে  
না পারে—”

স্বপন ওর হাত চেপে ধ'রে বলে : “ও কি আনা? ছি—শোনো।”

আনা উদগত অশ্রু গোপন ক'রে মুখ ফিরিয়ে বসে। তার মুখ চোখ  
এমন রাঙা দেখায়!...

কী কথায় তর্ক আরম্ভ—কোথায় তার পরিণতি! এত সাবধানতা,  
এত বাকনৈপুণ্য—তবু কি দূরত্ব বজায় রাখা যায়? নৈর্ব্যক্তিক তর্কেও  
উয়ার মধ্যে দিয়েও, ভুলবোকার মধ্যে দিয়েও, পরস্পরের মন কি  
আরও কাছে আসে না—বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে না পরস্পরের প্রতি?—  
বিচ্ছিন্ন নয়?

## সন্ধ্যার নবমুষ্টি

এরকম কত আলোচনার কত শব্দই যে ও পায় আনার কাছ থেকে। কিন্তু সব চেয়ে শব্দ পায় বুঝি এই নিষ্ঠার প্রসঙ্গে। আনা যেন চেখে চেখে উপভোগ করে একনিষ্ঠার প্রতিমাকে ধূসিমাং করতে। তাই কি তর্ক আলোচনা প্রায়ই এই দিকেই মোড় নেয় ওর ?

এর পরেও আর একদিন ওর সঙ্গে আলোচনা হ'ল ডঃয়েভস্কির 'ত্রাদাস' কাগ্যমাজতে কাত্যা ও গ্রুশেঙ্কাকে লম্পট মিটার একসঙ্গে ভালোবাসা নিয়ে। কিন্তু শেষটার অসতী গ্রুশেঙ্কার ক্ষত্রে সতী কাত্যাকে তো সে ছাড়ল। এত খারাপ লাগে ভারতে। তবু ও বলবেই বলবে যে মোহের ক্ষেত্রে এমনিই হয়—খতিয়ে প্রেমের জয় হয় কেবল উষ্টর রোমান্সে—বাস্তব জীবনের সাক্ষ্য উলটো—প্রায়ই।

মিত্যাকে নিয়ে আলোচনাটা উফতার শেষ হয়নি বটে। তবুও মনের কোন্ এক তারে যে লেগেছিল ওর।...

সেদিন রাতে স্বপ্ন দেখল সন্ধ্যাকে :

যেন সন্ধ্যা আকাশ-পথে উড়ে এসে নামল ওদের হোটেলের সামনের গেটে—ঠিক যখন ওরা চলেছে বের্ণষ্টাইনের একটি আধুনিক নাটক দেখতে যার পরিণতিও এমনি একটা অনিবার্য প্রণয়-ট্রাজিডি। ব্যুটি পড়ছিল। স্বপ্নন হঠাৎ ওকে এড়াতে চাইল ছাতার আড়াল দিয়ে। কিন্তু তবু হঠাৎ থকা পড়ে গেল। সন্ধ্যা ওদের দুজনকে একত্রে এ-ভাবে ঘেঁষে রেখেই কয় কয় ক'রে কঁদে ফেলল। স্বপ্নন ব্যাকুল হ'য়ে বাহ-বিস্তার করতেই ঘুম গেল তাকে। প্রভাতের আবহা আলো এমন রান লাগে !...

বাইরের বালকনিতে স্বপন আরামকেদার টেনে বসে। একটু শীত পাত করে—তবু আকাশের পানে চেয়ে থাকে—ড্রেসিং গাউনটা জড়িয়ে। সেখানে ছেঁড়া মেঘ জড়ো হয়েছে কত যে!...পশ্চিমের দিগধ্বজ বৃকের 'পরে কীকড়ামাথা এক পিঙ্গল দানব ব'লে জগদ্বল পাথরের মতন, আলোর উৎসায় মরে কেঁদে।...

স্বপনের মনের কোণে গুন্‌গুনিয়ে ওঠে : “মেঘালোকে ভবতি স্মৃখিনোহ্যপ্যস্তথাবৃত্তিচেতঃ”। কালিদাস সময়ে সময়ে এমন বিবাদই টেনে আনেন মেঘের সতযোগিতায়!

হঠাৎ স্বপন কলম ধরে :

“সন্ধ্যারাগী আমার!

তোমাকে দশ-বার দিন আগে যে-চিঠি লিখেছি এ মেলের আগেই পেয়ে থাকবে। তার পর? আচ্ছা শোনো।”

লিখে আনার অস্থখের ও এখানকার জীবনের একটা মোটামুটি বিরূতি দিয়ে লিখল :

“আমার ওপর ডাক্তারের আদেশ শুনবে? আনাকে প্রকৃত রাখা। কিন্তু তার দরুন আমার প্রাণশক্তি কতখানি নিয়োগ করতে হচ্ছে হঠাৎ আজ সকালে অনুভব করলাম। কাল শেষ রাতে স্বপ্ন দেখেছি যেন তুমি এই নিয়ে আমাকে ভারি খোঁটা দিচ্ছ...তারপর থেকেই মনটা কি জানি কেন...”

হঠাৎ ঘরের দোরে আঘাত। স্বপন চমকে উঠে বলে : “কে?” চিঠিটা লুকায় সঙ্গে সঙ্গে।

—“আমি নসিয়ে—একটা চিঠি।”.....



বশম চিঠি অসমাপ্ত রেখে পড়া ছুক করে :

“ওগো আমার রঙীন মোহন বশ্মরাজ,

গত মেলে তোমাকে খুব এক চোট ঠেল দিয়ে চিঠি লিখে অনুতাপ হয়েছিল। মাসের মেলে তার প্রায়শ্চিত্ত করব ইচ্ছে ছিল—কিন্তু বাবার হঠাৎ সরাসরি রোগের মতন হওয়ায় পিত্রালয়ে যেতে হয়েছিল— সেখানে সত্যিই নিঃশ্বাস ফেলবারও অবকাশ ছিল না, বিশ্বাস কোরো।

“কিন্তু তাতে ভালোই হ’ল একদিক দিয়ে। নাকের মেলে তোমার নীস-পালানোর খবর পেলাম।” এ মেলে নবতনার। যাক এতদিনের সম্মী-ভক্তির ক্ষতিপূরণ মিলছে এবার—ধারাসারে। কসল বধন কলে এমনিই কলে, না? শুধু দুটু সরসতাই নন,—লক্ষ্মীর চেলাচামুণ্ডাবাও আসেন দল বেঁধে। জীবন-নেবতার বুদ্ধি জাগানোর ভঙ্গীও যেমন— বরদানের ভঙ্গীও তেমনি রহস্যময়, না? ইন্দ্রদেব মাটিকে বধন বোঁদে পুড়িয়ে থাকুক’রে দিতে থাকেন তখন সাধ্য কি কেউ সন্দেহ করে সামনে ‘শ্মশ্রোতিঃসগিলমরুতাঃ সন্নিপাতে’ সুধাসমুদ্র ভেঙে পড়বার অপেক্ষার আছে। দিশা দিয়েও দিশারী লুকিয়ে থাকেন যে কোথায়? বিশেষ বধন দিশা চার প্রেমিকা।

“সত্যি না? দর্শনে বক্তিতই যদি না রাখতে পারল—তবে পুরুষের পৌরুষ রইল কোথায় বলো দেখি? বেধু রাধার হাতে বাজেনি— বেজেছিল কুফেরই হাতে। বংশীধট থেকে সুরের দিশাটুকু মাত্র পাঠিয়েই ভ্রামহুঙ্কারের দায়মুক্তি। বেদনা-পাথর লঙ্ঘন করে তাতে সাড়া দেবার তার রাধার। কাঁটাশখ তুচ্ছ ক’রে ছোট্টার তার তাঁর নয়। সে-তার—নারীর।

“করেকটা সুহৃৎজন কথা হ’লে কাল দিল ধরা।

যদি বাজে বাঁশরী,—  
 কেন দিশা ফুটে না ?  
 যদি রহিলে পাসরি',—কেন আশা লুটে না ?  
 যদি চালিলে প্রাণে  
 সাঁঝে স্বপন-তানে  
 তবে আঁকোটা স্বরণখানি গন্ধে গানে,—  
 তবে কেন না 'স্মরি'  
 রক্তা দূরে ? ফুটে না  
 যবে পথের পাথর,—তবু আশা লুটে না ?

ইতি—

তোমার পুসারাদমানা  
 সন্ধ্যারাগিণী"

## বিয়না

সন্ধ্যার এ কী মুক্তি ? ওর গত চিঠির সঙ্গে এর তুলনা করলে কী  
 চোখে তৈকে সব-আগে ? ওর এ-সংবতবাক্ রূপ এর আগে তো সে  
 কখনো দেখেনি ? ওর গত চিঠির সঙ্গে এ চিঠির মিল কতটুকু ? অথচ  
 কোথাও এতটুকু অস্ববোধ নেই, উপরোধ নেই, শঙ্কার নামগন্ধও না ।

• •

হেলানো কেন্দারার ব'সে স্বপন তখনো সমুদ্রের দিকে চেয়ে ।  
 আকাশটা একটু পরিষ্কার হয়েছে । সূর্যের দেখা এখনো যেলেনি—

তবে ক'রে উঠে একটা দীপ্যমান চক্রাকৃতি অর্ধমণ্ডল—তার যেন ঠিক কেন্দ্রে মেঘের চাঁদোরার একটা দুর্বল রক্ত দিয়ে এক ঝলক রূপালি আভা!.....পিরামিডের আকৃতি। যেন বাধা পেয়ে একরাল আলো আরও জোর ক'রে নিঃস্রেকে ঢেলে দিচ্ছে এক সঙ্গীর্ণ প্রণালীর মধ্য দিয়ে। সমস্ত পূর্বদিগন্তে একটা বার্ষ বন্দ। ঐটুকু আলোর প্রপাত? ঐ পুঞ্জ মেঘের চাপে কী আশা ওদের? ঐ পূর্ণশঙ্কটুকু আশা ছিল যদি এক দম্কা হাওয়ায় এ মিথ্যার মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে উড়িয়ে দিতে পারেন কোনো সত্য-দিগন্তনা। তা না পারলে? বৃষ্টি মিথ্যাকে স্বীকার ক'রে নেওয়াই ভালো। সে হঠাৎ ব্রির ক'রে বসল বতদিন না আগেকার মতন অকপটে পূর্ণসত্যটুকু লিখতে পারবে ততদিন আর তাকে লিখবেই না, কিন্তু তার পরেই 'আবার প্রবল ইচ্ছা হয় মোটার-বোটে স্বপন-ইসাবেল-সংবাদ সবটুকু লিখে ফেলতে'। কিন্তু আশ্চর্য্য—মনে হয় অসম্ভব। আশ্চর্য্য নয়?—যখন চাংকে বলতে পারল—আনাকে আভাষ দিতে পারল? মনের মধ্যে কোথায় একটা তার গভীর তিরস্বারের স্বর মেঘের মতন কালো হ'য়ে ওঠে। অকপটে সবকিছু বলতে-পারাই এদাবৎ ছিল যে তার সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব—তার চরিত্রের। আর সেইটেই কিনা সে খোঁয়াতে বসেছে?—না। সোজা মিথ্যাও যে ভালো এর চেয়ে। নয়?—নিশ্চয় ভালো। সজাগ ভাবে মিথ্যা বলা—মিথ্যার দারিদ্র্য নিয়ে। তাতে চরিত্রের মধ্যে গতির স্রোত অন্ততঃ বজায় থাকে। সত্যের স্রোত যায় এক দিকে—মিথ্যার অস্ত্র দিকে। কিন্তু ছুটোর মধ্যেই একটা স্রোত আছে। তাই মিথ্যার মোড় কখনো কখনো মুহূর্ত্তে বিপ্লবের মতন সত্যের দিকে ফেরানো যায়। কিন্তু অর্ধলভ্য যে নিঃস্রোত—পঙ্ক। ওকে গতি দেয় সাধা কার? থিক! এ আশ্চর্য্যতারণা আর না। সজ্ঞাকে আর সে চিঠিই দেবে না। তার বাবাকে যা লিখবে তা-থেকেই ও যা

খবর পায় পাক : যতদিন না—কথাটার খেঁই হারিয়ে যায়।—তবু সে মনভির করে। অনৈশ্চিত্যের দোলার হাত থেকে মুক্তি পায়। বাহোক মনটা তার একটু সুস্থ হ'য়ে ওঠে তবু।...

• •

হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি শুরু হয়। সমুদ্রের বক্ষ পাটল হ'য়ে ওঠে। সে রাশ্মি-পিরামিড কখন ডুবে গেছে। কেবল একটা চাপা আলোর সভা স্নান মুখে পরামর্শ করছে মেঘচমুর তলায়—কী ক'রে তাদের দ্বিতরাজ্য ফিরে পায় ঐ নির্জীত আকাশে।

তার মনটা আরও স্নান হ'য়ে আসে। আলোবঞ্চিত জগৎ কী স্নান! আর সন্ধ্যাকে সে তার চিঠি থেকে বঞ্চিত ক'রে রাখবে? কিছুই লিখবে না? দূর। হয় কখনো।—কিন্তু লেখতে বা কোন্ মুখে? কত গোপন করবে তার কাছে? তার চেয়ে নিষ্ঠুরের মতন চূপ ক'রে যাওয়াই কি শ্রেয় নয়?

না, আত্মকের চিঠিটা অন্ততঃ শেষ করবে সে। রফা হ'ল। এর পর আর না। আনার সঙ্কে দু-চারটে খবর দিল। কয়েকটা সভা খবরও দিয়ে ফেলল। লেখার ঝোঁকে কুঁঠা কেটে যায় বৈ কি খানিকটা। আনাকে তার ভালো লাগছে—দুজনের মধ্যে আড়ষ্টতাবের একটা পাতলা পরদা—আনার সন্ধ্যা-সঙ্কে তীর ঔৎসুক্য—তাকে এয়ারোপ্লেনে উড়ে আসতে লেখার জন্ত পীড়াপীড়ি—অসম্বন্ধ ভাবে লিখে গেল প্রায় পাঁচ পাতা। পরে লিখল নতুন পাতায় :

“তোমার দিশা ও দিশারীর গবেষণা ভালো লাগল—কিন্তু এত শব্দ কেন?—

“ভয় নেই গো ভয় নেই। বাশি বাজিয়ে আড়ালে যে-থাকে—”

দুই একটুও ভালো লাগে না।—এ পাতাটা টুকরো টুকরো ক’রে ছিঁড়ে ফেলে আরও কয়েকটা লৌকিক ধরণের বাজে কথা লিখে তৎক্ষণাৎ ডাকে পাঠিয়ে দেয় চিঠিটা।

## মরিসের পত্র

সে সন্কার চিঠিটা নিয়ে আনার শোবার ঘরের দোরে টোকা মারল। তখন বেলা ন’টা : সূর্য্যোদয়ের মেঘলা ঘোমটার মধ্যে দিয়ে সবে একটু উকি বিচ্ছেন। আনা একটা নীল কিমোনো প’রে বিছানায় শুয়ে একটা চিঠি পড়ছিল।

স্বপন উদ্বিগ্নমুখে বলে : “কী—এত বেলায় বিছানায় শুয়ে ? শরীর ফের খারাপ মনে হচ্ছে না কি ?”

আনা জোর ক’রে হাসবার চেষ্টা ক’রে বলে : “ও কিছু না। একটু মাথা ধরেছে মাত্র। বিছানা থেকে উঠিনি—কি রকম কুড়েসি লাগছিল ব’লে।”

—“কেন ঢাকছ আনা ? ও কার চিঠি ? মসিয়ে বেনারের ?”

—“না।”

—“তবে ?”

—“Que vous êtes indiscret mon cher.” \* আনা হাসবার চেষ্টা করে।

—“অন্তর্য্যায় দিয়ে কি আসল প্রেমোষ ঢাকা যায় আনা ?”

\* এমন অপব্যবহার এর করতে আছে বন্ধু ?

আনা হঠাৎ গভীর হ'য়ে বলল : “মরিসের।” বলেই চিঠিটা তার হাতে ছুঁড়ে দিয়ে উপুড় হ'য়ে বাগিশে মুখ লুকাইল।

স্বপন ভর পেয়ে বলে : “ও কি আনা ? মনে নেই ডাক্তারের কথা—”

আনা মুখ না তুলেই বলে : “ভয় নেই। আমি মুচ্ছা যাইনি। তুমি পড় না আগে চিঠিটা।”

• স্বপন পড়ে :

“শ্রী আনা,

কিরে এসো। মিনতি করছি। নীরার সঙ্গে আমি একেবারে পরিত্যাগ করেছি, ডাইভোসের কেসও তুলে নিতে রাজি—যদি তুমি শুধু কিরে এসো। ডাইনাইট-এ আমি অস্ত্রাঘ আচরণ করেছিলাম। কিন্তু তুমি তো জানো আমি কি-রকম বদরাণী ? তবু আমার সে-রাগের পরেও ম'সিয়ে বেনারের ওখানে তো কত অন্ততপ্ত হ'য়েই তোমাকে সাধতে গিয়েছিলাম। কিন্তু পাবাণী তুমি : আমার কাতর মিনতিকে প্রত্যাখ্যান করলে। আমি মেজাজী মানুষ, উফ কথায় উত্তপ্ত হ'য়ে সাড়া দেই—জানোই তো।

“কিন্তু এ-সব আত্মসমর্থনের পালা থাক এখন। আমার কেবল একটা অঙ্গযোগ আছে। এ পথ তুমি কী ব'লে বেছে নিলে আনা ? তোমার অন্তর্ভুক্ত অস্থখটার পরেও কি আমাকে একবার জানাতে নেই ?—কোথাকার কে একটা ভারতীয় বন্ধুকে নিরে গেলে বায়ু-পরিবর্তন করত ?”

স্বপনের গুঁঠ-উপাঙ্গে একটা জ্বালামিশ্রিত হাসি কুটে ওঠে : থিক, লজ্জা করে না ? এখনো—এ কাকুতি-মিনতি—অধিকারের দাবি খাটানো ?—বেখানে ভালোবাসাই নেই ?

• “তোমাকে তিরস্কার করছি ভেবে বোলো না যেন। কিন্তু বলো তো, এ কি তোমার যোগ্য কাজ হয়েছে আনা ?

“হয়তো বলবে আমার ঈর্ষা। কিন্তু ঈর্ষা কি ভালোবাসারই উলটো পিঠ নয়?—কিন্তু যাক এসব প্রশ্নও। আমার এ-চিঠির উদ্দেশ্য আলাপা : শুধু মিনতি জানানো। তুমি কিরে এসো। অতীতের কথা আমি মন থেকে মুছে ফেলে দেব, কথা দিচ্ছি। কেবল তুমি তোমার ঐ বিদেশী বন্ধুটিকে বরখাস্ত করো। আমাকে ‘তার’ করলেই আমি তোমাকে নিয়ে সিসিলি যাব। এটনা পাহাড় দেখবার তো তোমার কতদিন থেকেই আগ্রহ ছিল। তার পরে তুনিচ হ’য়ে কায়রো। পিরামিড তো তুমি স্বপ্নে দেখতে—বলতে না বরাবর? কায়রোতে আমার এক বেলজিয়ান বন্ধু আছেন তিনি আমাদের দুজনকেই পরশু নিমন্ত্রণ ক’রে এক দীর্ঘ পত্র লিখেছেন। তিনি আজও খবর পাননি—আজ কোথায় তুমি আর কোথায় আমি।

“হ্যাঁ, তাঁর কথা বলতে মনে হ’ল, তিনি এ-পত্রে লিখেছেন ভারতীয়দের সংক্ষেপে নানা কথা। ইনি কুড়ি বছর ভারতবর্ষে ছিলেন। লিখেছেন, ওরা অতি ইতর জাত—এমন কি মেয়েদের সঙ্গে মিশতেও জানে না। লিখেছেন, শুধু ভারতীয় না—ওরিয়েন্টালরা ভিতরে ভিতরে এখনও আধা-সভ্য মাত্র—মেয়েদের তৈজসপত্র ছাড়া আর কিছু তাবতে শিশুর কোথেকে? হবে কেমন ক’রে বলো? মেয়েদের সঙ্গে কি ওরা কোনোদিন মিশেছে যে মেয়েদের মর্যাদা দিতে জানবে? বন্ধুটির বেশ লিখেছেন যে, কোথায় তিনি শুনেছিলেন : “La conscience est un juge intègre qui ne tourmente que les bons et qui laisse courrir les mauvais.” • তিনি লিখেছেন এ ব্যঙ্গোক্তিটির

\* বিবেক ?—সে কই মহাত্মারখান বিচারক, যার এই স্বীকৃতি—  
হৃদয়কে চেপে ধরে জ্ঞান—হৃদয়ে দিয়ে সিক্তি।

মধ্যে ‘সুশীল’ের স্থলে ‘পাশ্চাত্য’ ও ‘দুঃশীল’ের স্থলে ‘প্রাচ্য’ বসালে এটি হয়ে দাঁড়ায় শুধু ব্যঙ্গোক্তি নয়—একটি গভীর সত্য আপ্যবাক্য।”

স্বপন টের পেল তার দুই রং ও কণ্ঠমূল ব’য়ে এক বলক ভগ্ন রক্ত মাথায় উঠছে। তার রাগ খুব বেশি হ’লে সে এটা খুব স্পষ্ট বুঝতে পারত। যা হোক আত্মসংবরণ ক’রে প’ড়ে চলে :

• “ভেবোনা আনা, এ কথা বলছি আমি ঈর্ষা-পরবশ হ’য়ে। এ-কথা যে সত্য তা যে-কোনো ওরিয়েন্টালিষ্ট বা ইংরাজকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে। ওদের বড় বড় দার্শনিক কথার ফাঁদে ভুলেও পা দিও না। জেনো ওরিয়েন্টালের কাছে সত্যতা আশা করা, আর সাপের দাঁতে মধু আশা করা—সমান। যে-মুহূর্তে নারীকে নিয়ে এতটুকু অসুবিধের পড়তে হয় সে-মুহূর্তে ওরা তাকে পথের ধুলোয় লুটিয়ে হয় গা-ঢাকা! তাই বলছি ওদের বাইরের চটকে বা শীপতায় ভুলো না। আশা করি এ-কথাগুলো ঠিক ভাবেই নেবে। আর আমাকে পরপাঠ তার ক’রে দেবে—আমি নীস থেকে তোমার নিয়ে সটাং কারো পাড়ি দেব। লক্ষীটি—আর অমত কোরো না। এ-রকম উড়ো-উড়ো জীবন ছাড়ো। দেখছ তো—তোমাকে দেখবার কেউ নেই? নইলে শবীর সারবার জন্তে একজন ওরিয়েন্টালের—রূপান্তরকারী হ’তে হয়? এ-অসম্মানও কি তোমার গায়ে বাজে না? ইতি—

তোমার

অমৃতপ্ত মরিস”

স্বপনের চোখ কান ঝাঁকি করতে লাগল। মাথার মধ্যে কেমন ক’রে উঠল—রাগে। একবার ডিক্রগড়ে একটি চা-বাগানে একজন সাহেবকে একটি কুলি-রমণীকে মারতে দেখে সে এইরকম রোগে উঠেছিল। তার মনে হ’ল যদি মরিস সামনে থাকত তবে সেই সাহেবটার মতনই



বেদম মার খেত তার হাতে। সে ঘুসি খেলা জানিত—কল্পনা করতে লাগল কী করে মরিসকে আক্রমণ করত—ও কী নিষ্করণ হ'য়েই না জখম করত তার নাক মুখ চোখ। উঃ! অপূর্ণ সে দৃষ্ট!! মরিস আর্ন্তনাদ করছে, মুখে ফেনা উঠছে, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, দুটো সামনের দাঁত ভেঙে গেছে!!—

হঠাৎ কেমন একটু হাসিও পায় আনাতোল ফ্রাঁসের একটা কথা মনে প'ড়ে : যে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা খুনে লুকিয়ে আছে—নষ্টলে খুন-জখনের খবরে মানুষ সর্বদেশেই এত উত্তেজিত হ'য়ে উঠত না। চমকে ওঠে আনার কর্ণধরে—এসব রক্তবিহীন জল্পনা-কল্পনার মাঝে।

—“কী স্বপন? ঠোট কাঁপছে যে?—খুব রাগ?—না?” আনা হাসে।

—“না—ঠিক—অর্থাৎ—” লজ্জাও হয় কেমন। অন্ধ দিকে চেয়ে থাকে। আনা বাধা দিয়ে বলে : “আমি কী ‘তার’ ক'রে দিয়েছি জানো?”

—“কী?” ওর কান, মাথা, মুখের সব রক্ত মুহূর্তে যেন পায়ে নেমে গেছে!

—“দে, অপরিচিত নিঃস্বার্থ ভ্রমলোককে যে-লোক গায়ে প'ড়ে এমন জঘন্য গালাগালি করতে পারে তার কাছে কিরে বাওয়া তো মূরের কথা, তার সঙ্গে খেলা করাও আনার পক্ষে অসম্ভব, এমন কি চিঠি লেখাও।”

স্বপনের বুকের রক্ত দ্রুত বয়। সে আনার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে গভীর চাপ দিয়ে বলে : “ধনুবাদ আনা।”

আনা হঠাৎ এক হাতে তার কণ্ঠবেটন ক'রে বলে : “এতে ধনুবাদের কি আছে বল? তোমার কাছে খণ আনার যে কতখানি তা কি তুমিই জানো?”

স্বপ্ন আনার কটিবেষ্টন ক'রে তাকে কাছে টেনে এনে ঈষৎ গাঢ়স্বরে বলে : “আনা—”

এমন সময় ঘরের দোরে আঘাত হয়। আনার মেডের হাতে একটা চিঠি।

## বেনারের প্রস্তাব

এত বিরক্ত লাগে! ঠিক এই সময়েই কি আনার চিঠি আসতে হয়!... একটু ভদ্র হেসে স'রে বসে। আনা বলে : “ও কি?—শোনো। মসিয়ে বেনারের চিঠি দে।” বলে তার একটা হাত নিজের বুঠোর মধ্যে ঢেপে ধ'রে তার কাছে ঘেঁষে ব'সে মৃদুস্বরে পড়ে :

“প্রিয় আনা,

পরশু মরিস এসে তোনার ঠিকানা নিয়ে যায়। প্রথমে তো আমার ওপরে তখিই হুক করে যে আমি এক অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশীর চার্জের তোমায় নীসে শরীর সারতে পাঠিয়েছি। কিন্তু আমি তার উদ্দেশ্যে দু-একটি চোখা-চোখা অন্তর টিপুনির লক্ষ্যভেদী বাণ ছাড়তেই সে থেমে গিয়ে অস্ত্র ত্বর ধরে। বলে : আমি যেন তোমাকে বুকিরে তার কাছে ফিরে যেতে বলি, সে তোমাকে ভালোবাসে, ডাইভোর্স কেস—যেটা আগামী সপ্তাহে কোর্টে উঠবার কথা—উঠিয়ে নিতে চায়, তোমাকে নিয়ে কে ওর বেলজিয়ান বন্ধুর কাছে কান্সরোতে বেড়াতে নিয়ে যেতে চায় ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর মিসিগিটে—সেগানকার জল-হাওড়া তোমার শরীরের পক্ষে সব চেয়ে ভাল হবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। সে-সব কথা তোমাকে সে নিজেই লিখে থাকবে।

“আমার এসবকিছো বিশেষ কিছুই ব্যক্তব্য নেই। এ-বিষয়ে তোমার

বা ভালো মনে হয় তাই করবে। কেবল একটা কথা আমার মনে হয় যে মরিস যে তোমায় এখনো ভালোবাসে বলছে সে কথাটা হয়তো সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। দাম্পত্যপ্রোতে এমন জোরার-ভাঁটা তো প্রায় একটা প্রাত্যহিক ব্যাপার, জানোই! অন্ততঃ নীরাকে যে সে ভালোবাসে না এ নিশ্চয়। এমন কি নীরা যে এখন কোথায় তাও সে জানে না। ক্রান্তে হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু পারিসে নেই। এরূপ ক্ষেত্রে যদি তুমি মরিসের কাছে ফিরতে চাও তো তোমার হয়তো খুব অন্ডায় হবে না। তবে তুমি এখন আর তাকে ভালোবাস কি না সেটা আমি জানি না অবশ্য। এটা আমার বলা উচিত মনে ক'রেই বললাম—নইলে এ-ধরণের অনধিকার-চর্চায় আমার বিরাগ কতখানি তা তুমি জানো! শুধু একটু বলা যে, তাকে স্বামী ব'লে স্বীকার করার দরকার একটুও না থাকলেও যদি তার প্রতি মেহ থাকে তবে বন্ধ ভাবেও—কিন্তু না। এ-সব তোমার বিচার্য্য।

"তবে একটা কথা। যদি মরিসের কাছে ফিরতে না-ই চাও তা হ'লে হয়তো তোমাদের ঠিকানা বদলানোই ভাল। কারণ সেনের ওপরে তার বিধব আক্রোশ মনে হ'ল। আমি বলি কি, তোমরা গ্রাস ছেড়ে অল্প কোথাও যাও না কেন? স্পেনের সান সেবাস্তিয়ান কি ইতালির গার্দা হ্রদে—এখন সময় খুব ভালো। যদি যাও তা হ'লে পত্রপাঠ আমাকে 'তার' কোরো—আমি কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব ও মরিসকে চমৎকার ধান্না দিবে বলব, তোমরা গেছ গ্রীসে বেড়াতে। ছুটুক না সে গ্রীসে। ধান্না দিতে আমার এত ভালো লাগে!....]’embrace ta main ma petite. \* ইতি—

পিয়ের বেমার

\* আমার চুপস নাও তোমার হৃদয়ের উপর, হোট্টাই।

পুঃ। সেনকে বোলো না একথা—কিন্তু তার ভুলে আমি একটু ভাবিতই হ'য়ে পড়েছি। কি জানি—উর্ধ্বাশে মরিস কী ক'রে যসে ? এসব ক্ষেত্রে বলা তো যায় না। তাই তোমাদের একটু সাবধান হ'তে বলছি। একটু গা-ঢাকা দেওয়ার কাপুরুষতার প্রমাণই আসে না অবশ্য। তা ছাড়া তোমার শাস্তির পক্ষেও সেটা ভালো।”

## নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে

চিঠির শেষের দিকটা পড়তে পড়তে আনার মুখে উদ্বেগের ছায়া এল ঘনিষে, কিন্তু সে জোর ক'রে হেসে বলল : “ও বাঃ। তোমাকে দেখানো হ'য়ে গেল যে।”

স্বপন হেসে বলল : “ভালোই তো হ'ল।”

আনা জোর ক'রে কণ্ঠস্বরের মধ্যে সহজস্বরের টেনে এনে বলল : “কিন্তু শোনো স্বপন। একটা কথা ক'দিন থেকে বলব বলব ভাবছিলাম : এ-চিঠির পরে বলা হয়তো সহজও হবে।”

স্বপন প্রস্তোৎসুক নেড়ে তার দিকে তাকালো—কোনো কথা বলল না।

আনা মুখ নিচু ক'রে মুহূর্তেরে বলল : “আমি বলি কি—তুমি পারিসে ক্ষিরে যাও। আমি তো এখন বেশ ভালোই হ'য়ে উঠেছি। সব দিক দিয়েই সেটা ভালো।” তার কণ্ঠস্বর খুব সহজ শোনালেও স্বপনের কানে এড়ালো না তার ভিতরকার ঢাপা স্পন্দন !...খানিকক্ষণ দুজনের কেউই কথা বলল না।

আনাই নিশ্চিন্ততা ভঙ্গ করল : “কী বলো মনামি ?”

স্বপন শুকনুয়ে বলল : “বহি তোমার দিক দিয়ে ভালো হয় আনা, তবে সে অল্প কথা—কিন্তু যদি মরিসের তরে আমাকে পারিসে ফেরত

পাঠাতে চাও তা হ'লে আমি এক পা-ও নড়ব না।" ওর বুকের মধ্যে কোথায় যেন বেদনার রসাল মূল ওঠে মোচড় দিয়ে...একটা দুর্জর অভিমানও...সঙ্গে আহত আত্মসম্মান!...

‘আনা বুল কোথায় যা লেগেছে। কিন্তু কথাটাকে সেদিকে বেক নিতে না দিয়ে শুধু হেসে বলল : “বাঃ—ভয়ের কথা কে বলল শুনি?”

—“তুমি।”

—“আমি?”

—“নিশ্চয়। নইলে সত্যি বলো তো—মরিসের চিঠি আসবার আগে একথা কি তোমার মনে একবারও উদয় হয়েছিল?” চেষ্টা সবেও প্রাণপণে-লুকোনো ঈর্ষা অভিমানের সুর ফুটে ওঠে যে!...ছি ছি।

‘আনা একটু চুপ ক’রে থেকে বলে : “হয়েছিল। তোমারও হয়েছিল। বলো। হয়নি কি? সত্যি বোলো কিন্তু।”

স্বপ্ন খানিকক্ষণ কিছুই বলল না, পরে বলল : ‘ঠিক এ-ভাবে না। ছাত্র আগের কথা এখন খাটে না, যেহেতু এখন ও-কথা ভাবাই চলে না।” ‘এখন’ কথাটার উপর খুব জোর দিল।

—“মানে এখন ‘স্বপ্ন’ রেছি—এই তো?” ‘আনা হেসে ফেলল।

স্বপ্নও হেসে ফেলল : “ঠিক না। তবে মরিসের ভয়-দেখানোর দরুণ গা-ঢাকা দিতে হবে”—তার অভিমানের সুরকে সে আফালন দিয়ে চায় ঢাকতে!...

‘আনা বোঝে, কিন্তু কথাটাকে ভয়ের প্রসঙ্গের দিকেই কিরিয়ে দেয় : “আজ্ঞা, কথাটাকে ও-ভাবেই বা নিলে কেন? চাঃ-ও তো কাপুরুষ ছিল না। বাস্তব বিপদকে যদি এড়িয়ে চলতে পারা যায় তবে সেটা না করাই যে দাঁড়ার গোয়ারতুমি। তা ছাড়া আমার পক্ষে তোমাদের বুকের লুপ্ত তো ভালো না হ’তেও পারে। ধরো যদি মরিস এসেই পড়ে

দু-একদিনের মধ্যে ? আমার হাফুমওলী তো এখনো দুর্বল আছে । তুমিই তো বলো ও-কথা অষ্টপ্রহর ।”

স্বপন মুখ নিচু ক’রে বলল : “যদি তোমার স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে হয় তবে রাজি আছি । কোথায় যাবে বলো ? গাঙ্গা—না মিসলি ?”

—“কোথাও না ।”

• —“সে কি ?” স্বপন আশ্চর্য হ’য়ে ওর দিকে তাকালো ।

—“আমি এখানেই থাকব স্বপন । কিছু মনে করো না—আমি বলি কি, তুমি যাও পারিসে ফিরে । কেন মিথো-মিথো একজন কোথাকার-কে-বাজবীর ক্ষেত্রে মিথো বোকা ব’য়ে বেড়াবে । আর বেড়ালেই বা—” আনার স্বর গাঢ় হ’য়ে এলো কিন্তু সে আত্মসংবরণ ক’রে বলল : “আমি কেমন ক’রে তোমাকে বিপন্ন করতে রাজি হই বলো দেখি ?” বলে ওর হাত ছেড়ে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বলল ।

স্বপন তার চিবুক ধ’রে জোর ক’রে তার রক্তিম মুখ ফিরিয়ে নিজের দিকে ধরল : “ওরিয়েণ্টালের বিবেক আছে কি না পরখই করো না আনা ।”

আনার চোখ চিক্ চিক্ ক’রে উঠল, আহত হুয়ে বলল : “হি, ও-কথা ঠান্ডা ক’রেও বলতে নেই স্বপন ।”

স্বপন ঈষৎ অপ্রতিভ হ’য়ে স্বর বদলে বলল : “আমার মাপ করো আনা ।—কিন্তু না, শোনো ও-সব পাগলামি রেখে একটু গম্ভীরভাবে কথা কওরা যাক । আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, তোমার ভাবনা এখন থেকে আমি ভাবব—কিন্তু আমার ভাবনা তুমি ভাবতে পাবে না ।”

আনার বাষ্পিত মুখ উজ্জ্বল হ’য়ে উঠল : “বাপু—বীরপুরুষ এরই নাম ।”

—“বীরনারীর বন্ধুত্ব যার জন্মস্থান বীরপুরুষ না হ’লে তার চলে ?”

আনা তার করতলের ‘পরে রেহিসিত চাপ দিয়ে বলল : “কিন্তু তা হ’লে আমারও একটা পালটা সঠিক আছে যে।”

—“যথা ?”

—“মিথ্যা সাহসিকতার বড়াই তোমাকে ছাড়তে হবে। চলো এখনি অন্তরে—যেখানে মরিস আমাদের সন্ধান পাবে না। সত্যিকার বিপদ না থাকলে মসিয়ে বেনার বলতেন না।”

—“রাজি। কেবল মনে রেখো যে, তোমার স্বাস্থ্যের জন্তে—”

—“হ্যা গো হ্যা বীরপুরুষ—তোমার নিজের প্রাণের ভয়ের জন্তে যে না—এ তো জানে তিনভুবনের বাসিন্দারা সবাই—অত ঘটা ক’রে জাহির করা কেন আবার ?”

স্বপন অপ্রস্তুত হ’য়ে বলে : “আমি তা—”

আনা বাধা দিয়ে ছেসে বলে : “জানি মনামি। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় বলো দেখি ?”

—“হুকুম।”

—“আমি বলি কি, চলো পাশেরই ম-পেলিয়ে কিংবা বোলিভাতে কোনো ছোট্ট হোটেলে। মসিয়ে বেনার মরিসকে ধাক্কা দিয়ে পাঠিয়ে দিল না গাদা হুদে—বলেছেনই তো তিনি—এ-সব মিথ্যা কথায় তাঁর পরমানন্দ হয়।”

ঢাকাঢাকিতে স্বপনের মন একটু থুং থুং করে, কিন্তু মুখে ইচ্ছুক ভাব দেখিয়ে বলে : “বেশি। কালই তা হ’লে ?—ম-পেলিয়েতে একটা ভালো হোটেলও জানি।”

—“তা হ’লে এখনি বেরোও ট্যাক্সি ক’রে; দুটি ঘর ঠিক ক’রে এসো। আজই সন্ধ্যার রঙনা দেব।”

স্বপন ট্যান্সি ক'রে চলল। ম-পেলিয়ে-তে 'বেলভু কোটেলে' ছুটি সমুদ্রসুখী ঘর ঠিক ক'রে ফিরল।

\* \* \*

• ওরা ট্যান্সিতে। আনা কোমল সুরে জিজ্ঞাসা করে: “কী ভাবছ মনামি?”

—“চাণ্ডের একটা কথা তুমিও আজ ঠিক সেই সুরে বললে খানিক আগে।”

—“কী?”

—“যে দরকার হ'লে বিপদ এড়িয়ে চলার নাম কাপুরুষতা নয়।”

—“তোমার কথাটা এতই আশ্চর্য মনে হচ্ছে না কি?”

—“ঠিক আশ্চর্য নয়। তবে নভেলি সাহস লু'ড়ে প'ড়ে সত্য সাহসের স্বরূপ অনেক সময়ে ভুলে যাই আমরা, নয়?”

—“সত্যি। তোমার বন্ধু চাণ্ডের সাহস তাই আমার অত ভালো লেগেছিল। দরকার হ'লে বিপদের সঙ্গুখীন হ'তে সে পেছপাও হ'ত না—কিন্তু দরকার না হ'লে বিপদের মধ্যে কাঁপ দেওয়ার মতন মুচু নট-ভজিমা তার ছিল না। অথচ এই জিনিষটাই তুমি চাইছিলে—এই নট-ভজিমা।”

স্বপনের মনের কোথায় বাজল, বলল: “বাঃ, চাইব না! আমি তো আর চাঃ নই।”

—“বাবা রে বাবা! কথায় কথায় অভিমানের বান ভেকে যায়!—অথচ আবার মেয়েদের মানিনী ব'লে ব্যঙ্গ করা হয় অমানবদনে!”

—“অভিমান করলাম আবার কোথায় শুনি? বরং ও-কথা আমিই



তো তোমার কতবার বলেছি যে চাণ্ডের মধ্যে কোথাও অভিনয়ের লেশও ছিল না। বলিনি?”

—“বলেছি! কিন্তু কি জানো মনামি। নিজের দোষ নিজের মুখে বলতে লাগে বেশ—কিন্তু পরে তাতে সায় দিলে ঠিক তেমন মধুময় লাগে না।”)

স্বপ্নন একটু অপ্রতিভ হাসে : “তা বটে।—চাণ্ডের একটা কথা কিন্তু এই ক্ষেত্রে কেবলই মনে হচ্ছে।”

—“কী?”

—“সক্রেটিস সিমিয়াসকে যা বলেছিলেন : ‘সাহসী মানুষও অনেক সময়ে মৃত্যুকে বরণ করে ভয় থেকে।’”

আনা একটু ভেবে বলল : “কিন্তু কথাটা কি সত্যি?”

—“অক্ষরে অক্ষরে। ঐদাহরণ দেব?”

—“কি রকম?”

—“আমিই নিজে।”

—“মানে?”

—“এই যে পানিক আগে চোটেল বদলাতে চাচ্ছিলেন না,—কম জানো কি?”

আনা হাসল : “পাছে আমি তোমাকে ভয়কাতুরে ভাবি।”

—“অবিকল। আর সেইজন্মেই আমার মনে হয় যে সক্রেটিস ঠিকই বলেছিলেন যে : ‘তুমি সত্য ষাণ্ডনিক ছাড়া আর সকলেই সাহসী হয় ভয় থেকে।’”

আনা বলল, “মপাসার একটা গল্প মনে পড়ল, জানো?”

—“কী গল্প?”

—“একজন লোক ভুলে গে তার প্রাণের ভয় প্রকাশ হ’য়ে পড়বে,

কাপুরুষ নাম রটবে এই ভয়ে করল আত্মহত্যা। পাছে গুপ্ত মৃত্যুভয় তার প্রকাশ হয় এই ভয়েই সে বেছে নিল ঐ মৃত্যুকেই।—কী জ্বলন্ত বাগান হোটেলটার!—” আনা হাততালি দিয়ে ওঠে। টাক্সি ঢোকে বেলুভা হোটেল।

## অনিবার্য

মাহুকের জীবনে এমন যোগাযোগ কত সময়েই না ঘটে যখন সে তার উপস্থিত কন্ঠের দায়িত্ব বাইরের ঘটনা-চক্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে পরম আরামের নিঃশ্বাস ফেলে। মরিসের ও মসিয়ে বেনারের চিঠি দুটির 'পরে ওর মপেলিয়েতে আসার দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে স্বপন এমনিই একটা স্বস্তির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। এর পর কি আর আনাকে একলা ফেলে বাওয়া যায় কখনো?—একে আনার এই বেপথু স্বাস্থ্য—তার উপর ঐ পাথর মরিসটার—‘স্টাউণ্ডেল’ কথাটা তার বসনাগ্নে এমন তৃপ্তির স্বাদে প্রায়ই উপ্ছে ওঠে!—ওরিয়েণ্টালরা মেয়েদের সঙ্গে মিশতে জানে না!—Deep-dyed villain কোথাকার! সে দেখিয়ে দেবে এবার—ওরিয়েণ্টালরা কী বস্ত!

কিন্তু সন্ধ্যা? ভাবতেই বুকের মধ্যে কোণার খস্ ক’রে ওঠে। তাকে কী বলবে ও? মরিসের সদয়হীনতা যে অনেক তা মেখে দেখাবে কেমন ক’রে? বোঝাবে কেমন ক’রে যে একেই আনার তার নেওয়া ছাড়া তার গতিই ছিল না। হার রে প্রণয়ি-প্রণয়িনী! পরম্পরকে পরস্পরের প্রাণের কথা বোঝাবার কতই না নিফল চেষ্টা!

ভেবে-চিন্তে সে সন্ধ্যাকে একটা চিঠি লিখে দিল মপেলিয়ের ঠিকানা দিয়ে ও মরিসের ভয়-দেখানোর বিশেষ ক’রে উল্লেখ ক’রে। আরও

অনেক কথা লিখল ঘুরিয়ে কিরিয়ে—কেবল একটা কথা বাদ : যে, সে আনার সংস্পর্শ কাটাতে চেষ্টা ক'রেও কৃতকার্য হয়নি। লিখল : পরের মেলে বড় ক'রে লিখবে। কেন যে প্রতি মেলে এ-ধরনের প্রবোধ দেয় সে!...কোথায় যে একটা স্থল কুঠা বাজে এ-সব ছোটোখাটো—মিথ্যা আশ্রয়ের জন্মে ?

মপেলিয়েতে এসে তার একঠোর ভাব কিছ একটু একটু ক'রে কেটে যায়। ওরা দুজনে একটু একটু ক'রে কাছে না এসেই পারে না। এতে থেকে থেকে স্বপনের কোথায় যে বেঁধে...সময়ে সময়ে সে একটু পাশ কাটাতে যায়—চবি-আঁকার অছিলায়। আনাও বলে চমৎকার একটা নভেল জুটে গেছে। কিছ উভয়ের অকুহাতই উভয়ের কাছে কাচ-স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠে প্রথম থেকেই যে।...তা ছাড়া দুদিন বাদে দূরত্ব কেটে যায়ই ও কণিক বাবধানের পর ওরা দেখে ওরা পরস্পরের আরো কাছেই স'রে এসেছে! হায় অনিবার্য!

## বৈলক্ষণ্য

কিছ দিন পাঁচ-সাত বেতে না যেতে সে নিজের মধ্যে একটা ভাব-বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করল। আনার মধ্যেও। সেটা হয়তো নিজেরই বৈলক্ষণ্যের ছায়া। বলা কঠিন,—এ-সব জিনিষ এমন পরস্পর-সংস্কৃত যে বলা ভার হয় অনেক সময়ই—কোনটা কার্য কোনটা কারণ। কেবল একটা জিনিষ বলা যায় : যে, ছায়ার পিছনে যখন বাস্তব থাকে তখন তার রূক্ষতাকে আর ছায়াময় বলে কোনোমতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না—ছায়ার অস্বীকার করতে ইচ্ছে হ'লেও কোনোমতেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না।

দুজনের মধ্যেই কী রকম একটা প্রত্যাশার ভাব জন্মে উঠছে যেন—  
অথচ উভয়েই আকারে-ইচ্ছিতে পরস্পরকে বোঝাতে চায় : যেন এ সেই-  
শ্রেণীর সহজ প্রীতি-বসন্ত যার আকাশে মন-কথাকথির টুকরো মেঘেরও  
নেই স্থান। কত রকম মনোমালিঙ্গ সে!—জয়তো কোনোদিন স্বপনকে  
আনা বলল নাচতে—স্বপন না-ও বলতে পারে না—অথচ ওয় এতটুকু  
অনিচ্ছার আভাষেই আনার মুখ যায় মেঘে ছেয়ে।

তারপর সে এক মহা বিষ্ট অস্বস্তি—malaise যাকে বলে। ঐ  
একটু অনিচ্ছার ছায়াতেই সমস্ত মোহাদ্যের স্বর্ণোজ্জ্বলতা গেছে পিঙ্গল  
হ'য়ে। তখন সে-আওতায় নেচেও স্বস্তি নেই—কেননা আনার মন আর  
করে না অথচ ঠাট বজায় রাখবার জন্তে তবু নাচতে হয়—নইলে যে  
আরও থারাপ দেখায়। কোনোদিন বা এ-ছায়া হঠাৎ ঘনিরে আসে  
অন্ত কোনো উপলক্ষ্যে—যেমন টেনিস খেলা নিয়ে বা থিয়েটার দেখতে  
যাওয়া নিয়ে বা সাঁতারকাটা। এ যেন এক সম্পূর্ণ নতুন ধরণের, নতুন  
শ্রেণীর অভিজ্ঞতা স্বপনের কাছে। সন্ধ্যার সঙ্গে ঠিক এ-রকমটা তো  
কই কোনোদিন হয়নি। স্বপন বেশ দেখতে পায় : আনার মধ্যে আছে  
একটা উগ্র চাওয়ার কামনা। সে ধরণের প্রত্যাশা সন্ধ্যার মধ্যেও ছিল  
অবশ্য (কোন মেয়ের মধ্যে না থাকে?) কিন্তু এত তুলভাবে নয়। না,  
ব্যক্তি ঠিক তা-ও নয়। সন্ধ্যার মধ্যে নিজেকে পিছনে রাখার অস্বস্ত  
একটা অহুত অহুমোদনও ছিল। কিন্তু আনা মনে-প্রাণে দুঃখোপীয়া  
ঠিক এইখানেই—এ-ধরণের আত্মবিলোপে বিশ্বাসই করে না আদবে।  
অবশ্য আবেগ-জগতের নানান লেন-দেনে সে যে আত্মপ্রতিষ্ঠার আনাচে-  
কানাচেই ঘোরে এটা সে বুঝে স্বীকার করে না—হাজারই বলি না কেন  
চাওয়ার উদ্বিগ্নতার মধ্যে যে-একটা আত্মবাসননা প্রচ্ছন্ন হ'য়ে লুকিয়ে  
আছেই আছে তাকে সাধ ক'রে নিরাবরণ করতে চায় কে?—কিন্তু তবু

এটা প্রকাশ হ'য়ে পড়েই যে নিত্য নিয়ত।—হয়েছে কি, দিতে হ'লেই হুমে-আসলে কিরে চাওয়ার প্রত্যাশা আনার মজাগত, আর এই প্রত্যাশাতেই ওঠে রাছোর ঝড়ঝাপটা, হৃদয় বাধে নিত্য নতুন ওজরের দানা বেঁধে—যারা একবার বাধলে কি আর গলতে চায় সহজে? এসব মন-কষাকষি ও মন-ফিরে-পাওয়ার মধ্যে নেই শাস্তি, নেই আত্মপ্রসাদ,—আছে শুধু একটা অকথিত নেশার মাদকতা যার অবসানের পরেই ছেঁরে আসে এক শ্রেণীর প্রলসঙ্কল অবসাদ। কণে কণে মেঘোদয়—কেবল দাম্পত্য প্রেমের ধারাসারের তৃপ্তি বা ভরসাটুকু বাদ। মনের তন্তুতে তন্তুতে টান ধরে—অপচ ব্লথ হ'তে দিলেও বিপদ। আর সব চেয়ে বিপদ ঘনিয়ে আসে—যখন অভিমানের কেরে নিষ্ঠুরতার ও প্রতি-নিষ্ঠুরতার ধূল শুল্লিক ফিলিক মেরে ওঠে ওদের মনের দিগন্তচক্রে। একটি শিখায়-ই সমস্ত প্রীতির আকাশের বুক কেমন যেন পাংশু হ'য়ে ওঠে—চাপা বেদনায়—কোভে!...

সত্যি, মেঘ কেটে যায় ও কাটার সঙ্গে সঙ্গে আসে একটা দীপ্ততর উল্লাস...রঙীনতর মাতোয়ারা উদ্দামতা...কিন্তু সেটাও যে আবার পুরোপুরি উদ্দামতা হ'য়ে ঘন হ'তে পায় না। প্রতি মান ও মানিক, বন্ধ প্রত্যাখ্যান ও অতশোচনা, ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণের ফলে গুহা একটু একটু ক'রে পরম্পরের কাছে স'রে আসে বৈ কি—নতুন পরিচিতির অরুণ আলোকে। কিন্তু তাতেই কি ছাই পুরো স্বত্তি আছে—বিশেষ ক'রে স্বপনের?...কেমন একটা ছায়া যেন একটার পর আর-একটা গাঁঠ-পড়ার অস্বস্তি। যেন তার ইচ্ছাও তার নিজেই না—কে তাকে বস ক'রে পুতুল নাচাচ্ছে। বতই সে ছাড়াতে চায় ততই যেন আটকে যায় কোথায়!...গ্রহি—গ্রহি—কুরাশির গ্রহি। বাঁধে কে?...

সব চেয়ে মুন্সিল এ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করাও অসম্ভব।

কিন্তু ইসাবেলার সঙ্গে তো যেত? তবে আনার সঙ্গে বার না কেন?

অপন থেকে থেকে ভাবে : এইখানে বুঝি ইসাবেলার সঙ্গে আনার একটু মূলগত প্রভেদ আছে।...

কিন্তু তাই কি আছে? ইসাবেলার ক্ষেত্রে খোলাখুলি কথাবার্তা সহজ ছিল কি শুধু চাতকের মধ্যবস্তিতার জট্টাই নয়?

সে ভাবে চাতকের সঙ্গে ইসাবেলার কি এই প্রণীর মন-কথাকথি কখনো হ'ত না আগে আগে?—তার হঠাৎ জানতে ইচ্ছে হয়। সে চাংকে এক দীর্ঘ পত্র লেখে—সব খোলাখুলি জানিয়ে। সন্ধ্যাকে এসব লিখতে পারে না—তাই বুঝি চাংকে লিখে তার মনটা এত হালকা বোধ করে? চিঠিটা ডাকে দিতে গিয়ে তার মনে পড়ে চাং একদিন তাকে বলেছিল : “এক-একজন লোক আছে অপন বারা প্রকৃতিতেই গল্পে—কথক—নিজের কথা কাউকে না বলতে পারলে যেন মনমরা হ'য়ে থাকে।” অপন পালটে বলেছিল : “আবার এক-একজন লোক থাকে বান্ধের মনের অন্তরে অন্তরহীন স্তোত্র বোধে বিপুল ডুবুরি নামালেও তল মেলে না। কোন্টী ভালো?”

কেউ কি জানে?—চাংকে লিখে অপন ভাবে।

## যাযিচা

আকাশ নির্মল। সকালবেলা ওষের খেয়াল চাপল নোকোতেই করবে পিকনিক।

অপন একটু আশস্তি ক'রেই সামলে দেয়। আনা কুল বোঝে আর কি। সেই মেঘ—আর একটু হ'লেই এসেছিল আর কি সমস্ত আকাশ-

ভরা আলো ডুবিয়ে দিতে!...অনেক কাকুতি-মিনতি সাধা-সাধনা করে তবে বোঝাতে পারে যে ওরই শরীরের অন্তে...ডাক্তারে ইত্যাদি। আনার মেথলা মুখে হাসির অরুণোদয় হয় বটে কিন্তু ছেঁড়া মেথের একটা আবছা পর্দা থেকে যায়। তা ছাড়া মানভঙ্গের মুকিলও তো ছাই কম নয়। দোতরফা গুণ্ণোল বে!—নিজের নিরালা মনকেই সামলানো দায়—এ আবার দুটি প্রত্যাশী মনের ঘাত-প্রতিঘাত!—একদিকে মনের কোথায় যে কি-একটা অদৃশ্য অমুতাপ মতন জমাট হ'য়ে থাকে—অন্যদিকে বেদনা-বিলাসী আহত মায়ু—সামান্য আঘাতেও দুগন্ধই ওঠে কাংক্ষপারের মতনই কন্ কন্ করে—তা আবার সম্পূর্ণ ছুঁতাবে। বিড়ম্বনা আর কাকে বলে! সবার উপর বিপদ এই যে, মনের আকাশে মান-অভিমানের মেঘ ঠিক ধূম-জ্যোতি-সলিল-মরুতের সঙ্গিপাতে গড়া মেথের সামিল নয়—উত্তরাধিকারী রেখে যায়ই কোনো না কোনো ছদ্মবেশে।...যাক, ওরা তো বেকলো, তৌড় জোড় বেধে।...

\* \* \*

বেকবার সময় একখণ্ড আগত মেথের জাহাজ পাল তুলে আকাশ দিলো ঢেকে। ওরা তারি অগ্নি হ'য়ে ওঠে। অকুরের মেথের টাল সামলানোই দায়! কিন্তু হঠাৎ প্রকৃতিদেবীর দয়া হ'ল : প্রথমতঃ পৃথাদেব একটু বাদেই মেথের আড়ালে থেকে আলোর তীরকাজি করলেন সুক, তার ওপর—সাথে এল একমল লম্বা হাওয়ার বরষ। দেখতে দেখতে জমাট মেথের জাহাজ টপিকো হ'য়ে কোথায় যে গেল ভেসে! ...অপন আশ্রয় হ'য়ে আনার মাথার উপর থেকে জাপানী সান্বেডতি হ'য়ে ঠোঁট ধরানোর সহায়তা করতে বলে আর কি।

আনি হেসে বলে : "হু—সমো, ও কি তোমার কাক!—আহা

নোকো উলটে বাবে—কী যে করো ?” হোটেলের মাঝি মুখ টিপে হেসে অস্ত্র দিকে চায়। স্বপন একটু অপ্রস্তুত বোধ করে। লোকটা বুঝি ভাবল—স্বপন মেয়েটির তর্জনী-সঙ্গেতে ওঠে-বসে ! আনা সময়ে সময়ে এমন তীক্ষ্ণ টোন ধরে হঠাৎ ! সে উঠে বাইরে গিয়ে বসে বিরস বদন বখাসাধা উজ্জলতার সুশীল ভণ্ডামি দিয়ে মুড়ে।

আনা মুখ টিপে হেসে বলে : “কের রাগ হ’ল ? এসো এসো। হঠাৎ স্পিরিট ফেলে পাছে দুর্কিপাকে কেলো—তখন একদিকে জল একদিকে আগুন—কী অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ কি ? লক্ষ্মীটি ভেতরে এসো—শোনো।”

মাঝিটা আরও হাসে। স্বপনের কোথার আরও থচ্ ক’রে বাজে : কেন এত চেষ্টা করে ও এসব কর’ল ? মুখে কিছ সে একটি কথাও না ব’লে হুড়হুড় ক’রে ছত্রির মধ্যে এসে বসে। মাঝিটার সামনে ‘আসব না’ ব’লে ‘সীন’ করতেও বাধে যে !

আনা দৌড় ধরিয়ে একটা সসপ্যানে কি-একটা চড়িয়ে—টোভের আঁচ একটু কমিয়ে স্বপনের খুব কাছ ঘেঁষে ব’সে ওর একটা হাত ধরে থপ্ ক’রে।

স্বপন হাত টেনে নেয়।

—“কী করো আনা ? মাঝিটা লক্ষ্য করছে হ’ল আছে ?”

আনা ফিক্ ক’রে হাসে : “ইলাবেলার সময় ছিল তোমারই কি ?”

স্বপনের এমন রাগ হয় !... বলে : “কী যে কথায় কথায়—” ব’লেই খেমে যায়।

আনা চটুল হয়ে বলে : “আহা—কথাটা শেবই করো।” ব’লে কের ওর হাত বন্ধনত ধায়।



স্বপন ওর হাত এড়িয়ে বলে : “তোমাকে বলেছি তো ও-রকম ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।”

—“বাগ্গে! ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি কটাক্ষ হ’লে ঠাট্টার পুষ্পাঘাতও হয় শক্তিশেল।”

স্বপন বিদ্রস্ব স্বরে বলে : “নিজেদের খোঁচাকে মেয়েদের অমনি কুলের পাপড়ির মতন নরমই মনে হয় বটে।”

—“ও মা—গো!”—আনা গালে হাত দিয়ে বলে—“খোঁচা দিলাম আবার কখন?”

স্বপন উত্তর দেয় না। আনা অত্যন্ত কোমল স্বরে বলে : “বলো না লক্ষীটি! কী এমন বলেছি যে—” ব’লেই হেসে ফেলে খিল খিল ক’রে!

স্বপনের রাগ আরও চ’ড়ে যায়—মুখ ফিরিয়ে বসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে। এ-সময়ে হাসি!

আনার উজ্জ্বল স্বরে মুহূর্তে অস্বস্তাপের মিড় ওঠে ফুটে, সে স্বপনের হাত নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধ’রে নাছোড়বন্ধ স্বরে বলে : “লক্ষীটি—মনামি!”

স্বপন একটু নরম হ’য়ে বলে : “কেন তবে অমন স্বরে কথা বলে—সকলের সামনে?”

—“সকলে মানে—আমাদের সামনে কি কার্ডিনালের পাল বিশপের কাঁক ব’সে?”

—“তা না হ’তে পারে—কিন্তু যখন ও-লোকটা হাসল তোমার দাবড়ি দেখুয়ালে তখন—”

—“ও মা আমার কি হবে? তোমার দাবড়ি দেব আ—মি? যাড়ে কি আমার একটা বই দুটো মাথা আছে?”

স্বপনের হাসি যায়, কিন্তু সঙ্কিত রাগের তাপে সে দ্বিধতা কমতে

না-জমতে বার ফের উবে, বলে : “বখন অকারণ রাগ করে তখন এ-টোন থাকে কোথায় ?”

—“প্রথমত, রাগ করিনি আমি একটুও। দ্বিতীয়ত, তুমি এত অভিমানী হয়েছ আজকাল—”

—“অভিমানী আমিই বটে !”

—“নয় ? এ-সীন করছে তবে কে ?”

—“সীন—রুচ টোনে কথা ব’লে ও-মানিটার সামনে আমাকে হাতাম্পদ করল কে শুনি ? আবার—” দেখতে দেখতে স্বপনের রাগের তাপমান বস্ত্রে পুরুবাণি অভিমানের পাগা ফের হ হ ক’রে ওঠে। সীন ! করেছে সে ?

—“ফের রাগ হ’ল ? কী যে করি তোমার নিয়ে স্বপন ?”

স্বপন মুখ ফিরিয়ে বসে ফের। আনা তার পিঠে হাত রেখে বলে : “ন” শেভালিয়ে !”

স্বপন গা ঝাঁকুনি দিয়ে তার রক্ত হাতটা ঠেলে দেয়। মুহূর্তে আনার মুখে মেঘ জমে ওঠে। সে তৎক্ষণাৎ স’রে স্টোভের সসপানের ‘পরে মনঃসংযোগ করে। তার চোখ দুটি চিক্ চিক্ ক’রে ওঠে।

স্বপনের রাগ মুহূর্তে কোমল উৎকণ্ঠায় দ্রব হয়। খানিকক্ষণ উল্গুন্ ক’রে শেভটায় উঠে আনার পাশে এসে বসে। আনা ফিরেও তাকায় না। স্বপন তার পিঠের উপর একটা হাত রাখে।

আনা স্তম্বেকবৎ অটল অচল। সসপানে একটা চামচ নিয়ে খুব জোরে নাড়তে থাকে—যেন এ দক্ষতার ‘পরেই ওর জীবন-মরণ।

—“আনা !”

আনা উত্তর দেয় না।

—“রাগ করলে ?”

—“রাগ করব আবার কার উপর?”

—“আচ্ছা ভেবে দেখ—মাকিটার সামনে ও-রকম ব্যবহার করলে, আর তাতে ও হাসল, কী ভাবল বলা দেখি?”

—“কিছু ভাবেনি ও।”

—“বাঃ! মুখ টিপে পষ্ট ব্যঙ্গের হাসি হাসল, তার কি?”

—“আর তুমি যখন আমার হাত ছুঁড়ে ফেলে দিলে তখন যে দুঃখের কান্না কঁাদল—তার?”

স্বপন হেসে ফেলে : “আমার হার হয়েছে গো হয়েছে রোজকার মতনই। এটী নাও ঘাট মানছি। হ’ল? কিন্তু নোকোর মধ্যে জাল পাত্তি কী ক’রে বলা দেখি?”

আনার মুখ নরম হ’য়ে গেল এক মুহূর্তে। কী আশ্চর্য! স্বপন নিম্ন হেসে ভাবে—মেয়েরা এত সহজে ফৌসফৌসানি থেকে নবনী কোমলা হ’য়ে পড়ে!—স্বপন ওর একটা হাত টেনে নেয় একেবারে কোলের মধ্যে।

আনার চোখে তখনও কিকিমিকি কিছু মুখে হাসি। স্বপন মুগ্ধ হ’য়ে চেয়ে দেখে।

আনা ফিক্ ক’রে হেসে বলে : “কী এত দেখছ হা ক’রে বললেই না-হয়।”

স্বপন তার গালের ’পরে টোকা মেরে বলে : “ইন্দ্রধনু।”

আনা ঝাপা ঝাঁকি দিয়ে হেসে বলে : “এবার? ও-লোকটা হঠাৎ শূন্যে মিলিয়ে গেছে বুঝি? দেখছে না?”

—“হার হয়েছে আনা, বললামই তো—রোজকার মতন।”

—“আ—হা—হা। তেমনি শিষ্ট শাস্ত ছেলেই বটে;—সাক্ষাৎ দেবদূতের ডানাকাটা সংকরণ। আর আমি যদি একটুও কিছু বলি—

এমন মুখ করবে যেন আমি বলছি তোমাকে ছুনিয়া ছেড়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে আমার জন্তে ।”

স্বপন হাত ছেড়ে দিয়ে বলল : “প্রায় তাই যে বলো মাঝে মাঝে আনা, কেবল ছ’শ নেই এই যা ।”

আনা চকিতে ওর মুখের দিকে তাকালো : “বলি ?”

—“ঠিক তা না”—স্বপন কাঁটচামি হাসে—কিছু কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে যে ধনুকলট বাণের মতন ।

—“তবে ঠিক কী শুনি ?”

—“কের জেরা ?”

হঠাৎ আনা গম্ভীর হয়ে বলল : “আমার সব আবদারই তোমার কাছে আজকাল ভার মনে হয় স্বপন—আমি কি বুঝি না ভাবো ?”

—“সে কি !”

—“নইলে জেরা বললে কেন ?”

—“ওই ভেবেই বললাম বুঝি ?”

—“নইলে কী ভেবে বললে জানতে পারি কি ?”

—“সাধে বলে মেয়েরা কল্পনাময়ী ?”

স্বপন হাসবার চেষ্টা করে নটের মতন ।

—“কল্পনা ?—সত্যি বলো তো ?”

কথাটা আবার এমন অকস্মাৎ তুকানের দিকে মোড় নিচ্ছে । স্বপন শঙ্কিত মুখে চূপ ক’রে যায় ।

আনা চেপে ধরে : “বলো—বলতেই হবে ।”

—“ভালো জাণা ! কী বলব বলো দেখি ?”

—“জাণা ?—বে—শ ।” আনা কের মুখ ফিরিয়ে বলল ।

—“কী মুক্তি ? কী করব বলো দেখি তোমার নিয়ে ?”

—“আমার ছেড়ে দাও স্বপন—ছেড়ে দাও—আর কিছুই করতে হবে না তা হ’লে।—যাকে ব’য়ে বেড়ানো এতই হুঃসহ হয়েছে—যার একটা কথাও সহিতে—” আনার কথা শেষ হ’ল না। তার ব্লাউসের হাতার সে চোখ ঢাকল। সসপানের মধ্যে যাই থাক পুড়ে বা হ’য়ে গেছে তা নিক্সিশেষ।

\* \* \*

স্বপন স্টোভের জ্বল নামিয়ে শুধু চা করল একাই। আনা সেট যে মুখ ফিরিয়ে ব’সে রইল আর তার খেয়ালই নেই কিছুই। ডিম ভাজা আর হ’ল না। রুটিতে মাখন মাখিয়ে স্বপন ওর সামনে ধরল। আনা ফিরে তাকালোও না।

স্বপনের মনের কোণে কোণে জ্বল জ্বল জমে ওঠে। এততেও রাগ পড়ল না ওর? কী করেছে সে শুনি? নিজের চাও সশব্দে ঠেলে সরিয়ে আনার দিকে পিঠ ক’রে ও উলটো দিকে রইল চেয়ে।

আনা ফিরে বলল : “খেলে না?”

—“নাঃ।”

—“কেন?”

কথা নেই।

আনা একটু কাছে স’রে এসে বসে। এবার স্বপনের পালা। সে একদৃষ্টে একটা জাহাজের পানে জটিক করছে প্রাণকে বাজি রেখে...

আনা খানিক উন্মুখ ক’রে হঠাৎ কি ভেবে স্বপনের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিল টেনে। স্বপন একটু টানাটানি করতেও ছাড়বার নাম করে না। তখন ও মুখ ফিরিয়ে ব’সে রইল : বেন ওটা ওর হাতই না—ধরুক গে।

—“থাবে না ?”

—“না: ।”

—“তোমাদের টোন বৃষ্টি কোমলতার পরাকাষ্ঠা ?”

স্বপন শুক সুঁরে বলল : “আমরা তো ওরিয়েন্টাল ! তত্ত্বতা জানব কোথেকে বলো ?”

—“আমি কি তাই বলেছি ?”

স্বপন চুপ ক’রে থাকে ।

—“আমার দোষ হয়েছে স্বপন—এসো খাও ’সে ।”

—“না: ।”

আনার চোখের কোণে দু’বিन्दু জল টলটল ক’রে ওঠে । শত চেষ্টা সত্ত্বেও স্বপনের মন উদাসীন থাকতে পারে না আর । কিয়ৎ ।  
কিন্তু তখন আবার আনার পালা যে—নাগাল পাবে কোথেকে ?

স্বপন একটু চুপ ক’রে থাকে—কী করবে ঠিক ভেবে পায় না ।

হঠাৎ বলে : “আনা !”

উত্তর নেই ।

—“আনা !”

—“কি ?”

—“কী হয়েছে ?”

—“কই ?”

—“বা: । কী সভাবানিনী ?”

নিঃশূন্য ।

—“আনা !”

আনা কিরে চাইলো এবার, কিন্তু কিছু বলল না ।

• —“তোমার চা কই ?”

—“কে জানে।”—আনা ফের মুখ ফেরালো।

—“কেন অমন করছ আনা?”

—“কী রকম আবার?”

—“ও-রকম।”

আনা হঠাৎ একটু হাসে—সামান্য চাপা হাসির ছটা...কিন্তু তাতেই তার সমস্ত মুখের ব্যক্তনা যায় কি একেবারে বদলে!...হু'চোখের উপাস্তে সেই দুটি মুক্তাবিন্দু তখনও টলটল করছে...কানে দুটি রুবির গুলও ছাতি ঠিকরে ঠিকরে সেনুতোর সাথে করছে সঙ্গত...হেলে ঢুলে...হু'একটি চূর্ণালক ঈষৎসিক্ত কপোলে একটু একটু কাঁপছে...সর্বোপরি ঠোঁটের আশেপাশে উৎসুক হাসির ঝিকিমিকি!...কী সুন্দর!—স্বপন দ্বির-নেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখে—সব ভুলে।

হঠাৎ আনা মুখ তোলো। ওদের দৃষ্টি বিনিময় হয়...মুখে এক ঝলক কাগ ছড়িয়ে দেয় কে, বলে : “কী দেখছ এত শুনি?”

—“মেঘ ও যৌহনের কিয়ারসুরো।”\*

আনার সম্মুখ হাসি এবার প্রফুল্ল হাসিতে রূপান্তরিত হয়, বলে : “আর ভাবছ?”

—“যে-মেঘ দেখতে সিন্ধুতম তার অন্তরেই বাজ ভিৎ রচে কী দিগে?”

—“আ—হা—কঠিন আমিই বটে!”

—“তবে কে শুনি?”

—“চা না খেয়ে মুখ ফেরায় কে? পিঠের ওপর হাত রেখে ডেকে ডেকে সারা হলেও উত্তর দেয় না কে? কাকুতি-মিনতি সাধাসাধি করলেও গোড়ায় কে?”

\* Chiaroscuro—ধ্বংস।

—“আর মাঝির সামনে ভদ্রসম্মানকে অপদহ করে কে ? বেগে টং  
ত’য়ে সসপানের নিরপরাধ সোনালি অমলেটটাকে কয়লা-কৈবল্য দান  
করে কে ? ঠাট্টাকে গম্ভীরভাবে নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধায় কে ?”

আনা ঠোট ফুলিয়ে “রহ !” ব’লেই ঘাড় ছলিয়ে ক্যাথলিকদের  
মুতন দুটিবন্ধ করযোড়ে বলে : “ঘাট মানছি বাক্যবাগীশ বীরপুরুষ মহাশয় !  
কিন্তু অধীনীকে নিজন্তুণে ক্ষমা ক’রে এখন একটু চা ইচ্ছে হবে কি ?”

—“তুমি না খেলে খেতে পারি আমি ! বাঃ !!”

—“বাপরে ! কী দরদ ! কেবল সইলে হয় এত সুখ !”

দ্বপন তার পেরালায় চা ঢেলে বলে : “সইবে গো সইবে । অপহকে  
চুটিয়ে দুঃখ যে দেয় আনা, অখের স্বব তারই একচেটে এই কথা প্রমাণ  
করবার জন্যেই যে জগতে মেয়েদের সৃষ্টি ।”

আনা হঠাৎ ঝুঁকে তার দুই কাঁধে কোমলভাবে দুই হাত রেখে  
বলল : “জেনেসিস্ সম্বন্ধে এতদিনে সত্যিকার অতীতদ্রষ্টা মিলল । না,  
ত্রিকালদর্শী ।”

নোকাটা একটু বেক নিল এট সময় । আনা ওর গায়ে ঢ’লে পড়ে  
অন্তকিতে ।

দ্বপন আর পারে না । বহুদিনের সংঘম ? দূঃ ! আনার আকর্ষণ  
গাও ...

আনা চক্ষের নিম্নে দিল প্রতিদান, কিন্তু দিবেই মুখ টিপে হাসে  
মহ মুহু ।

দ্বপন হাসিমুখে বলল : “কী ? জয়ের আনন্দ ?”

—“না ।”

—“তবে ? জিবাংসা ?”

—“বলব না ।”



—“লক্ষীটি।”

—“একটা কথা মনে হ’ল।”

—“কী?”

—“এ-নোকা-নাটিকার শেষ অঙ্কের এ দৃশ্যের \* জন্তে দায়ী কে ভাবছিলাম।”

—“কে?”

—“ঐ তুচ্ছ মাঝিটার হাসি—প্রথম অঙ্কে।”

স্বপন লোকটার দিকে তাকায়। সে ফের হাসে!...

স্বপনের বুকের মধ্যে কি-একটা তার ওঠে বেজে। সত্যিই তো।  
এতদিনকার এতবড় সংঘর্ষের পণ ভেঙে এতবড় একটা অসংঘর্ষের দিকে  
ওদের দুজনকে ঠেলে দিলো কে? না, একটা অসভ্য অভদ্র চুই-মিতরা  
চকিত হাসি!—একটা সামান্য, অজ্ঞাত, অবাস্তব অর্থহীন মাঝির!...

## \* QUI S'EXCUSE S'ACCUSE

স্বপন হোটেলে ফিরে এসেই নিজের শোবার ঘরে গিয়ে উপুড় হ’য়ে  
বিছানায় শুয়ে পড়লো। মনটা এমন খারাপ হ’য়ে গেছে। কী করল  
সে! সত্যি বটে ‘আজকাল তার বিবেক একটু বেশি স্থিতিস্থাপক হ’তে  
শিখেছে—কিন্তু এতটা!...অবশ্য “এতটা” কথাটা এ-টোনে বলা হয়তো  
একটু বাড়াবাড়ি—কেননা একটা চুষনের বেশি গড়ারনি ব্যাপারটা...  
কিন্তু ইসাবেলার সঙ্গে দেখা হবার আগে এটুকুও কি তার অকল্পনীয়  
ছিল না? শুয়ে শুয়ে কত রকম যে মনে হয়।...এক-একবার নানা দিক  
দিয়ে নানা দৃষ্টি দিয়ে নিজের আচরণকে সে সমর্থনও করে : এরা

• Denouement = শেষ নিষ্পত্তি।

এ-সবকে তেমন মারাত্মক তো মনে করে না ; সে রোমে এসে রোমানদের ব্যবহারকে এড়িয়ে চলতে যেয়েই এত দুঃখ পাচ্ছে হয়তো ; ভারতীয়রা তিলকে তাল ক'রে দুঃখ পেতে বড় ভালোবাসে—ইসাবেলা সেদিনও তো বলেছিলেন—এমনি কত সাধনা প্রবোধ !...

আর এ-সবে যে মনটা স্বস্তি একেবারেই পায় না তা-ও নয় । কিন্তু সে-স্বস্তির পথেও কাঁটা হ'য়ে দাঁড়ায় যে আবার কোথাকার একটা স্বপ্ন অক্ষতপ্রায় বিষম স্বর—যে বলে : “এ-সবে মারাত্মক কোনো ভরাডুবি নেই হ'তে পারে, এ-সবে ওরা কিছু মনে করে না এ-ও হয়তো হ'তে পারে—কিন্তু এ-রকম ঢালু পথের শেষ অবতরণিকা কোথায় ?” কোথায় ? —দেহের দিক দিয়ে কোথায় চাঁহর পাওয়া একটুও কঠিন নয়—কিন্তু মনের দিক দিয়ে ?—ঠিক ভেবে পায় না । এক-একবার ভাবে কেন এত তুচ্ছকে নিয়ে মাথা ঘামানো ? আবার এক-একবার মনে হয় যে, আজ যে-কুণ্ডা ও মানি সে বোধ করছে তাকে তুচ্ছ মনে করাই হয়তো ভুল হবে...হয়তো এই প্রতিক্রিয়াই তার আসল স্বরূপের উচ্চ অভীপ্সার অঙ্গুলি-সংকেত...হয়তো এ স্বপ্ন মানি-বোধ লুপ্ত হ'লে তার অস্বস্ততম শত্রু সন্তার কোথায় আর-একটা অনপনয় দাগ প'ড়ে বাবে, বিবেকের কোমল স্বর আরও একটু নিম্নোমল হ'য়ে আসবে—যেমন ধাপে ধাপে নিচে নামার সময় ক্রিমিনালদের হ'য়ে থাকে ।...অল্পভবের দার করে যাওয়া কি পরিতাপের বিষয় নয় ? না, কোনো রকম ক'রে একটা স্বস্তি ও আরামের আশ্রয় পাওয়াটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হ'তে পারে ?...

কিন্তু আবার অপর দিকেও বেশ ছ-চারটে কথা বলবার রয়েছে যে ! এ-সব ছোটোখাটো খলন থেকে কোনো মতে বেঁচে ফিরে যাওয়াটাই কি এমনই মত্ত একটা-কিছু ? এ-সব খলনের মধ্যে দিয়ে নিজের নানা নতুন পদ্ধতির কি সে নিতাই পাচ্ছে না ? আর এ-সব এড়িয়ে গেলেই

বা ওর কী এমন চতুর্ভুজ লাভ হ'ত শুনি? দেশে সচ্চরিত্র ছেলে তো কতই আছে। কিন্তু তারা—how un-interesting!

অথচ তার মনে তবু একটা স্বর দীর্ঘনিঃশ্বাসের মিড়ে থেকে থেকে রণিয়ে ওঠে : এ নয়, এ নয়, এ নয়। মনের গোপন-মন্দিরে কী এক ধূপারতির ঘণ্টাধ্বনি থেকে থেকে বেজে ওঠে : এ-পথে আর যা-ই পাকুক না কেন শাস্তি নেই—নেই পরিণতি, সুখ নেই—নেই সার্থকতা, স্থায়ী আনন্দ নেই—নেই পরমশুদ্ধি। কী এক বাশি যেন উদাস মূচ্ছনায় থেকে থেকে গেয়ে ওঠে :

যাহারা ডাকে নিয়ত তোরে রঙ্গিল বিভঙ্গে  
সপিল অনঙ্গহোলি মত্ত খেলা-রঙ্গে—  
উশ্বিল আসঙ্গ-রঙে ভূলায়ে চল চিত্ত—  
জানিস—নাই তাদের হাতে পরমতম বিত্ত।

\* \* \*

মনটা তার বিবাদে ছেয়ে যায় ধীরে ধীরে। সে কী-ই বা এমন করেছে? তবু তার মনে সে-প্রাৰ্থনা মানে কই? তার ফিরে ফিরে কেবলই মনে হয় চাণ্ডের সে গভীর রাত্তিরে একটি কথা : 'ভাই আমরা এ-জটিলতার গোলক ধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলেছি।'...

তার এত ইচ্ছা হয় আজ চাং-কে দেখতে! সে যদি আজ থাকত তবে ও তাকে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করত—এ-অবস্থায় সে ঠিক কী ভাবে সাড়া দিত। জিজ্ঞাসা করত—কেননা এদেশে সবার মুখে বতই কেননা ও উচ্ছ্বাস শুনে আহুক হামনি নিয়ে, তার বরাবরই কেমন মনে হ'ত এ-ধরনের হামনির সিংহনাদে কোথায় যেন একটু বহুবারতই বেশি। কেবলই মনে হ'ত—মনের অতল তলে একটা ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট স্বর থেকে

থেকে উথলে উঠত—বে শুধু হার্মিনিই জীবনের চরম বাণী নয়, চাই বড় উপলক্ষি—চাই বড় আলোর কাছে নিজেকে খুলে ধরা সৃষ্টিতে, প্রেমে, কর্মে, ত্যাগে, নিষ্ঠায়। যেখানে এ-উপলক্ষির স্পর্শমণি আছে সেখানে ছোটবড় ভালোমন্দ সব অভিজ্ঞতার খাদই সোনা হ'য়ে ওঠে বটে কিন্তু সেখানে নেই? সেখানে ছোট হার্মিনি কি মুক্তির উদ্যম দিখলয়ের বাণী বহন ক'রে আনে, না চলনসই রকম একটা ভঙ্গুর পিঞ্জরের?

পিঞ্জর?—তার মন বিস্ময় ক'রে ওঠে প্রথমটায়। কিন্তু অস্তর-গহনে কোথায় আবার সেট গভীর স্বর ফুটে ওঠে: ভেবে দেখ, ভালো ক'রে সত্য ক'রে অনুভব ক'রে দেখ, শুধু একটা সাময়িক বুলিতে ভুলো না। এত বড় প্রবৃত্তির দাসত্বে কি সত্যিকার মুক্তি মিলতে পারে? ধরো, যদি উলটোটাই সত্যি হয়—যে সংঘর্মের আত্মকর্তৃত্বের হাতেই মহত্বের মণিকুঠির চাবি? নিজের অনুভব-অন্তরে মাও ডুব, ভুলো না চূর্ণ হ্রস্বের বহিষ্কারচিকো।

তথাস্তু। সে ক্ষণের মধ্যে যায়—ডুব সাঁতার কাটতে, কোন্ অনির্বাণ অনুভবমণি তার কাছে সব চেয়ে সত্য ছোটো তারই সন্ধান। বড় বিচিত্র তার দ্রুতি! এত পেলব! ছুঁই—ছুঁই—ছুঁই—এড়িয়ে যায়।...তবু সে আভাস পায় যেন কী একটা ঝিকিমিকির। বড় মনোহর সে-ফুরং-রশ্মি! তাকে ডাকে...ডাকে...বলে: মনগড়া সব সাঙ্কনাই ভুলো। ঠিক ভুলোও নয় অবশ্য। সংসারে মনগড়া সব দুর্গ, সব নীড়, সব আশ্রয়েরই একটা সার্থকতা আছে। যখন মাস্তব নানা উলটোপালটা পথের ইজিতে দিশেহারা হ'য়ে পড়ে—এরা নানাতরুর পাঙ্ক-শালায় কাজ করে বৈ কি। কিন্তু তবু এরা পাঙ্কশালাই—সন্ধ্যাহল নয়। যখন ডেউ বড় বেশি দোলা দেয় তখন হার্মিনির মনগড়া নানান কুলের বাণী সাময়িক বন্ধরের কাজ করে মাত্র—স্বাধীন আশ্রয়ের না। জীবনের

মূলোবাণি ? ও-সবকে ঠিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় কেবল তখনই নয় কি—বধন লক্ষ্য থাকে স্থির, অচঞ্চল, শুভ্র—ঐ—ঐ যে সেই গভীর স্তব্ধ ফের বলছে—বধন বড় উপলব্ধির স্পর্শমণি হাতের কাছে মেলে তখনই মূলোবাণিকে স্বীকার করা সাজে, নৈলে নয়।

একথা সত্যি—যে, আনাকে ও যে আজ চুখন করেছে, কি একটু আঁদর করেছে তাতে খতিয়ে তেমন যায় আসে না ; একথা সত্যি—যে, নৈতিকতার পাহাবল্লকে জনতারার দিশা চিহ্নিত নেই, একথাও সত্যি—যে, একনিষ্ঠতা বধন সামাজিক কর্তব্যের ভিত্তি স্বরূপ হ'য়ে সাধকতার প্রতিষ্ঠা-সৌধ গ'ড়ে তুলতে চায়, প্রেমের ময়রসিঃসান ভেঙে শুধু অটল সামর্যন্তের গদীই কামনা করে—তখন তা একদিন না একদিন হাস মোখের মতনই জ্ব'লে পড়তে বাধ্য। আনার ও মসিহে বোঝাবের যুক্তি হয়তো মিথ্যা না হ'তেও পারে যে, মৈত্রিক অনাচারজনিত নরপক বিমি-অত্যাচারের চল অনেক সময়ে বার্থে বিহ্ব আত্মপ্রসাদের মকদ্দমিতেই পরিসমাপ্ত হয়। এমন কি সে একথাও মেনে নিতে বাঁজি আছে যে এসব অনাচার বা আচরণের সঙ্গে সত্য প্রেমের কোনো অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ মেই—ওরা পরস্পর-নিরপেক্ষ। কিন্তু তবু কে যেন তার মনের কোণে বলেই যে গভীর স্তব্ধ : যে, শুভতা পরিব্রতা সাংঘম এরা বধন উপলব্ধিস্বীকার তখন বজ্রা হ'তেই পারে না। বলে : যে, পথে পথে বাটবের হ্রোত ও আবর্তে গা কাসিয়ে চললে জীবনে আর যা-ই হওয়া যাক না কেন—স্থাননিধির অভলতলের ডুবুরি হওয়া অসম্ভব—সত্য মেলে আত্মসমর্থনের সহজ ক্রামল পথে নয়—নিভরূপ আত্মতত্ত্বের কঠিন লাইনার পথে। কে ? চম্কে ওঠে ও।

—“আমি, বধন, একটা চিঠি।”

## চাণ্ডের পত্র

আনার মুখ এত চিন্তাশেলতীন—উজ্জল হাসিভরা। তার মনেও সে ছোঁয়াচ লাগে, বলে : “এলো আনা।”

—“কী বন্ধু? এ-সময়ে শুয়ে!! ঐ নিয়ে মন খারাপ বৃদ্ধি?”

স্বপন লজ্জিত হ'য়ে বলে : “দুঃ—কই কী চিঠি দাও।”

—“আ-হা দিচ্ছি গো দিচ্ছি;—একটু সবুজও হয় না! তোমার ‘তার’ চিঠি নয়—লগুন থেকে এসেছে—বোধ হয় মসিমে চাণ্ডের।”

—“দেখি, দেখি।”

আনা চিঠিটা তার হাতে দিতে গিয়েই টেনে নিয়ে হেসে বলল : “কিছু বুঝা আগ্রহ মনামি, আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি—এর মধ্যে একজনেরই চিঠি আছে—ও তার জন্মস্থান মাদ্রিদ নয়—ক্যাটিন।”

স্বপন ভেত্রে এত প্রকৃত কখনো দেখেনি এসে অবধি। ওর মুখ-চোখে মোহের বরিষ্কতার কলমলানি। একটু অবাক হ'য়ে ভাবে। কই, ওর মনে তো চুখন-পক্কের পরে হৃদয়ের চিরুণ নেই? ভাবান্তরকে মনে পড়ে বার ইয়াবেলার কথা! তারও তো ছিল না। মেয়েটা কি সবই এই বকম নাকি? হঠাৎ কোথায় দাড়া বাজে। দুঃ, সব মেয়েটা এমন হ'তে পারে কখনো? স্তব্ধ স্তব্ধ আচম্বিতে বাঙালী মেয়ের ‘পরে’ জাগে যেন একটা নতুন ধরণের শ্রদ্ধা।

—“আঃ—কোনো বাকবীকে খান কখনো বন্ধু করতেই হয়—যেন দার্শনিককে কুলেও না করে। এই মন ছিল এখানে—এক লজ্জায় একশো মাইল দূরে—ক্যালো পেরিয়ে লগুন, কিংবা স্নুয়েক পেরিয়ে—”

—“না গো না”—স্বপন হেসে ফেলে। “কিছু দেবে চিঠিটা এখন, না বকেই চলবে?”

কথাটা ব'লেই স্বপনের আবেশ জাগে। আনা “আচ্ছা আর বকব না”—ব'লে চিঠিটা তার বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় আর কি—স্বপন তার হাত চেপে ধ'রে বলে : “শুনবে না চিঠিটা ?”

—“আমার অধিকার ? আমি তো কেবল ব'কে—”

—“কী যে করো আনা ! প্রতি ঠাট্টায় এমন শিরপা তুললে— আমার বন্ধুর চিঠি, শোনাচ্ছি আমি, অধিকারের প্রশ্ন ওঠে কী করে ?”

আনার মুখের মেঘ কেটে যায়, বলে : “বন্ধু হ'লে আপত্তি ছিল না—কিন্তু বান্ধবীর হ'লে—”

—“আচ্ছা—হা—বোসো—এইখানে আমার পাশে ডাইভানে, দুজনেই পড়ি।”

আনা একটু দূরত্ব রেখে বসল, কিন্তু স্বপন শোনে না, স'রে খুব কাছ ঘেঁষে এসে বসে। আনার মুখের মেঘটা এবার সম্পূর্ণ কেটে যায়। ওর হাতের উপর বাতর ভর দেয়—একান্ত বান্ধবী ভাবেই। কিন্তু সে-সংলগ্নতায় চিঠির খামটা খুলতে খুলতে স্বপন ফের অকস্মিক হ'রে পড়ে আর কি। খুব জোর ক'রে গাত্র-সংলগ্ন স্ত্রীভোল বাহুলতা থেকে মনকে ছিনিয়ে নিয়ে পড়ে মৃত্যুরে :

“প্রিয় স্বপন,

তোমার চিঠি পেয়েই জবাব দিতে বসেছি। ঠিক যে সময়ে তোমার কথা সব চেয়ে বেশি মনে হচ্ছিল সেই সময়েই কি না তোমার চিঠি এসে হাজির ! তুমি ‘ভক্তের ভগবান’ কথাটা মাঝে মাঝেই ঠাট্টা ক'রে বলতে মনে আছে ? দেখো বাংলা কথাটাও আমার মনে গেঁথে আছে। ভালো লেগেছিল কি না !

“ক’দিনই বা এখানে এসেছি! তোমার ওখান থেকে খুব দূরেও না;—কিন্তু তবু মনে হয় কত দূরে আমরা! তোমার হয় না? আমার কিন্তু সময়ে সময়ে মনে হয় যে, এতই কেন না আধ্যাত্মিকতার বা আত্মিক-সামীপ্যের স্ববগান করি—সময় ও আকাশের ব্যবধান বড় নিষ্করণ বাস্তব। মনকে ওরা এত বদলে দিতে পারে, না?”

“একটা বড় চিঠিই লিখব আজ। কারণ লেখবার উপাদান জ’মে উঠেছে বিস্তর। আর তোমাকে সেদিন অত কথা ব’লে ফেলার দরুণ ফের আরো কিছু বলার পথ একটু সুগমও হ’য়ে উঠেছে বৈ কি। কোনো অগল বহুদিন না খুললে প্রথমটায় খুলতে বেগ পেতে হয়। কিন্তু একবার খোলার পর দ্বিতীয়বার খোলা অনেকটা সহজ হ’য়ে যায়ই, নয়? কিছা হয়তো তোমার দীর্ঘ পরে তোমার নানা খোলাগুলি চিত্তাকর্ষক প্রশ্নের উত্তরেই দীর্ঘকালে নানা কথা বলতে ইচ্ছে করছে? কে জানে! কিন্তু কারণ যাই হোক বলার মেজাজ ফের এসে গেছে। তাই তৈরী হ’য়ে নেও। কলম আমার সহজে কাগজকে চুষন করে না। কিন্তু যখন একবার করে তখন প্রথম প্রণয়ী ম’নেই বলে—নাছোড়বন্ধ ভাবে।”

“তুমি করেছ কিন্তু বড় শরু প্রশ্ন। হামনি না শাস্তি—কোনটা চায় আমাদের অন্তরাস্ত্রা?”

“আশ্চর্য্য, এই প্রশ্ন নিয়ে আমাদেরও বড় বেশি ভাবতে হয়েছে যুরোপে! দেশে আনার মনে হ’ত যে দুঃখ বাধা চিরন্তন নয়—কণিক, ওরা আসে বাবার জন্মে। দুঃখ পেলে তাই মনে জপ্তাম লাগতলের একটা কথা:

‘প্রবল বড় বহে কি সারা সকাল ধরি’?

প্রবল বারি সারাটি দিন পড়ে কি করি’?



কিন্তু এখানে এসে অবধি আমার কেবল মনে হয় সুইনবার্ণের

‘কল্প হবে সৃজিল মর ধরা

ধকিল নয় বকে হায় তার—

কালের দান অশ্রুরাশি-ভরা—

বেদন পুট উপছি’ বার বার।’ \*

“সত্যি, বতই দিন যাচ্ছে, যুরোপের অন্ধরণ প্রাণ-চাকল্যে পিছনকার  
এই অন্ধসম্পৃষ্টই আমাকে আঘাত করছে ক্রমশই বেশি করে। রক্তমঞ্চের  
পাণপ্রবীণের কবিকের রংচঙে দীপালি-উৎসব নয়—তার পেছনের  
ক্রান্তিসেতে অন্ধকার।

“বলবে যেতো—টম্যাক পেতে না পেতে এ-শ্রান্তির সুর কেন?—তাই  
বলতেই আজ কলম ধরা। মনটা আজ একটু উচু তারে বাধা আছে—  
শেষ সে-রাহে তোমার কাছে যেমন ছিল। এ-শ্রান্তির একটা প্রধান  
কারণট বে ও;—যদিও ও সেকথা জানে না, এবং তুমি নিশ্চয়ই এ-সব  
কথা চিন্তিতে তাকে জানিয়ে আমার শ্রান্তিভারের উপর কিংকর্তব্য-  
বিমুঢ়তার ভার দেবে না চাপিয়ে?”

ওদের চোখোচোখি হয়—অপন চোখ নামিয়ে নেয়।...

\* \*

“টম্যাক মধ্যে কিন্তু ক্রান্তির অগ্রদূতেরও কোনো চিহ্ন নেই আজ  
পর্যন্ত। ওর প্রকৃতিসৌন্দর্য অন্ধরণ প্রাণশক্তির ঠাস-গাধুনিতে এমনি পাকা

\* Before the beginning of years  
There came to the making of man  
Time with a gift of tears  
Grief with a glass that ran.

ক'রে গীথা যে জীবিত পূরী হাওয়া প্রবেশের একটুখানি কাটলও পার না। কিন্তু আমার সেই মন প্রাণ যে একটু জির উপাদানে গড়া, আমি যে চাই শান্তি, চাই—জীবনের মাঝে মাঝে আলস্যভরা উদার স্বপ্নভরা আরামকুঞ্জ, বিহীনমণির। প্রতি নির্জন সাহসলাই আমাকে ডাকে। লক্ষ্যহীন সাক্ষীহীন গতির দৃষ্ট আমাকে, কি জানি কেন, ক'রে তোলে ক্রান্ত...একটা অনির্ণয়ের বিবাদের দেয় ক'রে।...কেন? কে জানে?

“নীসে এটা বুঝতে পারিনি। তার প্রথম কারণ: তখন আমাদের মাথার উপর বিপদের খাঁড়া বুলছিল। তার উপর অথের স্বচ্ছলতাও ছিল না; কাজেই রক্ত বাস্তবের চাপে স্বপ্নাবেশ একটু কিকে হ'য়ে এসেছিল। এখানে ভাগ্যক্রমে আমার কয়েকটা ছবি একজন ধনী ইংরাজ কিনেছেন। তার উপর মসিরে বেনারও আমার দু-একটা ছবি বেশ মোটা দামে বিক্রি ক'রে মোটা ঢেক পাঠিয়েছেন। কলে নিঃস্ব চাং রাতারাতি অপোগণ্ড জমীদার-পুত্রের মতনই নিশ্চিন্ত হ'য়ে পড়েছে অর্থ-সম্বন্ধে;—তার উপর জেনেরাল সেরানোর লোক-সম্বন্ধের টিকিও দেখি না-আমর। ওদের বুদ্ধি ঠকিয়েছি শেবটায়! অন্ততঃ বিপদ বোধ হয় আর নেই—আর আমরা তো মাসখানেকের মধ্যেই আমেরিকা হ'য়ে জাপান খুরেটীনে ফিরব, এর মধ্যে ওরা আমাদের গতিবিধির খবর কোনোমতেই পাবে না।

“কিন্তু ওদের ভয় কাটলেও—অন্ত অনেক ভয়ই তো কাটেনি। আর-একটা মস্ত ভয় হচ্ছে কেন,—ইসার জন্মেই। ও কি সত্যি অতী হ'বে আমার সঙ্গে? এ-আশঙ্কা আমার ছিল বরাবরই—কেবল ও আমাকে ভরসা দিত নানা ছাদে—বুঝতেই পারছ, যেমন উচ্ছ্বাসিনীরা কোঁকের মাথায় দিয়ে থাকে প্রথমটার।

“ও যে মিথ্যা বলত তা-ও নয়। কেননা এ-অস্বীকার ও বধন করেছিল তখন করেছিল তাজা ছদ্মরক্ত দিয়েই—বার মধ্যে আর বারই

অভাব থাকুক না কেন আত্মপ্রত্যয়ের অভাব যেমনই এটা নিশ্চিত । কিন্তু মুখিল কি জানো ভাই ? মুখিল এই যে, প্রেমের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে অঙ্গীকার শপথ প্রভৃতি একেবারেই নামঞ্জুর । ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাক্ষর—কালির, সে শুকোলেই হয় পাকা । কিন্তু প্রেমের স্বাক্ষর যে—রক্তের ; সে পাকা থাকে ততক্ষণই যতক্ষণ রক্ত থাকে কাঁচা ;—শুকোলেই সে-সইয়ের মলা যায় উবে । আমার মনে কেবল একটা প্রশ্ন মাঝে-মাঝে উদয় হয় গোখুলির বিদায়-স্মৃতি : প্রেমের দলিলের প্রকৃতি যা-ই হোক না কেন মানুষ তাকে ছাপিয়ে উঠতে পারল না কেন আজ অবধি ? কেন এমন কালি উদ্ভাবন করতে পারল না বা সব রকম আবেশের দলিলেই নিজের ছাপ রেখে যেতে পারে ?

“কুল বুঝে না কিছ । বলছি না—ও আমাকে ভালোবাসে না আর । বাসে—অন্ততঃ এখনো পর্য্যন্ত বাসে বৈ কি । কিন্তু সেইজন্তেই যে ভয় হয় আরো বেশি ভাই : ও আর আমি যে রকম বিপরীত উপাদানে গড়া তাতে আমাদের স্বভাবের বিরুদ্ধ টানে শেষ অবধি জরী হবে কে ?—আমাদের গঠন-প্রকৃতির বৈপরীত্য—না, প্রেমের চুপক ? যেখানে ভালোবাসার কাছে দুজন চার চুরকম বর সেখানে কোন্ বরদাতা মিলন ঘটাবে ? কে বলবে ?

“মনে পড়ে এই স্মৃতি মসিমে বেনারের একটি কথা । তিনি বলতেন যে গেটে ঠিকই বলেছিলেন :

‘কেহ হেথা চার আপনারি ভায়

লখিতে নয়িত মুকুর মাঝে,

বার মাঝে হেরে বিপরীত—কেহে

কেহ বা উছসি’ তাহারি পাছে ।’ \*

\* Es gibt Menschen, die ihr gleiches lieben and wieder solche die ihr Gegenteil lieben and diesem nachgehen.

“আমি—বোধ করি তুমিও—ধানিকটা এই প্রথম দলের দোক।  
এবং টসা—পুরোপুরি এই দ্বিতীয় দলের।

“তা হ'লেই সমস্তটা বুঝ আশা করি। ও আমাকে ভালোবাসে  
আমি ওর থেকে এত ভিন্ন ব'লে, কিন্তু আমার কোথায় যেন থেকে  
থেকে আসে নিরাশা—ওর সঙ্গে আমার সাদৃশ্য এত কম ব'লে। অর্থাৎ  
যে-কারণে ওর ভরসা এত বেশি যে, আমরা ক্রমশঃ পরস্পরের কাছেই  
আসব ঠিক সেই কারণেই আমার শঙ্কা—আমরা দু'রেই স'রে যাব  
উদ্ভবোত্তর।

“কেন ?—আজ একটু বিশদ ক'রে বলার চেষ্টা করি। কিন্তু সাবধান !  
আমিও যে সেক্টিমেন্টাল হ'তে পারি ভূমি হয়তো ঠিক করনা করতে পারো  
না, পারো কি ? এমন কি ওকে নিয়ে যে সীতিমত একটা ছোটোখাটো  
ড্রামাটিক সীন করতে পারি ?—পারো কি ভাবতে ? শোনো  
বলি সে-কথা।

“না,—তার আগে বলি কী ভাবে একটু একটু ক'রে আমাদের মধ্যে  
একটা অনিবার্য ব্যবধান এসে পড়ছে ক্রমশঃ। দু-একটা উদাহরণ দিয়েই  
স্বক করব।

“ওকে নিয়ে সেদিন বুকের একটা ছায়াচিত্র দেখতে গিয়েছিলাম।  
দেখে যে কী খারাপ লাগল তা বলতে পারি না। বুক দোপার সঙ্গে  
সরবৎ থাকেন, এক বছর সঙ্গে ইয়াকি করছেন, চাকর-বাকরকে  
বখশিশ দিচ্ছেন ইত্যাদি জিনিষ বাস্তববাদী প্রযোজক দেখিয়েছেন বুকের  
ঘোবরাজ্যের ইতিহাসকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে কোটাতে। আমার মন  
ধিক ধিক ক'রে উঠল। ফেরবার সময় ট্যান্সিতে বললাম ইলাকে। কিন্তু  
ও তো অবাক। বলল : ওর এ-সব খারাপ হো লাগেইনি, বরং  
ভালোই লাগেছে—কেননা এতে ক'রেই ওর কাছে বুকের নীহারিকাম্বর

চকির এত জীবন্ত, এত বাস্তব হ'য়ে উঠেছিল। আমি চুপ ক'রে পেলাম, থচ্ ক'রে বাজল। ও বুকল, আদর ক'রে আমার একটা হাত চেপে ধ'রে বলল : 'কেন তোমার এত খারাপ লাগল চাই-চাই?' আমি গোখাবার ভাষা বুঁজে পেলাম না। যে-বুদ্ধ আমার জীবনে তারার মতনই নিকলুয় সুদূর শুভ্রতার মণ্ডিত তাঁকে সরবৎ খেতে বা চাকরকে বখশিশ দিতে দেখার মধ্যে যে-ইতরতা আছে সেটার ব্যাখ্যা করব কী ক'রে চাই? যা দরদ দিয়ে গোখাবার—গৃহিণী দিয়ে তার নাগাল কেউ পেয়েছে কি কোনোদিন? শুধু এ-সবই না—আমি অসুভব করলাম বিপুল অতীতের ছায়া-পটভূমিতে যে-বুদ্ধ দেদীপমান, তাঁকে সমসাময়িকতার সান্নিধ্যের আলোয় দেখার মধ্যে—কল্পনা করার মধ্যেও কোথায় যেন একটা ইতরতা আছে। কিন্তু যেহেতু একথা বলতে গেলে বে-দরদীর কাছে বাড়াবাড়ি মতন শোনায় সেহেতু শুধু বুদ্ধের সরবৎ পাওয়া প্রভৃতি দৃষ্টের তুচ্ছতার কথাই বললাম একটু।

"কিন্তু তুমিও ইসা কোনোমতেই মানবে না,—কোনল সুরে বলল : 'বুদ্ধ যখন সরবৎ নিশ্চয়ই খেতেন—তখন ছবিতে তা দেখালে কেন এত লাগে তোমার চাই-চাই?' আমি একটু শুকসুরে বললাম : 'আমার লাগে—এর বেশ কিছু বলবার নেই ইসা।' ও একটু আহত হ'য়ে আমার কাছ থেকে একটু দূরে স'রে বসল। অগত্যা আমাকে নরম হ'তে হল—ওকে কাছে টেনে নিয়ে আদর ক'রে বললাম : 'ইসা, তোমার বক্তৃতা আমি বুঝেছি, কিন্তু আমার স্পর্শকাতরতাটা যে তুমি একটুও বুঝে না।'—ও টোঁট ফুলিয়ে বলল : 'অবজ্ঞা ক'রে উত্তর দেবেন না—আবার বলবেন আমিই বুঝলাম না; সব দোষ এই ভাগা-হীনাধেরই বৈ কি।' আমি বললাম : 'কি জানো ইসা? বুদ্ধ হয়তো জীবনে সর্বকংৎ খেয়ে থাকবেন, বক্তৃতাভবের সঙ্গে ইরাকিও দিতেন, কিন্তু

তার যে গরিমা ইতিহাসের আধার দিগন্তেরে নির্মল নক্ষত্রের মতনই চির-  
 ভাস্বর—সে-সুগমকিত মহিমার সঙ্গে এ-ধরণের ভালগার ঘটনা একেবারেই  
 খাপ খায় না। অন্ততঃ আমার এতে এতই বাজে যে, এ-ধরণের  
 মহাপুরুষদের ছবিতে এ-ভাবে দেখানো আইন ক’রে বন্ধ ক’রে দেওয়া  
 সাধারণের একটা নাগরিক কর্তব্য বলে মনে করি।’ ও এ-উদ্যায় একটু  
 আশ্চর্য্যাই হয়ে বলল : ‘কিছু মনে কোরো না চাই-চাই, কিন্তু আমি  
 বুঝতে চাই এতে এতখানি বাজেই বা তোমার ঠিক কোথায়, আর  
 মহাপুরুষদের দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনা কাহিনী ছবি নাটক প্রভৃতিতে  
 কুটিয়ে তুললে তাঁদের মহিমা থরকি হয়ই বা ঠিক কোন্‌খানে?’ আমি  
 বিপন্ন মুখে বললাম : ‘ইসা, এ-সব বলা এত মুকিল, প্রমাণসহ যা নয়—’ ও  
 বলল : ‘তা হোক, বলা।’ আমি বললাম : ‘ইসা, আমার মনে হয়  
 যে বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যে-দৈনন্দিন নিদায় নগণ্যতা কালের চিরন্তনতার  
 অতলে ডুবে গেছে তা ডুবে-বাওয়াই ছিল মহাকালের অভিপ্রেত। নইলে  
 তাঁর জ্যোতিষ্কভাতি কালের খুলন্তাবলেপকে ছাপিয়ে মাছুষের  
 অন্তরাকাশে এমন অবিস্মরণীয় আভাষ জন্-জন্ করত কি? আমাকে  
 ভুল বুঝো না : আমি বগছি না বৃদ্ধ সরবৎ কখনো বাননি, বা  
 ধরগোষ শিকার করেন নি, বা চাকর-বাকরকে বখশিশ দেননি ;  
 আমার বক্তব্য—বৃদ্ধের যে-শুভ্র দীপ্তির পাশে এ-সব তুচ্ছ স্মৃতি পাণ্ডুর  
 হ’তে হ’তে নিশ্চিহ্ন হ’য়ে মুছে গেছে সে-দীপ্তিকে শুভ্র রাধার  
 কপ্তেই চাই এ-সব তুচ্ছতাকে আমাদের ভোলা।’ ইসা বলল : ‘কিন্তু  
 বাস্তব?’—আমি ঈষৎ শুক হুয়ে বললাম : ‘দুরোপে ঐ এক ধূয়ো  
 উঠেছে—বাস্তব, বাস্তব, বাস্তব! আমার সত্যিই আশ্চর্য্য লাগে যে  
 তেমনরা একবারও ভেবে দেখ না যে জীবন পথে পথে বাস্তবের দাবিতে  
 দেউলে হয় বলেই কল্পনাকে বুগে-বুগে তার নিতে হয়েছে তাকে উর্ধ্বে

তুলে উত্তরতার ধূলোবালি থেকে মুক্ত রাখার। পাকের মধ্যে জন্মার ব'লেই সূর্যমুখীর পুষ্প-গোরব নয়—পাককে অস্বীকার ক'রে উজ্জ্বল ডাকে সে তার আলোর মল মেলতে জানে ব'লেই—' ইসা বাধা দিয়ে বলল : 'কিন্তু মাজবের মানবতা কি অমনি ধারা পাকেরই সামিল বলতে চাও— যে, তার মধ্যে জন্মাবার ইতিহাস বুকের মতন মহাপুরুষকেও প্রাণপণে লুকোতে হবে? না, পৃথিবীর আবেষ্টনী এমনই দূষিত যে সে ছোঁয়াচ লাগতে না লাগতে অমন নকরহুতিও থাকবে পাণ্ডুর হয়ে? আর যদি তা-ই হয় তবে আমি বলব : দেউলে যে হ'ল সে পাক না—সে সূর্যমুখী, মাজবের মানবতা না—দেবতার দেবত্ব। যে দেবত্ব এত নিঃসহায়, যে একটুতেই মূর্ছা যায় তার দেবত্বই কি খানিকটা নামস্ফূট হয়ে গেল না? শক্তির ঐশ্বর্য না থাকলে দেবতা শয়তানের সঙ্গে বৃকবেন কোন্ হাতিয়ার নিয়ে শুনি? কামার?'

“কথাটার মধ্যে সত্য আছে মানতেই হবে, কিন্তু আমাদের এ তুই মতামতের সুতাসত্য তোল ক'রে দেখাতেই এ-তর্কের অবতারণা করিনি। এ চুটকি দিলাম দেখাতে—ওর আর আমার দেখার-ভঙ্গির মধ্যে কী-ধরণের তুলনার ব্যবধান। আর এ-ব্যবধানের পরে জোর দিচ্ছিও শুধু বোঝাতে যে জীবনে এই দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্যের উপর অন্ধর-সামীপ্য কতখানি নির্ভর করে।”



আমি ব'লে উঠল : “এ-কথা আমি মানি না কিন্তু। এখানে ইসাবেলাই ঠিক বলেছে। নরনারীর দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্যই তাদের অন্ধর-সামীপ্যের সব চেয়ে বড় সহায় নয়।”

স্বপন তার দিকে চেয়ে বলল : “কিন্তু চাং তো বলছেই যে, এখানে কার দেখার ভক্তি ঠিক সে-বিচার অবাস্তব।”

—“কিন্তু ও এ-ও তো বলছে দুজনার দেখার ভক্তির সাদৃশ্য না থাকলে তারা পরস্পরকে ভালোবাসতেই পারে না। এ-কথা মেনে নেব কী ক’রে? নরনারীর মধ্যে যে-চুম্বক রয়েছে তার গুহ্যতরু কি এই ধরনের বুদ্ধিঘটিত মিল-অমিলের মধ্যেই নিহিত বলতে চাও? না, এই ধরনের তর্কবিচারের দালু ভিত্তির উপরই তার প্রতিষ্ঠা?—ও একটা কথাই না।” আনা খুব জোরে খাড় নাড়ল।

—“কিন্তু এসব কি ঠিক বুদ্ধিঘটিত ব্যাপার আনা? না, এ হ’ল হৃদয় অতঃপরের, সাদা দেওয়ার, দরদের রাজ্য? এখানে পরমিল হ’লে মানুষ যে-আশাত পায় তা কি তুমি অস্বীকার করো? বুকে পূজার যে-ভাব আমাদের—ওরিয়েন্টালদের—অগ্নি-মন্ডায় উপ—তাকে ব্যবসার কাজে লাগিয়ে যদি বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক মন ছবিখরে দেখায়—যদি বুকের সিদ্ধার্থকে তারা ভাড়িয়ে খেতে চায়—”

—“বুকের সম্বন্ধে ও বা বলেছে আমি মানি, কিন্তু সেটা তো আসল প্রশ্ন নয়। আসল কথা হচ্ছে ইসা বা বলেছে—বাস্তব—”

স্বপন বাধা দিয়ে বলল : “চাং বোধ হয় বলতে চাইছে—জন্মের এইসব গভীর দরদের রাজ্য, স্বপ্নের আকাশ মাতৃদের বড় আমরের। ধূলাগুলির রাজ্যে গরমিল বিরুদ্ধতা সহ—কিন্তু সব সত্য জন্ম-সম্বন্ধের উচ্চ-আকৃতিই যে পাখা মেলেতে পায় কেবল এই কল্পনার আকাশে। এমন কি বাস্তবতার অগ্রভিবাগ্য ভিত্তির ‘পরে’ লাড়িয়েও এ-কথা বলা যায়—হানো না কি?”

আনা একটু ভাবল, পরে বলল : “আচ্ছা, এ-তর্ক এখন রইল চাপা, তুমি শেষ করো আগে চিঠিটা—উঃ, কী লম্বা চিঠি!”



—“যদি স্নান লাগে—”

—“না না—বড় শুল্কর করাসী লেগে ও—ওর বলবার ভঙ্গিও এত শুল্কর যে—পড়ো পড়ো।”

\* \* \*

“এ শুধু একটা দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র, যাতে ক’রে ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করা তোমার পক্ষে একটু সহজ হয়। কিন্তু এরকম গরমিল আমাদের মধ্যে এত বেশি হয় আজকাল—প্রায় পদে পদে বললেও হয়—যে, একটু কথা-কাটা-কাটি ক’রেই সমাপ্তি টানতে হয়—মুখে স্বীকার না করলেও দুজনেই মনে মনে একটু সংশয়াকুল হ’য়ে উঠে—আমরা ঠিক এক-জগতের বাসিন্দা কি না ভেবে। অনেক দৃষ্টান্তই দিতে পারতাম, কিন্তু আর-একটা উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হব।

“তুমি জানো—টসা প্রকৃতিতে বহুবরতা। ও মনে করে এটাই স্বাভাবিক—বলে : বিবাহ প্রথাটাই একটা অস্বাভাবিক জিনিস, একটা প্রাগৈতিহাসিক বর্ধরতা প্রাপণপণে বেঁচে থাকতে চাইছে এর আড়ালে। জানো—আমি ওকে এখনই বিবাহ করতে চাই, শুধু ও রাজি নয় বলেই বিবাহ এখনো স্থগিত আছে—ওর দুয়ো free love, companionate marriage, আরও কত কী।

“তোমার সঙ্গে বিশেষ ক’রে companionate marriage নিয়ে ওর যে-তর্ক হয়েছিল তা ও আমাকে বলেছে। তুমি বলেছিলে যে আনার আদর্শ ছিল একটা সন্ত্যকার আদর্শ—যেখানে বিচারশক্তি লিওনের companionate marriage-এর উদ্ভাবনটা একটা বৈজ্ঞ ব্যবস্থা মাত্র—যেমন ব্যবস্থা হলে ভালো ক’রে ভাঁড়ার রাখতে জানা বা গৃহস্থালী করতে দেখা।”

স্বপনের দিকে চেয়ে আনা এত মিষ্টি হাসে...স্বপনের রক্ত জীবৎ জন্ত বয়...সে তার জাগ্রত উপরে ওর স্তন্য হাতটি মৃত্যুর মধ্যে নিবিড় ক'রে চেপে ধ'রে প'ড়ে চলে :

“আমি ওকে বলি : ‘স্বপনের কথা খুবই ঠিক।’ ও জোর ক'রে বলে : ‘কথুনো না,’ বলে : ‘ভালোবাসার যে বাহ্য-বাবস্ত্যের দিক আছে তার উপর টানের স্থায়িত্ব নির্ভর করেই।’ আমি বলি : ‘ভালোবাসাকে যদি ভিতরের জিনিষ বলে মানি তবে এ-ও মানতেই হবে যে, বাইরের অব্যবস্থাকে জয় ক'রে অপ্রতিষ্ঠ হবার শক্তি সে রাখে।’ ও বলে : ‘এ আমার অত্যন্ত আনু-প্রাকৃতিকাল কথা—অপ্রাদর্শীর মতনই বলি মাত্র—যেহেতু এর সত্যতাকে জীবনের সাফা—la Vie—নাকচ ক'রে এসেছে আবহমানকাল।’ আমি বলি ‘Tant pis pour la Vie.’ \* ও তাতে রূপে উঠে বলে : ‘আকাশে মাথা ঠেকাটা হয়ে ওঠে একটা উদ্বৃত্ত ব্যাপার যদি পা মাটির প'রে নোড়র খুঁজে না পায়।’ ”

\* \* \*

আনা বলে উঠল : “আমি সায় দেই। এ-ই-ই যুরোপের কথা।”

স্বপন বলল : “কিন্তু তুমি ফের সেই অবাস্তব প্রসঙ্গ এনে তুল করছ যে। চাং যুরোপের বা এশিয়ার কথার সত্যাসত্যের ওজন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না—ওর লক্ষ্য ওদের তরুণের আদর্শগত ভেদ দেখানো।”

—“কিন্তু আদর্শ বাস্তবকে ছেড়ে বাচি কী ক'রে এ-প্রশ্ন তো আর একেবারে ঠিক অবাস্তবও নয় ?”

—“তা নয়, কিন্তু চাংয়ের আদর্শ স্বপ্নজীবী এটা ধ'রে নেওয়াটাই বে

\* তা হ'লে জীকমেরই দুর্ভাগ্য সেটা।

তোমার আনন্দিক। চাং বাই হোক না কেন নিশ্চয়ই এক বোকা নয় যে, বলবে : আমাদের বায়ুচুক হয়ে ইস্তাখুর দিকে তাকিয়েই কবিত্ব করলে খাসা চলে যায়। ও শুধু বলতে চায় যে, মানুষ বাস্তবে বতই আপোষ করুক না কেন—চিন্তাজগতে, আদর্শজগতে, সত্যাহুগন্ধে তাকে হঠেই হবে খানিকটা একরোখা, এমন কি খানিকটা অসহিষ্ণুও বৈ কি। আমার মনে হচ্ছে তুমি ও ইসাবেলা একটু অস্থানে তোমাদের stressটা দিচ্ছ ব'লেই তালে গরমিল হচ্ছে পদে পদে।”

আনা হেসে বলল : “আর তুমি ঠিক তালে তালে পা ফেলছ প্রতি কদমে, এটো তো ?”

স্বপনও হাসল : “অন্তত তোমাদের দুজনার চেয়ে বোধ হয় কম বেতালা ফেলছি। যাক শোনো।” ব'লে প'ড়ে চলে ফের :

“দেখেছ মুছিল ? এটা কি কোনো সত্য-নির্দোষের সমস্তা—না গোনাশ্চি ওজন করা-করিরও প্রশ্ন যে, নিশ্চয়ই হবে বাইরের কোনো মাপকাঠি দিয়ে মেপে ? এ যে ভিতরের গরমিল স্বপন। বুঝ কি কোথায় আমার এত একলা মনে হয় আজকাল থেকে থেকে ?”

আনা অদুট স্থরে বলল : “বেচারী।”

স্বপন তার হাতটা আরও আড়ভাবে নিজের বুঠোর মধ্যে চেপে ধরে। ..

\* \* \*

“তাই বলছিলাম প্রাণির কথা। ও আমাদের ভালোবাসে না এমন কথা আমি বলি না। আমি যদি আজ হঠাৎ জলে ডুবি ও মসতো বাড়ির দরজা খুলেই কেবো খাঁপ। তবু ও যে অপর পুরুষকে দেখে আঁকুটে হয় এখনো তাতেও মর্জ্বাহিত হই না। কেবল ওর মধ্যে এ-প্রাণচাকলা একটু কমলে

স্বপ্নী কতাম নিশ্চয়ই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ওর ভালোবাসার বিশ্বাস করি—তুণু জানি : ওর ভালোবাসার ধরণ আমার থেকে পৃথক।

“কিন্তু এইখানেই না টাঁজিডি, স্বপন! কেন জানি না আমার নিঃস্বপ্নবই মনে হয়—যে-কথা তোমাকে সেদিন রাতে বলেছিলাম—যে আমাদের সামনে রয়েছে পরী-প্রাণী—কেবল মেলেনি চাবির উদ্দেশ্য। তুণু এইটুকু মনে হয় যে, এচাবি আছে ওই ভালোবাসারই কাছে—মানে, যদি কারুর কাছে থাকেই। তাই আমার বড় বেশি আশা ছিল যে, আমরা দুজনে ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে এ-জীবনের শ্রান্তিকারকে করব লাঘব, পাণ্থেয়কে করব সমৃদ্ধ, পথচলার অন্ধকারকে করব আলোকিত। কিন্তু—সম্প্রতি আমার কি জানি কেন কেবলই মনে হয় যে, অজ্ঞাতসারে আমরা দুজনেই ফের একটা চোরাগলিতে ঢুকেছি—অশ্রাপ্য ঘনের ব্যর্থ আশে।”

স্বপন তার মুঠোর মধ্যে আনার হাতের চাপ অস্বভব করে। আনার কপোল ওর বাজিতে ঠেকে। স্বপনের কোথায় একটা তার বেজে ওঠে যেন। সুর একটু নিচু ক’রে পড়ে চলে :

“কী চোরাগলি—প্রশ্ন জাগছে তোমার মনে? বোঝানো কঠিন। কারণ এটা হচ্ছে হৃদয় আশা-নিরাশার কথা। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, নিরাশাটা একটুও ছারাময়। মানে এট যে, তৃষ্ণার্ত বধন তৃষ্ণার জল ব’লে সুরার কাছে হাত পাতে তখন হয়তো তার তৃষ্ণার একটু উপশম হয়,” কিন্তু জলের কাছে সে যে শ্রান্তি-নাশিনী তৃষ্ণি পেতে পারত সুরার কাছে তার আশা করতাই পারে না। আমি ইসার সংস্পর্শে আনন্দ এখনো পুঁবই পাই—কিন্তু সময়ে সময়ে কি জানি কেন মনে হয় যে আহার-প্রকৃতির মাস্তুলের কাছে ওর ভালোবাসা বুঝি তৃষ্ণার জল নয়—রঙীন সুরারই মতন একটা কিছু—যার মধ্যে আছে নেমা, আছে স্মৃতি, আছে কবিতা

আবেশ। কিন্তু নেই স্বচ্ছতোয়া কলধ্বনি, তরঙ্গবর্ণী তৃপ্তি, নীলিমার নীল নীড়।

“কিন্তু কেন নেই? আর শুধু কি ওর মধ্যেই এর অভাব—না সব নারীর মধ্যেই। থেকে থেকে ভেবে এত বেদনা পাই—অথচ কুল পাই কই? তবে আজকাল যেন একটু আভাষ পাই সময়ে সময়ে—পুঙ্খ মেধের অনুরালে চাপা বিদ্যাদামের ঝলকের মতন। কিন্তু ঐ বিদ্যাস্তের মতনই সে পলাতক। ধরতে না ধরতে যায় মিলিয়ে। তা যাক—তবু তো একটু কম আপনা দেখি এই বেদনার অঙ্গন প’রে—এই-ই আমার বর্তমানের সাহসনা। চোখ তবু একটুও তো খুলল এ-আশাতত্তে। বখালাভ।

“কিন্তু এ-আক্ষেপ যাক। আভাষ-পাওয়ার কথা বলছিলাম না? কী আভাষ পাই? ইসাকে বোলো না কিন্তু। ও বড় ব্যথা পাবে। ও জানে না আমার মধ্যে কী ঘন্টাই চলেছে!...

“আমার মনে হয় : আমরা প্রেমের ক্ষেত্রে যার পিছনে ছুটি তা অভ্যস্ত মনে একটা-কিছু।—কলবে মরীচিকা? কিন্তু মনে রেখো মরীচিকাপূর্ণ লাস্ত্র হ’তে পারে—জল ব’লে জলাকৃতি ছায়ার পিছনে ছুটতে পারে—কিন্তু চার সে জলই, ছায়া নয়। কাজেই মরীচিকা ছায়া হ’লেও, যার ভরসা ও দেয় সে ছায়া নয়। ঠিক তেমনি ভালোবাসার ক্ষেত্রেও। ভালোবাসার আনন্দ চিরজিয়ারী, কেননা আমরা জানি যে, এক ভালোবাসাতেই তুমার জল মিলতে পারে। কিন্তু বাহ্যিক সার্থকতা-সম্বন্ধে আমরা সচেতন হ’লেও কেন জানি না ছোট্টাছুটি করি ঐ দেহগত প্রত্যাশাকেই প্রদক্ষিণ ক’রে। বার বার এ-পরিক্রমার নিরাশ হই, তবু বুঝেও বুঝি না—মোহের ফেরে—যে, দেবতা তীর্থেও নেই পরিক্রমায়ও না। দেহতৃষ্ণা হচ্ছে দেবছদ্মবেশী অপদেবতা প্রত্যাশা—ফুরৎ-বিতা আলোয়।

কামনা—সম্ভাব্যবশী মরীচিকা। ওদের স্বধর্ম—ডাকা,—প্রতিক্রিয়ার  
রঙীন উৎকোচে প্রলুব্ধ করা। রঙীন বলছি এইজন্তে যে, এসবের নানান  
অন্যকারের মধ্যে আছে একধরনের নাট্যরঙ্গের শিহরণ, একধরনের চকিত  
কিমোম—আত্মাদির-ভরা। এতে একরকমের সার্থকতা হয়তো থাকতেও  
পারে—অন্ততঃ আছে মনে করা অসম্ভব নয়—নইলে সেই ভুঙ্কার এই  
লোলুপতা নিয়ে এত মারামারি কেন? মরীচিকার তহবিলে জল না  
থাকুক—মোহ আছে বৈ কি, নইলে লোকে ছোটো কেন? এ-কথা তো  
খুবই স্পষ্ট।

“কিছু তা ব’লে এর মধ্যে নেই সেই সার্থকতা—যার জন্তে মানুষের  
হৃদয় চির-বৈরাগী—চির-বুড়ুকু। নেই সেই ভালোবাসা—যা ওঠা-পড়ার  
উপর নির্ভর করে না। নেই সেই দীপ্তি—যা নিত্য-নূতন ইচ্ছার নিত্য-সুখ  
রক্তরাগের মুণাপেক্ষী নয়। কেন এ-ধরনের কথা বলছি? শোনো। মনটা  
আমার তারাক্রান্ত আছে কাল থেকে। নইলে এ-চিঠি লিখতাম না  
হয়তো। আশ্চর্য্য! সময়ে সময়ে আমার মনে হয় বুঝি মানুষ শুধু  
একরাশি আশা আকাঙ্ক্ষা হর্ব বিবাদের জটলা নিয়েছে জীবন্তরূপ।  
নইলে কালকের কয়েকমিনিটব্যাপী একটা ঘটনার জন্তে আমার মনের  
রং এত বদলে গেল কেন? পরন্তুই তো কী রকম উল্লাসের মধ্যে  
কেটেছে—এক পিকনিকে! আর আর! মনে হয় কেবলি গেটের  
গভীর অবসাদ :

সকল কর্ম সকল নর্থ হিয়াকুলে বহি’ শ্রান্তি আনে

ভাগ্যবান্ সে—জীবন বেলায় শ্রান্তি-অন্ত যে নাহি জানে !\*

“বাক বলি ব্যাপারটা :

\* ‘Alles, was wir treiben and thun, ist ein  
Abmüden ; wohl dem, der nicht müde wird.’

“লগনে আমরা প্রথমে উঠেছিলাম ইষ্ট এণ্ডে জানোই তো। একটা ক্র্যাটে আমি, ওমা, উয়েলা ও ইসা—একত্রেই।

“কিন্তু সে মলিন পাড়ায় থাকতে ওর বড় কষ্ট ছিল। ভাগ্যক্রমে মোটা টাকাটা এসে গেল। আমরা হ্যাম্প্‌স্টেডে একটা ছোট্ট ক্র্যাট নিলাম—হীথের সামনেই।

“পাঁচ-ছ দিন তারি আনকেই কাটল : নির্মেষ জোৎস্না। তার পরই এলো রাত।

“আমাদের নিচের ক্র্যাটে ছিল বাটন ব’লে একটি মন্ত খেলোয়াড়। আমার ছবি দেখে সে তারি গুঁসি। ভাব হ’য়ে গেল।

“বয়স বছর আটশ। বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ—স্পোর্টস্‌ম্যান যাকে বলে। পত বছর ক্রিকেটে ও টেনিসে কেমব্রিজ থেকে সুপেয়ে এসেই উইমলডনে সেমি-ফাইনালে কে একটি বিখ্যাত ফরাসী খেলোয়াড়ের কাছে হেরে যায়। কিন্তু তাকে আর একটু হ’লেই হারিয়ে দিয়েছিল।

“এ বছর সে উঠে-প’ড়ে প্র্যাক্‌টিস করছে প্রাণপণে। বলে এবার তাকে অসম্ভব ফাইনাল পর্য্যন্ত যেতেই হবে—নইলে মান থাকে না আর।

“ইসা টেনিস খেলে খুব ভালো। বাটন তাকে নিমন্ত্রণ করল ওদের লাবে। ইসা যেতে স্লক করল, এবং দু’দিনেই ‘cynosure of neighbouring eyes’ হ’য়ে উঠল—বুঝতেই পারছ। ইংলেণ্ডে একেই ‘স্লকরী ক্রেনেত্’ নেই—তার উপর সাক্ষাৎ ইসাবেলা। নিমন্ত্রণের অশ্রাব্য মাঝেই প’ড়ে গেল ও বেথতে বেথতে।

“ওর বাড়িরে আমারও পসার হ’ল বৈ কি। বাটন কত দায়গার দে নিয়ে যেতে স্লক করল আমাকে আমার ছবি-সমেত!...হ’রে উঠলাম দামিও এক সচল প্রদর্শনী।

“কিন্তু দিন সাত-আটের মধ্যেই আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম একটা

জিনিষ : বে, বাউন ও তার বন্ধু-বান্ধব আমাকে নিমন্ত্রণ করে যেন একটু দ্বারে প'ড়েই। আমি তৎক্ষণাৎ ইসাকে বললাম : আমার দু-একটা ছবি আঁকা পড়েছে, সে যেন এখন থেকে পাড়ি-টাটিতে একলাই যায়।

“ভেবেছিলাম ইসা আপত্তি করবে। কিন্তু করল না। বরং একটু যেন খুসিই হ'ল। ওকে দোষ দেই না। জানো তো ইংলও ফ্রান্স নয়। এখানে অমন nymphএর এ-রকম পীতাত satyr প্রণয়ী—বড় কেউ ভালো চোখে দেখে না। তার ওপর আমি খুব মিশুকও নই। এখানেও দেখ, ওর সঙ্গে আমার কী ভয়ঙ্কর তফাৎ! পাড়ি-টাটিতে ওর রূপের বর্ণনা বয় উজ্জল হ'য়ে—কথার হাসির ঠনকের শ্রোতৃবিনী চলে গান গেয়ে। ও যেন ফুলের মতনই দুটে ওঠে সাল'-র রং-মশালে। আর আমি হ'য়ে বাই আড়ষ্ট—খুঁজি আওতা অস্বরালের আশ্রয়। যাক।

“দিন কয়েকের মধ্যেই দেখলাম ইসার রূপ আরও উজ্জল হ'য়ে উঠেছে—ওর এখানকার প্রসাধন-বিলোলা-সামান্যতা বেশা-চোখা দেখলে তুমি মাথা ঠিক রাখতে পারবে না—কী নোকোর, কী ডাঙায়।” স্বপনের সুর মৃদু হ'য়ে আসে এখানটায়।

• •

আনা স্বপনের পানে চেয়ে দুখ টিপে হেসে বলে : “কিন্তু এখানে কোয়ারী একটু তুল ক'রে বসেছে। তবে বলতে পারো, ডাঙায় তুমি যে একটু আলাদা মনিস্তি তা চাং জানবে কেমন ক'রে?”

স্বপন ঐবৎ রক্তিম হ'য়ে “হুঁ”—বলেই চিঠির দিকে চায় : “কোথায় সেল ?—এই যে!”

• •



“কিন্তু সে বাই হোক—আমার মনের মধ্যে কোথায় বেন বিঁধল। ইসাকে এক রাতে ছাড়া আর পাওয়াই দুর্ঘট। তা ছাড়া আমিও শুকে ধরে রাখতে চাই নে—বেচারী আমার অন্তে কম তো ছাড়েনি। শুওর নয়—ছেলেদের অন্তে মেয়েদের ভাগের কথা ভাবলে আমার সন্ত্রম আসে—সত্যিই। আমরা দাম্পত্য-সম্বন্ধে নিজেদের চার আনা মাত্র দিই—ওরা দেয় বায়ো আনা।—কিন্তু তবু মাহুকের বাসনা এমনি যে, আঁকড়ে ধরতে একবার পারলে তার মুঠো আর আলগা হয় কই? তার উপর আমি পুঙ্খমাহুয। ভালোবাসতে হ’লে একটু রক্ষণাবেক্ষণের ভার, কড়কের আত্মপ্রসার আমার কাছে শুধু বিলাস নয়—নেসেমিটি—বহিও বিদগ্ধ-সমাজে এ কথা প্রাণপণে অস্বীকার করব। মুখে বলব : দাম্পত্য-প্রেমে আজকাল নরনারী কী স্বাধীন যে !...”

\* \* \*

• আনা হেসে বলল : “লেখে বড় ভালো।”

—“হ্যাঁ—এসবের বেলা ভালো তো বটেই।”

—“কিন্তু সত্যি বলেনি? বুকে হাত দিয়ে বলো তো। তোমার এত কিছের আমাকে আসতে দিতে—বদি না আমি একটু অসহায় হ’য়ে পড়তাম?”

“অসহায়” কথাটা আনা এমন মিশ্র স্বরে বলে !...স্বপন হেসে উড়িয়ে দেয় বটে, কিন্তু ভিতরটা হ’য়ে ওঠে এমন আর্দ্র !...সে ওর কটি-কোঁঠন ক’রে কাছে টেনে আনে। আনার দেহ তৎক্ষণাৎ এত লম্ব হ’য়ে বিস্তৃত ভাবে দেয় মাজা !...স্বপনের হঠাৎ বুকের মধ্যে কোথায় ঢুলে ওঠে—সে তার বাহুবন্ধন একটু আলগা ক’রে দেয়—একটু সহনশীলতা বৈ।

\* \* \*

“কিন্তু বশন, মাহুকের কাছে কোনো কিছু নেলেগিটি হকামার সে  
তাতে বকিত হয়,—অন্তত আমার নিজের ক্ষেত্রে এ যে আমি কতবার  
দেখেছি! তুমি দেখনি? বিধাতা যদি থাকেন তবে তাঁর মানের  
এমনিই একটা বিজ্ঞপ্তি ভক্তি আছে—না?—বে, যে যা চাইবে তা কেবল  
ততক্ষণ অবশি পাবে যতক্ষণ অবশি পাওয়ার কামনা দুর্কার হ’য়ে  
ওঠেনি। কিন্তু বেই উঠবে অমনি আরন্ত বাবে কসকে—মুঠোর মধ্যেকার  
জলেরই মতন।—যতই ঝাঁকড়ে ধরবে ততই তাড়াতাড়ি করতলগত হ’য়ে  
পড়বে অলভ্য। তখন সে কী করবে?—না, না-পাওয়ার মধ্যে দিয়ে,  
বিশ্ব-কবিদের মধ্যে দিয়ে কোনোমতে সার্কসভৌম পাওয়ার স্বাদ সংগ্রহ  
করবে—বচনা করবে—ফটি করবে—শিল্প দিয়ে হোক, সত্য দিয়ে হোক,  
স্বপ্ন দিয়ে হোক, মোতাত দিয়ে হোক। কিন্তু মজা এই যে, এ-জগতের  
উপাদান মালমশলা সব ছায়াময় হ’লেও এ-জগতের বাসিন্দাগা অন্তর্য  
বাস্তব—কংক্রিট। তাদের নাম—বকিত শিল্পী। এইজন্মেই বুঝি  
দার্শনিক হেসে বলেছেন বোনে যেমন একটা statue-র জগৎ আছে  
তেমনি মাহুকেরও একটা মায়াময় জগৎ আছে—কল্পনার। বাক। বা  
বলছিলাম।

“ইসাবেলার মধ্যেও দেখলাম একটা দন্ডের জোয়ার-ভাঁটা দেলছে।  
কিন্তু সে মুখ ফুটে কিছুই বলে না। এতেও আমাকে বাজল। ঘনিষ্ঠতার  
ক্ষেত্রেও আমাদের দেখার ভঙ্গি কত তফাত দেখ। ও বলে : প্রতি  
মাহুকের মধ্যে একটা প্রাইভেট জগৎ থাকে দরকার—বলে : আড়ালেরও  
দরকার প্রেমকে নিবিড় করতে।”



আনা বলল : “ইসাবেলার একথা কিন্তু সত্য নয়। তোমার মনে হয় না স্বপন?”

স্বপন একটু বিব্রত বোধ করে, কী উত্তর দেবে ভেবে পার না।

\* \*

“আমি বলি প্রেমের ক্ষেত্রে খুব একটা বড় তাগিদ প্রেমাশ্পদকে গোপন কথা বলা—বা অপরাধে বলা যায় না তা তার কাছে ব’লে যে-তৃপ্তি তাতেই যে প্রেমের একটা মন্ত খোরাক।”

\* \*

আনা মুচ স্বরে বলল : “এই-ই হচ্ছে সত্যি কথা।”

\* \*

“কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও—যাক গে। আর এ নিয়ে এত বেশি লিখিই বা কেন? বোধ হয় প্রেমাশ্পদও যে আসলে আমাদের কত অচেনা বিশ্লেষণ করে জানার মধ্যে একটা বিষয়ের তৃপ্তি আছে ব’লে, না? আর সৌখিন্যের সঙ্গে বেদনার দোলা আছে ব’লেও,—না? যাক, শোনো অঙ্কটার শেষ পঙ্কতি।

“বুদ্ধদাম : ও চায়—আমি ওর ‘পরে একটু জোর করি—বলি পাটি-টাটিতে যাওয়া একটু কমাতে। মেয়েরা প্রশ্রয়ী অধিকার আহির করাটা সচিৎ চায়—জানো তো? যারা বড় বেশি স্বাধীনতার জয়গান করে তারা প্রেমের এই যেচ্ছাকৃত বস্ততার নাথুগীটুকুর কী জানে স্বপন? যুরোপের স্ত্রী-স্বাধীনতার এই একটা ভারি অসার দিক আছে। একথা

সজ্জা যে, বাইরের চাপে আসে দাসত্ব। কিন্তু খেজার দাসত্ব তো দাসত্ব নয়—সে-ই যে মুক্তি।—কোনো আদর্শের জন্তে দারিদ্র্য-বরণ যেমন। বন্ধন ? বন্ধন যখন প্রভু হয় তখনই সে বিব—যখন তাকে ভৃত্য বাহাল করতে পারি তখন সে সুধামিক সুখ। আর বন্ধন মানে কী বলো তো ? ভেবে দেখতে গেলে রেখা ছন্দ সুর সবই তো নিগড় স্বপন, নয় ? কিন্তু সেইজন্তেই তো শিল্পের বন্ধন শিল্পীর কণ্ঠে মলয়মালোর মতন শোভা পায়। কিন্তু বন্ধনকে বৈজয়ন্তী করবার জন্তে চাই খেজা-বরণ। বাইরের চাপে যে-রিক্ততা তাতে গোরব নেই—কিন্তু খেজার যে প্রাণাদ ছেড়ে গাছতলায় পড়ায় তার মধ্যে প্রবুদ্ধ বুদ্ধ না হোক সুখ বুদ্ধ কোনো না কোনো বেশে লুকিয়ে আছেন জানবে।

“এ-কথা আমি বুঝি। কিন্তু আমারও যে আবার গৌ ব’লে এক বিষম রোগ আছে, জানো তো ? যে-মুহুর্তে দেখলান ও বাইরের সাহচর্যে খুঁসি, সে-মুহুর্তে আমার গৌ চাপল ওকে একবারেই দেব ছেড়ে। একটুও দাবি রাখা নয়। ও বুদ্ধ—এ অভিমান। কিন্তু অভিমান বড় সর্ব্বনাশে জিনিষ ভাই। সারল্যের মতনই সংক্রামক ও লোভনীয়—অগচ সারল্যে যে-কালোমেঘ কাটে—অভিমানের কাজ তাকেই ফের জড়ো করা। আমাদের মধ্যেও নানা খুঁটিনাটিতে, নানা ছোটখাটো প্রত্যাশার অপূরণে, নানা অভিমানে দম্কা হাওয়ায় একটু একটু ক’রে অনেকখানি ছায়াঙ্ককার হ’য়ে এগো পুঞ্জীভূত। এক এক সময়ে ইচ্ছা হ’ত একটা খোলাখুলি কথাবার্তার হাওয়ার সব কুশাশাকে দিই দূর ক’রে, কিন্তু আঁধি যখন ওড়ে, তখন কটিকবৃষ্টিও যে হ’য়ে আসে দিক্ত কাচের মতন কাপসা কাই, সহজ হওয়াই যে হ’য়ে ওঠে সব চেয়ে দুঃখ ! নানী সজ্জিত অনির্বেষ্ট বেদনার বলে ইশাবেলার আড়াল-কাঁমানার কথাও উগ্রভাবেই মনে হ’তে লাগল ;—মন বলল, যখন আড়ালই ও চার—

তখন কেনই বা এক-তরকা ঘনিষ্ঠতার ভিঁকা, অকপট খোলাখুলি কথাবার্তার জন্তে ছ্যাংলারি ?

“ও এটা বুঝল; কিন্তু এতে সে আঘাত পেল সেটা ও-ও বলল না। প্রতিশোধ। কিন্তু একেয়ে সত্যিই ওর দোষ ছিল না—আমিই জেনে- শুনে রোগ ক’রে উলটো বুঝলাম। বিমুখ মনের কানেই তুললাম না যে, ঘনিষ্ঠতার বিরুদ্ধে ও একটা কথাও বলেনি। কিন্তু অভিমানের জগদল পাখর যখন বুকে চেপে বসে স্বপন!—ওর বুকেও-কিছু-না-বলাকে আমি ফের সুবিধা মতন ভুল বুঝলাম ও মনে মনে জপ করতে লাগলাম : যখন ও দূরত্বই চায়, তখন তাই হোক। এ-রকম আরও কত শত সূক্ষ্ম মন-কষাকষি সে! চিঠিতে লিখি সাধ্য কি? বুঝে নিয়ো। এখন শুধু শেষ অঙ্কের ঘটনাটাই বলি।

“শেষ অঙ্কটা হয়তো এত শীঘ্র ঘনিরে আসত না—যদি না ও ক্রমেই বেশি-রাত ক’রে বাড়ি ফেরা শুরু ক’রে দিত নানান সামাজিকতায় অজুহাতে। না, ‘অজুহাত’ কথাটা বললে অন্যায় হবে। নিমন্ত্রণের প্রারম্ভ থেকে যে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার উপক্রম করল সত্যিই। করবে না? ও যে কী রকম মিশুক ও নৃত্যপটু তা তো নীসেই দেখেছ—তার ওপর এ লণ্ডন, আর ওর জুড়ি খয়ং বাটিন—যে নাচে, খেলায়, গল্পে—ওস্তাদ। ওরা দুজন এক-একদিন ফিরত রাত ছটো তিনটায়। ফলে ভুল-বোঝার এবং মনান্তরের মেঘ গুমরে গুমরে জমেই উঠতে লাগল একটু একটু ক’রে।

“দাম্পত্য সখ্যকে—জানোই তো—ভুল-বোঝা সব সময়ে অব্যাহতীয় নয়। কত ক্ষেত্রেই ঠোকাঠুকির ফলেই পরিচয় নিবিড়তর হয়—কে না জানে কলো? মনান্তরও দাম্পত্যকে পরস্পরের কাছে টেনে আনে, দাম্পত্য-মিলনের সোহাগের দিকটাকে মধুরতর ক’রে তোলে বৈ কি। কিন্তু এ-মিলন মধুরতর হ’য়ে ওঠে কেবল তখনই—যখন দেহও নৈবুজা

যোষণা না করে। যদি দেহকেও মারবে—ক'রে উপবাসী থাকতে হ'বে অবস্থাটা দাঁড়ায় সতীন। মনের অভিমানী মরুচরকে দেহের মেহুর হ'বে—চুন্ননের ধারা বর্ষণ—আলিঙ্গনের—উর্ধ্ব করে বটে—দেহের দিগন্তেও উদ্ভূত আহ্বানের বিদ্যুৎ লেখা—মরুভূমির আঁকিকে না করে—তখন মনের অভিমানের উপর ভর ক'রে দেহের আবেদনকে ক'রে তোলে দুর্ভর!...

“এই দুই অভিমানে শেষটায় এমনই দাঁড়াল যে, ওর সঙ্গে আমার দেখা-শোনা কথাবার্তাও বন্ধ হবার যোগাড়। ভাবছ অতিরিক্ত মোটেই না। সত্যিই গত সপ্তাহে দেখা আমাদের প্রায় হয়নি ব'লে। চার-পাঁচদিনে চার-পাঁচটার বেশি কথা হয়েছে কিনা না এ সপ্তাহে দুদিন এমন কি প্রায় চোখের দেখাও হ'ল না বললেই দিনে আমি বীরপুরুষের মতন থাকি ঠুঁড়িয়েতে আরও ক'রে; ও শোধ নেয় রাতে—পাটিতে পাটিতে রাত ভোর ক'র বীর-নারীর মতন। সঙ্গে সঙ্গে এক জোটে দুজনেরই কেমন একটা চেপে যায়।

“ও-ও চায় আমি আগে ওকে বলি : এ নিঃশব্দ সময়ের সীতানতে—আমিও চাই ও বলুক আগে। ও চায় আমি ওর ওপর খাটাই, খোলাখুলি কথা বলি, অন্তর রাগ ক'রেও বলি অত রাত না আসতে—অর্থাৎ ওর অভাব আমি বোধ করি কোনো ছলে জানাতে। আমিও কোনোমতেই সেটুকু নত হব না। ভাব করি আমি আঁকার মত, যেন ওর আঘাতপ্রমোদ আমি নির্লিপ্ত পিতার মত উপভোগ করছি মনে প্রাণে নির্বাক মেহে।

“রাতে প্রায়ই ঘুম হত না, ছটফট ক'রে কাটাতাম। কিন্তু ওঁর প্রেমে ঘুমের ভাণ ক'রে থাকতাম প'ড়ে। দম্পতীর মধ্যে এক শ

শয়ন করেও যে দিনের পর দিন প্রায় অপরিচিতের মতন আচরণ করা  
সত্ত্বপর এ অত্যাচারী অভিজ্ঞতা আমার এ-স্বরে হ'ল।”

\* \* \*

আনা স্বপনের বাস্তব উপর চাপ দিয়ে বলল : “তোমার বন্ধুটির  
কিছু জেদ আছে। উঃ গো বটে!”

—“কী বলতে চাচ্ছ?”

—“সুন্দরী প্রণয়িনী—খাদ্যাদক্ষিনী—‘দেহের অভিমান’—ও কি  
একটা কথা হ'ল মনানি? অন্ততঃ পাশ্চাত্য প্রণয়ী এ জিনিষ বোঝে না।”

—“কিছু ইমাবেলা—”

—“আহা—সে কি আর দেহের দিক দিয়ে বাটনের কাছে কিছু কিছু  
খোরাকও পাচ্ছিল না? কিছু চাং যে ছিল নিরসু উপবাসে।” ব'লে  
আনা কেনন এক ধরনের হাসে। স্বপন ওর দিকে একবার তাকালো।  
ওর চোখে কিরকম একটা অস্বাভাবিক ছাতি দেন! সে চোখ ফিরিয়ে  
নিজের বক্ষ-স্পন্দনকে শাস্ত করবার কত চেষ্টাই যে করে!...

\* \* \*

“থাক এবার শেষ গভীরত্বটির কথা বলি।

“কাল ওমো ও উয়েদার ওখানে আমার সাক্ষাৎকারের নিমন্ত্রণ ছিল।  
আমি কিছু না বললেও ওরা খানিকটা এঁচেছিল যে, আমাদের চতুঃপদ  
টিক ভালো ভালো পড়ছে না—তাই আমাকে একলা নিমন্ত্রণ করেছিল।

“বেকুছি এমন সময় আমাদের পরিচারিকা বলল : ‘দাদাম জিজ্ঞাসা  
করলেন : আপনি কখন ফিরবেন যেতে?’ আমি আশ্চর্য হ'য়ে

জিজ্ঞাসা করলাম : ‘একথা তিনি জিজ্ঞাসা করছেন কেন হঠাৎ ? তিনি তো ক্লাবেই থান আজকাল, না ?’

‘সে বলল : ‘মাদাম আজ থেকে রোজ সন্ধ্যায় বাড়িতে থাকেন—তাই আমাকে জিজ্ঞাসা করতে বললেন।’ আমি বললাম : ‘আমার আজ নিমন্ত্রণ আছে, ফিরতে রাত হবে।’ ব’লেই হন হন ক’রে বেরিয়ে গেলাম।

‘পথে বেরিয়ে একটা ভীত আনন্দ ও বেদনার জ্বালা অনুভব করলাম বৃকের মধ্যে। বেশ হয়েছে, এখন থেকে রোজই কোনো না কোনো ছুতোয় বাইরে পাব ভাবতে ভাবতে বাসে চড়লাম। ইলা বাড়িতে একা থাকে ভেবে এমন একটা উল্লাসের মর্দঙ্গদ প্রবাহ হায়তে শির শির ক’রে ব’য়ে গেল—মাথাটা গরম হ’য়ে উঠল বর্ষের গর্মে।

‘কিন্তু বাসের উপরতলায় কনকনে হাওয়ায় মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হ’তে না হ’তে—জ্বালা আনন্দ কেমন বেন একটা বিবাদের রূপান্তরিত হ’ল। দীর্ঘ দীর্ঘ ননের মধ্যে কোথায় একটা ঝিকার উঠল ঘনিয়ে। ছি যেচারি এমন ক’রে ব’লে পাঠালো!—অস্তুত মুখে ওকে একটু মিষ্টি ক’রে ব’লে আসতে কী হয়েছিল ? যে আমার জন্তে এত ছেড়েছে তার উপর আমার জোর আছে ব’লেই তাকে—

‘হঠাৎ বাস থেকে নেমে পড়লাম। ওনাকে একটা টিউব ষ্টেশনের টেলিফোনে ব’লে নিলাম—শরীর অসুস্থ, যেতে পারব না।

‘ক্ষিপ্রিত পথে বাসের তর সইল না। একটা ট্যাক্সি নিলাম। ননের মধ্যে সব জ্বালা কখন বে নিবিড় অসুখম্পায় কাকণো প্রেসে ভিলে উঠেছে...ওকে আদরে আদরে আজ দেব ডুবিয়ে—দেহের মধ্যে একটা হিসোল রোমাঙ্ক হ’তে লাগল। বিদ্রোহের প্রবাহ—অথচ এমন স্বাধীন—নিষ্ক!...

‘আমাদের বাড়িটার নিচের তলায় বার্টন থাকত—বলেছি। বাড়ির



সিংহাবারের গাশেই ওর ঘর। সেই ঘোর লাচ-কী খুলতে বাব এমন সময়ে ইসার হাসি শুনতে পেলাম বাট'নের শরনককে। দোর আর খুললাম না। দেহের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ যেন এক মুহূর্তে জমাট বরফ হ'য়ে গেল। মাথার মধ্যে কেমন ক'রে উঠল।

“পরিষ্কার ক'রে ভাববার অবস্থা ছিল না আর তখন। চক্ষের নিম্নে, ডানদিকে লাফ দিয়ে বাট'নের একটা জানালার নিচেই গিয়ে দাঁড়লাম। সামনেই একটা ঝাউপাছ—তার আড়ালে। আলার মাথায় অসঙ্কেতে তার ত্রেক উইণ্ডোর নীল পরদা ঈষৎ ফাঁক ক'রে দেখতে লাগলাম সাবধানে। যা দেখলাম তা না দেখলে আজ ঢের বেশি মনের শক্তিতে থাকতাম বৈ কি—কিছু সে অনুশোচনায় এখন আর ফল কি? কী দেখলাম? বলি শোনো।”

\* \*

‘বগনের হাতের’ পরে আনার আঙুলের চাপ ঈষৎ কাঁপছিল।  
বগনের কান পরম হ'য়ে উঠল।

\* \*

“ইলা একটা কোচে হেলান দিয়ে—আর বাট'ন সে কোচের হাতার উপর ব'সে বুকে ওর মুখের পানে চেয়ে। ইসার এক হাত তার উকর পরে চুস্ত, অপর হাত তার মূঠোর মধ্যে বন্ধী। আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল ফের!...মুখে যতই বলি না কেন বগন, আনাদের আদর্শের সঙ্গে আনাদের প্রকৃতির সাদা-দেওয়ার-বীতির মিল কি হ'তে চায়, না হ'তে পারে? সংঘর্ষ তো শুধু একটা ঠাট বজার রাখবার ট্রট-জ্যাকেট। অত্যাধ তো ওতে বদলার না—যেই ও-জ্যাকেট থেকে

ছাড়া পাবে সেই সেই যে-আমির পশু সেই আমির পশু। যাক গবেষণা রেখে এ কয়েক মিনিট লুকিয়ে যা দেখলাম ও শুনলাম বলি শোনো। ওদের প্রত্যেকটি কথা বোধ হয় আমার স্বতিতে চিরদিন খোদাই করা থাকবে।

“ওদের হাতের কাছেই একটা তেপায়াতে একটা সবুজ ঝিলিমিলি দেওয়া টেবিল ল্যাম্প—পরীকার দেখা যাচ্ছিল সবই—বিশেষ করে ইসার মুখ—সমস্ত আলোটাই সংহত হয়ে পড়েছিল ওর মুখে ও বুকে। দেখলাম ওর ব্লাউসটা দ্রুত উঠছে নামছে—কিন্তু মুখে একটা ভাণ করা বেপরোয়া নিশ্চিন্ত ভাব। ওটাপ্রান্তে হাসি—কিন্তু চিনি তো ওকে—একটা ইতস্ততঃ ভাবও ছিল সে মুখের রেখায়-রেখায়। তবু একটু সাবুনা পেলাম। ইসার কোণায় একটা অশান্তিও আছে—মুপের হাসির মুণোষ তাকে ঢাকতে পারেনি সম্পূর্ণ।

“বার্টন বলল : ‘নয় কেন ইসাবেল ?’ এমন আমারের টোনে ‘ইসাবেল’ উচ্চারণ করল যে আমার বুকে তীরের মতন বিঁধল এসে। ওর পরস্পরের এতটা কাছে এসে পড়েছে!...অহুমান করেছিলাম অবশ্য—কিন্তু অহুমান বা করনা তো কখনো প্রত্যক্ষের মতন দাঁহ জাগাতে পারে না ভাই।—যাক শোনো।—ইসাবেলা একটু চুপ করে থেকে শুধু মাথা নাড়ল। বার্টন উত্তপ্ত কণ্ঠে বলল : ‘কিন্তু কেন—কেন?’ ইসাকোলা মুখ একটু ফিরিয়ে নিয়ে বলল : ‘অল্প কথা পাড়ো জেরালড।’ বার্টন বলল : ‘আমার কি ও ছাড়া আর অন্য কথা আছে ইসাবেল ? জানো না কি?’ ইসার মুখে ফের হাসির কলক খেলো গেল। তবু তার হাসির মধ্যে একটা দারবিক অসংলগ্নতা প্রকাশ পেল : ‘এত বিট কথার জানো—তোমরা পুরুষেরা!’ বার্টন কল : ‘তাবহ এ আমার দুঃখের—’ ইসা বাধা দিয়ে বলল : ‘না ভেবে করি কী হলো ?’ কিন্তু

ও-প্রসঙ্গ এখন চাপা দাও জেরালড যখন—যখন তা অসম্ভব।’ বার্টন বলল : ‘অসম্ভব কেন ? তোমরা তো বিবাহিত নও।’ ইসার মুখে এবার ফুটল স্নান হাসি : ‘না—তবু—’ বার্টন বলল : ‘ওকে ভালোবাসো ?’ ইসা বলল : ‘বাসি।’ বার্টন বলল : ‘তোমাকে নানা সূত্রে এত অবজ্ঞা এত অপমান এত—ইয়ে করার পরেও ?’ ইসাবেলার মুখে স্নানিমা এবার আরও স্পষ্ট ফুটে উঠল : ‘কিন্তু ওকেও তো আমি তাচ্ছিল্য দেখিয়েছি কম না ? তোমার প্রয়োচনায় পরখ করতে গিয়ে গত সপ্তাহে প্রায় অপরিচিতের মতন ব্যবহার করেছি বললেই হয়—তার ওপর—’ ব’লেই থেমে গেল। বার্টন বলল : ‘তার ওপর কি ?’ ইসা বলল : ‘আমি তোমার কথা শুনে ভালো করিনি জেরালড—কিন্তু যেতে দাও—আমার ভালো লাগছে না এ-প্রসঙ্গ। ও-চিন্তা তোমার মন থেকে দাও দূরে ক’রে।’ বার্টন তিক্ত হেসে বলল : ‘যা আমি পারি নে তা করতে বলায় তোমার নারীত্ব-গৌরব থাকতে পারে ইসাবেল—কিন্তু শুনে আমার পৌরুষগর্ভ জাগে না। কিছা এ-কথা আমাকে দিয়ে কবুল করিয়ে নিয়ে এতই আনন্দ হয় তোমার ? জানো না কি প্রেমের ক্ষেত্রে মানুষ কত নিঃসহায় ?’ ইসা একটু নরম হ’য়ে বলল : ‘আমার রুচুতা মাফ কোরো জেরালড, কিন্তু কেমন ক’রে তুমি এ-প্রস্তাব করছ ?’ বার্টন বলল : ‘না ক’রে পারি ?—তুমি কি সুখী হবে ওদের দেশে ? পাগল ! দুমিনও টিকতে পারবে না যে।’ ইসাবেলা ঈষৎ উদ্বাস হয়ে বলল : ‘কে বলতে পারে ?’ বার্টন এবার ওর দুহাত নিজের দুহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে তপ্ত হয়ে ব’লে উঠল : ‘আমি বলতে পারি ইসাবেল ! কারণ আমি তোমাকে ওর চেয়ে ঢের ভালো জানি—বে-তোমার কাজ পুরুষের মাঝার মণি হওয়া সেই তুমি হ’তে বাচ্ছ ওর দাসী। আর ও বে তোমার এত বড় আত্মত্যাগের কিছুই দাম দিল না এই-ই কি সব চেয়ে

বড় প্রমাণ নয় বে, তোমার মহিমা বুঝতে ও একান্তই অক্ষম ?' ইসার হুঁচোথে হুঁফোটা অক্ষ সেই হরিত-খীতাত আলায় চিকচিক ক'রে উঠল। ও মুখ নিচু করল। বাটিন টপ ক'রে ওর কণ্ঠ বেঠেন ক'রে আনত মুখ জোর ক'রে ধরল তুলে। ইসা মুহু আপত্তি করল : 'কী করো জেরালড ?' বাটিনের কান সে মুহুতা বুলল, মুহুন্তে তার অধর-প্রান্তে এক দীপ্ত হাসি খেলে গেল, বলল : 'বে আমার তাকে আমার ব'লে দাবি করি—শুধু এই।' ব'লে আরও ঝুঁকে ওকে জড়িয়ে ধরল, এক হাত ওর কণ্ঠে লতিয়ে, অপর হাত ওর গালের 'পরে রেখে। ইসা একটু আপত্তি ক'রেই চেড়ে দিল নিমেষে। সে ধরধর ক'রে কঁপে উঠল স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ওদের ওষ্ঠাধর মিলিত হ'ল। আমি ভাবলাম জানলা টপকে ধরের মধ্যে পড়ি লাফিয়ে। বহুকষ্টে নিজেকে নিবৃত্ত করলাম সে-পাগলামি থেকে। ফের দেখতে লাগলাম। একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম স্বপন, শুনলে হয়তো একটু আশ্চর্য লাগবে তোমার : এসব দেবার মধ্যে ঠিক যেমন জালা তেমনি এক অনির্দেশ্য আনন্দও আছে। হঠাৎ মনে হ'ল যে জালার মধ্যে এ-ধরনের আনন্দ আছে ব'লেই বোধ হয় প্রণয়ীর কাছে স্রবীর এত বেশি আদর, নয় ? যাক শোনো।

"খানিক পরে ইসা জোর ক'রে ওর বেঠনী থেকে নিজেকে একটু আলগা ক'রে নিয়ে বলল : 'কী করলে জেরালড ?' বাটিন ওর গালে হাত বুলিয়ে আদর ক'রে লখু হেসে বলল : 'বিখ্যাত রোমান কবি ওভিড হুহাকার বছর আগে এ-প্রশ্নের উত্তর দিয়ে রেখেছেন :

অবাধ্য লাগা নমিতে চাহে কি ?—ধীরে...অতি ধীরে...নোয়াতে হয়  
কমে শক্তিরে বে-মোহিনী—সে কি ছলাকলা বিনা আজ্ঞা নয় ?' \*

\* By slow degrees we bend the stubborn bough  
What force resists with art will pliant grow.

ইসাবেলার মুখের স্নানভাব হঠাৎ কেটে গেছে, সে হেসে তর্জনী তুলে শাসিয়ে বলল : ‘কিন্তু এ যে জবরদস্তি জেরালড।’ বার্টন তার দুই গাও নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে তার ওষ্ঠে ফের চুষন ক’রে বলল : ‘ত্রিকালদর্শী ওভিড একথারও উত্তর তোমারই উদ্দেশ্যে লিখে গিয়েছিলেন সেট সন্দেহ রোমে :

প্রেম কারে কচি ? রণ যার নাম,—তীন অলসতা কেহ না সহে

দৈরখ, দুখ, পাহারার বোঝা—শুধু কি সেনানী—প্রেমিকও বহে ? \*

‘ব’লেই ইসাকে বাহুবল্লভের মধ্যে নিলো টেনে। এবার সে আর একটুও আপত্তি করল না—হেসে তার বুক মুখ লুকোলো।

‘আমি আর থাকতে পারলান না—পরদাটা ছিঁড়ে ফেলে টেচিয়ে ব’লে উঠলাম : ‘ইসা !’ ব’লেই এমন লজ্জা হ’ল—কিন্তু তখন আর উপায় নেই।

‘বার্টন তড়িৎস্পৃষ্টবৎ লাফিয়ে উঠল। আমি খুব সংযত ভাবেই বললাম : ‘ইসা কথা আছে।’ ইসার মুখে রক্তের চিহ্নও নেই আর। সে বিশস্ত ব্লাউসের উপর তার শালটা ফেলে উঠে দোরের দিকে এগেলো। তার পা কাঁপছিল স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

‘বার্টন মুহূর্তকাল কিংকর্তব্যবিমূঢ় মতন দাঁড়িয়ে রইল, তার পরেই আমার পশ্চাতে ছুটে এলো। আমি শাস্তভাবে ল্যাচ-কী দিয়ে দোর খুলে বাড়ি ঢুকলাম। ঠিক তখনই ইসা তার প্রদরীর খর থেকে বেরলো। ওর পিছনেই সে। আমার সংঘম তখন কিরে এসেছে, আর এ-আত্মহারা

\* Love is a warfare, and ignoble sloth

Seems equally contemptible in both :

In both are watchings, duels, anxious cares.

The soldier thus, and thus the lover fares.

উদ্ভাসনার জন্তে এমন মানি বোধ হচ্ছে!... মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম এ-ধরণের সীন আর কোনো অভ্যুত্থানেই হ'তে দেব না। ইসাকে একটি কথাও বললাম না, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। সে-ও সিঁড়িতে পা দিল।

“হঠাৎ বাটন এসে তার হাত চেষ্টে ধরল, বলল : ‘বেও না ইসাবেল। আমি শপথ করছি’—ইসা তীব্র সুরে ‘আঃ’ ব’লে ঝাঁকুনি দিয়ে তার হাত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার দিকে চাইল। কিন্তু আমি আর একটি কথাও না ব’লে দৌতলায় আমাদের ফ্যাটের দরজা খুললাম ল্যাচ-কী দিয়ে। বাটন ফ্যাকাশে মুখে চেঁচিয়ে বলল : ‘ইসাবেল, শুধু একটি কথা।’ আমি খুব শান্ত মুখে শুধু বললাম : ‘ইসা!’ সে বাটনের দিকে আর কিরেও তাকালো না। আমার পিছনে পিছনে যন্ত্রচালিতবৎ ঘরে ঢুকল। আমি জানতাম এ-সময়ে আমার গান্ধীর্ষ্যে এই রকম ফলই ফলবে। ও স্বভাব-অসংযমী—আমার সংযমের ‘পরে’ সন্দীহের সীমা ছিল না। কেবল একটা কথা মনে হ’লে আমার একটু আশ্চর্য্য লাগে স্বপ্ন : সে-জানার সময়েও—প্রতিশোধ দেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষার সময়েও—আমার সহজবোধ আমাকে আত্মবিস্মৃত হ’তে দেয়নি, অভিনয়ে এতটুকুও বেচাল হইনি। হ’লে হয়তো ইসাকে সেদিনই হারাতাম। আরও আশ্চর্য্য এই যে সে-সময়েও আমার মন বেশ ব্যস্ত ছিল যে, এ-সংযম আমার অভিনয়। তবে কোন্ সংযমই বা নয় বলো ?

“তারপর ? কী আর বলব ? আর কী এমন আছেই বা বলবাব ? ইসাবেলাকে তো জানো। ও মিথ্যাবাদিনী নয়—কখনো শপথও করেনি যে, নিজের সব আচরণই আমাকে বলবে। আমাকে কিন্তু সেদিন বলল স—ব। বলল আমাকে বাটনের চেয়ে ঢের বেশি ভালোবাসে কটে, কিন্তু তাই ব’লে বাটন যে ওকে আকৃষ্ট করেনি বা বাটনের আত্মগত্যা ওর ভালো লাগেনি তাও নয়। একথা বলতে বলতে আমার বুকে

মুখ লুকিয়ে ওর সে কী কাগা—গলাগ—উচ্ছ্বাস! ‘কেন আমার ছেড়ে দাও চাং—যখন জানো আমি কত দুর্বল—আমার চরিত্রের মেরুদণ্ড এতটুকুও নেই? ভালোবাসার ধর্ম কি এই?’ সব ভুলে গেলাম আমি। ঘটল পুনর্মিলন। ও বাড়ি ছেড়ে আমরা পরদিনই ভোরবেলা ঈলিঙে একটা হোটেলে এলাম উঠে।

“পুনর্মিলন হ’ল বটে, কিন্তু যা যার তা কি আর ফেরে স্বপন? আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে যে-ঘনিষ্ঠতা ও মাদুর্য্য আগে ছিল তার কোণায় যেন একটা বড় রকমের নড়চড় হ’য়ে গেছে মনে হয়, অথচ ঠিক কোন্‌খানে যে জোড়টা আলগা হ’য়ে গেছে বুঝতে পারা ভার। তবে মনে হয় : ও আমার ‘এসো’ বলার দক্ষণ আত্মপ্রসাদ বোধ করলেও সে-শ্রদ্ধা বুঝি আমি বোধ করতে পারছি না আমার উদার অনাসক্তির প্রতি। যতই পৌরুষের গর্গল করি না কেন স্বপন, তাকে খাটানোর মধ্যে কেমন একটা আত্মগমনি নেই কি? উভয়কেই বেছেছে এমনি। ও মনে মনে হেসে বুঝেছে : পুরুষ যতই বড়াই করুক না কেন, কঠা না হ’য়েই পারে না—আমিও মনে মনে কৈদে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি যে, এটা আমার একটা বড় রকমের পরাজয় বৈ কি : শেষে কিনা ফিরিয়ে বেঁধে আনতে হ’ল! ঝিক। বলবে হয়তো : প্রেমের বন্ধন তো আর নিগড় নয়—মুক্তি। মানি। কিন্তু কখন? যখন এ-বন্ধনের পারে অপর পক্ষ আপনা থেকেই আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু প্রেমোন্মাদকে আমি তো তাই বলে বলতে পারি না : ‘এসো আমার প্রেমের শিকলে বাঁধি তোমার আঁটে শিটে।’ কাজেই একে একটা বড় আদর্শ থেকে চ্যুতি ছাড়া আর কী নাম দেব? কিন্তু সেজ্ঞেই বা আক্ষেপ কেন? আমার কোন্‌ আদর্শ জীবনের থাকায় একটুও যা পারিনি বলো? আদর্শ পথই দেখায়, ধরা তো দেয় না ভাই।

“কত রকমই যে মনে হয় আজকাল!...সে-সব এখনো বিশ্বাস্য অবস্থায় মনের মধ্যে ধুলো উড়োচ্ছে—ঝিতোয়নি। তাই থাক সে-সব বর্ণনা। কেবল একটা বড় উপলব্ধি বৃষ্টি পেয়েছি আভাষে : আজকাল কেবলই মনে হয়, ঠিক যে-ধরণের উদ্ভূততা প্রেমের স্বর্ণপীঠ, শাস্তির প্রতিষ্ঠাতৃমি,—দাম্পত্য-প্রত্যাশা—বিশেষ ক’রে যৌনতৃষ্ণা—বৃষ্টি তার মহা অন্তরায়। মনে হয় : শাস্তি আনে কৃতজ্ঞতা—নির্মলতা ;—অমিশ্র টল্টলে পরিপূর্ণ তৃপ্তি এরা দিতে না পারুক—সার্থকতার একটা ধিতিয়ে-যাওয়া সুষমা দেয়—নিশ্চয়ই। কিন্তু কামনা বাসনার ঝড় বহন ক’রে আনে—শুধু প্রত্যাশা আশঙ্কা উৎকর্ষ বেদনা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব। আর প্রতি পদেই একটা আর-একটার সঙ্গে জড়িয়ে মনটাকে হিজিবিজি চাকল্যে কুণ্ডলী ক’রে তোলে। তাই বোধ হয় বৃদ্ধ থেকে আরম্ভ ক’রে সব দিশারীই তাঁদের আধ্যাত্মিক সাধনাতে সব আগে তৃষ্ণাকে জয় করার উপর এত জোর দিয়েছেন, তোমার মনে হয় না ? বিশেষ ক’রে নরনারীর সম্বন্ধে ? কেন না এ-সম্বন্ধে লুক্কাতার, প্রত্যাশার, পূর্ণ-প্রতিদান-কামনার দিকটাই যে আনে জালা, আনে শঙ্কা, আনে বেদনা—আনে উত্তপ্ত উদ্‌গ্ৰহ বহিমুখিতা। তাই হয়তো মনে শাস্তির নিম্ন রস খিতুতে পায় না—যদি কামনার বিকোভ বেশি প্রস্রাব পায়। তাই কি ?

“জানি না ঠিক। আধ্যাত্মিক শাস্তির একটা হুঁসিয়ার কুবা আছে আমার। অথচ নারীকে বাদ দিয়ে, বা গায়েব জোরে অস্বীকার ক’রে কাটাছাঁটা প্রযুক্তি-নিরোধের কথা ভাবতেও ভয় হয়—বিভ্রাণ জাগে। মনে হয় সেই sphinx-এর প্রশ্ন—জন্ম কি শুধু আর না-জন্মাধার সাধনারই জন্তে।

“মনে হয়—না,—তা হ’তেই পারে না। অথচ নরনারীর এই আকিল উত্তেজনার সম্বন্ধের ভিতর যে কোনো বড় নির্মল সার্থকতা থাকতে পারে



এ-ও তো মন বলে না। ইসা স্বাধীনতার কথা বলে প্রায়ই। কিন্তু ও-ও এবার থানিকটা অন্ততঃ মেনেছে যে, প্রযুক্তিকে নিচু দিকে রাখছে। দেওয়ার নামই স্বাধীনতা নয় : ওতে ক'রে খতিয়ে লাভ হয় শুধু পরাধীনতাই। নইলে ও পড়ে বাটনের মতন একজন অতি-সাধারণ প্রমোদবিলাসী মানুষের কবলে—যে-লোক উদ্বাসনার বশে এক মুহূর্তে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান হারায়! কি জানি কেন—সেদিনকার তুর্কীলতার মানি ও কোনোটাই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। এতে কোথায় একটা বড় রকমের বা থেয়েছে ওর মায়ামণী। এক একটা ঘটনা মনকে এমনই অতিভূত করে—না? এ-ফেন বাটনের জন্ত আমাকেও ছাড়ার কথা যে ওর মনে হয়েছিল—এটা ও ভুলতে পারছে না কোনোটাই।

“আমার সঙ্গে তুলনা” ক’রে বাটনকে এ-ভাবে ছোট বলার অহংকার প্রকাশ করা হচ্ছে হয়তো। কিন্তু তা হোক, জীবনে—এমন সময় আসে যখন নানা জিনিষকে গোড়া থেকে বিচার ক’রে দেখতে হয়, যে-সময়ে নিজেকে বাড়াবাড়িরকম দীন ব’লে মনে নিলে হিসেব মেলে না। তা ছাড়া বাটনের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি যে আমি শুধু নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতে তা-ও তো নয়। আমি দেখাতে চাচ্ছি যে, যে-আমার প্রতি ওর উদ্বাস ভালোবাসা ওকে পথে বসালো বললেই হয়—সেই আমার পরিপূর্ণ প্রেমের প্রতিদানও ওকে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারল না তো—বীথতে পারল না তো! (দেখ, একথা স্বীকার করতে আমার আত্মদায়ের বা লাগলেও সমানই অকুণ্ঠ স্বীকার করছি।) কিন্তু কেন পারল না? কদিন ধরে অনবরত তাবছি—আখাল পাখাল।

“ভেবে ভেবে কেবল আজকাল আরও বেশি ক’রে মনে হচ্ছে যে, আমলা বড় বেশি রকম আঠেপিঠে বড়,—বড় বেশি রকম পরাধীন নানা অদৃষ্ট শক্তির কাছে—বাসের পথে কর্তৃত্ব অর্জন করতে না পারলে

‘প্রেম প্রেম’ ক’রে উজ্জ্বল হ’য়ে দাঁড়ায়—শুধু কবিতা। কেন না প্রেমেরও পূর্ণবিকাশ নির্ভর করে এইসব অদৃশ্য শক্তির উপর কর্তৃত্ব-অর্জন করার ওপর। নইলে ইসাবেলার মতন একটা প্রবৃত্তি থেকে আর-একটা প্রবৃত্তির অপলক চূর্ণতরঙ্গের দোলার দোলার ভেসে বেড়ানোই হয় সার—যা যুরোপের দাম্পত্য-সম্বন্ধে নিতাই দেখা যায়। প্রেমের নাম ক’রে সিংহনাম করতে এদের সমকক্ষ জাত বোধ করি জগতে মেলা ভার অথচ কোন্ জাতের নরনারীর মধ্যে প্রেম এত অস্থির, এত ভঙ্গুর, এত দুঃখময় বলতে পারো ?

“কিন্তু না স্বপন, এখানে আমি ব্যক্তিগত কোভকে একটু বেশি প্রাঙ্গণ দিয়ে থাকব। বার্টনের দল নেই কোন্ দেশে ?

“না, ওটাও কোভের কথা হ’ল বৈ কি একটু, যেহেতু বার্টন অসংখ্য হ’লেও ভিতরে ভিতরে ইসাকে কতখানি ভালোবাসে আমি সত্যিই জানি না। কিন্তু তাই ব’লে এটা নিশ্চয়ই আমার কোভের কথা নয় যে, তপাকথিত প্রেমের প্রকৃতি সব দেশেই চকলা হ’লেও এদের দেশের মানুষ প্রেমকে না চিনে, না জেনে তাকে নিরে বস্ত মাতামাতি করে অস্ত্র দেশে তার সিকির সিকিও করে না। অস্ত্রতঃ আমাদের দেশে ও ভারতবর্ষে যে করে না একথা বোধ হয় তুমি আমি হলপ ক’রে বলতে পারি। নয় কি ? —হয়েছে কি, তুমি আমি—ধানিকটা ওরিয়েন্টাল ব’লেই বোধ হয় বিশ্বাস করি না যে, প্রেমের সব চেয়ে বড় সম্পদ—তার এই মানকতা ও নিত্য-নূতন চমকপ্রদতা। কিন্তু ইসাবেলাকেই দেখ না : ও এদেশের অনেক মনোহারিণী মেয়ের বেশ ভালো নবুনা বটে তো ? ও ভালোবাসতেও জানে—বুদ্ধিমতীও। কিন্তু তবু প্রেমের কাছে ওরা চার কী ভেবে দেখেছে কি ? শান্তি ? হারিষ ? পরিতৃপ্তি ? কিন্তু ছাতি ?—না তো। চার—বিদ্রাবালা, গর্জন বর্ষণ, উজ্জ্বল, বর্ণ-বৈভব ও সর্বোপরি অক্লান্ত

ঠিক চাওয়ার-মতন-জিনিষ চাইতে শেখেনি—তেনি প্রেমের কাছেও। কাজেই শুধু যে এসভ্যতার মাহুষেরই হয়েছে অবনতি তাই নয়—প্রেমেরও হয়েছে অধোগতি। অন্ততঃ প্রেমের কাছে এরা অবুঝের মতন এমন সব উদ্ভট জিনিষ চাইছে যা দিতে প্রেম একেবারেই অপারগ—শুধু অপারগ নয়—যা দিলে প্রেমের মহিমাই লুটোয় ধুগায়—যেমন চমক উত্তেজনা ওঠাপড়া। কিন্তু তবু তা-ই এরা চায়—আর সেইজন্মেই না এত হাফাকার এদেশে এই প্রেমের ক্ষেত্রে। ইসাকে কালই তাই ঠাট্টা ক'রে বলছিলাম : 'ইসা, রাগ কোরো না, আমাদের সভ্যতার বাণী একটু দুর্বোধ্য যদি মেনেই নিই—তা হ'লেই বা কী ? তোমাদের প্রফেটের বাণী দিয়েই যদি তোমাদের সভ্যতাকে বিচার করো তা হ'লে কি তোমরা পরীক্ষায় পাশ করো ?' ও বলল : 'কী বাণী ?' আমি বললাম : 'গাছকে তার ফল দিয়ে বিচার করার বাণী। বলবে কি, তোমাদের বৈচিত্র্য-বীজে তোমাদের হাজারো বসিনা-বনস্পতিতে ফলছে লাথো লাথো অমৃতফল ? না, বলবে : বাট'ন তোমাকে যে-অপক্লপ সম্পদ দিয়ে গেল তার জন্তে তুমি ওকে আমরণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে ?'

"চিঠিটা ভাই মন্ত হ'য়ে গেল, তবে মনটা এত ভার আছে যে কমা করবে নিশ্চয়ই—এমন কি যদি তোমাদের উভয়ের বর্তমান জীবনের দোতল-দোলায় সুরতালের সঙ্গে এর সুরতাল না মেলে—তা হ'লেও।

ইতি তোমার মেহাগী চাঃ"

## অদৃশ্য বাণী

অনেককণ দুজনে চুপ ক'রে রইল। চিঠির শেষ কয় পাতা পড়তে পড়তে বশল অজ্ঞতব করছিল আনার আঙুলের চাপ স্রব হ'য়ে আসছে।

একটা সামান্ত চিঠিতে ওরা দুজনেই কী ভাবে যে লাড়া দিল! সামান্ত একটা চিঠি!... স্বপন ভাবে!—কত কথাই যে!

হঠাৎ আনা উঠে সমুদ্রমুখী বালকনির রেলিঙে হেলান দিয়ে চেয়ে থাকে ধূ-ধূ জলরাশির দিকে। স্বপন একটু ইতস্তত ক'রে উঠে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

\* \* \*

স্বপন কি ভেবে আনার পিঠে হাত রাখে।

আনা চমকে তার দিকে তাকায়। ওর মুখে রক্তের লেশও নেই। স্বপন ঈষৎ উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে : “কী আনা, শরীর খারাপ মনে হচ্ছে না কি?”

“না তো”—ব'লে আনা মুখ ফেরায়।

স্বপন তার কটি-বেঠন ক'রে নিজের দিকে টানল।

আনা কোনো কথা না ব'লে শুধু তার বেঠন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নেয়।

স্বপন ঈষৎ আহত বোধ করে কিন্তু বোধে : “কী ভাবছ আনা?”

নিষ্কূপ।

স্বপন জোর ক'রে মুখে হাসি টেনে এনে বলে : “চাত্তর জীবনের অভিজ্ঞতা তো সবাইকারই জীবনের একেবারে সাব্যস্ত হয়নি।”

আনা একটু চুপ ক'রে থাকে, পরে হঠাৎ বলে : “তা না হ'তে পারে, কিন্তু—আচ্ছা, একটা প্রশ্নের সত্য উত্তর দেবে স্বপন?”

স্বপনের বুকের মধ্যে যুগপৎ একটা আশা ও ভয়ের স্পন্দন ওঠে বেজে ... বলে : “কী?”

—“আমরা কি প্রেমের কাছে এমন ‘উটুট জিনিষই’ চাই যা দিতে প্রেম অপারগ ?”

—“ওটা চাওঁর কথা, মনে রেখো।”

—“অমন ক’রে সোজা উত্তর এড়িয়ে যাও কেন স্বপন ? আমি যে চাওঁর এ-বিজ্ঞ দার্শনিকতায় তোমার মস্তব্যই শুনতে চাইছি। পুরুষেরা না সত্য বেশি বলতে পারে ?”

এ-তিরস্কার স্বপনকে বেঁধে, সে একটু চুপ ক’রে থেকে সন্কুণ্ঠে বলে :  
“আমার মনে হয় ওখানে চাঃ একটু বাড়িয়ে বলেছে—তার যুরোপীয়া প্রণয়িনীর প্রতি কোভের দরুণ।”

—“মানে ?”

স্বপন এবার তার ইতস্তত ভাব চেপে একটু জোর ক’রেই বলে :  
“আমার মনে হয় যে, প্রেমের কাছ থেকে প্রাচ্যও অমনি অপ্ৰাপ্য জিনিষই চায়।”

—“ভূমিও ? সন্ধ্যাও ? পবম্পরের কাছ থেকে কি তোমরা কিছুই পাওনি বলতে চাও ? না, প্রেমের মধ্যে যা পাওনি সেটা এতই বড় যে যা গেলে তা হ’ল না-মজুর ?” বলতে বলতে আনার স্বরে উত্তাপ জমে ওঠে, সে বলে : “প্রেমের সব দানই কি একটা ছারাবাজি ? যত কিছু দান অস্বীকার বন্ধনাসার ?”

স্বপন মুখ নিচু ক’রে থাকে। আনার মনঃপূত উত্তর ও দেবে কী ক’রে ?

আনার চোখ চিক চিক ক’রে উঠল : “মাক কোরো স্বপন—এতটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন—”

স্বপন ব্যত হ’য়ে বলল : “কেন অমন টোনে কথা বলছ আনা ? ভূমি কি আমার এতই পয় যে, এ-প্রশ্ন করতেও এত অন্ততপ্ত হ’তে হবে ?”

আনা চকিতে তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে কোমলকণ্ঠে বলল : “বলো তবে।”

—“কী বলব বলো?”

—“তোনার কী মনে হয়। নবনারীর প্রেমের শাখায় চিরদিন কি কেবল বিষফলই ফলেছে—আনন্দের কোনো উদ্ভাসই মেলেনি?”

স্বপন বিপর বোধ করে ফের : “প্রশ্নটা কঠিন আনা—”

আনার মুখের উজ্জলতা মুহূর্তে মেলে যায় ঢেকে, সে স্বপনের হাত ছেড়ে দেয় : “স্বপন, যাও তুমি পারিসে কিরে—আজই—এখুনি।”

স্বপন আহত হুঁরে বলে : “সে কি আনা?”

আনা কঠিন জুরে বলে : “হৃদয়ের সহজ সঞ্চকে এতটুকু কৃতজ্ঞতা জানাতেও বে-দার্শনিকের এত কুণ্ঠা তার কেন এসব প্রেমিক সাজার বিড়ম্বনা?”

স্বপন কশাহতের মতন একটু স’রে দাঁড়াল—মুখ কিরিয়ে। এ-রকম তীব্র ভৎসনা সে কখনো শোনেনি কারুর কাছে—আর এত অকারণ!...

সবুজের বকের উপর একটা আলোছায়ায় নটনোৎসব—সমুজ্জল! কাছে সাদা পাখা মেলে এক ক’ক পাখী পরিক্রমা করছে একটা নোকোকে। জলের তিনটে অংশে তিনটে স্পষ্ট রঙের দীর্ঘায়ত দীপ চলেছে ভেসে। কাছেই পাটল, তার পরেরটা নীলাভ, তার পরেরটা সবুজ। সবার পরে একটি দিগন্তবিত্ত রক্তাভ উত্তরীয় বিকম্বিক করছে। ...কিন্তু আলোর এ অকুণ্ঠ দাক্ষিণ্যসত্ত্বেও স্বপনের মনে হয় যেন একটা কল্প পরিঘণ্ডল তার আবছা ছায়া কেলে দাঁড়িয়ে—এ-উজ্জল ছবিটির সমুচ্চ। কিসের? বেদনার? বৈরাগ্যের?...

আনা হঠাৎ কাছে এসে স্বপনের হাত ধরে : “কম্বা কম্বো স্বপন।”

স্বপন তার দিকে তাকাতেই আনা বর বর ক'রে কেঁদে কলে । ..  
হু'হাতে লুকোর মুখ ।

## আড়াল

আরও দু সপ্তাহ কেটে গেছে ।...

ওদের মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যবধান এসে গেছে । কাপসা অথচ এমন দৃষ্টিগম্য !—মানে, যুক্তির সাদা চোখে দেখা না গেলেও এবেদনার স্পর্শালু স্বকে । আর এ-আঘাতে এত তীক্ষ্ণভাবে বাজে যে, আশ্চর্য্য বোধ হয় বর্ণনা করা যায় না কেন ! ..স্বপনও ভেবে পায় না—কেন ?

আনাও একদিন ঐকটু আত্মা দিয়েছিল সমুদ্র-তীরে বেড়াতে বেড়াতে । বলেছিল : “খুব একটা ছোট ঘটনাও উপলক্ষ্য হ'য়ে জীবনকে” কি একটা দুর্কোণ্য দিকে এমন হঠাৎ ঠেলে দিতে পারে, না স্বপন ?”

কিন্তু এ-ছাড়া খোলাখুলি মনের কথা আর হয়নি ওদের মধ্যে ! হয়তো বা কোনো অতর্কিত অংশে ইঙ্গিত করেছে একপক্ষ—কিন্তু অপরপক্ষ ঠিক সেই মুহূর্তে সাড়া দিতে পারেনি । আবার সে-পক্ষ যে-সময়ে এ-অক্ষমতার অন্তে অনুশোচনা বোধ ক'রে এসেছে এগিয়ে—ততক্ষণে এ-পক্ষের দৃষ্টি-দুরার অভিমানে গেছে প্রায় বদ্ধ হ'য়ে । “There is a tide in the affairs of the heart...” স্বপন মনে মনে আবৃত্তি করে মাঝে মাঝে বিবাদ-বিলাসে ।

মাঝে মাঝে এ-বিলাসও কিন্তু সর না বেন আর ! স্বপনের এত কষ্ট হয় !...আনারও দান-মুখে এ-ব্যথার ছায়া এতই ঘনিষ্ঠে ওঠে !...কিন্তু বেকন্যাটা ঠিক কিসের ? স্বপন কুলকিনারা পায় না । সত্যিই কি

আনাকে সে ভালোবাসে তাই—? না, আনার কাছে যা চেয়েছে তার প্রতিদান পায়নি তাই—?

কিন্তু প্রতিদান দিতে তো আনা চেয়েছিল। ওর মেজাজ যে এত চকল অনিশ্চিত হ'য়ে উঠেছে এজ্ঞে কি স্বপনের সদাসঙ্গাগ কুঠাই দায়ী নয়?

দায়ী—সে? ভাবতেও কোথায় তার বাজে। না—গ্রহণ ক'রে মূল্য দিতে পারবে না ব'লেই না—কিন্তু এ-প্রবোধকে সে নিবৃত্ত করে। এ তো সত্য নয়—এ বাকাবিলাসী বর্ণনাকোশল বৈ আর কীই বা? স্বপন রান হালে। মনে প'ড়ে যার তাকে চাং বলতো প্রায়ই নীটসের ছুটি লাইন :

উর্দ্ধব্রতী বিহঙ্গ যে নচে

শৃঙ্গাসন তার কভু সহে!\*

মাত্র কি অনাবৃত সত্যের তুঙ্গ শিখর চায়? না, সেখানে কোনো মতে হঠাৎ উত্তীর্ণ হ'লে তুঙ্গও বাচতে পারে? না; মিথ্যার স্নিগ্ধ উপত্যকাই তার স্বস্তিপীঠ—শৃঙ্গাসন নয়। এই দেখ না—সে ভাবে—সেদিন আনা ব্যালকনিতে কি এই প্রগল্ভই সোজা হুজি করতে চায়নি? কিন্তু সে তো সত্য উত্তর দিতে সাহস পায়নি যখন আনা এই প্রগল্ভ করেছিল যে, তার কাছে ও এমন কিছু পেয়েছে কি না যাকে ও বধ্যাদা দিতে রাজি? প্রেমের শাখার কি শুধু বিবকলই ফলে!...কত সময়েই না আনার এ-প্রগল্ভ তার মনের মধ্যে ঘোরাকেরা করেছে!...স্বপ্নেও দু-একদিন। একদিনের স্বপ্নের কথা তার ভাবতে কষ্ট হয়—যখনই মনে পড়ে তখনই। স্বপ্নটি সে ঘেথেছিল—নৌকাবিহারের পরদিনই : যেন

\* Und wer kein Vogel ist, soll nicht  
über Abgründen lagern. Zarathustra



আনা ও সে জাহাজে চড়ে যাচ্ছে ইঞ্জিনে বেড়াতে। জাহাজে ওদের এক কেবিনেই দিয়েছিল শুলে। স্বপন হঠাৎ ঘুমন্ত আনার হাত ধরতেই সে জেগে উঠে বলে : “আমি সন্ধ্যা নই স্বপন। আমাকে ছুঁলে তোমার অকলঙ্ক শাখার বিবকল ফলে যদি?” তার ঘুম ভেঙে যায়। স্বপ্নে অমৃতত ভরই হয় অত্যন্ত বাস্তব—কিন্তু বেদনাও যে মনের পাষণ-ফলকে তার বিষাদ-চিহ্ন এ-ভাবে উৎকীর্ণ ক’রে রেখে যেতে পারে তা স্বপন কবে ভেবেছিল? তার কেবলই মনে হয় আজকাল : “কী চাওয়া উচিত তা হ’লে প্রেমের ক্ষেত্রে?” চাঙের চিঠিটা এর মধ্যে কতবার যে পড়েছে! আর যতই পড়ে ততই তার বুকের মধ্যে কোথায় বেজে ওঠে তার শেষ পাতার কথা কয়টি : বে, মানুষ শুধু যে মানুষের কাছে চাইতে শেখেনি তাই নয়—প্রেমের কাছেও কী চাইতে হয়, কেমন ক’রে চাইতে হয় আবিস্কার করতে পারেনি আজ অবধি। চাঙের এ-আক্ষেপ কি অতিরঞ্জন? তাই কি? আনা একদিন মাত্র এ-প্রসঙ্গ সামান্য তুলেছিল। বলেছিল : “স্বপন, মরিস আমার কাছে কী চেয়েছিল বলো তো—যা পেয়ে একদিন সে খুঁসি ছিল, কিন্তু ছদ্মি যেতে না যেতে আর তৃপ্তি পায়নি?” স্বপন বলেছিল : “কিন্তু সে তো বলে : তোমাকে আজও ভালোবাসে।” আনা রান হেসে শুধু বলেছিল : “এ-ও তো তার আত্মকের মনোভাবের নতুন একেহার স্বপন। কালকের মন যে সম্পূর্ণ উলটো একেহার দেবে না তা কে বলতে পারে!”

এ-আলোচনার অগ্রসারী শ্রোতকে স্বপন সে-সময়ে দন্তর্ক নীরবতার বাঁধ দিয়ে করেছিল প্রতিহত। কেন না এটা সে বেশ বুঝছিল যে আনা মনে প্রাণে চায় এই ব্যবধানের বাঁধকেই ভাঙতে—তারই মতন আন্তরিক উদ্যম ভাবেই চায়।...অথচ উদ্ভ্রমে এ-আত্মালকে অপসারিত করতেও আবার বাধা দেয়। এ-আত্মবিরোধের কোথায় দিশা? কোথায় যে

দূরত্ব এসে গেছে!...অজ্ঞাতে!...সেই নৌকাবিহারের চুখনপার্কের পর থেকেই। কেন এমন হ'ল? আনা একদিন সিনিক হাসি হেসে বলেছিল : “স্বপন, নীরার একটা কথা আজ আমার কেবলই মনে পড়ে।” স্বপন একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বলেছিল : “নীনার?” আনা বলেছিল : “হাঁ, সময়ে সময়ে সে বড় সুন্দর উপমা দিত। সে বলেছিল আমাদের একদিন ঠাট্টা ক'রেই : যে, প্রণয়ী প্রণয়িনীর প্রকৃতি অনেকটা বিলিয়ার্ডের বলের মতন—ছোটো বল পরস্পরকে নিশানা ক'রে ছোটো কেবল ততক্ষণই যতক্ষণ না পরস্পরকে ছোঁয়। ছোঁয়ার পরমুহূর্ত্তেই ওদের একমাত্র সাধনা হয় কী ক'রে পরস্পরের কাছ থেকে যাবে দূরে স'রে!”

## দোমনা

হঠাৎ তার আসে! এ কী! স্বপনের বুক ওঠে ঢুলে! সন্ধ্যার তার! পোর্ট'লেড থেকে! এ বে অভাবনীয়! তরুণই সে পৌঁছবে মার্সেল্‌সে! আর কী লম্বা টেলিগ্রাম! ঘটা ক'রে টেলিগ্রাম করা যাকে বলে। বোধ করি টাকা চল্লিশ লেগেছে। চিঠি বিশেষ বে!... সন্ধ্যাই বটে—সে না হ'লে এমন খেরালিনীর মতন দম্কা টাকা খরচ করবে আর কে? লিখেছে : সে বড়দর ক'রেই বাড়ীর সবাইকে তার যুরোপবাসীর কথা গোপন রাখতে বাধ্য করেছিল—ওকে চম্কে দিতে। দিল বৈ কি চম্কে! মানতেই হবে। সাহস আছে বটে। কোথাকার কে এক কবাসিনী কাকীমা—তাকে সহযোগিতা পেয়ে—আর আশ্চর্য্য!—অমন পৌঁড়া স্বত্ত্বকে রাজি করিয়ে, তাকে কানী পাতিয়ে। টেলিগ্রামে আরও অনেক কথা ছিল—কিন্তু স্বপন মন দিয়ে পড়তে পারল না সে-সব। একমুঠে চেয়ে রইল সমুদ্রের পানে।

সেখানে প্রবোধের শাবিছারা বনিয়ে আসছে। কিন্তু জলের বুক তাকে চায় না—অতিমানে কালো হয়ে ওঠে আলোর বিপক্ষে। পশ্চিম দিগন্তের কাছে একটি সারে তিনটি তারা। কী সুন্দর চাইনি—ত্রীর! —যেন বলে : “কেমন? তোমরা অজ্ঞানতার ডেলুড না অঘটনে বিশ্বাসই করো না—বলো : the age of miracle is past? হ’ল তো?” অন্ধুর পাহাড়ের গায় এখানে-ওখানে একটি দুটি ক’রে গৃহীণ উঠছে অ’লে! আনন্দ? কিন্তু তার সঙ্গে এবাবার মেঘ ভেসে আসে কোথা থেকে! বাধা?—ঈ, বাধা বৈ কি—আর অস্বীকার ক’রে কী হবে—সে আনিকেও ভালোবাসে। জোর করে “না” বলে ভালোবে কাকে? সত্যকে!—দূর। যে হুঁশিরা—প্রেমের প্রতিদান না পেলে কথার মিটে তার তুকা? মিটেতে পারে কখনো? তা ছাড়া ইলানীঃ তার চিত্রিশরের লায়-লালা ভাবেও কি সে গোয়েনি? তার স্বপ্ন সঙ্কলনের আলোর? তবে? তবে কি নিজেকে ভালোতে চায় সে? হঠাৎ সে ভবে ওঠে। নিজেকে ভালোবেই বা সে কী চাখে? যদি তার মন দুজনের প্রতি হুতাবে সাজা হের তাতে অগোচরের আঁচ! কিং কোথায় থচ্ থচ্ ক’রে বাজে যে তবু! ‘সাজা’ মানে? ভালোবাসা?—যেমন ইলাবেলা চাং ও বাটনকে ভালোবাসল একসঙ্গে। এ-চিন্তায় সে আরও আঘাত পায়। কখনো না...আমি কি বাটনের মতন উজ্জ্বল! না, কখন ইলাবেলার মতন চপলমতি? জাপে আত্মপ্রসাদ। যোগেনে অর্থের অভাব না-থাকা সত্ত্বেও কবে সে মানিকর জীবন বাপন করেছে? না; সে দুজনকেই ভালোবাসে ভালোবাসে ভালোবাসে।—কিন্তু বত জোর দিয়েই ‘ভালোবাসে’ কথাটি সে উচ্চারণ করুক না কেন, দুজনকে ভালোবাসে ভারতও আবার কোথায় বাধা বাজেই!...এ কি তার সংস্কারমত, না এর মধ্যে

কোনো সন্তোর ইচ্ছিত আছে বার স্পর্শ না-পাওয়ার মতবই এই দেখনা ?

তরুণই মাসে'লসে সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা হবে !

তার বা দুপুর তিলটা মনে পড়ে বার—হঠাৎ ! তার পূর্ণায়তা স্নেহতা ! কী সুন্দরী সে ! তার এসো চুলের গন্ধ ! তার বুকের সমস্ত রক্ত আছড়ে ভেঙে পড়ে তার বাসনার উপকূলে । সন্ধ্যাকে এত কাছে পেতে ইচ্ছে হয়—এই বুঝতে !—তার যেন আর সর না । কিন্তু ওই ওই সে বাসনার তীব্রতার ভীতি পড়ে—আনার হুঁত্রে এসে দাঁড়ায়— যেন বলে সন্ধ্যাকে : সরো !— হঠাৎ কোরে আঘাত হয় । চমকে ওঠে ও ।

—“কে ?”

—“আমি ।”

—“এসো আনা ।”

## বীরার গল্প

বিজুলি বাতির ঝাড় ওঠে অ'লে । আনাকে এত পাতুর দেখায় ! ওকে এত রক্তকীন তো সম্প্রতি কখনো দেখেনি ! মনটা আট হ'য়ে ওঠে নিবিড় কারাগারে । একটু উৎকর্ষাও আসে ।

—“বোসো আনা”, ব'লে উঠে দাঁড়ায় সে । তার কণ্ঠস্বরে যেন কোমলতার ঢল নামে ।

—“ব্যস্ত ছিলে ?”

—“না—কেন ? বোসো না । ওখানে না, এই সোফার বসি এসো ।”

—“না থাক । আমি একটা সরকারি কথা বলতে এসেছিলাম ।”

—“বেশ তো—কিন্তু দাঁড়িয়ে কেন ?”

—“একুশি ঘাব শুতে।”

—“এত সকাল সকাল ? সন্ধ্যাও হয়নি যে।”

—“একটু ক্লান্ত লাগছে।”

স্বপন উদ্বিগ্নস্বরে বলে : “হয়েছে কী ?”

—“এমনি। একটু ঠাণ্ডা লেগেছিল না কাল ?”

—“তবু ভালো—কিন্তু না, ও হবে না। বসতেই হবে এখানে।”

বলে স্বপন আনার হাত ধরতে যায়।

আনা তার উজ্জত বাহ এড়িয়ে বলে : “আচ্ছা আচ্ছা বোসো, বসছি।” বলে স্বপনের থেকে বেশ একটু দূরত্ব বজায় রেখে বসে তার ডাইভানের উপাঙে। স্বপন আহত বোধ করে, কিন্তু কিছু বলে না। এর পরে আর এগুনো যায় না। ঠিক কি এই সময়েই যা দিতে হয় শাস্ত্রকে ? আনা যদি জানত...

\* \*

—“এত অসম্মত কেন ?” নিস্তরতা ডাঙবার কষাই খুঁজে পায় না সে।

আনা হোর‘ক’রে হেসে বলে : “কই ?”

—“বাঃ—কী দরকার বলছিলে না ?”

—“ও হো”—বলে আনা মুখ নিচু করে হাসে একটু।

\* \*

—“কী ব্যাপার ?”

তবু আনা নিস্তর।

স্বপন চূপ করে থাকে। একটু রাগও হয়। এ বেশ অভিনয় মতন!...সন্ধ্যা এ রকম করে না কথ'খনো।

আনা নিজে থেকেই কথা কর আচম্কা : “আমি কালই নীরার কাছে যেতে চাই।”

স্বপনের বৃকের মধ্যে কোথায় মোচড় দিয়ে ওঠে। বাক'ক্ষুষ্টি হয় না খানিকক্ষণ। রাগ হঠাৎ শব্দায় রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে—মুহূর্তে! আনার মুখের 'পরে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নেয়, পরে বলে : “সে কি?”

আনা তার বৃকের মধ্যে থেকে একটা চিঠি তার হাতে দিয়ে বলে : “নীয়ার চিঠি, পড়ো টেঁচিয়ে, আমি ভালো পড়তে পারিনি—চোখের—জলে।”

\* \*

“প্রিয় আনা,

আমি এখন তোমার খুবই কাছে মার্সেল্‌সের উপকণ্ঠে একটি প্রাইভেট maison de santé-তে \* আমার একটি মেয়ে—আনেং হয়েছে—হয়ত মসিয়ে বেনারের মুখে শুনে থাকবে।”

\* \*

মুখ তুলে স্বপন জিজ্ঞাসা করে : “সে কি? তুমি তো আমাকে বলোনি এ-খবর?”

\* অল্প হ'লে খবী অনেকও এ-রকম প্রাইভেট ব্যারোগ্যালয়ে থাকেন ক্রান্ত—টাকা দিয়ে। স্বপ্নের চেয়েও গুজবের ব্যবস্থা এ-সব হলে বেশি ভালো।

আনা সমুদ্রের দিকেই চেয়ে বলল : “আমি জানতাম না এয় কিছুবিসর্গও। মসিরে বেনার বোধ হয় ইচ্ছে ক’রেই গোপন করেছিলেন। কিন্তু পড়ো।”

\* \* \*

“আমার শরীর খুবই শায়াপ। আনেও বাচে কিনা সন্দেহ। এখানে মসিরে বেনারই এক রকম আমাকে জোর ক’রে পাঠিয়েছেন। নীলে এত ভালো টাইলে লাক। আমার সাধারণত হ’ত না।”

\* \* \*

আনা বলল : “এ-কথাও মসিরে বেনার আমাকে গোপন করেছিলেন।”

—“কিন্তু কেন?”

—“ঐ তাঁর স্বভাব। কত লোককে যে তিনি বাচিয়ে রেখেছেন, অথচ চান বাইরে তাঁর কৃপণ নামই রটে।”

\* \* \*

“এখানে আছি আমি খুবই ভালো বায়গায়—সামনেই সুন্দর বাগান, তার পরেই বিড়িয়ে—সমুদ্র—কী নীল! দখটে অর্থ দিচ্ছি ব’লে নাস’রা অপব্যাপ্ত মত্তও করছে; কিন্তু আমার মনে শান্তি নেই। আমার নিজের কাজে নয়। তোমাদের কাজে। কী যে শূন্যের মতন তোমাদের বাস্তবতা হৃদয়ের মধ্যে এসে প’ড়ে সব ছারখারে দিলাম!...

“কিন্তু আক্ষেপ জানাতে এ-পত্র লেখা নয়। মসিরে বেনারের কাছে তোমার ঠিকানা নিরেছিও অনেক কষ্টে—তোমাকে অকারণ নিজের দুঃখ

জানাব না অস্বীকার করে—তবে। কিন্তু এ-শপথ করিয়ে নেওয়ার তাঁর দরকার ছিল না...হুঃখ জানিয়ে কবে কার দুঃখের নিরসন করেছে বলো? যা হয়েছে তা তো আর কি হবে না। অতীত স্থাপু... স্থির!...

“আমি বলি শুধু একটা কথা। নরিস তোমাকে সত্যিই ভালোবাসে। তার চিঠি পেয়েছি আরই। যদি আমি ম’রে ঘাই তবে সে আমাদের শিশু কন্যার তারও নেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—যদি কেবল তুমি ফিরে যাও তার কাছে। সে যে আমাকে ভালোবাসে না, তার চরম প্রমাণ তো এ-প্রতিশ্রুতি থেকেই পাচ্ছ?—কিন্তু এর চেয়েও বড় প্রমাণ আছে : আমাকে সে কাতরভাবে অশ্রুবেশ করেছে তোমাকে বোঝাতে। সে লিখেছে—আমি বললে তুমি বিশ্বাস করবেই।

“আমি তাই বলছি—অকুণ্ঠেই—তুমি ফিরে যাও। আমি নিশ্চয় জানি নরিস কোনোদিন আমাকে ভালোবাসেনি, যদিও আমি তাকে সমগ্র গ্রাণ মন দিয়ে ভালোবেসেছিলাম—নারী পুরুষকে বহুখানি ভালোবাসতে পারে। কিন্তু আমার দেহকে পেতে না পেতেই তার জুখা মিতে বার। অসামান্য কবি যে! আমার মতন সামান্যের মধ্যে কী পাবে বলো? তাই তাকে আমি একটুও দোষ দেই না।

“কিন্তু তুমি অসামান্য। বিশেষ করে তোমার তেজবিতার সে মুখ। তা ছাড়াও তোমার প্রতি কোথায় তার একটুখানি সত্যিকার টান আছে। নইলে তার পৌরুষ-গর্ভকে এ-ভাবে জলাঞ্জলি দিয়ে আমার কাছে সে ছুঁবে কেন বলো? তার মতন আত্মসমর্পণ মাত্রের পক্ষে আমার কাছে এ-মিনতি জানানো যে তার পক্ষে কতখানি মানিকত তা তো বোঝো? সর্বোপরি, মনে রেখো : জ্ঞাতে সে কবি—সব সত্যিকৃতাকেই আত্মবিকারের ইচ্ছা হিসাবে গ্রহণ না করেই পারে না :



এ-হেন প্রকৃতি-নিষ্ঠুর মানুষ একটু সত্যিকার টান না থাকলে এত কষ্টের  
করতে পারে কখনো? কেন করতে বাবে বলো?

তার উপর ক্ষোভবশে একথা বলছি ভেবো না। সাধারণ মানুষের  
মমতা কবিরের জাতের মধ্যে আশা করাই যে বিড়ম্বনা। কণিকতার জন্তে  
বিদ্যাহকে অভিসম্পাত দেবে কে? কণিক বলেই না সে চোখ-ধাঁধানো?  
তাই না সে বিদ্যাহ? মেঘের শুভঙ্করী ধারার অবিশ্রাম স্থায়ী বিদ্যাহকের  
পাশে নয়, তার বিকাশ—সজ্বাতের সুললিতপথেই। মাক-সবুজের  
নিরন্তর স্থলীল শাস্তি কি কূল মাতানো ফেন-কিরীট চির-চলিছু চেউয়ের  
কাছে আশা করে কেউ?

না—সত্যি বলছি, দুঃখ আমার আছে, কিন্তু ক্ষোভ নেই আর।  
তবু আমি বলব এ-কণিকের পাওয়াও সার্থক। এ-হেন মানুষ আত্মকেন্ত  
হয় চোক—স্বন্দর তো। আর ভেবে দেখলে আত্মকেন্ত বলেই বা দুঃখ  
কেন? আত্মকেন্ত না হ'লে কি তারা পারত কবি হ'তে? না  
বিরক্ত উপাদানকে আত্মসাৎ করে তবে কবিত্বদয়ের মননদণ্ডে ওঠে।  
বাঁটার শুভ্রতম সমিধকেও তারা নিজেদের দীপ্তির খোরাক করে নেয়।  
তাই এরা কাউকে না হি ভালোবাসল। অপরের ভালোবাসা হবি দিয়ে  
তাদের সৃষ্টিক্ষেত্র হোমকুণ্ডে রচনা করে। এটা যে একটা মস্ত  
কাজ। নয়?

আর একটুকে জানিয়ে রাখতে অনেক প্রাণহবিরই দরকার।  
আমরা সেই হবি। রাগ কোরো না জানা—ভূমিও। কারণ ভূমি  
কতই তেজস্বিনী হওনা কেন—সৃষ্টিপ্রতিভা তোমার নেই—ভূমি যে নাগী।  
পুরুষকে ভূমি পৌরুষগোরব দেবে এইতেই তোমার চরম সার্থকতা। এটা  
অপোরবের কাজও নয়। জল বীজ নয় বটে, ফলও না—কিন্তু জল নইলে  
বীজ বনস্পতিতে পরিণত হয় না—বনস্পতি—কলে। তোমার তেজস্বিতা

বদি মরিসকে আকৃষ্ট ক'রে থাকে তবে সেই তো তোমার নারীস্বের চিরজীবী বিষয়-তিলক। তোমার আত্মদানের সিকনে বদি তার শাখার ফলফুলের প্রেরণা জোগায় তবে সেই তো তোমার চরম আত্মোৎসর্গ। স্বীকার করি এ সৃষ্টি-কাজ—গোপভাবে—মুখ্যভাবে নয়। তবু এ সৃষ্টিরই কাজ। তা ছাড়া যা সত্য তাকে যেনে নেওয়ারই ভালো নয় কি? অনেক মিথ্যা-আশার দরুণ অপচয় নিবারণ হয় ওতে। দুঃখ চের ভালো এ-অপচয়ের চেয়ে। নদীর নির্মল জল সমুদ্রে প'ড়ে হয় লবণাধু—তবু জোর ক'রে সমুদ্রবিচ্ছিন্ন হ'য়ে নিঃস্রোত নির্মলতা বেন সে কামনা না করে। মরিসদের সংস্পর্শে আমাদের মতন মেয়েরা দুঃখ পায় অহরহ—তবু ওরাই হচ্ছে সত্যতার পুরোধা—বৈদম্ব্যের প্রধান হোতা। কারণ ওরা স্রষ্টা। জন্মের জীবন জানো তো? কিন্তু বেচারী জর্জ স্রাণ্ডের জন্মে দুঃখ করে আজ কে? জর্জ স্রাণ্ডের মতন জীবনহাতিরই যে জন্মের দরকার ছিল—জন্মের স্রষ্টা হবার জন্মে। এই আহুতি দিয়েই জর্জ স্রাণ্ড অমর হয়েছেন, নইলে ওঁর উপভাস আজ কে পড়ে বলো? আর ভেবে দেখ, বাবা স্রষ্টার জ্ঞাতি নয় তাদের পক্ষে সৃষ্টির এত বড় আত্মকল্যাণ করার মতন গৌরব আর কী হ'তে পারে? ইসাডোরা ডান্‌কানও বলেছিল শিশুর জন্ম দিয়ে সে বত আনন্দ পেয়েছে হাজারটা শ্রেষ্ঠ নাচ নেচেও তখন আনন্দ পারনি। একথা পুরুষ কখনো বলবে না। নারীর সৃষ্টি?—স্বাতন্ত্র্য?—ও হয় না আনা। সৃষ্টিকে ধারণ করবে, সৃষ্টির প্রেরণা দেবে, সৃষ্টিকে পালন করবে আত্মাহুতি দিয়ে—এই ই বে তার কাজ। তাই না সে নারী।

“আমার অদৃষ্টে এ-গৌরব বদি বিধাতা লিখতেন তবে জন্ম জন্ম এ-আহুতি আমি দিতাম—যতই দুঃখ পাই তবু মরিসকেই চাইতাম। কিন্তু হায়, সে সুখ বিধাতা আমার অদৃষ্টে নেবেননি। কিন্তু তোমার লগাটে এ অমরী-ঈর্ষিত সোতাগাঠিলক রইল আঁকা। তুমি প'রো : ওর

কাছে ফিরে যাও। আমার দুঃখের কথা ভেবো না। আমার দিন  
কুটিরেও এসেছে! এখানে সকলেই জানে আমি এখান থেকে সেয়ে  
ফিরব না, যে কোনো মুহূর্তে আমার এ বার্থ জীবনের অবসান হতে  
পারে। তাই আমি সর্বাঙ্গকরণেই তোমাকে অতুরোধ করছি—তুমি  
মরিসের কাছে যাও ফিরে। কেবল এক প্রার্থনা : যদি কয়েক দিনের  
মধ্যে তার পাও—যে আমার শেষ মুহূর্ত, তবে একবার এসো। একবার।  
তোমাকে শেষবার দেখতে চাই এ আলোছায়ার পৃথিবীকে বিদায় দেবার  
আগে। মরস এসেছিল আমার জীবনে ছায়াবসন্তন; শুধু একা তুমি,  
বাল্যসখী, আলো আমার জীবনে—আলোর অক্ষয় স্মৃতি হয়ে বিভাজ  
করছ। সেই তোমাকে এত ভাল দিয়েছি!—কিন্তু না, এ-পরিতাপেই  
বা ফল কী? মানুষ কতটুকু স্বাধীন বলে—বিশেষ প্রেমের ক্ষেত্রে?  
তা ছাড়া কে বলবে মানুষের জন্মে আলোর তৃপ্তিই বেশি, না ছায়ার?  
সার্থকতার শিখর বেশি উন্মিত, না বার্থতার গহ্বর? আর বার্থতাই  
বা বলি কেন? শূন্যতার নদ্যা, দীর্ঘনিঃশ্বাসের মধ্যে, অক্ষর মধ্যে এক  
মোর কেনই বা—যদি মস্তকস্থ বেদনা শুধু বার্থ, বক্ষ্যাই হবে? সব শেষে,  
এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে আমার কেমন মনে মনে হয় যে, যেকোনো  
অজুতুতি তীব্রতম হওয়াই জীবনের একটা পরম সাধনা। বার্থতার  
অজুতুতিও নিবিড় ক'রে পাওয়া কি কম কথা? বিষ যদি পানই করি—  
আকর্ষণ পান করতে পারলে অমৃতত্বের পৌছব এমন একটা উজ্জল নক্ষত্র-  
দীপ্তি আবারতম মুহূর্তেও ভুলে ওঠে আমার নিরাশার আকাশে। তবে  
হয়তো তুমি এ কথা বুঝবে না। মানুষ করে মানুষকে বোঝে আনা?

ইতি—নীরা

## সঙ্কট

খানিকক্ষণ কেউ কথা কইল না। স্বপন বাইরের দিকে থাকে এক-দৃষ্টে চেয়ে। বাইরের প্রদোষ-নিরাশো আরও ঘোরালো হ'য়ে এসেছে। সে তার তিনটি গেছে ঢেকে। একটা ঝোড়ো মতন হাওয়া উতলা হ'য়ে উঠেছে। সমুদ্রের বাষ্পোচ্ছ্বাস দীর্ঘনিঃশ্বাসের গমকে গুম্বরে গুম্বরে উঠছে। দূরে একটা জাহাজ। তার একটা সিঁড়িতে একসার নানারঙা আলো, ডেকে ছসার। ওখানে বুদ্ধি নাচ গান হচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হয় সকলেই যেন সকলের কাছ-ছাড়া...কেউ কারুর নয়। ঐ জাহাজ হয়তো কালই নীরার আরোগ্যালয়ের পাশ দিয়েই যাবে। তখন হয়তো নীরা আর এ-জগতে থাকবে না। কিন্তু ওর যাত্রীরা তেমনিই নাচবে গাইবে—যতদিন এ-পৃথিবীর বুকে তাদের একটুখানি আনন্দের উদ্ভাস থাকবে—যতদিন তাদের চকল চরণে গতির এক কণা পালের থাকবে। তারপর? সব শেষ! জীবনের এ-অবসানের দিকটার কথা এ-ভাবে কখনো ভাবেনি তো সে!

\* \* \*

আনা জিজ্ঞাসা করল : “কী বলো?”

স্বপন মুহূর্তেরে বলে : “আমি কী বলব?”

আনা পরিহাসের সুরে বলে : “তুমি না আমার অতিভাবক!”  
ক'লেই তুল বোঝে। ওরা যে সে চটুল চপল হাসি ঠাট্টার সম্বন্ধ থেকে কতখানি দূরে স'রে গেছে এ-পরিহাসের আকস্মিক বিসদৃশ বেহুয়ে দুজনেই একযোগে বুঝতে পারে যেন। আনা তার বার্ষ হাসির ক্ষেত্র টেনে বলে :

“কিন্তু অভিভাবকের আর দরকার নেই—আমি যেতে পারি, কেন না আমার শরীর ভালো হ’য়ে গেছে।”

স্বপন এবার মুখ তুলে বলে : “এ-কথা তো সত্যি নয় আনা। তোমার চেহারা গত দুসপ্তাহে ফের কত স্নান হ’য়ে গেছে আয়নার দেখতে পাওনি কি?”

আনা ফের জোর ক’রে মুখে হাসি টেনে এনে বলল : “হ্যাং। ও একটু সামান্য ঠাণ্ডা লেগেছে—তাই। কিন্তু তোমার নামে একটা টেলিগ্রাম দেখেছিলাম নিচে—”

—“পেয়েছি।”

আনা কী জিজ্ঞাসা করতে গিয়েই থেমে যায়। স্বপনের বুকের মধ্যে ফের কেমন ক’রে ওঠে।...একটা সামান্য প্রশ্ন করতেও ওর এত বাধে? এত দূরে এত অকস্মাৎ স’রে গেছে ওরা? হঠাৎ বলল : “কান টেলিগ্রাম জিজ্ঞাসা করলে না?”

—“আমার অধিকার?” স্বপন স্পষ্ট দেখতে পেল আনার ঠোট দুটি একটু কেঁপে উঠল—কিন্তু সে মুহূর্তের জন্তে। তার পরেই আনার মুখের ক্ষুদ্র-আবেগ উদাসীনের প্রচ্ছদে ঢাকা প’ড়ে যায়।

—“আমি তোমার কী করেছি আনা যে”—বলেই স্বপন থেমে গেল। কান কাছে অভিমান?

আনার স্রের শুকতা ও মুখের কাঠিন্য নরম হ’ল, সে একটু স্রর যুহ ক’রে বলল : “কী বলছিলে—শেষ করলে না যে?”

স্বপন আরও যুহ কর্তে বলল : “কী হবে শেষ ক’রে?” কিন্তু তার সহজবোধ বোঝে—একটুখানি স্থান মিলেছে আনার হৃদয়ের এককোণে।

আনি তার একটা হাতের পাবে হাত রেখে বলল : “বলো না স্বপন।

কেন এমন পর-পর ব্যবহার করছ আমার সঙ্গে ? কাল যখন চিরদিনের মতন অনেক দূরে চ'লে যাব—” বললেই সে চুপ ক'রে গেল।

বপনের রক্ত উতলা হ'য়ে উঠল চক্কর নিমেষে। ওর হাতটা নিজের দুহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল : “আর যদি বেতে না দেই ?”

আনা স্রিতমুখে বলল : “কোন স্বখে শুনি ?” হাসির মধ্যেও ছিল তার এমন একটা শ্রানিমা...

—“যদি বলি ণানিক আগে বা নিয়ে ঠাট্টা করছিলে সেই স্বখে ?”

—“অতিভাবকের ?”

—“না—বন্ধুর।”

আনা চুপ ক'রে রইল।

বপন বলল : “ভাবছ কথার কথা ?”

—“হি বপন, তুমি আমার জন্মে কত করেছে—এত সহজে ভুলতে পারি কখনো ? আমি দারিদ্র্যজানহীন হ'তে পারি, কিন্তু অকৃতজ্ঞ হব কেমন ক'রে ?”

বপন কাছে স'রে এসে তার দুটো হাতই নিজের দুহাতের মধ্যে চেপে ধরল। আনার হাত দুটি পর পর ক'রে কাঁপছিল।—“তবে আমার কথা রাখো।”

—“কী কথা ?”

—“শরীরটা না সারিয়ে নীরার কাছে বেরো না। বেজন্মে এ'ানে এসেছ সেটা তো সুসম্পন্ন হওয়া চাই।”

—“কী জন্মে এসেছি ?”

—“মানে ?”

—“মনে করো কি শরীর সারতে ?”

—“তবে ?”

আনা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল, তার পর কেমন-কেমন হেসে বলল : “সত্যি কথাটা বললে সহিতে পারবে কি ?”

—“পারব না বলে ভয় হয় ?”

—“একটু হয় বৈ কি মনামি, আর বলে তো, হবার কারণ নেই কি ?”

অশ্বিন মুখ নিচু করণ : “আর ভয় পাবো না কথা দিচ্ছি, বলতে পারো।”

আনা আবার সেই অবর্ণনীয় হাসি হাসে, তার পরে আচম্কা বলে বলে : “মরিসকে ছেড়েছিলাম কেন বুঝতে পারিনি কোনোদিন ? মনে হয়নি একবারও ?”

অশ্বিনের হুক হুক-হুক ক'রে উঠল, কী বলবে ও ?

আনা একটু হাসল : “ঐ দেখ, ভয় পেয়েছ।”

—“কখনো না। আমি ভাবছিলাম কী কারণই বা হ'তে পারে ?”

—“আজ্ঞা করো দেখি।”

—“তুমি তো বলেছিলে স্বাধীনতার স্বাধ পাওয়ার পরে কের মরিসকে কর্তব্য—”

—“তুমি এক এক সররে এমন সরল ব'নে যাও মনামি !”

—“সরল !”

—“নর ?”

—“বলোনি তুমি একথা ?”

আনা তার মুখের দিকে তাকিয়ে সবাত্তে বলে : “বলেছিলাম, কিন্তু আজিহানে অ—তি—ন—র বলে একটা কথা আছে, যানে কখনো দেখনি কি ?”

—“অ—তি—ন—র !!”

—“অ—বি—ক—ল ।”

—“একটু থুলে বলবে ?”

—“মরিসকে বলেছিলাম ডাইভোর্সের পরে বিবাহ না করলে একত্র থাকতে পারি, মনে আছে কি ?”

—“থুব আছে ।”

—“কেন এমন প্রস্তাব করেছিলাম—সন্মতও করেনি—একবারও না ?”

—“একবার—মাফ করো আনা, আজ খোলাখুলি কথা বলছি বলেই বলছি—একবার হয়েছিল সন্মত—একটা ।”

—“কী ?”

—“যে, ও-প্রস্তাব তুমি করেছিলে আমাদের চোখে বড় হ’তে ।”

আনা স্নান হাসল : “আমি প্রেমের পাশায় অত ছোট পথে খেলি না স্বপন ।”

—“অর্থাৎ—?”

—“অর্থাৎ ও-প্রস্তাব আমি করেছিলাম নিশ্চয় জানতার বলে যে, মরিস আর যে-কোনো প্রস্তাবেই রাজি হ’ত ।”

—“তার মানে—” স্বপন শেষ করতে পারে না ।

আনা ব্যর্থক হাসে : “তা-ই স্বপন ।”

স্বপন স্তম্ভিত হ’রে বার ! আনা এত ভেবে চিন্তে .....স্টেট ক’রে তা’কতেও পারে না .....করেক সেকেক ঘরের মধ্যে কেবল বাইরের হাওয়ার শব্দ শোনা যায় ।

আনা ঘেন আপন মনেই বলে চলে : “অভ্যাস করেছি বৈ কি স্বপন ।  
কিণে বধন জানতার তুমি বিবাহিত ও স্ত্রীকে ভালোবাসো ।—কিছু—”



ব'লে গাঢ় স্বরে বলে : “কিন্তু হয়তো—না, আপনি যে কখনো দেয়নি তাকে  
আপনি মেওয়ার ইতিহাস কি ব'লে বোঝাবার? না, কেউ জানে—মাহ্মুদ  
যখন একলা বোধ করে তখন কেন সে সব ব'লে স্বপ্নেও একটুগানি সান্নিধ্যের  
জন্মে—”

পরের পীতাঙ চাপা-আলোর ওর মুখ এমন সজল দেখায়!...

স্বপন ওর কাছে স'রে বেতেই আনা তার কোলে মুখ লুকায়।

স্বপন ওর মুখ তুলে ধরে : “ছি আনা।”

—“ভয় নেই—এখন অস্বস্তি: মূর্ছা বাব না—এত বোকা আমি নই।”

ওর মুখে হাসি ফুটে ওঠে চোখের জলের মধ্যে দিয়ে। হঠাৎ ও  
স্বপনের কাঁধে মাথা রাখে। স্বপন তার চুলে গভীর মেহে হাত বুলায়।

মুখ না তুলেই আনা উজ্জল স্বরে বলে : “তা হ'লে কমা পেয়েছি?”

—“কমা না—অয়ণতাকা।”

—“না, সন্ধি হলো তার চেয়ে।”

—“আজ্ঞা গো আজ্ঞা, তাই সই।” ব'লেই স্বপন বলে : “কিন্তু  
একটা কথা দিতে হবে।”

—“কী?”

—“সন্ধিপত্রটা এবার এমন কালি দিয়ে স্বাক্ষর করবে যার প্রধান  
উপাদান কর্পূর না।”

আনা ঠোট কুলিয়ে বলে : “আনা আছে গো আনা আছে। কর্পূর  
তো তবু খানিকক্ষণ থাকে। কিন্তু এক হাতে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করতে ও  
অন্য হাতে ভোরা শানাচে”—বলেই হেসে ফেলে, কথা অসম্পূর্ণ রেখে।

—“একটু ভুল করছ আনা, ও-কাজ তাদেরই একচেটে দ্বারা অভিনয়ে  
সম্ভার দেয়া।”

—“কিন্তু মাটী অভিনেত্রী নয় শুধু বুকের সময়—শান্তির সময়ে না।”

—“উলটো পালটা বললে। এক রাগের মাথায়ই নারী সত্যিকথা বলে।”

—“আ—হা।”

—“নয়? সেদিন ব্যালকনির রেলিঙে হেলান দিয়ে জময়ের বিষ উল্গীরণ করেছিল কে শুনি?”

—“কিছু পর মুহূর্তেই সে-বিষ বখন অক্ষর অমৃত রূপ নিল তখন সাবধানতার শুদ্ধ অভিনয় করল কে শুনি?”

—“শ্রীমৎ স্বপন?”

—“নয় তো কি শ্রীমতী আনা?”

—“একশোবার।

—“প্রমাণ?”

—“আজকেই খানিক আগের কথা ভুলে গেলে?” ব’লেই স্বপন ভুল বোঝে।

—“কী?—টেলিগ্রামটা কার জিজ্ঞাসা করলাম না বলে?”

বা ভয় করেছিল তাই। স্বপন কাটহাসি হেসে বলে : “টিক তা নয়।”

আনা তার কণ্ঠস্বা হ’রে বলল : “টিক তাই। আজ্ঞা! এখন থেকে সন্ধির পর মৈত্রী সর্বাত্মক ও স্বাভাবিক হবে মেখে নিয়ো। বলা কার টেলিগ্রাম, বগভেই হবে।”

স্বপন বিপর্যয়ে ব’লে কলে : “চাঃঃ।”

—“যেখি।”

• —“এমন কিছু দেখবার নেই—সে লিখেছে—” ব’লেই থামে—অস্বপ্নোচনার।

আনা রূপালি হাসির বরণা বইয়ে দিয়ে বসল : “অত কুঠা কেন

গো ? জানি ও-তার ক্যান্টনবাসীর নয়—স্পেনবাসিনীর। দাও—”  
ব’লেই তার বুক পকেট থেকে “এই যে” ব’লেই ছৌ মেরে তারটা কেড়ে  
নিল।

—“আজ কী করো আনা ?”

—“বলিনি—এখন থেকে পূর্ব মৈত্রী ? সুতরাং এ-তার দেবার  
অধিকার আমার মারে কে ? দেখি স্পেনবংশোদ্ভবা কী বলেন ?”

স্বপন টেলিগ্রামটা ঠিক অমনি ছৌ মেরে কেড়ে নিতে যায়। কিন্তু  
‘আনা সতর্ক ছিল, চক্ষুর নিষেধে লাকিয়ে বালকনির উপর গিয়ে পাড়ায়।  
স্বপন তাকে ছুটে ধরতে যাবে এমন সময়ে ও শারিটা দড়াম ক’রে বন্ধ  
ক’রেই ছিটকিনিটা দেয় কেলে। স্বপনের এমন অসম্ভব রাগ হয় !...  
সঙ্গে সঙ্গে একটা অনির্দিষ্ট অগত নিশ্চিত আশঙ্কায় তার সমস্ত মনটা হ’য়ে  
ওঠে কালো ! সে আনাকে একদৃষ্টে দেখতে থাকে শারির মধ্যে দিয়ে।  
কেন যে টেলিগ্রামটা লুকিয়ে রাখেনি ছাই !...

লাকালাকিতে আনার মুখ ভেৎস বাড়িয়ে উঠেছিল, টেলিগ্রামটা পড়তে  
পড়তে সে-মুখ ছাইয়ের মত বিবর্ণ হ’য়ে গেল। সে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে  
পাশের রেলিং চেপে ধরে। স্বপন সজোরে ঝাঝা মারতেই ছিটকিনিটা  
হাট তেড়ে। আনার কণ্ঠবেষ্টন করে ও।

—“অমন করছ যে ? আনা !”

—“ও কিছু না, মাথাটা কেমন হঠাৎ ঘুরে উঠল একুনি ঠিক হ’য়ে”

—কথা জড়িয়ে আসে ওর—

আনাকে স্বপন ধ’রে কেলে।... পরে ধীরে ধীরে নিজের বিছানায় এনে  
পৌঁচায়

## বিপর্যায়

আনা চোখ বুঁজে বলে : “ভয় নেই, একটু মাথা ঘুরছে মাত্র।”  
ব’লে চোখ চাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু চেয়ে থাকতে পারে না।

স্বপনের বৃকের মধ্যে রক্তশ্রোত উচ্ছল হ’য়ে উঠেছে!...এ কী ঘটে গেল!...ছি ছি, কেন মিহিমিহি মিথ্যা বলতে গেল? কতবার তো সে দেখেছে যে, মিথ্যার ফল এমনভাবেই ফলে—ঠিক যেধানটার মানুষ নিজেকে সব চেয়ে নিরাপদ ভাবে সেইখান দিয়েই ছয় অথম।...অথচ তবু কত কী উলটো-পালটা বুদ্ধি, লজ্জা, কুণ্ঠা এসে যে সহজ সত্যচরণের পথরোধ ক’রে দাঁড়ায়!...একটা বুদ্ধির ঝাঁক, একটা চকিত চমক, একটা সংশয়ের বিদ্রাব্দীপ্তি...অমনি দেখে কি—সত্যের সহজ বস্তু চকোর নিমেষে কোন্ এক আলাদিনের দৈত্য উড়িয়ে এনে ফেলেছে আকাশছোঁয় পাহাড়...এতটুকু ঝিধা থেকে গর্জ্জে উঠে দাঁড়িয়েছে কত যে মিথ্যার আঁধার! চোখ যার কাপসা হ’য়ে...মন সোজা পথেও পারে না টাল সামলাতে...জন্ম অমৃত্যু করে মানুষ কতই অসহায়!...এতটা যা আনা কখনই যেত না যদি না সে—কিন্তু এখন আর পক্ষাত্তাপে ফল কি? ও আশ্রয়ে আশ্রয়ে আনার কপালের উপর ল্যাভেণ্ডার-পটি লেপে দিয়ে গুকে পাখা করতে করতে বলে : “ডাক্তার সিরেরাকে কোন করব আনা?”

আনা কোনো কথা না ক’য়ে শুধু হাত নেড়ে আনার—না।...একটু বাদে চোখ চেয়ে বুদ্ধির বলে : “সামান্য একটু মাথাব্যথা মাত্র।”  
ব’লেই ফের চোখ বোঁজে।...

আনা লজ্জিত বোধ করছে এতটা আত্ম-কণ্টর হারানোর অজ্ঞে।  
তাই ওর হাতের মুঠো থেকে নিজের হাত অমন সসঙ্কোচে টেনে নিল।...

ত আকুলন যে তার চেনা!...মানিনী! তার উপর একটু

আগেই সব কথা অকপটে খুলে বলেছিল কতই না প্রত্যাশা নিয়ে !  
 স্বপনের মনে পড়ে, সন্ধ্যা একদিন তাকে : “সিসি, মেয়েরা যখন খুব  
 লজ্জার কিছু একটা ব’লে ফেলে—তার জন্তে লজ্জা কিছু বোধ করে না যদি  
 ভালোবাসার জোর থাকে ।”

স্বপন হেসে লিঙ্কাসা করেছিল : “কিন্তু কেন করে না ? তাদের  
 আত্মমর্যাদা তেমন নেই ব’লে ?” সন্ধ্যা ভ্রূকুটি ক’রে উত্তর দিয়েছিল :  
 “না গো বীরপুরুষ, না । তারা ভালোবাসতে জানে ব’লে । তোমাদের  
 মতন প্রতিপদে আপনাকে কেন্দ্র ক’রে ঘোরে না ব’লে । ভালো যে  
 বেসেছে সেই জানে—কত ইচ্ছে হয় জানাতে যে, সে ভালোবাসার ক্ষেত্রে  
 কত দুর্বল ! দুর্বলতা অল্প সব ক্ষেত্রেই দেয় লজ্জা—কেবল প্রেমের  
 ক্ষেত্রেই জানে প্তেরব ।”

স্বপন আনার নিম্নলিখিত দীর্ঘপদ্য চোখ দুটির পানে চেয়ে অন্তরমনস্থ  
 হ’য়ে এককথাক্তি বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবে । সত্যি । আনাও  
 তার আচরণে প্রকারান্তরে এ-কথার সত্যতার স্বপক্ষেই সাক্ষ্য  
 দেয়নি কি ? ও যে মরিসকে ছাড়বার অভিনয় করেছিল স্বপনেরই  
 জন্তে—ভারতে তার বৃকের মতো কেমন একটা গর্গ উল্ছে পড়ে কিন্ত !—  
 অস্বাভাবিক মনোভাবের ভাণ করেছিল—এ লজ্জার ইতিহাস ও এমন সানন্দে  
 স্বীকার করতে পারত তো ! স্বপন পারত না কখনই । নীরার কথার  
 মধ্যে বৃষ্টি ণানিকটা সত্য আছে বা : শিল্পী প্রকৃতি বোধ হয় সত্যই  
 একটু বেশি রকম অভিনয়ী—আত্মকেন্দ্র । মেয়েরা প্রকৃতিতে স্বাভা-  
 বী, পালিনী—শিরিষশ্চিই তো নয়—তাই ওরা প্রেমের ক্ষেত্রে এভাবে  
 নিজের চারদিকেই পরিক্রমা করে না, নিজের দুর্বলতাও দরিত্রের কাছে  
 উন্মোচিত ক’রে এত আনন্দ পায় !

তবে এ-ও বোধ হয় ওদের ক্ষেত্রে বটে—স্বপন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবে

—ওদের নারীশকারই প্রাত্যহিকায়। নারীর প্রকৃতিতে লজ্জা অত্যন্ত  
আজ অবধি পুরুষের চেয়ে বেশি। জগতের রূঢ় আঘাত থেকে ওরা  
যতই আশ্রয় চায় কোনো নিরাপদ নীড়ে। জনতার নিকরূপ চোখে  
দৃষ্টিতে ওরা ভয় যদি না-ও পায়—অবশি নিশ্চয়ই বোধ করে। যতই  
পুরুষালি চং ওরা আশ্রয় করুক না কেন—পুরুষের মতন খোলা হাওয়ার  
ওদের বিশিষ্ট বৃত্তিগুলি ফুটে পাবে না। অবশ্য কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ  
—যানে, মেয়েলি পুরুষও তো আছে, কাজেই পুরুষালি মেয়ে থাকবে না  
কেন? নিম্নুক্ত হাওয়া, খোলা আকাশের চাদোয়া, তটহীন সিঁদু—  
ওদের বুকে জগদ্বল পাখরের মতন চেপে বসে। এ চাপের থেকে ওরা  
প্রতিপদে চায় ছাড়া, চায়—জীবনের দিনাচর্যনৈমিক কতিপূর্ণ—প্রেমের  
ক্ষেত্রে। তাই প্রেমের ক্ষেত্রে ওদের মন পুরুষের চেয়ে ঢের বেশি খোলা  
—অর্থাৎ, ঢের বেশি অকুণ্ঠ!...এই তো, আজ খানিক আগে আনা কী  
উন্নতিই না হয়ে উঠেছিল—তার অভিনয়-করার লজ্জাজনক ইতিহাস  
থলে ব'লে। জীবনে ওরা স্বভাব পর্দানশীন—তা কী ঘুরোপে কী ভারতে  
—তাই প্রেম ওরা নিরন্তরই সুযোগ খোজে বে-আক্ৰ হবার।

তাই তো আজ আনার অন্ত বেজেছে—স্বপন বোঝে বৈ কি। ঠিক  
সময়ে ও স্বপনের কাছে নিজেকে সব চেয়ে অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ  
করেছিল—ঠিক যে-সময় এ-আয় উন্মোচনের প্রতিধানে স্বপনের প্রস্রবে  
ওর দুর্বলতার দৈব প্রেমের গর্ভে রূপান্তরিত হবে ভেবেছিল—সেই সময়েই  
কিনা ঐ তারটা তার হাতে পড়ল!...ওর মন গেল ঝুঁকড়ে। ওর প্রেমের  
মর্যাদা রইল কই? তৃতীয় ব্যক্তির কক রায়ে সব বিদ্ধ প্রস্রবের ভরসাই  
যে গেল ধুলিসাং হয়ে!—স্বপন সব এত স্পষ্ট দেখতে পায়!...এ-সব স্বপ্ন  
লেন-ধেনে সময়ে সময়ে যেন তৃতীয় নয়ন ওঠে ফুটে সত্যিইঃ সব মনের  
কথা দেখা যায় যেন কাচঘেরা অক্ষয়বহুর মতন! এতটা মুক্ত দৃষ্টিতে

তবু অথই নেই—হঃখও বাজে বৈ কি...কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা তৃপ্তিও মেলে। আশ্চর্য্য! প্রতি নিম্মুক্ত দৃষ্টিই ব্যাপার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা সত্যিকার তৃপ্তিও দেয়, তা সে যাকেই দেখুক না কেন—কী মহিমা কী মানি, কী অন্ধর কী অসুন্দর, কী গোরব কী কলঙ্ক। প্রতি অহুতৃতিরই সত্যরূপকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতেদর্শন পাই তখন তাতে যুগপৎ স্রষ্টার ও স্রষ্টার গোরব মেলে। কেন মেলে?—এইজন্মেই কি যে, সত্য দৃষ্টি সত্য সৃষ্টিরই সংগার? প্রকাশ তো খানিকটা অবাস্তব—পাঁচজনের জুড়ে কপের প্রসাধন-প্রযুক্তি। কিন্তু এই রূপ উলঙ্গ শিশুর মতন জন্মার ঠিক কখন? না, জটী যে-মুহুর্তে ঠিক দেখল। তাই সৃষ্টিও সে অজ্ঞাতসারে করেছে তখনই—যখন রূপরূপ তার দৃষ্টি হরাঘুর মধ্যে নিল জন্ম। সব সৃষ্টির গর্ভাধীন হয় এই দৃষ্টির সঙ্গে সত্যের সঙ্গমে।—প্রতি নিঃশব্দ নিঃসংস্কৃত দেখার ভঙ্গির মধ্যেই প্রকাশের ব্যক্তনা স্বতঃস্ফূর্ত। ভাব ও ভাষা অবিশেষ্য। ভাবের উত্তাপে ভাষা তেমনিই দুনিবার ছন্দে বেরুবে—যেমন ছন্দে বেরায় গৈরিক ধাতু—ভূগর্ভের প্রসব-উত্তাপে।

আশ্চর্য্য, এ উৎকর্ষার সময়ও ওর এইসব কথা মনে হ'ল!...আর এতশ্রুতি ভাবে! কত সময়েই ও দেখেছে যে, গভীর বেদনার সময়েও ওর একটা অংশ নিঃস্পৃহভাবে সব দেখে—যে-অংশ অটল, অচল—যে সবেমাই মধ্যে পায় রস—তা কী গভীর হঃখে, কী গভীর স্নেহে। বুঝি তাই নীরা বলেছে শিল্পী প্রতি অভিজ্ঞতাকেই তার সৃষ্টির সমিধু হিসেবে করে আঁকলো?

হঠাৎ আবার কণ্ঠস্বরে ও চমকে ওঠে : “যখন!”—হয় এত কীল!  
—আহা, বেচারি!...

—“কী আশা?” যখন খুব ছুঁকে ওর গালে কপালে মাথার হাত বুঝিয়ে দিতে থাকে।

—“আমি একটু ভালো বোঝ করছি, আমাকে আমার ঘরে শুইয়ে দেবে? একটু ধরলেই যেতে পারব।”

—“কাজ কি আনা? থাকো না এখানেই।” বলে ঘপন ওর পাণ্ডুর গালে হাত রাখল।

আনা মুখ সরিয়ে নিয়ে বলল : “আমি একটু ঘুমবো।”

—“বেশ তো আনা, আমি এ ঘরেরই নীল পর্দাগুলো টেনে আরও অন্ধকার ক’রে দিচ্ছি।”

—“না না—আমার ঘরেই বাই। একটু একলা থাকতে চাই।”

কলাগুলি খুব সহজভাবে উচ্চারিত হ’লেও পিছনে যে পুঞ্জীভূত বিষাদ বর্ষণোন্মুখ তা বুঝতে অন্তর্যামী হ’তে হয় না। ঘপনের বুকের ভিতরটা কেমন ক’রে ওঠে! অথচ কী বলবে সে?—বলবার আছে কী? দুজনেরই হৃদয় দুজনের প্রতি উন্মুখ—এমন উন্মুখ বৃত্তি কখনো হয়নি!... অথচ তবু...না, ও ভাবাই চলে না...অসম্ভব! সব যেন ভেঙে গেছে। অনেক-বহু-গড়া তাদের প্রাসাদের মতন সব নিষ্কতা যেন ছত্রাকার হ’য়ে পড়ে!...কেন এমন হয়? কার দোষে ঘটে এমন? আনার? সন্ধ্যার? ঘপনের?

—“কী? কথা কচ্ছ না যে?”

ঘপনের চমক ভাঙে : “ও—হ্যাঁ। তা চলো।”

ও আনাকে অতি সন্তর্পণে ধ’রে ওঠায়। অতি স্নেহের সঙ্গেই ওকে ধরে বটে কিন্তু অবসরা বাছলয়ার কোমল দেহের উত্তাপ যখন তার পজরে লাগে তখন তার স্নেহের মধ্যেও হঠাৎ কেটে পড়ে কোর সেই আবিষ্কার। ও চকল হ’য়ে উঠে ডানহাতে আনার কটিবেষ্টন ক’রে নিয়ে চলে। আনার মাথা ঠিক ওর কাঁধের পুরে, আর বাঁ হাত ওর গলা জড়িয়ে। না টলছে, ওর উন্মুক্ত কণ্ঠ মৃদু মৃদু করছে এত জোরে যে, ঘপন স্পষ্ট



দেখতে পাচ্ছে !...ওর দেহ মন যেন কোমলতার কারপো আসে এলিয়ে !  
...সঙ্গে তপ্ত উদ্ভবর স্পন্দমান আবেগ !...ওর ইচ্ছা হয়...কিন্তু না। আর  
কেন ? বা যেতে চাইছে তাকে যত শীঘ্র বিদায়—ও প্রাণপণে আত্মসংবরণ  
করে। এ-সব ভাবনা ভাবারও বিপদ।

\* \* \*

—“তা হ'লে আমি বাই আসা ?”—যতখানি কোমলতার সম্পদ ওর  
ছিল ওর এ-স্বরভরী স্নানতম রেশের মধ্যেও নিঙ্ড়ে শেব বিস্মৃতি পর্যন্ত ও  
ঢেলে দেয়—উজাড় ক'রে।

আনা প্রতিবর্তকণ্ঠ বলে : “ধন্যবাদ মনামি। কেবল ঐ সবুজ  
আলোটা জ্বলে দাও—সঙ্গে ওর দোমটাটা—চাঁপা, ওটাও আর একটু  
টেনে দাও—ধন্যবাদ। চাপা সবুজ আলোয় অনেক সময় আমার  
দাঁড়গুলো এমন আশ্রয় পায় !”...

স্বপন অতঃপর ওর কাছে এসে দুই গালে দুই করতলের নিবিড় চাপ  
দিয়ে বলল : “সুখোও শেরি !”

চকের নিম্নে আনা দুহাতে ওর গলা জড়িয়ে ওর মুখ নিজের বুকের  
মধ্যে টেনে ধরন চেপে। স্বপনের দেহে বিদ্ব্যৎ ওঠে জেগে। কিন্তু কী  
কোমল বিদ্ব্যৎ !...

হঠাৎ আনার কারার শব্দ। স্বপন ওর বুক থেকে মুখ তুলল।  
—“কী আনা ?”

আনা পাশ ক্রিয়ে তরে বাগিশে মুখ গুঁজে থাকে।

—“ছি আনা। অমন করে কি ?”

কোনো পক্ষ নেই। কেবল ক্রুদ্ধ-ক্রন্দনে ওর দেহ ধর ধর ক'রে  
কঁপছে।

বপন ওর মুখের খুব কাছে কুঁকে বলল : “হি আনা, তোমার শরীর—”

কিন্তু এমন বাপছাড়া শোনার !..

বপন কী যে বলবে ? অথচ ওর দেহে মনে আধকোটা গোলাপের ভিতরকার মধুমলের-মতন-কোমলতা যেন সমস্ত মরুভূমিকে কোমল যেতর উর্কর করে তুলতে চাইছে। কী হিলোল এ-আকাজ্জাব ! অথচ কী বার্থ !...তার মনে জেগে ওঠে এমন একটা বিবাদ !...মাছুষ কী নিঃসহায় ! একটা সামান্ত টেলিগ্রামের করেকটি শব্দ পড়া আর এ কী বিগব ঘটে গেল ? সঙ্গে সঙ্গে যে ছিল করতলগত সে আজ কত দূরে...অথচ প্রেম যখন এমন নিবিড়-বাসনা এমন উদ্দাম—কথাটা বীকার করতেও ওর কুষ্ঠা হয়—তবু সত্য তো। ওর এই চাপা কাহার সামনে সে আজ এমন গভীরভাবে অহুতব করে প্রেমের সাগরদানের একান্ত অকমতার কথা ! ...ভুল ভুল-কবির কল্পনায় পরকেও ঠকায়--নিজেদেরকেও : প্রেম সর্বস্বয়ী ? দুঃ। অগতে প্রেমের চেয়ে নিঃস্বল কে ?

কতকণ এরকম অসহায় ভাবে কাটে ওরা কেউ জানে না। হঠাৎ আনা ওর দিকে ফিরতেই বপন ওর গাও হাত রাখল। ভৎক্ষণাৎ আনা আবার ওর গলা জড়িয়ে ধরল। ওদের ওষ্ঠাধর হ'ল মিলিত—বিলম্বিত চুষনে।...

বপনের দেহ আবেশে শিথল হ'য়ে আসে। সব সে ভুলে যায় আর কি... হঠাৎ ঐ আবার আনার কারা।...এ কী ! এ যে প্রায় দ্বিগিরিগা।

“বপন সমস্ত হ'য়ে ওঠে !...ওকে এত বিবশ সে তো দেখিনি কখনো।

হঠাৎ আনা বলল : “আমার মাথা বড় ঘুরছে বপন—চোখে অন্ধকার—কাছে এসো।”

বপন তার পাশে অর্ধশায়িত ভাবে ওরে তাকে বাহুপাশে টেনে নিয়ে

হাওয়া করতে লাগল।...হঠাৎ মনে হ'ল আনার বেন সাড় নেই। ও  
তর পেয়ে গেল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম...হাত শক্ত। একটু ভরসা  
পেলে। মূর্ছা।...বাঁচা গেল। টেলিফোন ধরল।...

—“ডাক্তার সিরেরা।”

—“একুনি আছেন একবার। মাসমোগাসেল ছাপ মূর্ছা গেছেন।”

• • •

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডাক্তার সিরেরার মোটর-বর্ণ শোনা গেল।...

পাখা রেখে অশন উঠে দাঁড়াল। টেটী আনার মুখের কাছে ধরল।

—“মূর্ছা কেটে গেছে। এখন ঘুমছেন, থাক। ঘুমতে দিন।  
এখানে কথা না। বাইরে চলুন।”

অশন বাইরে এল।

—“ব্যাপারটা কী?”

অশন নতমুখে বলল : “কী আর? পারিবারিক হুঁশুটিনা—  
একটি ডার।”

—“ঐ ভো।” ডাক্তারের মুখে বিচক্ষণ হাসির চকিত আভা  
খেলে গেল।

—“কী করব বলুন?” অশন মুখ নিচু করল।

ডাক্তার হাসলেন : “আপনি আর কী করতে পারেন? শুধু  
এইটুকু ভেবে রাখবেন যে—ভয় পাবেন না, এখনো ভয় ভয়ের কিছু  
ঘটেনি—ভয় সাবধান হ'তেই হবে। কোনো রকম উদ্বেজনা বা প্রবল  
আবেগ ওর হাটের ও শরীরের এই দুর্বল অবস্থায়...বুকেছেন ভো?—  
তবে যদি ঘন ঘন মূর্ছা না হয়—বুকেছেন না—জা হ'লে আশা কোনো  
সফট নেই। আর—” ডাক্তার অমতা আহতা করতে লাগলেন।

—“কী ? বলুন নিঃসঙ্কোচে ।”

—“এমন কিছু না । এ সময়ে সেন্স সংক্রান্ত কোনো উদ্বেজনাও—  
কিছু মনে করবেন না মসিবে—”

—“না না । আপনার কী ।”



ছি ছি !—শেষে ডাক্তার সিয়েরাও তাকে ডাকলেন—? লক্ষ্য করুন তার  
শরীর শির্ শির্ করে উঠল !—অথচ কে না ঐ কথাই ডাকবে—?  
আর এমন বোগবোগ—সে, সব চেয়ে নিফল—প্রতিবাদ !...ভাগ্যে আজই  
সন্ধ্যা আসেনি !...

## লকেট

বখন সবুজের ধারে একলা একলা খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ায়।—  
কতক্ষণ ?—ও নিজেই জানে না । বখন কিয়ল—চোটেলেস ডিনার সমাধা  
হ’বে গেছে । ওর পরিচারিকা জিজ্ঞাসা করল খাওয়া হয়েছে কি না ?  
ও অস্বস্তিক ভাবে বলল : “হয়েছে ।”

কিন্তু ঘোড়ার উঠে নিজের শরনকে ঢুকল না, ঢুকল পাশে আনার  
ঘরে—নিঃশব্দ পরস্কারে । আনা ঘুমছে । সবুজ কাড়ের মধ্যে দিয়ে  
তিনিমিত আলোও ঘুমিয়ে পড়েছে ওর মুখে । কী সুন্দর !...ও মুহূর্তে  
চেয়ে থাকে !...আনার মুখে একটুকরো ছিন্ন হাসি লেগে বেন !...থেকে  
থেকে ঠোট দুটো সামান্য কেঁপে কেঁপে উঠছে ! সবুজ আলোর ‘মোড়’  
ঘড়ের রাউন্ডটা এত অপূর্ণ দেখাচ্ছে ! হ-একটা চূর্ণ-কুতল অন্ন নড়ছে—  
পাশের আনাটার একটা ছোট পানী দিয়ে সামান্য কিরকিরে হাওয়া  
আসছে কি না । সেই লকেটওয়ালা সন্ধ্যা সোনার হাতটা ওর উল্লু

কণ্ঠে দীর্ঘজ্বল নিঃশ্বাসের তালে তালে উঠছে পড়ছে। স্বপনের হঠাৎ বাসনা ওঠে জেগে!...আর একটু কাছে স'রে যায়।—সত্যিই ওর ম্লান মুখে প্রিমিত হাসির রেশ। ও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছেই বটে। কী হৃদয়! চোপ ওর আর কেবোতে ইচ্ছে করে না। ইসাবেলা, সন্ধ্যা কেউই বুঝি এত মায়াময়ী নয়। রূপে হ'তে পারে, কিন্তু লাভণ্যে নয়। সন্ধ্যা? হৃদয়ী নিশ্চয়ই! কিন্তু এমন বিবাদময়ী নাদুদী তার মুখে কুটে উঠবে কী ক'রে? ইসাবেলা? তার রূপ চোপ ঝুলে দেয়—সত্য, কিন্তু মনকে এমন ক'রে ডাকতে পারে কখনো?—ভাবতে তার অন্তরের নিভুতে কেমন একটা গন্ধ জাগে...এমন যে আনা—সে একান্ত ক'রে তাকেই চায়!...কিন্তু সে হিম্মত কণিকের...তার পরেই গর্ভ বিধানে জেতে পড়ে! এত কাছে ও...তবু কত দূরে!

কত দূরে! কথাটা উচ্চারণ করতে বাধা বাজে!...

সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে সেই আকাজকা ওঠে জেগে! হৃদয়কে সমীপে-ডাকার সেই চিরন্তন আকৃতি!...এত ইচ্ছা করে আনাকে জাগাতে!...কাছে পেতে!...বাধা?—কেন? একরাজির জন্তেও কি ও সব ভুলতে পারে না? বলতে পারে না : ভুলবে কর্তব্য, ভুলবে সমাজ—ভুলবে সব? নিজের পরেও জাগে হয় : এখানে এসে অবধি শুধুই কুটা ও যন্ত্রের দোলা!—এই-ই কি তার ভাগ্য-বিধাতার প্রেত দান : এই অশ্রান্ত দোলা—দোলা—দোলা?—বিধাতার প্রতি কোতে তার মনটা ওঠে বিরল হ'য়ে : কেন? কী জন্তে এত শত বিড়ম্বনা? কী কতি হ'ত কার গুনি, যদি...

না—এ চিহ্নাও পিছল! তা ছাড়া আনার দেহ মন এত অসুস্থ। তার উপর ডাকার সিরেরার অর্ধশূন্য মুহূর্ত হাসি! সব চেয়ে বড় কথা : তার সাধন-বাক্য!...অসম্ভব! ও করে। পা টিপে টিপে—

ঐ—আনার কাতরানি না ? ও ফিরে চায় । না তো । ও জেটিক তেমনিই অকাঙ্করে ঘুমছে—কেবল দাড়টা আরও তারই দিকে ফিরিয়ে । স্বপন ফের তার কাছে স'রে যায় : যদি ও হঠাৎ আপনা থেকেই আগে—লোভ হয় এত !

হঠাৎ ওর দৃষ্টি পড়ে লকেটটার 'পরে । তার ডালাটা ঈষৎ খুলে গেছে—কার ছবি ? নিশ্চয় মরিসের—আর কার ? এ সময়েও হঠাৎ কোথায় পচ্ ক'রে ওঠে ওর বুকের মধ্যে । না না—নিশ্চয় মরিসের বেনারের । মনের মধ্যে কেমন তৃপ্তি আসে । দেখিই না । দেখা অস্বাভাবিক ?—দূর—কী হয় দেখলে ?

চোরের মতন সন্তর্পণে ওর লকেটের ডালাটায় সে হাত দেয় । আনার মুখ থেকে নির্গত হয় ফের সেই অর্ধশব্দ শুভ্রনন্দনিনী ! স্বপন নবকল্পবেগে পিছু হটে । এমন ভয় হয়—ছি ছি । আনা দেখে ফেলেছে ! লজ্জা ! লজ্জা !

না । ও তেমনিই ঘুমছে । এবার পুরোপুরি ফিরল প্রাণ । সর্বরুদ্ধ ! বিধাতা করুণাময়—একশোবার ।

ডালাটা আরও খুলে গেছে । ও কুঁকে দেখে । হাত দেবার দরকার হয় না—আর ওতে হাত দেবে না—তুলেও । এ কী ! কার ছবি ?—তার নিজেরই !!

তার বুকের সমস্ত রক্ত বেন বাহি তুলে ধরে আসে তার পঙ্কজকলোকে নিশানা ক'রে ! এত সামান্য আবিষ্কারে মালুকের স্পন্দনের সত্তার যে রক্ত-কুরকম ছুটিয়ে চলতে পারে—

ওর ছবি ! স্বপনের !! আনার বুকের সোপান লকেটে !!! আর এটা হ'ল কি না সামান্য আবিষ্কার ? স্বপনের জীকনে এর চেয়ে বড় আবিষ্কার কবে হয়েছে ? কলহসের জীকনেই কি

হয়েছে? তার রক্তের প্রতি বিদ্যুৎ সায় দিয়ে তারদ্বারে বলে :  
না না না।

ওরে মনে পড়ে একদিন মাত্র এ-হারটা ও আনার টেবিল থেকেই  
তুলে নিজ হাতেই আনাকে পরিয়ে দিতে গিয়েছিল। আনা নক্ষত্রবেগে  
ওর হাত থেকে হারটা ছিনিয়ে নেয়। ও বুঝেছিল লকেটটার জন্মেই।  
ভেবেছিল কোনো গোপন প্রশংসার ছবি বুঝি বা। কে জানত যে ওরই  
পাসপোর্টের জন্মে তোলা একটি ছোট ছবি—যেটা একদিন আনা হাসি  
ঠাট্টার মাঝখানেই আনুসং করে ওর অসুখতির অপেক্ষা না রেখে—সেই  
ছবিটা ওর কাছে এত যত্নের।

এ আবিষ্কার ক'ল সামান্য!

ও পা টিপে টিপে বেরিয়ে যায়। এমন বিষাদ আসে ছেয়ে—  
আঁচখিতে!..

## জয়?—না পরাজয়?

সত্যি বিজ্ঞানীর এসে ও শুয়ে পড়ে। মোটে রাত ন'টা—তবু। কী  
করবে আর? আশ্চর্য্য,—তবু মনের কোণে সাধনা প্রবোধ ভরসা  
কিছুই বাশও নেই...আছে কেবল নিকরকালো বেমনার এলোচুল!  
এলোচুল!..কোথেকে যে এ-খাপ্‌ছাড়া উপমাটা আসে...অমনি ওর  
মনে হয় যেন ওর সমস্ত বুকেটা কার বিদ্যুৎ এলোচুল ভ'রে গেছে!...  
শুধু দেখতে পার!..হঠাৎ মনে হয়—ও! সবুজ আলোর আনার  
খোলাচুল ঠিক এমনিই দেখাচ্ছিল! কী আশ্চর্য্য! চোখের নজরে দিয়ে  
মন যে কখন সে-ও সে-ওক সবই ছেকে নিয়েছিল—ও জানতেও  
পারেনি! ওর কতক মনে পড়ে ও ডেরে ডেরে দেখছিল কেবল আনার

দীর্ঘশ্বাস ছাখ, হুড়োল বাহ, বাঁকা ঠোঁটের আবছা হাসি ও পুন্নিভ মেহলতা। কিন্তু ওর মন আনার চুলের ছবিটিও একে নিয়েছিল যে কোন্ গোপন পটে?—কোন্ অতক্ৰান্ত মুহূর্তে? স্বপ্নেও বুঝি এমনিই ঘটে, না, যা চোখে দেখি কানে শুনি অথচ ভুলে যাই তা'ও স্মৃতির পটে ছাপ রেখে যায়ই—তার নাম অবচেতনই দাও বা বা-ই দাও। ভোলে না মাহুষ কিছুই। তাই জন্তেই না এত বিপদ!...অসতর্ক লগ্নে বিম্বত কত কী জেগে ওঠে...বাধায় কুরক্কেত্র!...

চুলের ছবির সঙ্গে গন্ধ ওঠে জেগে। আনা কি একটা বৃদ্ধ সৌরভ এসেছে মাথত চুলে!...খুবই ফিকে গন্ধ—ও কতদিন এই নিরে আনাকে ঠাট্টা করেছে। তাতে আনা প্রায়ই মুখ টিপে হাসত; শুধু একদিন উত্তর দিয়েছিল : “এ ফিকে গন্ধ তোমার ভারিক্টি মনেও একদিন হয়তো ঘন হয়ে উঠতে পারে বন্ধু, অত ঠাট্টা করো না।” আজ সে-কথাটা বার বারই মনে হয়।...আনার কাছে এটা ছিল বুঝি বহু-পরীক্ষিত সত্য? ও বুঝি চেয়েছিল এইসব ইচ্ছার পথ দিয়ে স্বপনের মনে তার ছাপ রেখে দিতে? Nothing is unfair in love and war—চাং বলত। আনা কি জেনেগুনেই এ-সব সাজ-সরঞ্জামের যোগাড় রাখত?

সত্যি, আজ ওর চুলের পরিচিত কিকে গন্ধ এত নিবিড় হয়ে উঠেছে স্বপনের মনে!...আনা—শুধু আনা কেন—এদেশের মেয়েরা প্রায়ই ভুরোদন্দী—নয়?—কি শেষ করে এই ছলাকলার ক্ষেত্রে? তার ওপর ফজলিনী হ'লে তো কবাই নেই : এ-সব ধনুর্কিভাষ্য তাদের হাতে বড়ি হয় বৈ কৈশোর থেকে!...

আহা কোরি! কত দীর্ঘ সাধনাই না করেছে ও! সব জেনে-গুনে। “জেনে যে, ও বিবাহিত। জেনে যে, সন্ধ্যাকে ও ভালোবাসে।” আনার বিবাহ-করণ-দিকে-উচ্চারিত এ ছুটি কথা বার বার তার মনে



ধিয়ে ধিয়ে ওঠে এসাজের মুছিত শব্দে।—আনা ওকে চেয়েছিল জেনে—যে, এর শেষ অঙ্কে টাঁজিড ছাড়া আর কোনো সুরই বাজতে পারেনা। আহা!

তবু আনা ওর লকেটটিতে রাখত তারই সামান্য একটা ছবি! বুকের সব চেয়ে কাছে!! তাই দুন্নি এইটেই ছিল ওর গোপনতম রহস্য? এমন কি, ওর অভিনয় করার কথা প্রকাশ ক'রে দেওয়ার সময়েও একথাটা ও প্রকাশ করেনি। স্বপনের মূখে করুণ হাসি ফুটে ওঠে : আনার সব চেয়ে ভয় ছিল—পাছে কাকর চোখে ওর কোনো আচরণ সেটিমেণ্টাল হোক!—ওর কাছে দীর্ঘশ্বাস, হাহুতাশ, কান্নাকাটির চেয়েও লজ্জাকর এই গোপন উচ্ছ্বাসের প্রকাশ হ'য়ে পড়ার সম্ভাবনা। শুধু ওর কাছে কেন? সকলেরই কাছে। এ যে বড় লরদের জায়গা—অসুট কুঁড়ির রক্তিমতম বুকটুকুর পেলবতম বং যে এ ;—সমালোচকের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টির কাছে ভরসা পাবে কেন? শুধু তার কাছে এ গোপনতম বর্ণের লালিমাতিক্ মেলে ধরা চলে যে বিচার করবে না—যে শুধু বুঝবে। বাকি সকলের কাছেই এ উচ্ছ্বাস।

স্বপনের বুকের মধ্যে জেগে ওঠে করুণা!...এমন করুণা! কোমলতা! ...এমন কোমলতা!...

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে বাসনা! আনাকে যদি আজ কাছে নেত ... একবারের জন্ম মাত্র একটিবার!...কেন?...হয় না কি? ওর লকেটের গোপনতম ইতিহাস জেনে ও যে-অপরোধী হ'য়ে রইল—অন্ততঃ তার কতিপূর্ণ যেওনাও ওর কর্তব্য নয় কি?

দুইতই ভাবে ততই তার কক্ষের ঘোঁটে নিবিড় হ'য়ে ওঠে—মায়কতা। সন্ধ্যা জো এল ব'লে। কী কতি হ'ত যদি—

আনা—প্রাণপণে এটিভ্যাক ও রাখে টেকিয়ে। সকলের সব চেয়ে

পরাক্রান্ত শত্রু যে এই প্রথম দিককার চিন্তাকণার প্রশ্নের। এ-কণার প্রকৃতি রক্তবীজের : প্রতি কণা সহস্র কণার জন্ম না দিয়ে ক্ষান্ত হয় না।

কিন্তু সেই প্রথম তুচ্ছ বিদ্রোহী কণা গোড়ায় আসে মিতালির ভঙ্গি নিয়ে। বসে : “বেশি কিছু না—কেবল একটু ভেবেই বেথো না ভাই।” সে-সময়ে তার রূপ হয় কাকুতির। অথচ জগতিক প্রশ্ন-সিঙ্কনের পরেই পেলব অঙ্গুর হ’য়ে দাঁড়ায় বনম্পতি...তখন তাকে উদ্ভুলিত করে কার সাধ্য ? স্বপনেরও মন শেষটার এসব চিন্তা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না...হু হু ক’রে চূর্ণ বাধের প্রতি কণার উপর দিয়ে ঐ একই চিন্তার বান হু হু ছাঁসে আসতে থাকে যে কত আন্দোলন কত ইজিত আন্দোলন নিয়ে !...

ঠাণ্ডা সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। তাড়াতাড়ি বেশ-পরিধান ক’রে একটা ট্যান্সি নিয়ে ছুটল সোজা নীচে। একটা কিছু করা দরকার...নির্জনে এ চিন্তার সহস্র আকৃতি সহস্র ছাঁতছানি আর তো নয় না ! ...ট্যান্সির ঠাণ্ডা হাওয়ার তার একটু ভালো মনে হ’ল। ফিরল ঘনন তখন রাত বারোটা। অন্ধকারের পরে এসেছে তখন অবসাদ। ঘুমিয়ে পড়ল।

\* \*

ঘুম ভাঙল দশটা তিনেক পরে। ঘরের সিঁড়ির ডং ডং ক’রে চারটে বাজছে। কিন্তু নিশাও তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে আজ : শান্তিদাঙ্গিনী কুঁচিতে আসেনি—এসেছে বিকৃত অশ্রের অঙ্গুর হাতে। সমস্ত সন্ধ্যাকোণার আগ্রহ সংগ্রামে যে-সব চিন্তাকে ও অন্ত চেষ্টায় নিরস্ত করল, স্বপ্নে তারাই ছাড়া পেয়ে তার মনটাকে নিয়ে করেছে

দক্ষয়জ্ঞ। আনি যে কত মুষ্টি দ'রে কত ভাবেই এসে ওর সংঘের  
 ব্যাহতন করতে চেয়েছে... আর সে কী অশ্রার ভাবে!... জাগ্রত অবস্থায়  
 আনি-সখকে, তাদের সখকে বাসনা উঠতে-না-উঠতেই দিয়েছিল যোধ ক'রে  
 —কিছু করলে হবে কি? —তারা প্রত্যেকেই এসে হাত পেতেছে এ স্বপ্নের  
 হিজিবিজি ভাঙবের মাঝখানে। আর সে কী নিলজ্জ উত্ত্বৃতি!  
 কোথায় বা তার অহঙ্কৃত স্বাবলম্বন-প্রবৃত্তি! কোথায় বা আত্মসম্মন,  
 পৌরুষ আত্মকর্তৃত্ব! লজ্জার তার শরীর কুদ্ধিত হয়ে ওঠে... অথচ  
 ভালোও লাগে, আশ্চর্য! সব চেয়ে বেশি হয় কোভ।... মনটা তার, না  
 আর কার? এ কী ব্যাপার? তা হ'লে মাফব করবে কী শুনি?  
 মাফব তার আচরণকে চিন্তা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, কিছু চিন্তাকে  
 নিয়ন্ত্রিত করবে কী দিয়ে?... ইচ্ছা? কিছু হায়তে, স্বপ্নে যে এই ইচ্ছার  
 কর্তৃত্বই যায় বিলুপ্ত হ'য়ে! শুধু কি তাই—স্বপ্নে এইসব পরাস্তব  
 জাগ্রতেও রেখে যায় তার মানি। এর উপায় কী? ও উঠে জেঙ্গিং  
 গাউন প'রে বালকনির রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়ায় এসে।...

সেখানে এক টুকরো বাক্য তাদের স্বরূপা স্বরূপে রাশি রাশি কেনার  
 বুকটে।—যেন বার্থ সব! চাপা প্রত্নাবের জ্ঞান আলো দিগন্তের বুক!  
 যেন রজনীর তামসী অনীকিনীকে বিদলিত ক'রে উর্দ্ধবাহ উদয়ের নিখল  
 চোঁটার জন্তেই এ জানিমা, নয়? চাঁদের টুকরোও তেমনি পরাস্ত ভঙ্গিতে  
 চেয়ে!... কয়েকটা তারা... এখানে ওখানে মেঘের তাড়নার বিমর্ষ।... সমস্ত  
 প্রকৃতি যেন ওরই মতন বুকভাড়া—মনমরা।...

ওর একটা খণ্ড-স্বপ্ন কেবল কেবলই মনে হয়—কিছুতেই তাড়াতে  
 পারে না। যতবার হঠিয়ে দেয় ততবার আসে ফিরে ফিরে। এক  
 একবার নিঃশব্দ হ'য়ে যদি বা কান্না হয়—কিন্তু সে অধিকের জন্তে।  
 ওং পেতে থাকে যেন—যেই একটু অসন্তর্ক করেছে সে-ই পড়েছে লাকিয়ে!

...সব চেয়ে...মুন্সি এই যে তার উপবাসী দেহ কামনিক চিন্তার নানা আহুতিতে একটু একটু ক'রে জলে উঠতে চায় যে! ...ঐ—বগুটা ফের আসে—ভাবতে ভাবতে ও ফের চকল হ'য়ে ওঠে।...প্রথমটার এর প্রতিরোধ করে...কিন্তু শেষটার স্রবভাবে এ-চাকলা বিলাসের ঘোঁতেই দেয় গা ভাসিয়ে...আর পারা যায় না। ভাবতে থাকে বগুটারই কথা। বাসনার স্বপ্ন

চকল হ'য়ে ওঠে ভাবতে ভাবতে। ওঠে।

\* \*

আনার শিয়রে সেই সবুজ আলো তেমনি জ্বলছে। পা টিপে টিপে স্বপ্ন ওর পালকের কিনারার সন্মুখণে বসে।...কী মনোহারিনী সৃষ্টি! চুল আরো বিস্তৃত...পায়ের উপর একটা কফল টানা...কিন্তু কঠোর কাছে সেটা খলিত হ'য়ে পড়েছে : ওর তর-হরিভাঙ ছাতি নিকমিক্ ক'রে উঠছে...স্বপ্নের বাসনা উদ্দাম হ'য়ে উঠল মুহূর্তে! সে উদ্দাম কামনার মধ্যে কোথায় বা খানিক আগের কোমলতা...কোথায় বা নিবিড় কাকলা...অগ্রকম্পা...বিবাহ! ...আছে শুধু এক লেলিহ স্মৃতি!...আর অস্বীকার করার পথও থাকে কই—দৃষ্টি ওর সহসা এমনি তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠেছে! ও স্মৃতি দেখতে পায় যে কে যেন তাকে চালাচ্ছে! অলচ প্রথমে তো কই এ-বাসনার সঙ্কে সত্যিই টের পায়নি মানিকর কিছু! এ বাসনা যে এসেছিল দরদ, উপকার, আরও কত কী কোমল ছয়বেশ প'রে!

স্বপ্নন রূপে ওঠে : কিছুতেই না। তার আত্মসন্ধান এখনো তো হুলিসাং হয়নি—এখনো সময় আছে!...কিন্তু হায়, পা যে ওঠে না!...ভাবু সে জোর ক'রে বিছানার কিনারা থেকে উঠে পড়ায়। অর্ধস্বপ্ন হ'য়ে

বলে : “না না না—আমার পক্ষে এ কাজ !! তার ওপর দখল আনার শরীর এত দুর্বল—ডাক্তার বলেছে।”

“খিক ডাক্তার!”—বাসনা কের বলে ওঠে চৈচিয়ে। কিন্তু তার পরেই তার উগ্ররূপ আসে নয়ন হ’য়ে। বলে : “কী ছেলেমানুষি করছ বলো তো? হেলার হারাচ্ছ? পরে অস্ত্রশোচনার মত হ’তে হবে মনে রেখো। জীবনে এ-সুযোগ বার বার আসে কি?—একবার পায়ে ঠেললে তো আসবেই না আর।”

“তা ছাড়া”—এ স্বর বলে—“এ-মানকে বিধাতার দান বলেই জেনো। অস্ত্রায়? কে বলে? কী?—বাসনা হচ্ছে ভ্রম? কোন্ সত্যরূপের নিকষে এটা ধরা পড়ল তুমি? আর ধরো যদি এ ভ্রান্তিই হয়—কী তাতে?” এ স্বর শেষটায় গর্জন ক’রে ওঠে : “ওরে মূর্ব, দেখ, ওই দেহলতা ওই যৌবন-সরস—পুষ্পতলা,—নবনীত-কোমলা—তবু এ-সুযোগ—”

স্বপন প্রাণপণে মুখ ফেরায়। আনার বিশ্বস্তা এলারিতা ঘোঁহুড়ি মুষ্টির কাছ থেকে তাকে পালাতেই হবে।—এরূপ তার বাসনাদীপ্ত ময়নের পক্ষে...

সে-স্বর বলে : “পালিয়ে আশ্রয়কা? মূঢ়! মনে নেই চাঁদের কথা? সে গেবেছিল? যদি পারিস—মরদের মতন বুক ক’রে জয়লাভ কর—কঁদে কোকিয়ে পালিয়ে এড়িয়ে কে কবে জীবন-সংগ্রামে সার্থকতার বহনমালা পেয়েছে?”

স্বপনের ভিতরের এক গভীর স্বর বলে : “এ-সময়ে পালাবো মানে কাপুরুষতা কেমন ক’রে?—মিথ্যার প্রলোভনকে ছুঁতে গেলেই ঠেঁকে পড়ি—না শৌর্যেই? বুঝতে পারো না কি, এর কবল থেকে স’রে যেতে কতখানি মনের জোরে দরকার করে?”

কিন্তু হার, তার চারদিকে কত বিরোধী বৃত্তি যে জিড় ক'রে পাড়ায় !  
তার দৃষ্টিশক্তি কানসা হ'য়ে আসে !...

তবু সে কীপন্থর শেষবার বলে : "কিন্তু তুমি না ওর অভিভাবক ?"

হঠাৎ—কোথেকে ও বৃকের মধ্যে বল পেয়ে যায় একবার । সত্য ।  
এ বে অসম্ভব, অসম্ভব, অসম্ভব । কথাটা বার বার মস্তের মতন উচ্চারণ  
ক'রে সে একটু জোর পায় । কোন প্রাণী দিয়ে কখন যে সহায় উদয়  
হয় !... সে দৃঢ় হ'রে ফের বলে : অসম্ভব । আমার বাসনা বতই উদ্দাম  
হোক না কেন ওর স্বাধ্বের কথা না ভেবে—ছি ! নিজের চোখে যে  
চিরদিনের জন্তে ছোট হ'য়ে যাব ।

বাসনা লোল জিহ্বা বিস্তার ক'রে বলে : "এতে কখনো কিছু হয় ?  
আজ্ঞা বিশ্বাস না হয়, ওকে আগিয়ে দেখো ।"

স্বপন ভাবে : "সেই ভালো ।" কিন্তু বিপুল লজ্জা আসে । কী  
খ'লে জাগাবে ওকে ? তবু নিজের চোখে না, ওরও চোখে কি চিরদিনের  
জন্তে ছোট হ'য়ে যাবে না ? ওর এত অসুস্থ পরীয়ে ওকে আগিয়ে...  
একবার ফের বল আসে ফিরে ।

না । ও ফিরবেই !...

ফিরবার পথে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে সেই লকেটটির 'পরে । খোলা । ও  
আর একবার চেয়ে দেখে । সঙ্গে সঙ্গে বৃকের মধ্যে সেই শব্দ কোমলতার  
বান ফের ওঠে ডেকে । না, লকেটটি আর দেখবে না । ওটাকে বন্ধ  
ক'রে দেওয়াই ঠিক । তবু ওর মূর্ধি আনার বৃকের...ঐ দুহুগুদ্র  
দেহলতার এত কাছে !...

হাত বাড়ায় ওটিকে বন্ধ করতে । কে বলে : "থাক্ থাক্ । তুমি  
স'রে গেলেই তো হয়"—কিন্তু কী এক অনান্য আশার বরচালিতবৎ ও  
লকেটটিকে ধরে চেপে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে শোনে আনা ঘুরের ঘোঁক-

কী বলছে। কার নাম?—ওর সমস্ত বুকের রক্ত মাথার শিখ শিখ করে উঠছে!...ওর যুথের খুব কাছে কান নিয়ে গেল। “স্বপন”—বলেই আনা একটু চুপ করে। খানিক পরে : *Que tu es cruel mon chéri !* \* •

স্বপন? স্বপন “নিষ্ঠুর”! একথা তো কোনোদিনই কেউ বলেনি। লোকে তো ওকে উচ্ছ্বাসীই বরাবর বলে এসেছে। আনার মনে এই খাবনাট থেকে যাবে ছাড়াছাড়ির সময়েও?—নিষ্ঠুর ও? বটে! ও পালকে আনার কম্পিত অধরের পরে হয় নত।

আনার ঘুম ভাঙল না—কিন্তু আশ্চর্য!—ওর হাত দুটি স্বপনের গলা জড়িয়ে ধরল। ঘুমের ঘোরেরেই? হ্যাঁ, নিশ্চিত আনা জাগ্রত স্বপনকে বুকে টেনে নিল। আর ঠিক সেই স্পর্শেই ওর ঘুম গেল ভেঙে। স্বপন মাথা তুলল। শুভৃষ্টি!

আনা মুহূর্তকাল বিহবল হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে; পরে হঠাৎ ওর পাংগু গায়ে জাগে রং, টোটার প্রান্তে হাসি : *“Viens chéri”* † বলেই ওর মুখ নিজের যুথের কাছে টেনে নেয় : বিচ্ছেদ আর বুঝি আসবে না সে-চুপনে।

আনার বাহুবন্ধন আরও নিবিড় হ’ল...আরও • আরও...

স্বপনের বুকের মধ্যে সেই স্বর শেষবার বলে : “এখনো সময় আছে।”

কিন্তু এমন সময় জীবনে কি আসে না—যখন সময় আর থাকে না?

আনা অশ্রুটলবে বলে : “এমো।”

স্বপন প্রাণপণে সংযতভাবে বলে : “কিন্তু—”

\* কুমি কী নিষ্ঠুর ছিল :

† এমো ছিল :

আনা বৃহৎ হাসে : “একটা রাতের জন্তেও ? হী ! Que tu es cruel caro mio !”

ওর মুখে তো কই বিবাদের বা আশঙ্কার বাস্যও নেই ! বাধভাঙা আবেগের স্রোতে সব কি গেছে গুরে মুছে উধাও হ’য়ে তেলে ?

সত্যি, এমন সময় জীবনে আসে—যখন আর সময় থাকে না !...

## সহসা

পূর্বের আকাশে একটা সরু সোনার রেখা...তার উপরেই একটি পাতলা ছাইরঙের মেঘের ভিতর দিয়ে স্নান একটিমাত্র তারা !...

স্বপনের মন অবসাদে গেছে ভ’রে !...“কী করলে আনা ?”

আনার মুখে শুধু ঝিকিমিকি : “কেন শেরি ?” বলোই ও স্বপনকে বাহ্যপাশে টেনে নিল ।

—“যখন জানতে—যে—”

—“কী ?”

—“এ-সময়ে মানে...পুরুষেরা কত দুর্বল ! তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি ।”

আনা শুধু হাসে !...তার ঠোঁটের কোণে প্রকৃততার আভা যার মিলিয়ে । এত লীল্যমান সে আভা !...

—“কী ? জানতে না ?”

—“জানতার স্বপন ।”

—“তবে ?”

আনা তাকে আরও কাছে টেনে নেয় অকূটে, —রানি হেসে বলে :  
“তবে কথাটার মানে কী গনি ?”



—“যখন জানতে যে”—অপন কথাই বুঝে পার না।

—“যে—?”

—“এ অসম্ভব।”

—“কই অসম্ভব? সম্ভব হ’ল তো বেশ।” করুণ নয়, চটুল হাসির পুনরাবৃত্তি।

—“না... মানে—এ সময়েও অপনের অপ্রতিভ বোধ হয় আশ্চর্য্য!

আনার হাসির মধ্যে রান জাতা আরও ফুটে ওঠে, কিন্তু বেশ সহজ ভরেই বলে : “জানি অপন, অত ‘মানে’ ব’লে বোকাবার ছুরকার নেই।”

—“তবে?”

আনা হাসে এবার : “কে—র তবে? তবে—তবে—তবে—  
—কী শুনি?”

—“যখন জানতে কতিপূরণ দেওয়া—মানে—আমার পক্ষে”—ব’লেই সে থামল।

—“অসম্ভব?”

অপন বাসিলে মুখ লুকালো। তার বুকের মধ্যেটা এত ভারি হ’য়ে ওঠে!...

আনা ছোর করে তার মুখ তুলে ধরে : “কতিপূরণের কথা মনে হ’ল কেন অপন?”

মিস্ত্রী।

—“আমি কি চেয়েছি কতিপূরণ?”

অপন তবুও কথা ব’লে পার না।

আনা অপনের মাথা তার বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে ব’লে বলে : “আমার কাছে যে এইটাই সব চেয়ে বড় লাভ অপন। কতিপূরণের দাবি করতে

পারো এক তুমি—কেন না কতি যদি কারুর হ'য়ে থাকে সে এক তোমার।”

—“আমার ?”

—“নয় ? তোমাদের কাছে এর চেয়ে পাপ কি আর আছে ?—  
পরকীরার দেহ !...বাপরে !”

স্বপনের বেধে...কী বলবে সে ?

—“আচ্ছা স্বপন ! তুমি অশ্লীলতা মানো না।”

—“না ! কাটিয়ে উঠেছি।” হঠাৎ এ কী প্রশ্ন ?

—“তুল কারো মিরো, তুল। অশ্লীলতার অশুচিবোধ বিশেষ তোমার  
প্রতি রক্তকণিকার। শুধু খাওয়া-ছোওয়া ছেড়ে সে একটু উজ্জ্বল হয়ে  
উঠেছে মাত্র।”

—“কিছু”—স্বপন ফের মাঝপথে থেমে যায়।

—“এতে পাপ কোথায় স্বপন ?” আনা হাসে—সেই রান হাসি...  
আরও রান।

নিরন্তর।

আনার সুখের হাসি বার মিলিয়ে : “স্বপন, তুমি না আর্টিষ্ট ?”

স্বপন প্রস্তোত্বক ভাবে তাকায় ওর সুখের পানে। আনার হৃদ  
আরও গাঢ়, আরও সুস্থ হ'য়ে আসে : “কল্পনা করতে পারো না কি  
একটা কথা ?”

—“কী ?”

—“যদি কোনো মেয়ে ছেলেকেবা থেকে শিকার পেয়ে এসে থাকে...  
শুধু শিকারী না, অশ্লীল ক'রে এসে থাকে যে, রান স্বপন যনকে সব চেয়ে  
বেশি টানে তখন তার দেহও এ-আকর্ষণকে প্রতি দেহকথা দিয়ে করতে  
চায় অশ্লীল ; যদি সে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে রাতের পর রাত...

অহুতব, এই আকাঙ্ক্ষার দেখে স্বপ্ন; যদি সে দিনের পর দিন, কেবল রাতের পর রাতের স্বপ্ন-পূরণেরই করে কামনা;—তা হ'লে—”

আনার স্বর ঈষৎ গাঢ় হ'য়ে আসে...সে আশ্বাসবরণ ক'রে গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বলে: “তা হ'লে এ বহুদিনের আশা-পূরণকে বিধাতার বরদান ছাড়া সে কি আর কিছুই ভাবতে পারে—যদি কোনো করুণাময় বরদাতা নরনারীর মিলনকে তুলে একদিন বর দিয়েই থাকেন? পারবে কি কোনো নারী-হৃদয়ের এ-ভাষা বুঝতে?”

স্বপ্নের বুকে কের অ'মে ওঠে সেই বেমনার মেঘ!..

আনা ওকে চুপন ক'রে বলে: “না, অহুতাপের কুআটিকার এ-ভাষার আলো কে মনে হয় আঁধার?”

স্বপ্নের স্বর তারি হ'য়ে ওঠে: “তোমার কি সত্যিই এর জন্মে কোনোদিন পরিতাপ—”

কথাটা অসমাপ্তই থেকে যায়।

আনা রান হাসে: “তাই তো জিজ্ঞাসা করছিলাম স্বপ্ন, তুমি কখনও কখনও শিখেছ কি না?”

স্বপ্নের কর্ণমূল উত্থাপ হ'য়ে ওঠে লজ্জার: “তোমার ভিৎসারের আমি অযোগ্য নই আনা—”

আনা হঠাৎ ওর মুখ নিজের কাছে টেনে নিয়ে গাঢ়স্বরে বলে: “না স্বপ্ন, মাফ করো।”

—“কেন আনা?”

—“বে-তুমি আমার জন্মে এত করেছ—এত দিয়েছ যে তোমাকে ভিৎসার করতে আমি সাহসী হয়েছি বলে—বিশেষ বেদনায় দোষ আনারই। আমি অতি—” তার পরে রক্তস্রাব স্বরের মধ্যে শুধু শোনা যায়: “হীন”।

—“তা কেন আনা? হী!” স্বপন ব্যগ্রভাবে খোঁকে গুর মুখের পানে।

আনা গুর মুখ তেলে দিয়ে বাগিশে মুখ লুকিয়ে বলে : “সত্যিই হীন, স্বপন। আমি জেনেওনে দিনের পর দিন ফলী এঁটেছি, অভিনয় করেছি।”

স্বপন ওকে আদর ক’রে কাছে টেনে নিয়ে বলে : “না আনা, তুমি তা পারো না।”

—“পারি স্বপন—তুমি জানো না মেরেগা কতটা অভিনয় করতে পারে। মেরেগা নিজেরাই জানে না অনেক সময়ে।”

—“কেন অধীর হচ্ছ দেখি? আমি কি তোমাকে জানি না যে—একথা—মানে, লম্বীটি আনা, হী! কেঁদো না। আমি একথা বিশ্বাস করতেই পারিনে।”

আনা অক্লবিকৃত কণ্ঠ পরিষ্কার ক’রে একটু সহজ হুরে বলে : “কোনটা পারো না? যে, নারী জন্ম-অভিনেত্রী? না, আমি সব অভিনেত্রীর সেরা?”

—“হি আনা, কেন অমন ক’রে অকারণ আঘাত ক’রে নিজেকে ভাঙ দাও হলো তো।”

আনা উচ্চত-অক্ল সংবরণ ক’রে বলে : “তর নেই স্বপন। তবে বিদায়ের আগে তোমাকে আমার বগতেই হবে একটা কথা—বহিও বলতে এতটুকু ইচ্ছা করছে না।”

স্বপন আদরের হুরে বলে : “তবে থাক না আনা।”

আনা মুখ কিরিয়ে চুপ ক’রে রইল। পরে তার দিকে বখন ফিরল তখন চোখের জল উপছে পড়েছে : “না, বগতেই হবে আমি দেখবার।”

—“কী এমন কথা ?” স্বপনের কোতুলে উদীর হয়ে ওঠে।

—“যে আমি আশ্রয় অভিনয় করেছি—কল কী হবে কেনেতনে।”

—“কখন !!”

—“এইমাত্র—যখন তুমি আমার খাটের ধারে বসে আমার বিজ্ঞপ্তি—  
আমাকে দেখছিলে।”

—“সে কি ? তুমি জেগে ছিলে ?”

—“আমি কি সাত্যাত ঘুমিয়ে কাটিয়েছি ভাবো ? কেবলই কামনা  
করেছি যদি তুমি একবার আসো ! একবার কি একটা ছুতো ক’রে  
তোমার ঘরেও গিয়েছিলাম। ভাগ্যে তখন তুমি ট্যান্সি ক’রে বেরিয়ে  
গিয়েছিল, তোমার ভ্যালিট বন্দ।”

স্বপনের বুকের রক্ত জরত বয় !...“সত্যি ?”

—“সত্যি, স্বপন। আমি সব ভাবই করতে পারি—এমন কি—”

বলতে বলতে ওর স্বপ্নের অশ্রুতে আসে আবিল হয়ে...“এমন কি...

আমার : ঘুমের ঘোরে তোমার নাম কড়াও...ভাণ। আমার সবই ভাণ

—ভাণ—ভাণ ! ভাণ ছাড়া আমার কিছুই নেই।”

ব’শেই ও কান্দতে লাগল হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে।

স্বপনের মন গভীর করণার ছেয়ে বার। সেখানে শুধু একটি মিড়ই  
ঝেঁকে উঠতে থাকে নানা রাগে নানা ভালে নানা অজকল্পার গমকে :  
“আমি !”

আনিকে ও কাছে টেনে নেয়। হঠাৎ আনা তড়িৎস্পৃষ্টের মতন  
জকে গ্রাণপথে ঢেলে ধরে। তার পরে জেগে ওঠে কাজা...সে কী  
কাজা !...ওর প্রতি দেহ অংশে-কারার হয়ে মেলার দৃষ্টি, প্রতি গ্রাণ অংশ  
তার কাছে বের ভাল।—

কিন্তু আতুল কণ্ঠে বলে : “হি আনা, শোনো, লম্বাটি ! আমি

তো—শোনো কথা একবারটি—আমি স্বপ্ন ক'রে কাছি আমি একটু কিছু মনে করিনি একবার। শোনো শেরি! কেন এমন অকারণ হুঃখ পাইব বলো তো? ছি আনা, শেরি! ওঠো—শোনো—অমন করে কি? আমি কথা দিচ্ছি—কিছু কী কথা দেবে? প্রতিশ্রুতি অসমাপ্ত রেখেই ও যায় খেমে।

আনার কারার উচ্ছ্বাস একটু কমে, ও বলে অশ্রুস্রাবের কণ্ঠে : “কেবল স্বপ্ন, এইটুকু জেনে আমাকে কমা কোণে...বে, সত্যিই বড় শ্রুততার মাঝখানেই এ অভিনয় করতে হয়েছে আমাকে...নইলে...তোমার বিবেক বুদ্ধিকে ধূলিসাৎ করতে কি আমার বাজে নি জাণো? যাকে এত ভালোবাসি”...ওর কণ্ঠের বাস্পাতাবে অশ্রু হ'য়ে আসে...বলে : “আমি অত ছীন নই স্বপ্ন, সত্যি বলছি, বিশ্বাস করবে না? করবে না?”

—“কেন করব না আনা? ছি। শোনো—”

আনার চোখ ফের জলে ভ'রে আসে। স্বপ্ন ওর চোখ বুদ্ধির দ্বারা তার কোমলতর কণ্ঠে বলে : “শোনো, আনা ছি, অমন আতুল ফোঁসো না শেরি! শেরি! তোমাকে আমি কখনো বিচার করব না—কোনোদিন—না না।”

—“করবে না, সে তোমার উদারতা স্বপ্ন, আমি তো আমার চোখে ছোট হ'য়েই রইলাম।” ফের তার কণ্ঠের তারি হ'য়ে আসে “তা ছাড়া এ তো নয়—বা বাজে সব ডেরে—”

স্বপ্ন সন্নত হ'রে বলে : “নয় কেন আনা? তোমাকে আমি কি কোনোদিনও ভুল করতে পারি মনে করে?”

আনা এর উত্তর না দিয়ে উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলে : “কেবল এইটুকু করতে চেষ্টা কোরো স্বপ্ন”...ব'লেই খেমে বলে : “কিছু...নই”

—“মানেকারের হাতে আঁটি আমাকে তোমার স্ত্রী বলে সঁপে দিয়েই গেলেন চলে। তোমার ড্যাংলট পৌছে দিয়ে গেল তোমার ঘরে।” বলে জোর করে মুখে হাসির অভিনয়-রেশ টেনে এনে বলল : “কিন্তু তোমার শোবার ঘরে—তুমিই নেই—তা আবার শেষ রাতে !”

অশ্বন লজ্জা চেপে কাঁচি হেসে বলে : “বাঃ—রাতে বুড়ি কেউ ওঠে না ?”

সন্ধ্যা হঠাৎ বলে বলে : “ওঠে—কিন্তু পাশের কোনো শোবার ঘর থেকে বেগোর কি ?”

অশ্বনের মুখ রাঙা হয়ে ওঠে ; সন্ধ্যা সামলে নেয় : “আনার ফের অমুখ বুড়ি ?”

মজ্জমান সাঁতার মাগছে তলসণ্ড চেপে ধরে, অশ্বন তৎক্ষণাৎ বলে : “হী, সাঁতারাত হাওয়া করতে হয়েছে। কিন্ত তবু—”

—“ঘুম এল না ?”

—“ঘুম তো ঘরের কথা—বা ছট্‌কটানি !”

—“অমুখটা কী—ঠিক ?”

—“পানিকটা তিষ্টিরিয়াই বলতে হবে—এইমাত্র বুজ্জা পেল ফের।”

সন্ধ্যা অসুটখয়ে চীৎকার করে উঠে বলে : “ওমা ! বুজ্জা ! চলো তো, দেখি।” বলেই এগোর ছুঁপা।

অশ্বনও এক পা এগিয়ে গুর কীধের শব্দে হাত রেখে বলে : “একটু দাঁড়াও, আগে আমার ঘর থেকে শেলিং সন্ট্”—

সন্ধ্যা অরিতচরণে অশ্বনের শোবার ঘরে ঢুকে গুর একটা ছোট্ট কয়াকো-মাক্কা হাতবার ও একটা আশানী হাতপাখা ছৌ মেয়ে তুলে নিয়েই এগুলো।...



## ব্রহ্মযজ্ঞ

প্রায় দশ মিনিট গেছে কেটে।

সন্ধ্যা আনার মাথা কোলে তুলে নিয়ে ক্রমাগত হাওয়া করছে। মাঝে মাঝে স্বপনকে এটা-ওটা ফর্দাস করছে : কপালের পটিটা ও-ডি-কলোনে ভিজিয়ে দিতে, শেলিং সন্টটা পরতে, নাকীটা দেবতে...

স্বপন একবার একটা প্রঙ্গের অবতারণা করেছিল ; কিন্তু সন্ধ্যা মুহূর্তে “শ্—শ্—শ্—” বলাতে থেমে যায়। ও খাটের কাছে একটা চেয়ারের খুব কিনারায় প্রায় আলগোছে বসে। প্রায়ই পটিটা ভিজোতে কুঁকতে লাগে যে।

আরও পাঁচ-সাত মিনিট এ-বিচিত্র ভঙ্গিতে কাটে ওদের।

• •

“মনাশি—শেরি—”\* বলে আনা চোখ মেলেতেই দৃষ্টি পড়ে বীজনময় সন্ধ্যার আনত মুখের 'পরে।

দৃষ্টি খোলাটে কপালে করেকটা রেখা চেঁটে খেলে যায় চকিতে। কিন্তু তাৎক্ষণিকও সেনা হিতৈষিতা নেই আর : রেখায়িত ললাট ফের হ'য়ে ওঠে নিস্তরঙ্গ। আনা গুঁমিত-নেত্র পানিককণ চেয়ে থেকে বিহবল হয়ে বলে : “স্বপন ?”

সন্ধ্যা ওর রেখময়ী কপালের পটিতে আরও একটু ও-ডি-কলোন ছিটিয়ে ইয়োজীতে বলে : “না, আমি সন্ধ্যা। আমার কথা হয়তো তুমি থাকবে।” তার মুখে স্বিড ঔৎসুক্যের বিহীনতা।

আনার অর্ধহীন দৃষ্টি মুহূর্তের অন্তে যেন প্রবুদ্ব হ'য়ে ওঠে—কিন্তু

\* বহু আবার, জির !



তকপি আবার ঘনায়মান মনোযোগ বিস্তৃত হ'য়ে যায় : "স-ন-না ? Vous ?" \*

সন্ধ্যা ইংরাজীতে কোমল সুরে বলে : "হাঁ। কিন্তু এসমতা নিয়ে এমন মাথা-মামানোর একটুও দরকার নেই। এখন চোখ দুটি বুঁজে একটু ঘুমতে তো।"

আনা বিবলভাবে চোখ বোজে।...হঠাৎ কৈশে ওঠে।...

বশন সন্ধ্যাকে উৎকণ্ঠিত সুরে বলে : "আবার মূর্ছনা না কি?"

সন্ধ্যাও চাপা সুরে বলে : "না না। চূপ। মূর্ছনা কেটে গেছে— একটু ঘুমতে দাও।"

বশন বাঁক্যমুঢ় ভঙ্গিতে একবার আনার মুখের 'পরে চোখা চাউনি রেখেই সরিয়ে নেয়। নিজেকে এমন হসন্তের মতন অকেজো বুঝি ওর কোনোদিন মনে হয়নি। যেন এ-অর্থ-স্পন্দিত জগতে কেবল ও-ই একলা নিঃসঙ্গ, নিঃস্পন্দ, নিরর্থক। যেন...

সন্ধ্যা ফিশ্ ফিশ্ ক'রে বলে : "পায়ের কাছের জানালাটাও খুলে দাও তো। বত হাওয়া চলাচল হয় ততই ভালো।"

বশন আদিষ্টবৎ ক'রে কের এসে দাঁড়ায় আনার শিরেরে। কিন্তু এবার আর বসতেও যেন ভরসা পায় না। মাপার মধ্যে চিত্তাভ্রাণে কেমন বেন এলোমেলো হ'য়ে গেছে।...বারবার শৌর্য্যাপর্ক্য গুপ্তপ্রায়। কার্য্য-কারণ যেন জগতে সবই আনুগা হ'য়ে গেছে, ভেঙে গেছে একটা আকস্মিকতার প্রবল কঁাকুনিতে।...ঐ কি আনা? আর এই কি সন্ধ্যা? বার খোঁশার উপর রাঙা সূর্যালোক পড়ে এমন অপস্রপ দেখাচ্ছে। ওর স্তম্ভম দেহলতা—যেন হয় যেন কোথায় সে—ক—বে

দেখা একপল্লভ নয়। ফেনা—অপট টিক যেন পরিচিতও নয়। সবই যেন কি একরকম ছায়ার ঘোমটা পরে!...এ-যোগাযোগ যেন...কী বলবে?—

অবাস্তব?...না, তার চেয়েও বেশি—

অসম্ভব?...তাই বুঝি এ ঘটল? বুঝি সংসারের মত ঘটনাই অবটল...অবিবাহিত...তুঙ্গ সব প্রাত্যহিকতার মধ্যেই কেমন যেন একটা মূল-হত্যাকলেশ আছে। তাই সব যোগাযোগেরই অস্বাভাবিক বিরুদ্ধাচার আমাদের চোখে পড়ে না।...

সন্ধ্যা বলে : “ও-ডি-কলোনের পেরালাতে একটু ঠাণ্ডা জল ঢালো তো এবার। একটু তাইলিউট করা মরকার এখন—মলটাকে কিকো করতে। বুঝবে কি না।”

অপন বহুচালিতবৎ আবেশ-পালন করে।...সন্ধ্যা আনার কপাল থেকে পটিটা তুলে নিয়ে পেরালায় জলে ভিজিয়ে আবার সঙ্গে আনার কপালে লেপে দেয়।...কী সহজ নৈপুণ্য!—অপন ভাবে!—যেন এ-সব ওরই ঘরবাড়ি—ওর আনা ছিল জাহাজে চ’ড়ে যুরোপ রওনা হওয়ার মুহূর্ত থেকে। এতটুকু আত্মপ্রত্যয়ের অভাব নেই তো! এত নতুন লাগে সন্ধ্যার এ রূপ!...কই বেশে তো এ-গৃহীগীর্ণনা ওর মধ্যে কোনো দিনও ফুটে ওঠেনি? আনা ওর চেয়ে বরষে দু এক বছর বড়ই হবে, কিন্তু আজ যেন ওর কাছে অসহায় সন্তানের মতনই লুটিয়ে পড়েছে। আর ও ও তুলে নিয়েছে তাকে ঠিক অসহায় শিশুরই মতন। হঠাৎ কের অপনের মনে গুহীকৃত হ’য়ে ওঠে অবিবাহিত। এ কখনো হয়!... বুঝি সবই স্বপ্ন - যেহনি হঠাৎ বলিয়ে উঠেছে তেমনি হঠাৎই যাবে উবে।... কি ভেবে ও নিজের চোখের পাতার হাত দেয়। কের চোখ খোলে। কই, সাকনের দৃষ্ট তো সন্ধানই বাস্তব রয়েছে! একটু হালিও পার বৈ

কি। সারারাত ঘুম উৎকর্ষা...তাই বুঝি তার চিকিৎসার এমনতর  
 অদোহালো ভাব? তাই বুঝি এ অতি প্রত্যক্ষকেও বার বার বলতে  
 হয় : এ স্বপ্ন নয় নয় নয়?—মন কেবলই চার ইন্ড্রিরের এজেক্টার? ...  
 ঐ তো সন্ধ্যার ময়ূরকণ্ঠী শাড়ীর পরে সোনার সূর্য্যাকিরণ বিক্ষমিক  
 করছে! ঐ তো ওর শাড়ীর গায়ে তারই দেওয়া "সাঁক" নামে ব্রোচটি  
 রাখা। "সন্ধ্যা" নামে ব্রোচ পরতে ওর আপত্তি ছিল—তাই স্বপ্ন  
 বিয়ের পরে সে আপত্তিকে এ-ভাবে এড়িয়ে গিয়েছিল—বাকে ও  
 হেসে বলত : camouflage! ঐ তো ওর যুগ্ম ক্র—বাকে নিয়ে সে  
 কত ঠাট্টা করত "পুন্পদিকিনী"র ধনুক ব'লে। তার বুকের মধ্যে কী-এক  
 রকম বেন করতে থাকে। সামনে আনা! আহা, বেচারি! কিন্তু  
 শুধু কি ওই?—তাকে যে কোলে ক'রে ব'সে—সে-ও কি সমান  
 নিঃসহায় নয়? না—স্বপ্ন মাথা নেড়ে বলে। কেন না ও যে সুন্দর।  
 ও যে ভেজবিনী। সময়ে ওর মন ওঠে চলে—সন্ধ্যার প্রতি যেতে চায়  
 ছুটে। কী আশ্বাস এ! তার ঘোলাটে মন বেন বিস্তারে যায়—  
 হিরবিহির মন আসে নিটোল হ'য়ে। কিন্তু ঐ—সেই সঙ্গে এক টুকরো  
 অহঙ্কার চূর্ণ যেও যে তার উপচীরমান চূড়কের অনাচে কানাচে ঘুরে  
 ঘুরে বেড়ায়—ওদের দুজনের পানে চাইতে ছোটো দৃষ্টিভঙ্গির বাধে সন্ধ্যাত!  
 নাগীর অসহায়তার প্রতি করুণা বনাম তার মহীরসী সৃষ্টির প্রতি সন্ধান।  
 কোন্টো বড়? কোন্টো ছোটকে বেশি তৃপ্তি দেয়? বুঝি প্রথমটা?  
 তাই হবে না। নইলে আনার রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকাতেও ওর  
 বুকের মধ্যে কোথায় একটা তারে এমন অপক্লম বেমনার মিড়ে সুধার  
 রাগিনী করে কেন?—তার উষর অস্তর উর্বর হ'য়ে ওঠে কেন?...

আরও কতকশ এইভাবে কাটে স্বপন জানেও না। হঠাৎ ওর চোখ পড়ে আনার মুখের 'পরে। চমকে ওঠে তার চোখ খোলা দেখে। সে-চোখে নেই দৃষ্টি, নেই স্বপ্তি, নেই বুদ্ধি।...উৎকণ্ঠিত-চিত্তে ও সে চোখ দুটির পানে চেরে থাকে। কিন্তু আশ্চর্য!—উৎকণ্ঠার সঙ্গে কোড়ালোরও একটুখানি উদরফটা না?

আনার চোখে ধীরে ধীরে যেন স্বপ্তিশক্তির পুনর্জাগ্রত স্বচ্ছ আভা ওঠে রঙেরে...বিহ্বল ঘোলাটে ভাবটা বার কেটে। কাকে যেন ধোঁজে! স্বপনের চোখের 'পরে চোখ পড়ে ওর।... একদৃষ্টে ও থাকে চেরে। ক্রমশ সে-চোখের স্বাভাবিক আসো-থিকমিক ক'রে ওঠে...কিন্তু বুদ্ধি ঘরে যে আর কেউ আছে সে-সংজ্ঞা নেই!...তাই কি ও হাত বাড়িয়ে নের স্বপনের হাতের দিকে?...

• স্বপন এমন বিব্রত বোধ করে!...তার মুখের প্রতি অণু যেন অল্পভব করে সন্ধ্যার তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি। স্বপন নিজের হাত দুটোকে কোন্‌র উপর যতটা পারে গুটিয়ে নের।...

কিন্তু সন্ধ্যার সঙ্গে অনিচ্ছাসত্ত্বেও দৃষ্টি-বিনিময় হ'য়ে বার যে কেমন ক'রে! ওর বীকা ফুক দুটি আরও বৈকে ওঠে। ভাবটা : হাও না হাত তোবার—কী ছেলেনাছবি করছ বলো তো! অগত্যা স্বপন আনার হাতের 'পরে হাত রাখে। উৎকণ্ঠায় সে ওর হাতটাকে ছুটো লাগতর যথো বন্দী ক'রে রাখে।...স্বপন স্পষ্ট অল্পভব করে একটা রক্তযোতের উৎসক্তি তার বাড় বেয়ে কপালে উঠছে। কান দুটো গরম হ'য়ে ওঠে!...কী অস্বস্তি বে!...প্রাণপণে সহস্র হবার চেষ্টা করে...বৃত্ত হাতটা দিয়ে আনার আঙুলের 'পরে সতর্পণে হাত ফুলাতে থাকে।...

আনা কীপবরে জিজ্ঞাসা করে : "Est ce que je me suis évanouie alors que vous me consoliez ?" \*

স্বপন বামতে থাকে । ঠিক এই সময়েই কি এমন প্রশ্ন করতে আছে !  
.. কহালে কপাল মুছে বাড় নেড়ে জানায়—হী ।

সন্ধ্যা স্বপনকে বাংলায় জিজ্ঞাসা করে : "কী জানতে চাইছে ?"

স্বপন বিপর্যয়ে গসি টেনে বলে : "এই—অর্থাৎ—মানে—তোমার নাম আর কি ।"

সন্ধ্যা ওর কানের খুব কাছে মূখ নিয়ে গিয়ে স্নেহভরে বলে :  
"স-ন্ধ্যা ।"

আনা চমকে ওঠে । মুহূর্তে ওর পূর্ণ সচিব ফিরে আসে । কী একটা ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যার চোখের পরে চোখ রাখে খানিকক্ষণ । পরে স্বপনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে : "Votre femme, n'est ce pas ?" +

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসু নেত্রে স্বপনের পানে চাইতে না চাইতে সে বলে :  
"কলছে তুমি আমার স্ত্রী বটে তো ?" সত্য কথাটা বলতে পেরে ও সহজভাবে হাসার চেষ্টা পায় । পারেও—এবার !

সন্ধ্যা বাংলায় জিজ্ঞাসা করে : "ও কি ইংরাজী বোঝে না ?"

স্বপন বাড় নেড়ে জানিয়ে দেয়—বোঝে । আনা তৎক্ষণি জিজ্ঞাসা করে : "Qu'est ce qu'elle demande ?" ‡

স্বপন এবার খুব স্পষ্ট কাটাকাটা সুরে ইংরাজীতেই উত্তর দেয় :  
"আমার স্ত্রী ইংরাজী জানে করাসী জানে না তো । তাই জিজ্ঞাসা করছিল তুমি ইংরাজী বোঝো কি না ?"

\* স্বপন তুমি আমাকে সাহসী নিজলে আমি খুব মুগ্ধ । বিরহিনী ।

+ তোমার স্ত্রী, না ?

‡ ও কী জিজ্ঞাসা করছে ?

আনা সন্ধ্যার মুখের 'পরে হৃদয় সবেদ ক'রে দীর্ঘে দীর্ঘে পরিকার  
ইংরাজীতে বলল : "হ্যাঁ, আমি ইংরাজী বুঝি সন্ধ্যা। তবু যে এতকল  
করানী ভাষার কথা কইছিলাম সেজন্তে আমাকে কথা কোরো। আমার  
মাথার মধ্যে এখনো কেমন কাঁকা কাঁকা লাগছে। এক একবার যেন  
সংজ্ঞা ফিরে আসছে, কিন্তু তারপরেই ফেরে যেন...কী বলব সব করসা।"  
শেষ কথাগুলোর মধ্যে বিবাদের বেশ এমন নিবিড় হ'য়ে ওঠে। ..

সন্ধ্যা সরেহে হুঁকে বলল : "কমা চাওয়ার কিছু দরকার নেই  
বোন—তুমি কেবল বেশি কথা কোরো না।" ব'লে ওর সেই মরোজো-  
মোড়া হাত বাজটি থেকে একটি ছোট খার্মস ক্লাব বার ক'রে তার  
চাকনিটি পুলল। সেটির মধ্যে একটি ছোট্ট পেরালা উলটে বসানো।

আনা জিজ্ঞাসা করল : "ও কী?"

—“একটু গরম চা মাত্র।” ব'লে সেই বাস থেকেই একটা চামচ  
বার ক'রে আনার মুখে শিশুর মতল পাঁচ-সাত চামচ দিল।

—“আরও একটু—”

আনা হাত তুলে নিরস্ত করে : “ধন্যবাদ। আমি অনেক সুস্থ  
বোধ করছি।”

সন্ধ্যা দুব বিজ্ঞ তৃপ্তির সুরে বলে : “এই-ই তো চাই। এখন একটু  
ঝুঁলেই পুরো সুস্থ হ'য়ে উঠবে।”

—“আমি কি এতকল তোমার কোলে মাথা দিই—”

—“হ্যাঁ, কিন্তু সেজন্তে একটুও উষেগ বোধ করার দরকার নেই।  
এখন দরকার শুধু পুরো বিজ্ঞান—যু।”

• আনা কীদ হেসে বলে : “অনেক ধন্যবাদ ; কিন্তু এখন দুসবারও  
সত্যিই দরকার নেই। 'চা-টা' থেকে বেশ ভালো বোধ করছি। থাক,  
আর হাওতা করতে হবে না। তুমি এত ভালো পেরি।”

সন্ধ্যা আপত্তি করে কি-একটা বলতে বেতেই ও হেসে বলে : “বাঃ, আমার প্রাণদাত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাতেও পারব না !”

খবর গুরুগম্ভীর আবহাওয়া একটু যেন পাতলা হয়ে আসে। ... ..  
আনা কিন্তু—বোধ হয় অজান্তেই—চোখ বোজে।

\* \* \*

আনা চোখ মেলে বলে : “এ কি ? এখনো হাওয়া করছ ? কের ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝি ?”

সন্ধ্যা হেসে বলে : “ওকে কি আর ঘুম বলে ভাই ? পনের মিনিটও হয়নি যে।”

—“তা হোক ! এবার তুমি আমার বালিশের ওপর আমার মাথাটা, বীয়ে বীয়ে রেখে বাও দেখি—বিশ্রাম করো গে নিজে।”

—“কখন কথা কইল : “কিন্তু আর একটু—”

আনা এবার বেশ পরিকার কণ্ঠে বলে : “না, আর ঘুমবার দরকার নেই। আর ঘুম হবেও না এখন। তা ছাড়া মাথাটাও বেশ ছাঁকা মনে হচ্ছে।” বলে সন্ধ্যার পানে চেয়ে বলে : “লক্ষ্মীটি, আর হাওয়া না। আনাকে বালিশে শুইয়ে দাও।”

সন্ধ্যা আনিতবৎ না করেই ওর চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে চালিয়ে দিড়ে লাগল।

আনা আরামের স্বরে অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে “আঃ” বলেই ওর হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে নিল টেনে : “খাক, অত সেবা সহিবে না ভাই আমার।”

সন্ধ্যা হেসে বলল : “কের শুনি ?”

আনাও হাসল : “খোঁসবার পাশা এবার বে আমার। বলো তো, তুমি কি আজই এলে?”

—“নইলে কি কাল এসে লুকিয়ে বসেছিলাম?”

—“পৌছুলে কখন?”

—“তোরা বেলা—ঠিক বখরী তুমি মূর্খা গেছিলে।”

আনার চোখে অভিনিবেশের আভা বন হ’য়ে উঠল, একটু ভেবে বলল : “হাঁ, সব মনে পড়ছে এবার একটু একটু ক’রে। কিন্তু যোলো—তোমার জাহাজ তো পরন্ত সকালে মাসেলুসে এসে পৌছবার কথা ছিল; না?”

সন্ধ্যা হাসিমুখে বলল : “সংবাদ নিভূল; তবে আমি ইজিপ্ট থেকে ক্রালে এয়ারোপ্লেনে এসেই সব হিসেব তোমাঘের ভেত্রে দিয়েছি।” ব’লে স্বপনের দিকে চেয়ে বাংলায় বলল : “নইলে আরও ছদ্মিন সময় পেতে।”

স্বপনও বাংলায়ই বলল : “কী বে বলো সন্ধ্যা!”

আনা কিন্তু ঠাট্টা কানে তুলল না, হঠাৎ স্বপনের দিকে কিয়ে প্রশ্ন ক’রে বলল : “Est ce qu’elle m’a vue dans vos bras?”

স্বপন সন্নত হ’রে বলল : “Mais non, restez tranquille. Il n’y était personne ici alors?”

স্বপনের দিকে সন্ধ্যা প্রশ্নোৎসুক মুখে চাইতেই ও অস্বাভাবিক বাংলায় বলল : “ও জিজ্ঞাসা করছে : এতটা উড়ে এসে তোমার তো তা হ’লে বড় কান্স লাগছে!”

সন্ধ্যা ইংরাজীতে বলল : “একটুও নয় তাই।”

• ও কি আমাকে তোমার বাহুবন্ধনে দেখেছিল?

• না পো না, ওখানে কি তখন কেউ ছিল যে দেখে?



আনার চোখে না-বোকার তার ফুটে উঠল। একটু আশ্চর্য্য হয়ে সন্ধ্যা বলল : “তুমি ওকে বলছিলে না আমি বড় ভ্রান্ত হয়ে এসেছি ?”

আনা তখনও যেন ঠিক বুঝতে পারে না ;—অশ্লীল তাড়াতাড়ি ইংরাজীতে বলল : “না, বললে না এইমাত্র যে, সন্ধ্যা এতটা পথ এগিয়েছিলেন এলে নিশ্চয়ই খুব ভ্রান্ত আছে ? দেখ দেখি, এখনও সব কুল বন্ধ—তবু বসো যে, বিজ্ঞানের আর দরকার নেই।”

আনার চোখের বিহ্বল ভাবটা কেটে গেল...সে বলল : “হা হা—কলিলাম বটে।” ব’লেই চোখ বুজল। অশ্লীল ঘাম দিয়ে অর ছাড়ে।

সন্ধ্যা নতুনভাবে বাতাস কর্তে থাকে।...ওর মস্তক ললাটে কেবল থেকে থেকে দু-একটা রেখা ফুট হয়ে ওঠে যেন—আবার বার হিলিয়ে।

হঠাৎ আনা চোখ মেলে। অশ্লীল ফের অর হয়ে ওঠে...চোখে সে অজ্ঞান যে আবার ঢেকে গেছে ! যেখানে বাঘের ডগা—আনা ব’লে বলে : “Vous êtes sûr qu'elle ne le sait point ?” \*

অশ্লীল দ্বিগত বোধ করে এত ! আনা করছে কী ? বার বার এরকম করলে...

সন্ধ্যা বলে : “কী করছে ?”

অশ্লীল হেসে বলে : “করছে তুমি খুব বাহাদুর মেয়ে বৈ কি।”

আনা বলে : “Qu'est ce que vous lui-dites ? J'espère que mon évanouissement—” \*

\* তুমি নিশ্চয় জানো যে যে ও একজন কিছুকিছরের জানে না :

। তুমি ওকে কী করছ ? আনা বলি আবার সূক্ষ্ম—

অশ্বিন এবার উষ্ম উষ্ণার সুরেই বাধা দিয়ে ব'লে বলে : "Parlez anglais, je vous en prie, et ne posez pas de telles questions embarrassantes." • ব'লেই ফিরে হাসিমুখে সন্ধ্যার পানে চেয়ে বাংলায় বলল : "আনা বলছে কি জানো ? বলছে ওর এয়ারোপ্লেনে চড়লেই মাথা ঘোরে ।"

কিছু সন্ধ্যার মুখের উপর কখন যে মেঘের ছায়া এসে গেছে !—সে আনার দিকে চেয়ে একটু হেসেই বিমনা হ'য়ে কী ভাবতে ভাবতে পাখা করতে থাকে । অশ্বিনের মনে এমন উৎকণ্ঠা আসে পড়িয়ে !—তাকাতাকি ইংরাজীতে বলে : "আনা, সত্যিই তোমার একটু ঘুঘোনো দরকার এখন । ডাক্তার দিয়েও তো বলেছেন জানই যে, তোমার সব চেয়ে বেশী দরকার এখন বিশ্রামের ।"

সন্ধ্যার মুখের শুক ভাব কোমল হ'য়ে এল : "হ্যাঁ, সত্যি । তুমি একটু ঘুমও তো বেশি । লক্ষীটি !"

আনা নিম্নলিখিত নৈরে বলল : "না—না ।"

অশ্বিন বলল : "না না বললে শুনব না । ঘুমতেই হবে ।"

আনা ফের চোখ মেলাল : "কী ?"

সন্ধ্যা বলল : "কিছু না । একটু ঘুমও বেশি এখন ।"

আনার চোখে হঠাৎ জল উপড়ে পড়ল : "তুমি এত ভালো, বোন ।"

সন্ধ্যা "হি" ব'লে ওর চোখ মুছিয়ে বেহানজনুখে হাওয়া করতে থাকে ।

আনা ওর হাত চেপে ধরে : "আর হাওয়া করতে হবে না ।"

• বলা করে ইংরাজীতে কথা বলে এখন, সোচ্চারি, আর এ-বক্তব্যের এক কোঠো না—  
যাতে অজান্তে বিস্তৃত হোখ করতে হয় ।

সন্ধ্যা আদর ক'রে ওর হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে :  
 “না সুমলে করবই হাওয়া।”

—“তা হ'লে আমার বালিশের ওপর—”

—“আচ্ছা” ব'লে সন্ধ্যা সম্ভরণে ওর মাথা নিজের কোমরে থেকে  
 আঁখিরে বালিশের খাঁজের মধ্যে ভুত ক'রে দেয়। আনা চোখ বোঁদে...  
 বীরে বীরে ওর নিঃশ্বাস দীর্ঘচ্ছন্দ হয়ে ওঠে।...

সন্ধ্যা হাত-পাখা রেখে দেয়।...বশনের সাথে ওর দৃষ্টিবিনিময় হয়...  
 দুজনেই তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বাইরে সমুদ্র  
 দিকে চেয়ে থাকে। সেখানে সবুজ চেউ আলোর তালে তালে নে  
 চলেছে : খেলা খেলা খেলা !...বশন তাবে !...The world is but  
 stage...রঙ্গমঞ্চই বটে !

আর সন্ধ্যা ? সে কী ভাবছিল ?...সে উঠে দাঁড়ায়।...বশনও।

## উন্নয়ন

সন্ধ্যা প্রসাধনকক্ষে। বশন তার ঘরের সামনেকার অর্ধচন্দ্রাকৃতি  
 ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়।...

সামনের সবুজ-নীল জলরাশি চলেছে শ্রান্তিহীন সীমাহীন কল্লোলে—  
 উচ্ছল নৃত্যতন্মে। একটা প্রকাণ্ড জাহাজ মন্থরগতিতে চলেছে ভেসে।  
 করেকজন যাত্রী উদাসভাবে ডেকে ব'সে। সূর্যোদয়ের অনেকখানি উচুতে  
 উঠে পড়েছেন। অলক্ষিতে। তবু একটা প্রকাণ্ড মেঘ আশা ছাড়েনি :  
 ধরণীর জলপি বন্ধকে হুমরাহ করবে এই তার পল।...দেখতে দেখতে সে  
 আশাশেখের শুভ্র পদাতিবর্ষের জড়ো ক'রে গড়ে বল।...সূর্যের হাসি বার  
 ডেকে।...সবুজের বুকও কালো হয়ে আসে। অকোয় নামে অন্ত-আভা !

ও চেরে চেরে তাবে!... এই-ই বুঝি জীবনের রূপ : একটুখানি আলোর বিকল্পে বিশ্বগ্রাসী অমোচ্যের বিজয়ান্তিক্য! একটুখানি সত্যের পিছনে পক্ষতপ্রমাণ মিথ্যার মাধ্যাকর্ষণ!...নইলে...ছি! সন্ধ্যা এসে পৌছতে না পৌছতেই হুক হর অভিনয়!...ও কি যুগতে পেরেছে?

কিন্তু যদি না-ও পেরে থাকে তা হ'লেই বা কী? সন্ধ্যার সঙ্গে যে মিথ্যা অভিনয় ওদের হৃদয়কে আজ প্রথমেই করতে হ'ল—বিশেষ করে সন্ধ্যার শুভ্রতার প্রতিদানে—সে তো মিথ্যেই হ'য়ে রইল!

কেন এমন হয়? কেন যত মিথ্যা, যত ভাণ, যত ভর এই এক সখকের বেলায়ই আসে ভিড় ক'রে? যদি প্রেমে দূত কিছুই না থাকে—যদি এতে লজ্জাকর কিছু না থাকবে তবে শুধু এই সখকের কেনেই বা এত ঢাকাঢাকি কেন?

তার মন রুট হ'য়ে ওঠে প্রথমটার : ঢাকাঢাকিটা যে যায়।—কিন্তু মায়ার দূত হ'ল কেন সখকটা?—সমাজ যে দূত ক'রে দাঁড় করিয়েছে।

নইলে প্রেমে লজ্জা পেত কে?—স্বপন ভোর ক'রে বলে।

কিন্তু তাই কি সত্য? সমাজ অস্ত্র কোনো সখককে দূত ক'রে দাঁড় করাতে পারল না শুধু এই সখককেই পারল? ঘোড়ার পিঠের এমন কিছু গুণ আছেই যাতে সওয়ার চড়তে পারে। চড়ুক তো দেখি সে বাঘের পিঠে?...ঘোঁ-সখকের মধ্যে এমন কিছু আছেই আছে বা কলুবিত হয় সব চেরে সহজে। ঘোঁ-সখকের গোড়ার কোণায় একটা গলদ আছেই আছে লুকিয়ে—যার জন্তে সত্য, সত্যনিষ্ঠ মানুষও খোলাখুলি ব্যবহার করতে পারে না। অথচ মানুষ চার সরল সহজ খোলাখুলি ব্যবহার! তাই বিবাহের প্রকান্ত পাঞ্জা দিয়ে পক্ষণের গুপ্তচর-বৃত্তিকে ধানিকটা নিরস্ত করার এত পত প্রয়াস সব বেশেই। তাই কি?

কিছু বা। কিন্তু হ'লে হবে কী...এই যৌন প্রযুক্তিটাই এমন পোলায়েলে, এমন বিশৃঙ্খল যে, ওর এলাকার এলে মানুষ কোনো স্বকম স্বয়ং ব্যবহারই সার দেয় না। মিথ্যা, অর্দ্ধসত্য, ভয়, ভাণ, আতিশয্য, অভিনয়—এ সবের ওঠাপড়ার চায় সে একটা ছায়ায় রস। প্রেমের তৃপ্তি ? —চিরন্তনতা ? ওর ওঠ কুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে ।...দূর্ব। একটা চৌপ বই আর কী ? তৃপ্তি ওতে আছে কি ? আছে একটু হয়তো—প্রথমটার—একটু “পরোমুখ”। কিন্তু পরে ?—এর দলগুলি জল-থেকে-তোলা-পদ্মপাতারই মতন দেখতে না দেখতে যায় না বিবর্ণ হ'য়ে ? কত কবিত্ব, কত রঙ-চঙ, কত চালচিহ্ন—কিন্তু হায় রে !...প্রেমের বিজয়া দশমী আসেই একদিন না হোক দুদিন না হোক তিনদিনের দিনে ।...মানসী-প্রতিমা যে পূজার অযোগ্য—তাই না পদে পদে জগৎজোড়া আশার ভরাডুবি...অপ্সর ! জীবনের অস্তসব দুঃখ সওয়া যায়—অপ্সর জগতের অঙ্গুষ্ঠ সাধনায়। কিন্তু অপ্সর জগৎ বধন বাস্তবের টিটকিরির চাপে হার মানে—তখন ? তখন হাত পাতবে মানুষ কার কাছে ? তার মনে পড়ে, চাং-ও একদিন এই কথাই দুঃখ ক'রে বলেছিল। বলেছিল যে মহাকবি দাস্তে তাঁর স্বর্গোচ্ছ্বা বলেছেন যেটে যে :

সুখতার সত্য বত রাজে চির-গহন-কন্দরে

সুখক-ময়নাগীত ; তাই শুধু আছা অজমাদ

খোদে অহনিশ : “তারা আছে—আছে ;”—নিষ্ঠার নির্ভরে

ভিত্তি করি' তুজ বয় রচে তারই দ্রাব্যাক প্রাণাধ। \*

\* Le profonde cose

(Che mi largiscono qui la lor parvenza,)

Agli occhi di laggiu son si nascose.

Che l'esser lor v'e in sola credenza,

Sovra la qual si fonda l'alta spene.

কিন্তু—চাঁৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলে করেছিল—এ-নির্ভরের ভিত্তিই যে  
এ-বৃত্তিকর্জর যুগে টলমল ক'রে উঠেছে। নিষ্ঠা দাঁড়াবে আর কোথায়?...  
তাই তো আজ ওর এত ব্যথা বেজেছে! সন্ধ্যাতে অভ্যর্থনা করতে  
হ'ল ওকে মিথ্যার উপচার দিয়ে!—বাক্যের তার অমোঘ পাবাণ-কঠিন  
বিজ্ঞপ-বাণে প্রেমের শেলব মহিমাকে শতছিন্ন ক'রে দিয়েছে যে! যে-সন্ধ্যা  
এত আশা ক'রে সাগর-পার থেকে ছুটে এসে ওর কাছে—তাকে কিনা  
করল ও প্রবন্ধনা?

আর এমন সময়ে প্রবন্ধনা বলেন—সে আনারই শুভবারতা!...ওর  
মন ওঠে তারি হ'য়ে। কেন এসে সন্ধ্যা?

\* \* \*

হঠাৎ একটা থম্ থম্ শব্দে ও চমকে ওঠে। ঠিক ওর পিছনে সন্ধ্যা  
দাঁড়িয়ে—বালকনির রেলিঙে ভর দিয়ে! বাঃ, শাড়ী বললেছে যে!...  
কী অপূর্ণ নীলাসরী! আর কী মধুর এ চিরপরিচিত বেনারসী শাড়ীর  
থম্ থম্ ধ্বনি! মনটা হ'য়ে যায় পালকের মতন লবু!—যদিও একটু  
অসুভাষও হয় : কী বলছিল একলি—কেন এসে ও?

## দৌহে

সন্ধ্যা অসুট সুরে চীৎকার ক'রে ওঠে : “এ কী?”

—“কী?”

—“একটা গরম সেজিও গরোনি, অথচ জ্বলিৎ গাউনটির বুকোর  
কাছটা একেবারে খোলা!”

—“তাহে কী?”

—“ভাতে কী—মানে? জোলো হাওয়া বইছে না? দেখ ছেয়ে আসেনি? ঐ দেখ—”

সত্যিই টপ্ টপ্ করে বড় বড় কয়েকটা ফোঁটা পড়ল। গাছের পাতার পাতার স্বর্গের শব্দ উঠল জেগে।

—“এসো এসো ভেতরে—” স্বরে সেই বয়স্কাদের পরিচিত সত্ৰাস সন্তোষ আহ্বান।

—“আহা—এ সামান্য বৃষ্টি।”

—“কে—র সেই বাঁচাহরি চাল? বৃকে ঠাণ্ডা ব'লে যদি নিউমোনিয়া হয়”—বলতে বলতে সন্ধ্যা ওকে হাত ধরে জোর করে ঘরের মধ্যে টেনে এনে শার্শি দিল দড়াম করে বন্ধ করে।

—“করো কী? অত জোরে শার্শি বন্ধ করে?”

—“আমার ইচ্ছে।”

—“তা হ'লে ঠাণ্ডা লাগানোও আমার ইচ্ছে।”

—“নাহিল্লর।”

—“জ্বর শার্শি জ্বাম করা-রূপ পাশের বেলা?”

—“গোটেল মানেজারকে কিছু দণ্ড দেবো না হয়।”

—“নিউমোনিয়া হ'লে ডাক্তারকে কিছু দণ্ড দেবো না হয়।”

সন্ধ্যা হাসল: “তা বটেই তো। এখন যে বিনি-মাইনের নার্স আছে—ভাবনা কি?”

হলন ওর গালে ঠোনা ঘেরে বলল: “ঈশ, বড় নার্সিং বিজ্ঞান অইজ্ঞার—না?”

—“না হবে কেন শুনি? বিজ্ঞা কবে হয় আশ্র-অচেতন?”

—“কিছু ওগো সচেতন! আমার কাছে থাকলে যে এ-বিজ্ঞা অচেতন হ'য়ে পড়বে প্রবোধের ফর্ম না পায়।”

—“আ—হা—ম’রে বাই। যে ভীম ভবানীর শরীর!”

—“নয়?”

—“কত কেরামৎ জানো রে বান্ধা, কত কেরামৎ জানো,

মাঝ দরিয়ায় জাল ফেলে ডাঙায় ব’লে টানো—

বলি, ঘরে কি একখানা আগনাও নেই ছাই! না, সোনার-বরণ  
কালীমূর্তি হ’য়ে গেলেও এ উলটো রাগীর দেশে প্রতি জুরোরাগীর চোখের  
আগুনায় উলটো রঙ কলে?”

বপন থম্কে যায়। সন্ধ্যা ওর মুখের পানে তাকায়। ও মুখ নিচু  
ক’রে বলে : “সন্ধ্যা!”

—“কী?”

—“আজ আনার সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম—”

সন্ধ্যা উৎসুক হয়ে বলে : “তখন কী?”

বপন স্বীকারোক্তির তোরণবারে এসে হ্রস্ব বদলে ঠাট্টার হয়ে বলে :  
“বলব কেন?”

সন্ধ্যা ওর চোখের ‘পরে অচঞ্চল দৃষ্টি নিবদ্ধ ক’রে বলে : “তাবছ  
পীড়াপীড়ি করব—কোতুলে?”

ওর হ্রের মধ্যে কি-একটা অপ্রত্যাশিত রেশ বেজে ওঠে যেন...  
বপন ভবুও ঠাট্টার হ্রের জের টেনে বলে : “মেরেমেরও বুদ্ধি সময়ে সময়ে  
অ-মেরে হ’তে ইচ্ছে হয়—কোতুল তাদের পছন্দেই এইটা প্রমাণ করতে?”

—“না।” সন্ধ্যার হ্র অকম্পিত।

বপন এবার উৎকর্ষ গোপন করতে পারল না চোটা সবেও : “অবে?”

—“আরি জানি।”

বপনের হ্রের মধ্যে স্পন্দনের গতিবেগ বেড়ে গেল, কিন্তু ভবু সবুহুরে  
বলল : “জানো মানে?”



—“আমার শেষের দু-একটা কথা আমি একটু বৃক্ষে পেরেছিলাম।  
আলবার আলো মাস দুই করাসী পড়েছিলাম যে।”

স্বপন কাউন্সিলি হেসে বলল : “তাই নাকি!—কিন্তু যদি বলি,  
অল্পবিজ্ঞা ভরকরী—তাই উলটো বুঝেছ, বা ভুল শুনেছ?”

সন্ধ্যা একটু চুপ করে থেকে বলল : “শুধু অল্পবিজ্ঞা পণ্ডিতের  
সবল থাকলেও বা সেটা সম্ভব হ’তে পারত।”

স্বপন তবু শেষ চেষ্টা করতে বন্ধপরিকর হ’য়ে বলল : “অন্ত কি এমন  
সবল থাকতে পারে শুনি?” স্বরে তার করাসী ‘রাগ’। \*

—“থাকতে পারে—নয়, ছিল।”

—“কিসের?”

—“চোখের সাক্ষ্যের।”

স্বপন শুধু কণ্ঠকে প্রাণপণে সরস করবার চেষ্টা ক’রে বলল : “চোখের  
সাক্ষ্য—মানে?”

—“যে-মুহুর্তে আমার শোবার ঘর থেকে তুমি বেরিয়েছিলে  
সে-মুহুর্তে মুখের পানে কোনো মুখোষই ছিল না—এই।”

স্বপন বিপন্নমুখে বলল : “সত্যিই আমি—মানে আমার অস্থ—  
অর্থাৎ ও মুচ্ছা গিয়েছিল বলেই ওর ঘরে গিয়েছিলাম।”

সন্ধ্যার চোখ দুটিতে অশ্রু উথলে উঠল, সে তাড়াতাড়ি মুখ নিচু  
ক’রে বলল : “আমি কি তোমার কৈফিয়ৎ চেয়েছি সিসি যে—নিখোর  
পর মিথ্যে—” বলেই বর বর ক’রে কঁদে ফেলল।

স্বপন ওর কাছে স’রে এসে ওর দুটা হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে  
টেনে নিয়ে বলল : “আমার ক্ষমা করো সন্ধ্যা! কিন্তু হয়তো তুমি  
জানো না যে, মিথ্যার আকর্ষণে একবার পড়লে আর পারের নিচে

সহজে সত্যের মাটি খুঁজে পাওয়া যায় না—এক নিখোর পাক থেকে আর-এক নিখোর পাকে হাবুডুবু খেতে খেতে উষাও চলতেই হয় ।”

সন্ধ্যা ওর কাঁধে মাথা এলিয়ে দিল । রক্ত কারার ওর দেহ খর খর করে কঁপে কঁপে উঠতে লাগল । শব্দন শুকে বুকে টেনে নিল ।...

• • •

ঘরের দুয়ারে টোকা ।

—“কে ?”

—“চা দিয়ে বাব মসিয়ে, না কফি ?”

—“কী, সন্ধ্যা ?”

—“কফি আমার অভ্যাস আছে ।”

—“কফি । আর অমেনেট—s'il vous plait ।” বাইরে দুইয় সঙ্গে গাছের পাতার সঙ্গত অশ্রান্ত রাগিণীতে মগ্নরিত হ'য়ে উঠেছে ।...

## বাস্তব

—“বাঃ, ও ডিমটা ?”—

—“এর ওপর ?” সন্ধ্যা চোখ কপালে তোলে ।

—“তা হ'লে ঐ পরম দুধটুকু ?”

—“না, লক্ষীটি মিলি । কফির সঙ্গে কতখানি দুধ বেয়েছি তার খবর রাখো ?”

—“তা হ'লে ঐ বার্শালেন্ড—”

—“বাবা—বাবাঃ ! বিশেষত্বের গুরুত্বপূর্ণত্বও যদি সেই নাহোড়বন্ধ চং এক ভিন্ডও করতে !”

স্বপন ককির পেয়ালায় চট্ট করে মুখ ঢাকল।

সন্ধ্যা রুটিতে মাখালেড মাখাতে মাখাতে বলল : “কম্বা। ভুলে গিয়েছিলাম যে এদেশের শিষ্টাঙ্গের এ-বিষয়ে গুরুমারা বিস্তে।”

স্বপন ককির পেয়ালা সরিয়ে রেখে বলল : “এ-কথাটা ঠাট্টা করেও না বললে পারতে কিন্তু সন্ধ্যা।”

সন্ধ্যা স্নেহে আহত সুরে বলল : “একটা ঠাট্টায় তুমি এমনভাবে দপ্ করে উঠবে জানলে—” ব’লেই থেমে বাইরের সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল।

স্বপনের চোখ ওর চোখকে খোঁজে...কিন্তু তখন সন্ধ্যার দৃষ্টি দূরনিবদ্ধ...যেন ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তির অস্তিত্বে ওর চেতনার পটে ছায়াও পড়ছে না।

স্বপন উঠে সন্ধ্যার চেয়ারের হাতলের ওপর বসল। ও তবু বাইরের দিকে সেই একভাবেই চেয়ে।...

স্বপন ওর বাহুতে হাত রাখল।

সন্ধ্যা কাঁড়া দিয়ে বাহু সরিয়ে নিল।

স্বপন ডাকল : “সন্ধ্যা !”

নিরুত্তর।

—“কথা কইবে না ?”

ভবুও নিশ্চুপ।

—“তা হ’লে আমি বাই—স্বপন তুমি আমাকে ডাক না।”

স্বপন দুয়ারের পানে এগোলো। কিন্তু যেতে একটুও যদি হচ্ছে থাকে ! অথচ একটা ছুতোও কি ছাই মনে আসে !

সন্ধ্যার দুয়ারের হাতল ঘুরলো শেষটায়। কী আসল ! একটু শব্দও করুক হাতলটা—তাও না। আসবাবপত্রও তার দিকে বক্র

করেছে আজ !... অগত্যা বলল : “আমি হয়তো হুপুজবেলা এখানে যাব না।”

• সন্ধ্যা ঘাড় ফেরাল : “সে কি ? এ বাবলার বেকজ না কি ?”

তখন মুকলবারে বুড়ি হুক হয়েছে।

—“নইলে করি কী বলো—যখন তুমিও নন-কো-অপারেট হুক ক’রে দিলে।”

সন্ধ্যার চোখে জল ভ’রে এল। সে বলল : “তার মানে তোমার ঘর থেকে আমিই তোমাকে তাড়ানছি, এই তো ? আজ্ঞা কাক কী ? তুমিই থাকো, আমিই যাই।”

বপন হাসল সন্ধ্যাকে উঠতে দেখে। সন্ধ্যা বলল : “তাবছ পারব না ?”

—“আমি ও-সব কিছুই ভাবছি না, তাবছি শুধু একটি কথা।”

—“চাইনে শুনতে।”

—“তবু শুনতে হবে। তাবছি : এখনো কি ঠিক তেমনিই অভিমানিনী ! একটুও বদলাওনি।”

সন্ধ্যা রাগত: হয়ে বলল : “আ—হা। যেন নিজের ক্ষুদ্র ব্যবহার একটুও বদলেছে।”

—“রুচ !”

—“আকাশ থেকে পড়লেন ! হবে। আমরাই বুঝতে পারি না তোমাদের ভালো ব্যবহারের দুর্গম রহস্য। বাঙালিনী বই তো নই !”

বপন গম্ভীর হ’রে সেল, বলল : “কী ছেসেমাছবি করছ বলো তো ! ও তো কাল-পরন্তই চ’লে যাবে।”

সন্ধ্যার ঠোঁট দুটি ধরধর ক’রে কেঁপে উঠল : “আমি কি তাই চাইছি ?”

—“তবে কী চাইছ তুমি ?”

সন্ধ্যা একটু চুপ করে থেকে বলল : “বললে কি সহিতে পারবে ?”

স্বপন কুণ্ঠিতভাবে বলল : “বলোই না।”

—“ঐ তো,” সন্ধ্যার মুখে বাকা হাসি, তার পরেই ও গভীর হয়ে বলল : “সিসি, একটা কথার খোঁজখুলি জবাব দেবে ?”

—“কী যে বলো তার ঠিক নেই। আমি কি নাটুকেপনা করবার শপথ করেছি যে দেব না বলে এত সন্দেহ ?”

—“আজ্ঞা, তা হ’লে নির্ভেজাল সত্যি উদ্ভার দাও : আমি আমার ভূমি খুঁসি হয়েছে, না—না ?”

—“কী যে প্রশ্নের ভঙ্গি! তবু যদি—”

—“না, এড়িয়ে গেলে চলবে না। আন্ট গ্রেস কন্টিনেন্টে বেড়াবেন ছ’মাস।” = বলতে বলতে ওর গলা ধরে এল : “তিনি আমাদের সঙ্গে নেবেন—বললেই। তাই যদি সত্যিই আমার অধিকার-প্রবেশ হয়ে থাকে—”

—“তুমি কি পাগল হয়ে গেছ সন্ধ্যা ? চলো বসবে সীটের লাউজে।”

• •

লাউজে দুজনে দুটো পাশাপাশি কাউচে বসল। কিন্তু ওদের মুখের মেন তেমনি বনিয়েরই। তাসো এ সময়ে লাউজে কেউ থাকে না !...

হঠাৎ সন্ধ্যা উঠে দাড়াল : “আমাকে দেবে আসি একবার।”

কলম ওর হাত ধরে টেনে বসাল : “আজ না হয় একটু আমার কাছেই বসলে হুজু গো।”

সন্ধ্যা তির্থাক হাশে : “তবু বা হোক একটুখানি ভরসা দিলে । Merci.”

—“ভরসার কথা কেন ?”

—“আজকের দিনে পাবলিক লাইব্রেরি বসার অর্থ কী নইলে ? খুব কাছে কি আমাদের চাও ?”

স্বপন ওর মুখ চেপে ধরল, তারপর মুখ ছেড়ে দিয়ে বলল : “এ-সব বাক্য বাণ ছাড়ো আজ সন্ধ্যা, লক্ষ্মীটি । চলো ঘরে যাই । আমাদের ঘরটা সকালবেলায় এই সময়টাই পরিষ্কার করে, তাই লাইব্রেরি থেকে এনেছিলাম ।”

সন্ধ্যার মুখ মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল : “সত্যি ?”

—“সেন্ট পাসেন্ট—তামা তুলসী গন্ধাজল নিয়ে হালফ ক’রে বলতে পারি ।”

—“আচ্ছা, তা হ’লে বসা বাক এখানেই আর একটু ।” এতক্ষণে ওর মুখের হাসি শুভ্র হয়ে ওঠে ।

—“না চকলে, কাজ নেই । চলো ঘরেই যাই—মুখোমুখি হ’য়ে ব’সে থাকি সারাটা দিন ।”

মুহূর্তে সন্ধ্যার মুখ ফের মেঘে ছেয়ে গেল, সে ঈষৎ ভীতকণ্ঠে বলল : “কাজ কি গো উদার প্রেমিক ?—বখন একটু নিরিবিলি থাকতে হ’লেই এতটা দুঃসহ মনে হয় ।”

—“তোমার আজ হয়েছে কী বলো তো ?”

সন্ধ্যা ব্রাউসের হাতের চোখ মুছল : “সে তুমি বুঝবে না সিসি ! যা বুঝবে বলি, শোনো ।” ব’লে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ক’রে নিয়ে বলল : “আমি বুঝছি আমি ভুল করেছি । যার সঙ্গে সারাটা দিন মুখোমুখি হ’য়ে ব’সে থাকলে সমস্তের পাখা ওঠে সে বখন আমি নই তখন কেন মিছে এ-কাড়া কাড়ির বিড়ম্বনা ?”

স্বপন ওর দুই গাল দুহাত দিয়ে চেপে ধ'রে বলল : “কী যে ছেলেমানুষি করো—একটা ঠাট্টা করলান—অমনি শুরু হ'ল ফৌসফৌসানি।”

সন্ধ্যা মাথাটা ঝাঁকুনি দিয়ে সরিয়ে নিয়ে বলল : “হয়েছে গো হয়েছে। এখন একটু অভিমানও দুর্ব্বাহ মনে হয় ও সর্ব্বসহ কাঁধে। কিন্তু এক সময় ছিল যখন এই চোখ দুটিরও প্রতি জলের বিন্দুতে ছলত—মুক্তো, যখন এর দশগুণ অভিমানকেও ফৌসফৌসানি নাম দিতে বাধ্যত।”

স্বপন নিজের দুই হাত কোলের 'পরে গুটিয়ে নিয়ে খানিক কী ভাবল, তারপর বলল : “সন্ধ্যা!”

ও ওর চোখে চোখ রেখেই দৃষ্টি নিল ফিরিয়ে।

—“তুমি কেন আমার ওপর রাগ করছ বলো তো? আমি কী করলে তুমি খুশি হও?”

সন্ধ্যা ব'লে বলল : “সত্যি কথা বললে।”

স্বপন এবার ওর চোখের দিকে স্থিরভাবে চেয়ে বলল : “কী জানতে চাও?”

—“আনার সঙ্গে—” ব'লেই সন্ধ্যার জিভ আর এগুলো না—কোনোমতেই।

স্বপন মুখ নিচু ক'রে বলল : “হ্যাঁ—ওকেও আমি ভালোবেসেছি। এই অপরাধে কি তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে? বলবে, তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা ব্যর্থ হ'য়ে গেছে?” ওর মুখ এমন স্নান দেখায়।

সন্ধ্যা ওর কাঁধে হাত রেখে কোমল কণ্ঠে বলল : “ঘরে চলো সিসি, পাবলিক লাইভে কি সত্যিকার কোনো কথাবার্তা কওয়া যায়?”

রুটিটা একটু ধরেছে সবে মাত্র। জানালা দিয়ে পাম ও ফার্নদের মাথা নাড়া দেখা যাচ্ছে শুধু।...

স্বপন ও সন্ধ্যা সোফায় বসল। স্বপনের দুটি হাত সন্ধ্যার কোলে ওর একটি হাতের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বন্দী। সন্ধ্যার আর একটি হাত ওর কণ্ঠবেষ্টন ক'রে। বাইরের কান্ডবর্ষণ মেঘের চাপা আলোয় সন্ধ্যার মুখ এমন মায়াময় দেখায়।...

—“আমায় ক্ষমা করো সিসি।”

স্বপন ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল : “ক্ষমা ? তোমার ?”

—“আমি বড় অসহিষ্ণু—তাই তোমায় দুঃখ দিয়েছি। আমার বোঝা উচিত ছিল—”

স্বপন ওর এলো চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলল : “তোমার দোষ কী বলো !”

—“খু—ব দোষ। কিন্তু আমি মুখে হিরোইন সাজতে চাইলে হবে কী বলো, আমার অন্তরের সব প্রতিক্রিয়াই যে অতি সাধারণ—” কণ্ঠ ওর রুদ্ধ হ'য়ে আসে প্রায়।

স্বপন ওর মাথা নিজের বুকে টেনে নিয়ে বলল : “কেন কঠিন কথা বলে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করবার চেষ্টা পাচ্ছ সন্ধ্যা ? আমাদের প্রকৃতির এ-সব দিকের প্রতিক্রিয়ার ওপরে কি কারুর হাত আছে ? না, আচরণে ওদের প্রকাশ হ'তে না দিলেই তারা রাতারাতি কৈবল্য লাভ করে ?”

সন্ধ্যা ওর বুক মুখ লুকিয়েই বলল : “তবু সংঘমের সাক্ষ্য তো আছেই।”

—“কী সংঘম বলছ ?”

—“প্রকৃতির ছোট দিকটার নানারকম ফ্রোসফোসানিদের দাবিরে রাখা।”



—“তাতে কতটুকু সাধনা ?”

সন্ধ্যা ঘাড় নেড়ে বলল : “আছে বৈ কি। তাদের গর্জানি-  
কাতরাণি প্রকৃতির কুশ্রী উদ্দামতাকে তবু তো ইচ্ছাশক্তির লাগাম দিয়ে  
বাগ মানানো গেল।”

—“কিন্তু তারা বদলালো না তো।”

—“না ; কিন্তু তাদের অসভ্যতার, বর্বরতার, রুক্ষতার গ্লানি তো  
খানিকটা কাটল।” ব’লে একটু থেমে বলল : “বিশেষ ক’রে যখন  
সুকুমার মাগুব এই ছোট প্রকৃতিকেই দেয় রাশ ছেড়ে, তখন গ্লানি কি  
উগ্র হ’য়েই বাজে না সিসি ?”

স্বপন ওর মাথায় চূষন ক’রে বলল : “এ-কথা মানি সন্ধ্যা। কিন্তু  
এটা ব্যতীত পারাই যে তাকে বশে-আনার প্রথম ধাপ।—আর—আর এই  
দিকটাই যে তোমাদের একমাত্র দিক নয় তা-ও তো সমান সত্যি। আনাকে  
যা সেবাটা করলে—”

সন্ধ্যা মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে সজোরে মাথা নেড়ে বলল : “ছাই ;—  
তা ছাড়া ও তো অভিনয়।”

স্বপন উজ্জল হুঁরে বলে : “না সন্ধ্যা। এবার নিজেকে আঘাত  
করার বিলাস তোমাকে পেয়ে বসেছে। ও তোমার অভিনয় ছিল না।  
ভাণ করা মেহে এতটা নিখুঁত কোমলতা আসে না।” ব’লে একটু থেমে  
হালে : “আমার সত্যি কী মনে হচ্ছিল জানো—যখন আনাকে তুমি  
কোলে নিরে—”

সন্ধ্যা সলজ্জ হুঁরে বলল : “যা—ও, ও-সব আমি শুনতে চাইনে।  
কিন্তু বলো—আমাকে তা হ’লে কি—কি এখনো—” ব’লেই ও  
থেমে গেল।

—“ভুলোবাসি কি না ? ওগো অভিমানিনি ! আমার ভালো-



ওর ভালোবাসা ? না বদলিয়ে পারে ! অনড় অচল উদ্ভিদেরও প্রতি শিরা  
 দায় বদলায়... প্রতি মুহূর্তে হয় এ বিশ্বভূবনের নবজন্ম... আর বদলাবে না  
 শুধু দম্পতীর ভালোবাসা—যা এত বিচিত্র... এত নানামুখী... এত জটিল !  
 তবু প্রণয়ি-প্রণয়িনী যুগ যুগ ধরে প্রেমের সম্পর্কে তার চিরন্তন  
 অপরিবর্তনীয়তার শপথ করে এসেছে... বলেছে প্রেম চিরস্থায়ী—তার  
 জোয়ার-ভাঁটা নেই। যার প্রবৃত্তি এত দুর্কোথ্য... যার স্নিগ্ধতা, যার  
 বিকাশ, যার নিভে-বাওয়া ইচ্ছাশক্তির কোনো ধারই ধারে না... এক  
 কথায় : যে ক্ষণিক-অতিথির মতিগতি একটা প্রহেলিকা, যে  
 চির-মুসাফের, চিরচঞ্চল নাত্যম তাকেই চেয়েছে সব চেয়ে ক'বে  
 বাঁধতে !

তাই তো আজ ওর মনে তৃপ্তি এমন স্বভোল হ'য়ে এমন নিটোল  
 হ'য়ে ফুটে ওঠে। তার কত রকমেরই যে আশঙ্কা হ'ত সময়ে সময়ে !...  
 হবে না ? যদি সন্ধ্যার প্রতি কোমলতা, দরদ, আবেগের চুষক আর  
 বোধ করতে না পারত ! উঃ—সে যে ভাবাও যায় না। আমার বাঁধা  
 থাকতে হবে তারই সাথে—যাকে ভালোবাসি না—যার চরণ-ধ্বনিতে  
 বুকের রক্ত ওঠে না ছলে ?—যার হাসির আলোয় জগতের হাসির রহস্য  
 ওঠে না স্বচ্ছ হ'য়ে ?—

না। ভগবানকে ধন্যবাদ যে এত নিষ্ঠুর তিনি ন'ন। ভগবানকে  
 ধন্যবাদ যে সন্ধ্যার দেহসামিধো তার দেহ মন আজও রোমান্সিত হ'য়ে  
 ওঠে। সব শেষে ভগবানকে ধন্যবাদ যে আনাকে ইসাবেলাকে ভালো-  
 বাসার পরেও সন্ধ্যার প্রতি ভালোবাসা তার কর্পূরের যতন উবে যায়নি।  
 কিন্তু যদি যেত !... উঃ ! ভাবতেও তার গারে কাঁটা দেয় ! সন্ধ্যাকে  
 সে আরো বুকের কাছে টেনে আনে..... আরো..... আরো।

## ডায়ারি

চেয়ার খেঁচ দোরের বাইরে থেকেই হেঁকে ভাড়া ইংরাজীতে বলে :  
“মানের ঘরে টবে গরম জল প্রস্তুত মাদাম।”

সন্ধ্যা ওর বাহুবন্ধন থেকে ধড়মড় ক’রে উঠে পড়ল। স্বপন হেসে  
বলল : “বাস্তব হবার দরকার নেই, এ আমাদের দেশ নয় : ‘এসো’  
না বললে কাইজার বা জারের চোক্ষ পুরুষের সাথি নেই বলে ঢোকেন।”  
সন্ধ্যা অপ্রতিভ হেসে বলল : “ব্যা-ও।” বলেই প্রসঙ্গ বদলাতে বলল :  
“উঃ, দেখ তো। কানের ঢলটা এমন দুমড়ে দিয়েছ!”

স্বপন হেসে বলে : “এখনো পাখিব কানের ঢলের ভাবনা?  
Woman ! Toilette is thy name.”

সন্ধ্যা সজ্জভঙ্গে বলে : “আ-হা। যেন নিজেদের মতি-গতি সবই  
অপাখিব—সেই মাকাতার আমল থেকে। তবু যদি না জানতাম একদিন  
দাড়িটা ভালো কামানো না হ’লে—”

—“ছি ছি, ও-সব গল্পময় কথা এখন! কবিত্বের এ মাহেন্দ্ৰ-লগ্নে!”

—“তবে রূঢ় কথা বলো কেন? রাগিয়ে দাও কেন?”

স্বপন বলে : “এ-কথার উত্তর তোমায় একশো একবার দিয়েছি  
কল্কাতায় : রসিকরাজ কবি ষিঞ্জেন্দ্রলালের ভাষায় :

কহিলেন পিতামহী :

আমাদের সময়েও

স্বামী-স্ত্রীতে চিরকাল

তবে বেই রূঢ় কহে

বেশি দোষ তার ভাই,

‘হ’য়ে থাকে বটে :

এইরূপ হ’ত সে-ও

—পুরাণেও রটে

তার তত দোষ নহে ;

যে তাহাতে চটে।”

—“চটি কি সাধে ঠাকুর! বার জন্তে করি চুরি সে-ই টয়লেট নিয়ে খোঁটা দিলে—”

—“ঐ একটা মিথ চ’লে আসছে যে ছাঃ কবে থেকে! কবে হয়তো শুনব যে মেয়েরা ক্রাউট করেও পুরুষদেরই নিঃসঙ্গতার কথা ভেবে। নইলে তাদের এ-বিষয়ে বৈরাগ্য একেবারে যৌগিক—অস্থিতে মজ্জায়।”

—“সাজতে আমাদের ভালো লাগে না তা তো বলছি না, তবে—কিন্তু কী আলা! দেখ তো ছলটার পাথরটা কী রকম বে কাং হ’য়ে গেছে আর সোজা হচ্ছে না কোনোমতেই।”

—“হুজুরে হাজির বখশ স্বয়ং শ্রীমৎ স্বপন, তখন তুমি এ ভার তারই বৃষককে চাপিয়ে শ’ ক’রে স্নানের ঘরে ঢুকে পড়ো। গরম জলটা নইলে বরফ হ’য়ে যাবে—ও-রসনার অক্ষুরস্ত বক্তব্যকে স্মৃতি পূর্ণচ্ছেদে এনে শেষ করার অসামান্য কঠোর করতে গেলে।”

—“আ-হা-রে। যেন নিজেকে রসনা হৃদগুণে রেহাই চায়। ওর

উত্তর আমিও কল্‌কাতায় শুনেছিলাম :

কহিলেন পিতামহ :

আমাদের সময়েও

প্রথমে উচাত বরও

পায়ে নাহি এঁটে উঠে

চলে বেসামাল সতী,

‘বধূ ঠাকুরাণী!

এইরূপ হ’ত সেও

চোখা-চোখা বাণী

কহিত; ছি ছি ছি, ছুটে

ওই জিতখানি!”

স্বপন হো হো ক’রে হেসে উঠল। সন্ধ্যার মুখেও নির্মেষ প্রকৃততার আলো ঝলমল করছে। বীরছন্দা হেলতে ছলতে হেলতে ছলতে স্নানের ঘরের দিকে এগুলেন। মুখ স্বপন চেয়ে রইল তার পানে।...সেই সন্ধ্যাই বটে...সেই চিরপরিচিতা...সেই গতিভঙ্গা...লাস্তভঙ্গা...অথচ কোথায় বেন এক অনাসক্ত উদাস ভাব লুকিয়ে!...

## স্বাধিকারী

স্বপন খানিকক্ষণ অশ্রুমনস্কভাবে চেয়ে রইল। স্নানের বরের ছুয়ারের চকচকে হাতলটার পানে।...চঠাং ওর চমক ভাঙল। পরে একটা আরাম-কেদারা সমুদ্রের দিকে ব্যালকনির ছুয়ারটার কাছে টেনে নিয়ে ব'সে পড়ল। ব'সেই কিছু উঠে পড়তে হ'ল। সন্ধ্যার ছোট্ট একটা জাপানী হাতবাক্স আরাম কেদারাটির ওপর ছিল। ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে সহস্রপণে বাক্সটি হাতে তুলে নিল...আহা, কোথাও ভেঙে বায়নি তো সুন্দর বাক্সটির? নাঃ, কোনো ক্ষতি হয়নি। আশ্চর্য হ'য়ে ডালাটির হাতল ধ'রে পাশের টেবিলের ওপর রাখতে যেতেই, অরব্বর ক'রে কত কী বে ধারা'প্রপাতের নতন টেবিলে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।...নিজের অসাবধানতায় নিজের 'পরেই বিরক্ত হ'য়ে স্বপন সন্ধ্যার আরনা চিরুণি ছোটখাটো করেক রকমের কোটো, পুঁথি, রঙীন একটুকরো নৃতো ছুঁচ সেপ্টিপিন হো ক্রীম সাবান—তা আবার কত সাইজের!—আচ্ছা, এতরকম টয়লেটের চিড়িয়াখানা ধরেও তো ঐ আলাদীনের হাতবাক্সে!—কে বলে ইলুজালের যুগ চিরান্তগত?

মেয়েরা হ'ল মেয়ে! একটা ছোট হাতবাক্সেও এ-তব্বের পুঞ্জীভূত লাক্য জাক্জল্যমান!...এ-আধিকারে ওর মনে জাগে এক বিমল আত্মপ্রসাদ: পুরুষেরা কিন্তু ঢের বেপরোয়া! নয়? এত শত লাক্সসরঞ্জামের তোয়াক্কা?—দুঃ। সে-জাতই নই আমবা—পুরুষেরা। যুদ্ধক্ষেত্রে শিবাজির হাতে কী-ই বা থাকত? একটা বল্লম ও ঢাল-তরোয়াল। হাজারটা যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকে কাটাতে হয়েছিল কত অস্ত্রধরসে! ...নেপোলিয়ন ষোড়ার উপরেই ঘুমিয়ে নিভেন। রাণা প্রতাপ ভূর্জপত্রেই কটি খেতেন—বাসের কটি। এঁরা কি কেউ ও-রকম হাতবাক্স নিয়ে

বেড়াতেন ? না, বেড়ালে সীজার ভুলেও বলতে পারতেন যে, আলেকসান্ডার সে-বয়সে বিশ্বজয় ক'রে ফেললেন সে-বয়সে সীজার ক্যাপিটোলই ছাড়াতে পারলেন না ? স্বপনের ওষ্ঠপ্রান্তে সীজারীয় হাসি কুটে ওঠে : নাঃ, মেয়েদের জাত এসব বুঝবে না, তাদের মন প্রাণ তো সীজার, নেপোলিয়নের উপাদানে গড়া নয়।

হঠাৎ ওর চিন্তাস্রোতে বাধা প'ড়ে যায়—এ কী ? ডায়ারিটা ? স্বপনেরই উপহার যে। ক—বে দিয়েছিল ও—সেই ফুলশবার রাতে। ননোকো-বাধা—উপরে সোনার জলে লেখা : “প্রদোববালাকে…… উল্লেখ্য।”

কী সন্মের রেখেছে ও ! প্রায় চার বৎসর হ'তে চলল এখনো বাকবাক করছে যেন ! পাতলা রেশমী ওড়নায় কত না বহ্নে আদরে মুড়ে-রাধা ! ...সন্ধ্যা রাখতে জানে বটে জিনিষপত্র !...সম্ভরণে ডায়ারিটিকে তার রেশমি প্রচ্ছদ থেকে খুলে বার করে। স্নিগ্ধ থসথসের গন্ধ !...স্বপনের মন ভিজে ওঠে...কত সম্ভরণেই না সন্ধ্যা রেখেছে ওর কতদিনের আগের এ-উপহারটিকে !...মেয়েরা বুঝি এসব বিষয়ে স্বতঃই অস্বমুখী সংহতচিন্তা ! তুলচুক ওদের হয়—কিছু এসব ক্ষেত্রে নয়—পুরুষদের মতন। ওর মনে পড়ে সন্ধ্যা ওকে একটি চমৎকার রেশমি রুমাল উপহার দিয়েছিল—কত বহ্নে একটি টিয়াপাখীর ছবি বুনে। সেটি কোথায় আজ ? কবে যে হারিয়ে গেছে—ওর খেয়ালও হয়নি। নাঃ, এসব বিষয়ে মেয়েদের কোথায় একটা সহজাত দরদ আছে...সৌকুমার্য্য। পুরুষরা এসব বিষয়ে—কী কলা বাবে ?—তুল। মতিগতি তাদের চলে মোটা কদমে, মুখর ছন্দে। মেয়েদের গতি এ-সব বিষয়ে অঙ্কশীলা। কিছা বলা যেতে পারে—শুভ্র বাপুচরে দ্বিধ তটিনীধারার রেখাভঙ্গে। দৈনন্দিন গৃহকর্মের খরতাপেও এ-সুখধাতাকে শুকোতে না-দেওয়া কি একটা আর্ট নয় ? একটা সৃষ্টি

র ? ঠিক তেমনিই সৃষ্টি এসব—যেমন সৃষ্টি—একটা নবরাজ্যে  
ঘটিনকাঠন গড়া। শীতের, নেপোলিয়নকে ওরা তেমন ক'রে বুঝতে  
হয়তো সত্যিই পারে না—দেহ-সুখ, স্বস্তি, আরাম-আমোদ-প্রমোদের  
প্রতি অনাসক্তির গোরবটুকু ঠিক কোন্‌খানে—এসব ছেড়ে গহন বনে  
নিরালা তপস্বীর অলভ্যের আরাধনাকেও হয়তো ওরা ঈর্ষ ভয়ের চোখে  
দেখে,—ওদের স্বভাবই যে নীড়ধর্মী—কিন্তু ওদের এই মিত্র দরদটুকুর মূল্য  
দেবে কে ? মেয়েরা যে-কোনলতা দিয়ে তাদের আবেষ্টনীর প্রতি আস্বাব-  
পত্রকে ঘিরে রাখে—যে-মিত্র স্পর্শে দরিদ্রের অভাবক্ষুদ্র রিক্ত গৃহাঙ্গনেও  
শ্রী জাগিয়ে তোলে, হৃদয়ের যে-সুখমার নরম আলো বিছিয়ে দিয়ে এক্সির  
সংসারের সব স্থলতা, সব কঠোরতা, সব বর্ণ-হীনতাকে মাধুর্য্যে রাভিয়ে  
তোলে তাকে কি সৃষ্টি না ব'লে অতী কিছু বলা যায় ? - আর শুধু কি  
ডায়ারিটার রেশমি প্রচ্ছদটিই ? এই ছোট্ট কারুদণ্ডটির প্রতি  
টুকিটাকিই যে ওর প্রত্যক্ষ হৃদয়-রাগে রঞ্জিত। প্রত্যেকটির মধ্যেই  
ওর সজাগ মঞ্জুশ্রী উঠেছে কুটে...

অন্তমনস্ক ভাবেই সে পাতা উলটোতে থাকে...হঠাৎ তার চোখ  
আটকে যায়। নাক থেকে এমনিই সে গুলেছিল—সত্যিই কোনো  
কোড়ুল বশে নয়—কিন্তু সন্ধ্যার পরিচিত নিটোল কয়েকটি অক্ষর দেখেই  
তার ঝিমিয়েপড়া অন্তমনস্ক মন ওঠে ধারালো হ'য়ে।—কিন্তু এ যে  
অস্ত্রায়। দুঃ—পড়লই বা একটু। ও ভুলে যায় যে ও নিজের কতবারই  
বলেছে যে স্বামী-স্ত্রীর যদি প্রণয়-প্রণয়িনী থাকতে হয় তবে পরস্পরের  
গোপন কথা জানার দাবি ছাড়তে হবে সব আগে। পরস্পরের গোপন  
কথা জানতে ইচ্ছা হবে না—নয়। জেনে কৃতজ্ঞ বোধ করবে—বধন  
একজন আর একজনকে সাগ্রহে সানন্দে বলবে। এ-কনকিডেন্স হবে একটা  
দান—অন্তরঙ্গতার পুরস্কার। দাবি ক'রে গেলে একে পাওয়াই হ'ল না।



কিন্তু আশ্চর্য্য! আজ তবু তার মনে উল্টে পড়ে সেই দাবিতটী জোর। সন্ধ্যার ডায়ারি হো! পড়লই বা। স্বার ডায়ারি পড়ার অধিকার স্বামীর নেই? বাঃ। ওর উদারতা বৃদ্ধি বড় বড় কথা মল যায় কেনে। একটু কুণ্ডা ভাগে অবস্থা। কিন্তু তাকে জাপিয়ে ওঠে ওর এই অহঙ্কৃতি যে, সন্ধ্যার ডায়ারি পড়ার ওর অধিকার আছে। হায় রে স্বহাসিকারি!

## সন্ধ্যার ডায়ারি

প্রথম দিকটা খালি। সন্ধ্যা একটি কথাও দেখেনি যতদিন ও ঘেঁষে ছিল। সময় কোথায় এর তখন?

প্রথম তারিখ ২৩শে জুন, রাত বড়ব—যেদিন স্বপন দুঃখের দ্বারা করে। পাতাটার শুধু উচ্ছ্বাস—নবোদয়স্বর। উচ্ছ্বাসের ঘটা পড়ে স্বপনের সত্যিই নিজেকে একটু অপরামী মনে হ'ল। মনে হ'ল হঠাৎ এরই নাম বৃদ্ধি সেন্টিমেন্টালিটি—যাকে সংখ্যা যায় কেবল আবেগের টেম্পারেচারে; একটু বাসি হ'লে খেলতে পড়তে না পড়তে মনে হয় শুধুই কেন্দ্র। হঠাৎ একটা প্রশ্ন জাগে: সত্য মূহুর্তে এ-উচ্ছ্বাসকে যেভাবে দেখি তাকেই বা বড় ক'রে দেখতে হবে কেন? কে বলল যে, উচ্ছ্বাসের নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিত নেই? যদি বলি সে পরিপ্রেক্ষিত হচ্ছে এই আবেগেরই দৃষ্টিকোণ!—কিন্তু বললে হবে কেন? ওর মনের কিন্তু-ভাবটা ঘোড়ে না যে এ-উদ্ভবে। কেবলই মনে হয় যে, উচ্ছ্বাসের একটা আর্জিত, সংবদ-প্রজ্ঞা, সমাহিত রূপ আছে যাকে সহজ দৃষ্টিতে দেখলেও কেনা মনে হয় না, এবং সেইজন্মেই আবেগের এই বিস্তার-বাণীরা রূপই আবহমানকাল রূপ পেয়ে এসেছে কাব্যে গানে আটো। কিন্তু নবদম্পতীর উচ্ছ্বাসের বারো

আনা দেহগত, হাথগত, মনোগত উদ্বেজনায় কুহকে রচিত। তাই না ও'হায়ে দাঁড়ায় সেটিমেটালিটি— তাই না ও কারো শিল্পে পানে শিখোশা পেল না। তাই তো রসের কনককিরণে যখন সে-চেতনার জাগে নিটোল আত্মপ্রকাশের জ্বাতি, যখন মনের গায়ে ধরে হাঙ্কিত বুদ্ধির তিকিমিকি, প্রাণের গায়ে—সুদায়িত আবেগের নিমলিনতা, এবং মনোপরি, যখন জয় প্রাণের হাতে হাত মিলিয়ে মনের সঙ্গে মিশ্রালি ক'রে আনন্দের বরমালা প'রে নিজেকে রসের সভায় চায় মেহিনকপে প্রকাশ করতে—তখনই তা হয় সত্যিকার প্রকাশ। আবেগ কারো অস্বাভাবিক নয়। কেবল, সংজ্ঞাতোকে বসতে চ'লে তাকে সে-সভার নিমহরণ-পর লাভ করতে হবে, পায়ের কোবে ওড়োরছি ক'রে অন্যতর বা অব্যাহত হ'য়ে গেলে সে হ'য়ে দাঁড়ায় উড়ে গিয়ে জুড়ে বসে। তা করলে চলবে না। এ-নিমহরণপর পেতে চ'লে আগে তাকে লাভ করতে হবে রসসুখি সৌকুমার্যে কৌলীক।—চর্চাং সজ্জার ভার্যারিতে চোখে পড়ে :

“প্রিয় ভাই যে-ভাই পোতবে পো

2226-6077

ভা. ১. প্রতিদ্বন্দ্বিতে নেয়াতে বাধ্য

२० दि बिना का ?

আমি তোমার কাছে পেরেছি বউ,

চক্রেণ ভাষ্যে ন্যস ন্যস

पुस्तिकान्तरण विभाग, दिल्ली

ଶୈବତା କେ ହୋଇଲା :-

৩৭      তোমার কাছে ভিত্তি নে হারি

ভারিলে—সেখা কর ।

এই—এই—এই। এই-ই হ'ল টিক উচ্ছ্বাস—যা প্রকাশে মজুর।  
তাই তো এত রাশি রাশি উচ্ছ্বাসের পরিপাক ফেনিলতার মধ্যেও  
এ-লাইন ক'টি তেমন অমলিন অক্ষুণ্ণ গোরবে রঙীন হ'য়ে রয়েছে যেমন  
রঙীন ছিল ওরা—যেদিন সন্ধ্যা এ-গানটি রচনা করে। মনে পড়ে—  
সেদিন ওদের ছাত্রদের মধ্যে ঘটেছিল মোমালিঙ্গ। কে আগে এগুবে  
অপরকে সাধতে? শেষটায় সন্ধ্যাই আসে—গানটি রচনা ক'রে।  
না—স্বপন মাথা নাড়ে—নাশ্রয় ভুল করেনি—কায়ামর আবেগকে  
জীবনমত্ত আবেগ থেকে পৃথক ক'রে। ওরা রূপে স্বজাতীয় হ'লেও রয়ে  
একেবারে অহি-নকুল। বুক-চাপড়ে গড়পড়তা বিধবার কান্না ও ভ্রমরের  
কান্না, শুড়হুড়ি দিয়ে হাসি ও “পাচশো বছর এমনি ক'রে”র হাসি—  
এরা এক ভাতই নয়।



চোখ নামালো ফের ডায়ারিটির দিকে। হায় রে, “স্বপ্ন হ'তে হ'ল  
পতন” : এমন লাইনের পরে আবার সেই হা হতাশ। ফের সেই  
জীবনের কাঁহুনি! কেন এমন হয় জীবনে? নভেলে তো হয় না!  
নভেলে আবেগ বোমচারণ করতে শুরু করল তো করলই—কার সাধা  
রোধে তার গতি? কিন্তু বাস্তব! হায় রে! স্বপন ক্ষুণ্ণ পাতা উলটে  
চলে।...তবু ভালো, উচ্ছ্বাসের ঘটায় ধীরে ধীরে একটু একটু ক'রে ভাঁটা  
পড়ছে। জুলাই আসতে না আসতে ওর মনের প্রাণের একটা নিম্ন  
বিরহরূপ ফুটে ওঠে যা পড়লে তেমন বাড়াবাড়ি মনে হয় না আর। সহসা  
সন্ধ্যার কয়েকটা লাইন ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে :

“আজ সিলির প্রথম চিঠি এল সুরেন্দ্র থেকে। কী চমৎকার লেখা।  
...বাড়ীতে এত বইয়ে তো কত অক্ষরই আছে। কিন্তু এ-অক্ষরগুলি ?..

এরা যে আখর—অক্ষর ভৌ নয়। বইয়ের অক্ষর হ'ল গভা—এরা যে কাব্য!...তাই বুদ্ধি পড়তে মন ওঠে এমন ছলে? তাই বুদ্ধি বার বার প'ড়েও তৃপ্তি হয় না?—কেবল একটা আক্ষেপ জাগে তবু : ওরা কেমন যেন সাবধান-সাবধান ভাব। পুরুষ জাতটা বুদ্ধি সত্যিই মেয়ে নয়। ওদের ভাবনা কামনা চলন বলন সবই অনাস্থ্য। বিরহ যদি অল্পভবই করল—তবে প্রকাশ করবার বেলায় এত লজ কিছ কেন? এত ভয় কেন উচ্ছ্বাসে? কাব্য হবে না ব'লে? ওরে অবোধ, কাব্যে মেয়েরা কবে যেমন আনন্দে-উচ্ছল হ'য়ে উঠেছে যেমন হয়েছে তারা অকাব্যগন্ধী প্রেম-পথে? এটা তোরা বুঝবি কবে—ওরে স্বভাব অপ্রেমিক? কাব্য লিখতে তোরা জানিস্—মানি, কিছ এত বয়স হ'ল তবু ভালোবাসতে শিখনি কই! মেয়েদেরকে কবিতা লিখতে শেখা না তোরা—বত প্রাণ চায়। কিছ দোহাই, একটু নম্র হ', বল তাদের পায়ে সূটিয়ে : 'আমরা ভালোবাসতে শিখিনি দেবি, সেটা তোমাদের কাছ থেকে শেখা ছাড়া গতি নেই।

“কিছ হায় রে! এ তারা বলবে না। বলবে কি?—হয়তো কোনোদিন জানবেও না। জানবে কেমন ক'রে? ভালোবাসার নিবিড়তম সত্যতম রূপটি দেখার দিব্যদৃষ্টি যারা পায়নি কেমন ক'রে তারা ধরবে যে, তার পুরুষালি রূপটি মেয়েলি রূপের তুলনায় কত অগভীর—কত উপর-উপর? জন্মাক্কে বড়োর মহিমা বোঝাবে এমন ভাষা কোন্ কবি কবে তৈরি করেছেন? তিনটি কোমল পঙ্খায় তোড়ির রূপ ফোটে—অতি কোমল গা, অতি কোমল রে, সা। যে শুনল সেই জানল ওর মিড়টুকুতে কী কুটল। কিছ বার শ্রবণ নেই তাকে এ তিনটি বৃক্ষ ক্ষতিতে তোড়ির মর্গ ব্যাখ্যা করবে কে? মারী পুরুষকে বোঝাবে কী দিয়ে—প্রেমের বেদনা তার হৃদয়ে কী ঢেউ তোলে? যে-জাত আত্মনিবেশনকে বলে

মেয়েলি, আবেগের আন্তরিক প্রকাশকে বলে উচ্ছ্বাস—তাকে বোঝানো যায় কখনো?"—বপন বমকে যায়। এ কী দৃষ্টিভঙ্গি ওর!!—

কয়েক পাতা পড়েই :

“আজ সিসির চিঠি এল পোট্ট সেড থেকে। বাক তবু ভালো যে অত দ্রুত পট-পরিবর্তনের মধ্যেও এ-প্রতীক্ষমানার নিষ্ফল প্রত্যাশার বেদনা নিয়ে সে কবিত্ব করার সময় পাচ্ছে।—তবু আশঙ্কা হয়। কিন্তু কিসের আশঙ্কা? দূর। সত্যিই বুঝি মেয়েরা একটু বেশি উচ্ছ্বাসিনী। উচ্ছ্বাস—বুঝি। কিন্তু এ অহেতুক ভয় কেন? ঢুক ঢুক বন্ধ, অতক্রান্ত উৎকণ্ঠা, বিনিস্ত রজনী—এ-সব গোমাগে শুনতে বেশ—কিন্তু জীবনে? না, ও চাই না জানি। এ-অহেতুক উৎকণ্ঠার মূল আমি সবদিক মতনই ফেলব উপড়ে। আরের বধূরা কি ছাই ‘আন ঘবে’ যায় না? তবু তো আমার বধূরা গড়ে আছেন—‘আমার আভিনা’ বেয়ে আমার বৃকের ওপর দিয়ে কোথাও বাননি। তবে? এত ভয় কেন?”

তারপরই অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত : কী উচ্ছ্বাস! উঃ—

“আমার স্বামীর মতন স্বামী কার? রূপে শুধে স্বভাবে”—বপন সজ্জার ঘানের ঘরের দিকে তাকায়। মনটা আগ্রহ হয়ে ওঠে কিন্তু। আশ্চর্য্য। ও জানে যে এ নিছক অকাব্যিক কেনা কোনোদিন একরটি লাইন দিয়ে মেঘদূত রচিত হবে না, রোমিও জুলিয়েটও না। তবু—ভালো লাগে। সজ্জা ওকে এত বিশ্বাস করে? কোথার একটা বাগানও বেন ওঠে কেজ।

তবু তাড়াতাড়ি পাতা উলটে যেতে হয়। কি জানি কখন সজ্জার দোর খোলায় আঙুরাঙ্ক হয়?

পরের কয়েক পাতায় স্বাক্ষর খবর : তার কন্যাসী শেখার ইচ্ছে হওয়ার

কথা রমুর ঠাট্টার উল্লেখ... আরও কত জল্পনা করনা... মাকে মাকে  
একটি কবিতার অসম্পূর্ণ স্তবকও :

"তোমার পেতাম বেদিন হাত বাড়ালে

তালে তালে

বনস্তলী

কলাঞ্জলি

চলত মুঠো ভ'রে...

শুধু নেইক ব'লে কাছে ভূমি

'আজ কুহুমি'

ওঠে না দিন

বাজে না বীণ

ধরাব কলস্বরে ।"

কী স্নানর লাগে একটি লাইন—ডায়ারির নিম্ন পট ভূমিকায় ।  
বেন ধূসর সন্ধ্যার বৃকে ফুলের মতন অ'লে উঠল কয়টি তারা !... হঠাৎ  
স্বপনের মনে প্রান্ত উদয় হয় যে, কবিতার সঙ্গে তার টিহিটাসের—  
কন্টেক্সটের আবেষ্টনীর যে-সবক সেটুকু জানলে কি কবিতার রসভোগ  
বেশি অসম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে, না, ওঠে না ? যদি জানা যেত রজকিনীর  
সঙ্গে কোন্ কোন্ দিন কী কী আদর সৌহারগের অঙ্ক হাসির পরে চণ্ডীদাস  
কোন্ কোন্ পদ লিখেছিলেন ?—রজকিনীর কোন্ অমর বেহনা অঙ্কুর  
ক'রে তাঁর কলম দিয়ে বেরিয়েছিল :

শুন হে চিকণ কালা !

বলিব কি আর

চরণে তোমার

অবলার ধত জালা ?

চরণ থাকিতে না পারি চলিতে

সদাই পরের বশ,—

কভু কোনো ছলে তব কাছে এলে

লোকে করে অপঘণ ।

বদন থাকিতে না পারি বলিতে

তেঞি সে অবলা নাম,—

নয়ন থাকিতে সন্ম দর্শন

না পেলে ঘনশ্রাম ।

অবলার যত দুখ প্রাণনাথ

সব থাকে মনে মনে,—

চণ্ডীদাসে কর রসিক যে হয়

সেই সে-বেদনা জানে ।

অবস্থা—রজকিনার বেদনার ইতিহাস এ সব গানের ছন্দে ছন্দে গাঁথা ।  
তবু নিশ্চয় ক'রে জানলে এ গানগুলির রস আরও নিবিড় হ'য়ে উঠত  
না কি ?—যেমন সন্ধ্যার কবিতাগুলি তার ডায়ারির মধ্যে । ডায়ারির  
মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে প্রকাশকের দোকানে কিনে এককবিতাটি পড়লে  
অনেকখানি সৌরভ কি মাঝে যেত না ?

• •

কয়েকপাতা পরে :

“সিসির নবপরিচিতি এ অজ্ঞাতকুলশীলাকে দেখতে ইচ্ছা হয় । কিন্তু  
কেন হয় ?—যখন জানি সে বিলিতি ঘেরের মতন বিলিতি রকমই দেখতে  
হবে ! সম্ভবতঃ স্তম্ভপাতা । কলমাখা, পায়ে-পড়া, চকুয়া, হুখা,

রোমান্টিক-ভাবাপন্ন, দরকার হ'লে গদ্‌গদ্‌ভাবিনী—এ সবই তো জলের মতন শুষ্ক। তবু দেখতে ইচ্ছে হয় কেনই বা? বাঃ! কথ'খনো না, কথ'খনো না, কথ'খনো—কিন্তু তা হ'লে এত আপত্তি ঘোষণা করছিই বা কেন এ-গলীর রাতে? না না না। একথা কখনোই সত্যি নয়। দেখতে ইচ্ছে হয় কেন? বাঃ! হবে না-ই বা কেন? ইন্টারেস্টিং মেয়ে—আলাপ করতে ইচ্ছে হবে না? না ভ'লেই তো হ'ত সেটা হোয়ের।"

অপনের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে :

"কিন্তু তবু কোথায় একটা অনুষ্ঠ কীটা!...নড়তে চড়তে খচ্‌খচ্‌ করে যে—অস্বীকার ক'রে হবে কী? না, এ-ডুর্ভাগ্যতাকে দমন করতেই হবে। সিসিকে যাবার সময়ে বলিনি যে, বিশেষিনীদের শুধু বেউড়ির নয় অন্তরমহলের খবরও মছন ক'রে এনে আমার শ্রীচরণ নিবেদন করতে হবে! ও চেসে বলেছিল : 'যদি বিষ ওঠে তবে কি শিবের দোসরা হবে না কি গো?'—আহা—হা। যেন বিষ শুধু পুরুষেই পরিপাক করতে পারে—নারী যেন শুধুই মধুবিলাসিনী। এ-অগোরব দূর করতেই হবে আধুনিকাদেরকে।

"কিন্তু জর একে না হয় করলামই। তবু প্রশ্নটা তো রইলই। বাজে কেন? খারাপটাই বা মনে করতে ইচ্ছে হয় কেন? আনা তো ভালো হ'তেও পারে। অতিবৃষ্ণ আসামী আইনেও অনৈশ্চিতির বেনিফিট পায়—অথচ সুকুমার প্রণয়-জগতে তাকে সরাসর দেব প্রাণদণ্ডাজ্ঞা—তার স্বন্ধে কিঙ্কির্গও না জেনে? এ কী রকম কাজীর বিভার?

"নাঃ। ও নিশ্চরই ভালো মেয়ে। ক'দিন আগেই নীলিমা'কে লিখেছি সিসির চিকণতার কত তারিক ক'রে। আর আজই তাকে ধ'রে নিছি বিবুধ—প্রলুভ—অচ্‌? না, তাকে আমি অবিহাস করব না।



না না না। তা ছাড়া সত্যিই তো ওরা ধর্ম ছয়ছাড়া। ওদের বেধে রাখতে চাওয়া—সেটাই যে অত্যাচার। বেধে ওদের সর না—যদি লালন বড় বেশি সম্ভাব্য হয়। উপায় কি ?

“আনার সঙ্গে মিশছে বনিষ্টভাবে ? মিশলই বা যদি এতে—দুঃ, গু-কথা মনে স্থান দেওয়াও হীনতা। ছি। বিশেষতঃ যখন মেয়েটি এতবড় আঘাত পেয়েছে। আচ্ছা! কিয়ৎ আশ্চর্য! আচ্ছা বলছে কে ?—আমার মন। প্রাণ না তো! এ সব ক্ষেত্রে বুদ্ধি কত বেশি বেশরোয়া, নয় ? প্রাণ কত বেশি বেশ—বাসনার, প্রকৃতির, প্রকৃতির। আচ্ছা, সত্যিই কি মেয়েরা বেশি প্রাণদম্মী বলেই এত বেশি প্রকৃতির তীব্র ? কিছু বিষয় লাগে! আনা যদি সিসির সঙ্গে না মিশে মলয়, অতল, পল্লব বা নিলয়ের সঙ্গে মিশত তা হ’লে ওর দুঃখের জাল আমার দরদ উঠত উঠলে। অথচ একেই সিসি দরদী হ’ল বলেই আমি হ’য়ে উঠছি বেদরদী! না—এ অসহ্য : প্রকৃতির তাতে খেলার পুতুল হওয়া আমাদের আর চলবে না—কোনোমতেই না। অতীত যুগের মেয়েদের এ-অপবন অবলা-ব’লে-এ দুর্নাম কাটিয়ে উঠতেই হবে এ-যুগের সবলাদেরকে। অবলা! পুরুষের কাণে ও নাম বতই কেন না মধু-বর্ষণ করুক—এ জুলী মানুষী অপলকা লাংগোর রক্ত মেয়েদের আর প্রসাধন করা চলবে না—তাতে বতই কেন না তাদের রূপশ্রী-বুদ্ধি হোক। একেই আনার সঙ্গে আমার একমত। ওর স্বামীকে ছেড়ে আসাকেও তাই আমি প্রচা করি। নারী থাকবে শুধু পুরুষের প্রেরণাবাদী হ’য়েই ? না না না। তাকেও আগে হ’তে হবে মানুষ—পরে নারী। নারীর নারীত্ব! না, তা ছাড়ব কেন ? যা শব্দর সূক্ষ্মতার মধুর তাতে যদি নারীর জগৎকে বেশি থাকে তবে পুরুষালি বর্ধরতার অন্ধকরণ ক’রে তাকে খোয়ানো হবে হুত্ব। এ-বিষয়ে বিলিতি মেয়েদের মতন লোকা

হবে কেন আমরা ? না ; সম্প্রদায়কে ছাড়ার মানে তেজ নয়—কোনো ইসমেরই ফেরে প'ড়ে । কিন্তু তাই বলে বাধ্যগতি সহকারকে অবলম্বন ক'রে তবেই আকাশের পানে উঠবে, নইলে পড়বে মাটিতে লুটিয়ে—এ কথা মনেও গা জালা করে । এ তো সম্বল নয়—এ হ'ল শূন্যতার পরাসক্তি, মিথ্যার আশ্রয় ।”

তার পরের কয় পাতা ফাঁক । স্বপনের উলটোতে উলটোতে কত কী যে মনে হয় !...সন্ধ্যা যে এত ভাবে.....

“কিন্তু সিসির এ আড়ষ্ট ভাব কেন ? এর কী দরকার ছিল । ওর সব ঠাট্টা সব লজ্জা সবই এমন বেহুসারো বাজে কেন ?...আমার এ জ্ঞানি ? হবে । তাই চোক । কিন্তু --না প্রমাণ করতে পারি না তাই কি অসত্য ?”

পরের কয়েকটা পাতা ফের ফাঁক । তার পরে :

• “আজ্ঞা, একথা ডায়ালগে লিখতেও ভয় পাই কেন ? এ-আশঙ্কা সত্যি নয় ব'লে ? কিন্তু তাই যদি হবে তা হ'লে একথাটা উঠতে চাইলেও মনের মুখ চেপে ধরি কেন ? তবে কি সত্যিই যুগ-যুগের সঞ্চিত কল্লানির ফলে আমাদের মনের মূলে অবলা শিকড় গেঁথেছেন ?—না ; যদি গেঁথেও থাকেন—তবে তাকে ফেলব উপড়ে—তাতে বত বাধাই বাধুক না কেন ।

“কিন্তু তবু জনয়ের কোথায় একটা কালো মেঘ ধীরে ধীরে আসে ছেয়ে ...ভরসার আলো বায় নিভে । আবার 'পরে জ্বালা যে-পরিমাণে বাচ্ছ, তার বাধার জগ্রে দুঃখ দরব যে-পরিমাণে নিবিড় হ'য়ে উঠছে—তিক সেই পরিলোকেই যে আবার জনরটা উঠছে টন টন ক'রে । কেন এমন হয় ?

“উত্তর আমি জানি, কিন্তু নানি না । না—না—না : কিছুতেই একথা আমি স্বীকার করব না যে, এর কারণ শুধু মেয়েদের বাধ্যগতি-

প্রবৃত্তি। আঁকড়ে থাকতে চাওয়ার প্রবৃত্তি নেই কার? পুরুষেরাও কি রোগে শোকে মেয়েদের সাধনা মিথ্যতার কাছে এসে লুটিয়ে পড়ে না? বলে না—তোমাদের মিথ্যতার অরপূর্ণা-অঙ্গলির কাছে আমরা পাতব হাঁড, আর তোমরা আমাদের সব রিক্ততা, সব অভাব, সব শুষ্কতা সেরসখারার দানে ক'বে ভুলবে সবুজ? নাঃ। ও একটা কথাই নয়। ভালোবাসায় প্রতিদান-কাননা থাকতে পারে, কিন্তু তার মানেই কি প্রেমোপদকে শুধু গ্রাস করার ইচ্ছে? তবে মিসি এ রকম অজ্ঞানর ঠাট্টা করে কেন? বার্নার্ড শ'র ও'ঠাট্টা তীক্ষ্ণ হ'তে পারে (যে, মেয়েরা পাছোড়ে সাপ—বলভটিকে আশ্রয় মুখে না পুরলে তাদের স্বপ্নই পালিত হয় না) কিন্তু সত্য নয়। আর আজকের যুগের মেয়েরাই এ-কথা প্রমাণ করবে। তাদের 'পরেই' ভার দে দিয়ে দেবার যে মেয়েরাও অনাসক্তির মধ্যে দিয়ে ভালোবাসতে জানে—যেমন ভালোবাসতে জানে শিল্পী তার শিল্পকে।"

হঠাৎ ঘানের ঘরের দোরের কাছে কী-একটা শব্দ হ'ল। স্বপন তাড়াতাড়ি ডায়ারিটা সজ্জার হাতবাক্সে রেখে ভালোমাসুকের মতন সবুজের দিকে চেয়ে চুপটি ক'রে ব'সে রইল। ওর বুকের মধ্যে কী একটা জিনিস যেন উঠেছিল বেজে...কী হৃন্দর! সজ্জার প্রতি এত শ্রদ্ধা এত সম্মম বুদ্ধি ও জীবনে কোনোদিন বোধ করেনি। এত পড়তে ইচ্ছে করে ওর মনের লাড়ুক' কথাগুলি। এমন কি লুকিয়ে এ-সব পড়া বে অজ্ঞার তা মনেও হয় না আর।...

কিন্তু কই, ঘোর তো ঘুমল না। বিপদ ছেনেও লোভ সে সামলাতে পারল না। বড় জোর হাতে-নাতে ধরা পড়বে। এ সব অশরমে জয়যজ্ঞতার কাছে যে-সাজা মেলে তা খুব অকটিকরও নয়। দেখা যাক কের দুর্গা ব'লে।

টেনে নিয়ে ফের পড়তে লাগল—কিন্তু খুবই সতর্ক হ'য়ে :

“কিন্তু স্বীকারে থাকার গৃহ প্রতিষ্ঠা যদি প্রেমের মূলে লুকিয়ে না থাকে তবে এ কথা ভাবতে কেনই বা এত ব্যথা পাই যে সিসি আমাদের দুজনকেই একসঙ্গে ভালোবাসতে পারে ? বতটা দেব ততটা ফিরে চাই এ-দরদস্তরের ভাব যদি প্রেমের আদান-প্রদানে নাই থাকবে—তবে আনার সঙ্গে সিসি এখন হয়তো প্রেমলাপ করছে ভাবতেও এমন বেধে কেন ? কতদূরে সে । আনা না থাকলেও তো কিছু আমি এখন তার কাছে থেকে আমার প্রেমের প্রতিদান পেতাম না । কাছে থাকলে—‘আমাকে বঞ্চিত ক’রে আনাকেই দিচ্ছে সবটুকু’ একথা ভেবে না হয় অল্পযোগ করতে পারতাম । কিন্তু এখানে তাও তো নয় । তবে ? তবে একে প্রতিদান-কামনা ব’লে চোখ ঠারছি কাকে ?

“না । একথা স্বীকার করতে আমার যতই বেদনা লাগুক না কেন একথা আমাকে মানতেই হবে যে সিসির প্রতি আমার প্রেম যে-ধরণের ব’লে আমি গর্ব বোধ করতাম সে-ধরণের প্রেম আমার নয় ।

“এ-স্বীকারে ব্যথা বাজে ? বাজুক । সত্য বা তাকে সত্য ব’লে না মানলে সত্যের সাধনা হবে কেমন ক’রে ? আর তা-ই যদি না হয় তবে প্রেম বড় হবে কী ক’রে ? প্রেমের ভিত্তি টোঁকে কখনো—যদি সত্যে সে সাহস ক’রে ভর করতে না পারে ? ‘বাস্তবতা’ কথাটা শুনেই আমার কী খারাপই না লাগত এক সময়ে ! কিন্তু বাস্তবিক ও তো আদর্শের শত্রু নয়—বন্ধুই । ও-ই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—আদর্শের পথে কীটা কোথায় । ক্লেশপূর্ণ কখনো জাগতে মুগ্ধ হয় কি—যদি কীটা সবকিছু চেতনা পূর্ণ সজাগ হ’তে না পেয়ে ?”

• হঠাৎ মানের দরজা খোলে ফের শব্দ হয় । দশন নবজন্মবেশে সন্ধ্যার ডায়ারিটা হাতবাক্সে রেখে দিবে সমুদ্রের দিকে থাকে চেয়ে ।

—“কি গো ভাবুকরাজ ? এতক্ষণ হচ্ছিল কি ?”

—“দূরের ঐ পালতোলা নৌকোটা কী সুন্দর !”

—“ঐটে দেখছিলে বুঝি ?” সন্ধ্যার এমন ভালোমানুষি টোন !

—“এমন প্রভাতকনককিরণোজ্জ্বল দিনে কি আর কোনো দিকে  
মন যায় ?”

—“যায় গো যায়—কারুর হাতবায়ে মরোকোবাঁধা কিছু থাকলে  
বাঁহিরে কনক হো কনক, হীরে জহরতের মেলা বসলেও এসে যায় না ।”

স্বপন সন্ধ্যাসে ওর দিকৈ তাকায় ।

সন্ধ্যা খিল খিল ক’রে ছেসে বলে : “এতদিন এদেশে আছ ঠাকুর,  
তবু জানো না ‘কী-হোল’ কাকে বলে ? এ কি আমাদের দেশের দোর ?”

## কথার লহরীভঙ্গ

সাত আট দিন কেটে গেছে । কী সন্ধ্যা ক’রে যে কেটেছে তা  
স্বপনই জানে ! এ যে অভাবনীয় !—জীবনটা গগনময় এই-ই তার জ্ঞান  
ছিল বরাবর । প্রথম জানা, ইসাবেলা ও চাটের সংস্পর্শে এসে সে-টার  
শায় যে জীবনের গম্ভীরতার প্রতি ফাটলেও কাব্যছন্দ, নাট্যছন্দ বেড়ে  
উঠতে পারে অশ্রুতৃতি-বিশেষের স্পর্শে । শুধু অশ্রুতৃতি—না, ঘটনার  
যোগাযোগ । অলঙ্কার থেকে কে যেন যোগান দেয় নাটকত্বের সব  
উপাদান—মাল-মসলা । শুধু যোগান দেওয়াই তো নয় । কে যেন  
খেলায় তাকে খেলার পুতুল ক’রে ! সে খেলে কিছ বৃদ্ধিতে পারে কই  
যে নিজের ইচ্ছে সে খেলেছে না ? অবশ্য তার নিজের ইচ্ছা, যে  
একবারেই শূন্যের কোঠায় তা নয়, কিন্তু এতটুকু ইচ্ছার ঢলে পা এলিয়ে  
দিতে না দিতে বেথে যে চক্কর নিমেষে সব গেছে গুলট-পালট হ’য়ে ।

কত বকম দুঃখ ঘটনায়ই যে সে বোঝে একথা! না বুঝে উপায় আছে? ধরো না কেন সেদিনই—সন্ধ্যা আসার দুদিন পরে।

ওরা তিনজনে এক টেবিলে বসেছে—প্রাতরাশে। আগের দিন আনা প্রায় সমস্ত দিনটা ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। সন্ধ্যা ও স্বপন দুজনেই বোঝে যে এত ঘুম একটা অছিলা মাত্র—যাতে ওরা দুজন একসঙ্গে থাকতে পারি বেশি।

আজও সকালে আনা একটু আপত্তি করতে বার “স্ট্রাইক” অফুতাত্তে। কিন্তু সন্ধ্যা শোনে না, বলে : “সে হচ্ছে না আনা, কেবলই আমাদের এড়িয়ে চললে শুনব না।” আনা ঈর্ষ প্রক্টিম হ’য়ে ওঠে, আর একবার না-না-ও করে, কিন্তু শেষে রাজি হয়। সন্ধ্যাও ভারি বিরত বোধ করে। কথাটা ছিল ওর মান্যজ্ঞই—কিন্তু তার ইঙ্গিতটা যে অস্বস্তিকর! আর অস্বস্তিটা উগ্র হ’য়ে ওঠে কাঁটার মতন—দখন এ-ইঙ্গিত আনা চাপতে দায় অথচ পারে না। তবু কেন এ-চাকাতাকির বিড়খনা?—কেন? স্বপন বিমর্ষভাবে হাসে একলা।

ধরতে গেলে ওরা বেশ খোলাখুলি ভাবে হেসে খেলে বেশামেশি করতে গিয়েছিল ঐ প্রাতরাশের টেবিলে। কিন্তু কি-রকম যে হ’য়ে দাঁড়াল ঘটনাক্রমে...ওদেরই গ্রহ-বৈগুণ্য! অকোয়ার্ড? না, তার চেয়েও বেশি। কিন্তু সেটা বুঝবে স্বপন কাকে! আর বুঝোতে বাঙলার পথেই কি কম অজ্ঞার? জীবনে এমন সব যোগাযোগ অদ্ভুত ছুঁচের মতন নিরন্তর বিঁধতে পারে কে জানত—যে-সব বৈধার ইতিহাস কাউকে বলেও হালকা হবার উপায় নেই। না আনার কথা বলতে পারে সন্ধ্যাকে, না সন্ধ্যার কথা আনাকে। কচিং একটু যদি বা বলে একজনকে অমনি অপরের চোখের দৃষ্টিতে কুটে ওঠে অদ্ভুত অজবোগ কত যে!... ওরা কি ক’রে মনের কথা টের পার—মেয়েরা? এ-ধরনের কত ছোট-

খাটো দোলা ..কত অস্বস্তি..আর সব চেয়ে সঠীন অবস্থা এই যে, ওরা পাশাপাশি রয়েছে এঘটনাকেও নির্মল আকাশে হরুণোদয়ের মতনই করতে হবে ওকে অভিনয়ন। এই-ই যে জীবন-দেবতার খেলার প্রথম বিধান এ-ত্রয়ীর নিকট-সংস্থানে। অথচ ত্রয়ীর সান্নিধ্য যে কোনো দিক দিয়েই এক রকমে তিনটি সই-পাতানো ফুলের মতন স্বাভাবিক নয়, অভিনয়নীয় নয়, তা তিনজনেই বোঝে। অথচ মুখে একজনও যুগ্মকরেও প্রকাশ করতে পারে না। যা প্রতি রক্তকণা দিয়ে করি অসুভব—তাকে প্রতি নিঃশ্বাস দিয়ে হবে ঢাকতে।

আর শুধু ঢাকার সমস্যাই তো নয়। উকীলের মতন নয়-কে-হয়-করার ভারও যে ওদের তিন জনারই ওপর! আইনজ্ঞের তব বাচোয়া যে, যুক্তির এগাকান্ধী তাঁর প্রমাণের ভার—কিন্তু প্রণয়জের? প্রতি পদে যৌক্তিকতাকেই চলতে হবে পাশ কাটিয়ে—মান অভিমানের ক্ষেত্রে অযুক্তির শূণ-শূন ছেড়ে যুক্তির সরা ফুল চায় কোন্ অরসিক? অথচ দেখাতে হবে যে অজ্ঞার আচরণ কেউই করছে না, প্রত্যেকের আচরণই যুক্তিসঙ্গত, প্রত্যেকের দাবি দাওয়াই শিশুর স্তনভূমির দাবির মতনই অনবস্থ। অথচ যুক্তির এই যে, দাবি যেখানে অস্বস্তি সেখানেই তাঁর সন্ধ্যাদা দাপা হয়ে ওঠে সব চেয়ে কঠিন। শিশুর দাবি তার প্রতি দেহদোলে মুখভঙ্গিতে হাসিতে কান্নাতে মাংসপেশীতে ব্যক্ত—উচ্চল। কিন্তু যেখানে প্রণয়ী-ত্রয়ীর নিকট সংস্থান—সেখানে প্রতিজনার দাবিই লুক্কায়িত অথচ একীভূতকে না মানে যুক্তি, না—জনন।

তবে মানে কে? ঐ জো! সাথে কি স্বপনের এত মনে হয় খেলার পুরুষের কথা।

সন্ধ্যা বলে : “তোমাকে বড় ক্যাশে দেখাচ্ছে আনা।”

আনা উৎকর্ষভার ভাব ক’রে হেসে বলে : “পাশে হরদম রত্নীনারাজ থাকলে—অল্প সবাইকে ‘অমন দেখিয়ে থাকে মা শেরি।’”

অপন বিব্রতভাব গোপন ক’রে বলে : “কিছু ধ’রে নিচ্ছ কেন যে, সন্ধ্যা রং-কাণা নয়?”

সন্ধ্যা কিক্ ক’রে হেসে বলে : “ওগো রত্নরাজ, রং-কাণা হ’লে ‘আমিও বাঁচতাম তুমিও বাঁচতে বোম হয়।’”

অপন আনার দিকে চেয়ে মুখে বেপরোয়া হেসে বলে : “মেয়েদের সব এক ক্রা—দেখেছ আনা? সবতাইই একটা ঘোরালোপনার ভাব। তোমাদের কথার কি কোনো মাথামুহু আছে? অথচ এমন চটে বলবে যে মনে হবে বৃষ্টি প্রতি কথার পেছনে পুঞ্জ-অর্থের ঢাণা বিদ্যায় কিলিক নেপে মেরে বেড়াচ্ছে—শুধু একান্ত অন্ধ বল’লেই আমরা—পুঞ্জগতা—দেপতে পাই না।”

আনা উত্তর দিতে বাবে এমন সময় সন্ধ্যা বলে : “ওগো রত্নরাজ, ঘোরালোপনার ভাণে আমরা যে তোমাদের কাছে লিখিত একথা আনার চেয়ে বেশি জানে কে?”

আনা লাল হ’রে ওঠে। অপনও কফির পেয়ালাকে মুখের দ্রোণ ক’রে ধরে। আনার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতাকে দ্বিধে এভাবে ঠেল-বেওয়া কি সন্ধ্যার উচিত? রাগও হয়। অথচ মনে হয় কথার পিঠে কথা যে কী ভাবে পুড়ে কেউ কি জানে? “খেলার পুতুল”—“খেলার পুতুল”—দুয়োটা কিয়ৎ কিয়ৎ আসে। দাবার ছক বেন—কোন কথার বোড়ের চালের পর কারক যে দাবা দাবে কেউ কি জানে?

“খানিকক্ষণ তিন জজর ঘোষা একটু অবস্থিকর নিয়ন্ত্রকতা আসে নেমে। সন্ধ্যাও বোকে কথাটা একটু বেকাশ হয়ে গেছে। অথচ অস্তি



সাধারণ কথা। শুধু বর্তমান কন্টেস্টে এমন ঘোরালো দাঁড়িয়ে  
গেল—মুহুর্তে!...

\* \* \*

আনা বলল : “বাঃ—ডিমটা”—

সন্ধ্যা বলল : “আনি সিদ্ধ ডিম ভালোখানি না তাই, বাস্ত  
হোয়ো না।”

আনা বলল : “তা হ’লে একটা অয়েট আনিয়ে দিই?” বলেই ঘণ্টা  
টেপে আর কি—সন্ধ্যা ওর হাত চেপে ধরে বলে : “না না—আর  
খাবো না।” ব’লেই কণাটার মোড় ফিরিয়ে দেয় : “বেশ ঘাছোক  
গিরিপনা হচ্ছে। তোমাকে দেখাব কথা আমারই না?”

আনা রাগ ক’রে বলে : “তাই বটে না শেরি! অতিথি তুমি  
আমাদেরই দেশের, এ-কথা থালা তুলে গেলে শুধু কায়দার পেয়ে একটু  
কপালে পটি বাধবার সুযোগ পেয়েছিলে ব’লে।”

অগ্নি হেসে বলে : “রাগ করো কেন আনা? অসহায়রা আমাদের  
নিরবলম্ব স্বরূপটিকে কালরে ভুললে তাদের সেই ছবিই যে প্রতি  
অভিভাবকের চিত্রপটে চিরদিনের মতন আঁকা হ’য়ে যায়।”

সন্ধ্যার টোঁট হ’য়ে ওঠে ধুক : “আহা অসহায়াদের ব’য়ে ব’য়েই  
ঠাকুরদের অভিভাবকি হাওড়াটি ফুলে উঠেছে বটে।” বলেই তীক্ষ্ণ  
হাসে : “তবু যদি এ হাওড়াখানি নিরেট হ’ত!”

—“নয়ত কি কাঁপা?”

—“তার চেয়েও ব্যাপ—অগ্নিকা—ফুটো বেলুনের মতন : যেই  
মনে হয় বৃষ্টি আকাশ হ’ল দৌসর, অমনি—জমা!—দেখি ধূপ্ ক’রে

ট'লে পড়ে ধুলায় । একটুও ভার নয় না—তবুও দেখাকে মাটিতে পা পড়ে না ।”

—“দেখাক নানি—কিছু ভার নয় না ? বাঃ এ যে জেপেলিন !”

—“জানা আছে গো জানা আছে কেন আর । একটির বেশি বাহিনী হ'লেই জেপেলিন পড়েন মুখ পুবড়ে ।” ব'লেই ও তুল বোম্ব ।

আনা লাল হ'য়ে উঠেও প্রাণপণে হাসে, বলে : “একথা স্বপন মনে মনে নানে মা শেরি ! কেবল মুখে কবুল করাও তো দেখি !”

হুজনেই তীরনাজি শুরু করল—বুগপৎ ! স্বপন একটু বিরক্ত হয় কিন্তু চেষ্টা ক'রে শুক হেসে বলে : “কেন ? পুরুষেরা জাতে মিথ্যাবাদী বলে ? না, মন মুখ এক-করা-রূপ হুজুরেই তোমাদের কাছে তালিম নেয়নি ব'লে ?”

সন্ধ্যা উপ্ ক'রে বলে : “হুয়ো, হেরে গেলে—হুটোর একটিও না । সত্য কথাই পিন লাগতে না লাগতে পুরুষদের আত্মাভিমানের ঐ অপল'কা বেহুঁন চুপে মাটিতে ধর'লে পড়ে ব'লে ।”

স্বপন বলে : “অর্থীং ?”

সন্ধ্যা বলে : “বলব ?” আনার দিকে চেয়ে বলে : “না, তুমিই বলো বরং ।”

আনা বলে : “বলতে পারি, কিছু ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে ?”

সন্ধ্যা বলে : “শেখ আনা । তুমি না জন্ম-নির্ভীকা—সিসির গরু—করাসিনী ।”

আনা বলে : “সেটা জাঁকের গরু । আসল গরু ওর বাঙালিনীকে নিয়েই কোনো ।”

সন্ধ্যা একটু অপ্রতিভ হয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলে :

“তোমার কাছে ও বুঝি বাঙালিনীকে নিয়ে জাঁক করত—যেমন আমার কাছে করত ফরাগিনীকে নিয়ে ?”

অপন সম্বল হ’য়ে ওঠে ভিতরে ভিতরে : “সন্ধ্যা—তুমি যে বলেছিলে বাংলাদেশের মিষ্টি এনেছ—কষ্ট আনাকে দিলে না ?”

সন্ধ্যা বোঝে হঠাৎ । তার গাল দুটি ঈষৎ লাল হ’য়ে ওঠে ।... লজ্জিত হ’য়ে বলে : “ওমা, তাই তো—একবারে ভুলে গেছি ।”

আনা চেপে ধরে এবার : “আমাদের কথা কি ভাই মনে রাখার যোগ্য ?”

সন্ধ্যা টপ ক’রে বলে : “কিন্তু তার ক্ষেত্রে তোমাকে তো উপোষী হ’য়ে থাকতে হয়নি ভাই—যার মনে রাখার কথা তার তো আর ভুল হয়নি সন্দেহ তোমাকে দিতে বলতে ?” বলেই ও ফের কুণ্ঠিত বোধ করে—জাগ্য ভালো সন্দেহ আনতে উঠে পড়ার পথ খোলা । চেয়ার সম্বন্ধে তেলে ওঠে ।

আনার পাখুর গাল দুটিতে কের কে যেন কাগের জল ছিটিয়ে দেয় । সন্ধ্যা উঠতে বাবে, অপন বলে : “বলো না কোথায় আছে আমি জানছি ।”

সন্ধ্যা বলে : “না তুমি পাববে না—আমি একুনি এনে দিচ্ছি ।” শত চেষ্টায়ও ওর সন্ধ্যাচাঁকতে পারে না । কেন বে বার বার এত সঙ্কল্প এত প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে কস্ম ক’রে বেকাস কথা বেহিয়ে যায় ওর ! অপন পরিষ্কার দেখতে পায় ওর মুখে আশ্চর্য-ভয়-সনার সহস্রাঙ্গীত ছবিটি । কতবার নিজের এ-দোষটি নিয়ে ও অপনের কাছে কঁদেছে—সত্যি কঁদেছে । কেবল একদিন ছিল যখন প্রতি আবদারানিও হ’য়ে উঠত মধুর... অপনের আদরে-সামান্য !... কিন্তু আজ ? হৃদয়েই বোঝে যেন একসঙ্গে ।

## বিদ্ভাট

স্বপন উঠে গিয়ে স্বস্তি পেতে চেয়েছিল—হ'ল না। সুখোমুখি থাড়া ব'লে থাকতে হ'ল ঠিক কি এই সময়েই? তরুণীন প্রাক্তরে ধর স্বর্য়ালোকের নিচেই নিরুপায় পথিক। উদ্ভাপ অনিবার্ধা—একথা ভাবতেও বাজে। অসহায় মনে হয় নিজেকে এত।...

আনা একটা টোটে মাখন মাথায় নিবিষ্ট-চিত্ত। ওর চোখের নিচে কালি, গালটুটি এত ফ্যাকাশে দেখায়। সন্ধ্যার ঠাট্টায় ওর কোথায় বেজেছে। বাজবে না? কিছ...এর পতীকার কোথায়? এত কাছে থেকেও আজ যে ওরা কত দূরে!...ভাবতে কোথায় ব্যথিরে ওঠে মনটার তলে। তবু ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়—দূরে যাবে কেন? গেলে ব্যথা বাজত কি?

ও কী ভাবছে? এই কথাই কি? না, সন্ধ্যার কটাক্ষের সত্যি, একুনি—টেকেরট হোক বা অনিচ্ছেরই হোক পর পর জু-জুবার সন্ধ্যা বা বলল শুকে ঠেপ দিয়ে—কিছুট না যাকে ধরা ছোঁওয়া যায়, সে রকম হুল অসহ্যচরণ সন্ধ্যা করতেই পারে না—কিছ তবু বেদনা দেওয়ার এই ধরনের স্নকুমার প্রয়োগ-রীতিতে আরও যেন বেশি বাজে। মন যে বলে: এ অভিচার, অথচ এর আপীল কোথায়? নইলে কি বাকপটু তীক্ষ্ণী আনাও চূপ ক'রে হজম করে? গর্কিতা চটুলা আনা? অথটন বৈ'কি।

আপীল? স্বপনের মুখে কেমন যেন একটা বিঘাঘের হাসি ফুটে উঠতে চায়। ও যেটারী নালিশ করবে কোন্ অধিকারে? শুধু সমাজই যে ওকে বক্তিত করেছে তা তো নয়!...

তাই কি?—স্বপন ভাবে সন্নিহিত-চিত্তে। হঠাৎ ওর মুখখানি এমন পাণ্ডুর দেখায়!... বেচারী! কাল সারাদিনটা কাটিয়েছে একলা! দেহ অসুস্থ, মন বিবশ—এক কথায় চ'লে যেতেও পারে না—গেলে যে সেটা দেখায় আরও খারাপ!... বিশেষ সজ্জার এমন শুষ্কতার পরে। তিনজনেই জানে যে সবই জানা—অথচ মুখে বা আচরণে প্রকাশ করবার জো নেই। কেন এমন হয়? মানুষের মধ্যে গোপনতার একটা সহজ প্রবণতা আছে বলেই কি? না, এ প্রত্যেকের অপর দুজনকে বাধ্য থেকে বাঁচাবার চেষ্টা? কিন্তু হায়রে—স্বপন যান চলে—এতে বাধ্য থেকেই কি বাঁচানো যায়? যেখানে ভিতরের অবস্থাটা স্বচ্ছ নয় সেখানে বাইরের সহজ আচরণের আলো কাপসা না হ'য়ে পারে? অথচ তবু মানুষের যে কেন এ আশ্রয় চেষ্টা—চাঁট বজায় রাখার!

হঠাৎ মনে হয় সজ্জার মনের কোণে কোণায় সেই ঈশ্বর বক্রতাটাই বুঝি ওর এ-সব কটাক্ষের জন্তে দায়ী। প্রথমটা এটা ওর মনে হয়নি। কিন্তু যখন ওর ডায়ালগি কথা মনে প'ড়ে যায়। প্রথমটায় মনটা ওঠে বিমুখ হ'য়ে। কিন্তু পরেই কের মনে হয় সজ্জার বিচারাসনেই বা বসবে ও কোন্ জায়গায়? আর কেউ না জাহুক ও তো জানে যে, সজ্জা চেষ্টার ক্রটি করেনি—কিন্তু যা চবার নয় তাকে—

হঠাৎ আনা ওর দিকে তাকিয়ে বলে : “কী ভাবছ?”

স্বপন ইতস্ততঃ সূয়ে বলে : “এমন কিছু না তো।”

—“এমন কিছুই না স্বপন? সত্যি কথা?”

স্বপন কাঁটকাঁসি হেসে বলে : “এমন কী-ই বা হ'তে পারে কলো তো?”

আনা বলে : “কেন মিথ্যা মিথ্যা গোপন করবার চেষ্টা করো স্বপন? বাইরের আচরণেই না হয় বুঝে গেলে মিরেছ, কিন্তু চেনা কি ভাসে অচেনা হয়?”

স্বপন আমতা আমতা ক'রে বলে : “মানে ?”

আনার স্বর এবার স্পষ্ট শ্রুত হ'য়ে ওঠে, বলে : “মানে আর কিছুই নয়, শুধু এই বে—” ব'লে একটু থেমে যুহু অথচ দৃঢ় স্বরে বলে : “তোমার মুখের প্রতি আকৃষ্ণনের ব্যঞ্জনা আমি অক্ষরের মতন পড়তে পারি যে সনামি।” ওর স্বরের মধ্যে ছিল... কী ছিল ?... কত কী !... অল্পবোগ... ভাবসনা... সবার ওপর সে কী এক কোমলতা !...

স্বপন মুখ নিচু করল। কী বলবে ও ?

হঠাৎ ব'লে বলে : “কিছু মনে কোরো না আনা, ও তোমাকে সত্যিই ভালোবাসে।”

ব'লেই কপাটা এমন বেহরো লাগে !... এমন ছেলে-ভুলোনো কথা, এমন নির্ভজাল মিথ্যে কথা—যা কেবল নভেলের পাতের পড়া দায় ও নভেলেই সুলভ শোনায়, নিটোল দেবার, বাস্তবের নিকরপ আলোর ফোকাসে মনে হয় কাটগধরা, কঙ্কালসার... একপটতা ঘেঁষে করার কী দরকার ছিল ওর ? বালহুলত রোমান্স করবার জঙ্গ ব্যর্থ মিথ্যার এ-বিড়বনা... ছি !...

আনা হাতের মাখন-মাখানো রুটিটার উপর বহুচালিতের মতন মার্মালেড মাখাতে মাখাতে যেন ভুলেই যায় নিজেকে... স্বপনকে... দৃষ্টি হ'য়ে যায় ওর দৃষ্টিহীন—মার্বেল পাথরের মতন স্থির।

—“ও কী আনা, ছি ?”

ছ'কোটা জল ওর গাল বেয়ে পড়ে। আনা চমকে ওঠে। কেমন ক'রে ও ভুলেছিল—যের ও একলা নয় ? ওর গাল ছুটি রক্তিম হ'য়ে ওঠে কেন... কী বল কী ব'লে ?—সন্ধ্যার অল্পস্বপ্নে ! উঠে সোজা সামনের ব্যালকনির উপর গিয়ে দাঁড়ায়।

স্বপন একটু ইতস্তত ক'রে ঘোরের দিকে চায় তারপর ওর কাছে

এগিয়ে গিয়ে, ওর কাঁধে হাত রাখে। কিন্তু ওর কান থাকে দোরের  
হাতলের দিকে।

—“ছাড়ো ছাড়ো—যদি—”

—“না, ওর পায়ের শব্দ আমি চিনি।”

—“তা হোক—অত কাছে না।”

—“আঃ—অত ভয়ের কী আছে?”

—“ভয়?” আনার মুখচোখ শুদীপুর হয়ে ওঠে।

হঠাৎ এ কী টোন আবার? স্বপন কী যে করবে! যা-ই করতে  
যায় ও—বাধে বিভ্রাট।

—“না—ঠিক ভয় বলিনি—তবে—”

—“ভাবো কি স্বপন—” বলেই আনা আত্মসংবরণ করে।

—“কী বলছিলে?”

—“নাশ্বাক।”

—“বলো না আনা—সন্দীতি!”

এত ইচ্ছে করে ওর আনাকে আর একটু কাছে পেতে—কিন্তু  
এখন—অসম্ভব। হঠাৎ যেন দোরের কাছে কী একটা শব্দ হয়—  
স্বপন মকসুদেগে স’রে দাঁড়ায় একটু—ভদ্র রকম ব্যবধান রেখে। না  
কেউ না।

হঠাৎ আনা ওর দিকে ফিরে তাকায়। ওর হ’চোখে দু’বিন্দু জল  
ঝিক্‌ঝিক করছে!

স্বপনের বুকের মধ্যে কেমন ক’রে ওঠে। সব চেয়ে বিচলিত হয় ও  
মেয়েদের চোখে জল দেখলে। কোঁকের মাথায় স’রে এসেই আনার  
কণ্ঠে বোঁটন ক’রে বলে : “আনা কখনা ক’রে—বে—”

হঠাৎ কোরে আঁবাঁত। এত খারাপ লাগে! স্বপনের তরুণ হৃদ

পাছে—না, সর্ব্বরক্ষ : মেড । বলল : “মামাম এই গ্রেটে মিটি পাঠিয়ে দিলেন আপনাদের জন্তে ।”

—“তিনি আসবেন না ?” আনা ও স্বপন প্রায় একসঙ্গে হিজ্জাসা করে ।

—“না । বললেন তাঁর মাথা ধরেছে—তিনি একটু ঘুমবেন—ঘণ্টা খানেক ।”

মেড চলে যায় ।

আনা স্বপনের চোখের 'পরে চোখ রেখে কী ভাবল । তারপর বলল : “এল না কেন আমাদের কাছে ?”

—“যে কারণে কাল তুমি আসোনি আমাদের কাছে ।”

—“কী কারণ ?”

স্বপন কোনো উত্তর দেয় না ।

—“বুঝতে পেরেছে কি যে—”

—“কী বলতে যাচ্ছিলে ?”

—“না থাক ।”

—“না বলো ।”

—“কী হবে ব'লে স্বপন ? বুঝতেই তো পারো ?”

—“তবু ।”

আনা ম্যান হেসে বলে : “আমি একটা ঠাট্টা করতে যাচ্ছিলাম ।”

—“বর্ণা ?”

—“বলতে যাচ্ছিলাম যে ইংরাজীতে বলে না two is company three is none ?”

—“হ্যাঁ—তাই কী ?”

—“কিছু না । কেবল একখাটা কাল বুঝেছিলাম আমি, আজ বুঝতে পেরেছে ও ।”



অপন মুখ নিচু করল।

আনা বলল : “কিন্তু এটা ঠাট্টাই মনামি, কিছু মনে করো না যেন।”

—“ঠাট্টা মানে ?”

—“নানে ও এখন জানে যে, একথা থাকে মানতে হবে সে আর যেই হোক না কেন—সে ও নয়।”

ব’লেই আনা ছ’হাতে মুখ ঢাকে।...

—“ছি আনা !” অপন ওর কটিবেটন ক’রে কাছে টেনে আনে।

হঠাৎ সন্ধ্যা ঘরে ঢাকে। অপন ওকে ছেড়ে দেয়। আনা কিছু তেমনি কুঁকিয়ে কুঁকিয়ে কাঁদতে থাকে।

সন্ধ্যার হাতে একটা প্রেট। পানিকক্ষণ বাক্যমূলের মতন চূপ ক’রে থাকে, পরে বাংলায় বলে—“কিছু চন্দ্রপুলি ছিল—আনতে ভুলে গিয়েছিলামি।”

হঠাৎ—“ওকি ?” ব’লেই অপন গিয়ে আনাকে ধরে।

আনার কায়া হিস্টিরিয়ার রূপ নিয়েছে। ওর সমস্ত শরীর উঠেছে ঢেউ।

সন্ধ্যা ওর মাথা বুকের ‘পরে টেনে নিয়ে বলে—“ছি বোন, কঁদ না—কের হয়তো সুখী হবে, অস্থির করবে—”

বলতে বলতে আনার দেহ কাঠের মতন শক্ত হ’য়ে যায়। পতনোন্মুখ অবস্থায় ওকে ধ’রে দুজনে কোনো মতে এনে সোফায় শুইয়ে দেয়।

সন্ধ্যা বলে : “তুমি যাও ডাক্তারকে টেলিফোন করো—এদিকে আমি সব ব্যবস্থা করছি।”

অপনের মনের মধ্যে তখন উড়ছে আঁধা শুধুই অর্থহীন রক্তহীন আঁধা... হুঃধের... আক্ষেপের... বেদনার নাট্যকেশনার ‘পরে একটা বিত্বকার...

অবশ্য এ-ধরনের জিনিস উপস্থানে পড়লে ওর যে কা ভালোই

লাগত।...ভেবে একটু হাসিও আসে। গুর মধ্যে একটা মাহুত আছে...  
সে কিন্তু সব দেখে আর হাসে।...জীবনের সব নাটক ভোগ করে বুঝি  
সে-ই মাহুতটাই?

## বাঁকা

ডাক্তারের মুখ ফের মেঝাক্স হ'য়ে গেল। ..

ফল হ'ল এমন অবস্থিকর।...

আনার চাই পুরো বিশ্রাম—ডাক্তার সন্ধ্যার কাছে ভাঙা ইংরাজীতে  
উনিশবার উচ্চারণ করলেন “রেস্ট” কথাটি, ও তেইশ বার বললেন :  
নইলে সীরিয়াস হ'তে পারে। কোনো রকম তর্কাতর্কি না, বেশি  
পরিশ্রমের কাজ না। অল্প-স্বল্প গল্পগাথা—তাও বেশি না, এমন কি  
বেশি হাসিও না, তাতেও নাকি রাগ উত্তেজিত হয়। বললেন : খেনারাল  
প্রস্ট্রেশন্ বড় বেশি রকম হয়েছে।

\* \*

সব লেন-দেনই প্রায় বন্ধ হ'য়ে যাবার দাখিল। অনেকে ওরা কেবল  
হুপুরে ওদের টেবিল ডাকে মধ্যাহ্নভোজনে। তাও এত মৃদু ও সন্তোষভাবে  
বে, একত্রে আহারের সব আনন্দই বায় মাটি হ'য়ে। সন্ধ্যা ইচ্ছে ক'রেই  
কম কথা বলে—অথচ হাসি গল্পের ঠাট বজায় রাখতে চয় ভো ভাকেই  
সব চেয়ে বেশি। অল্প নাট্যকারের কলবের একটি টানে সমস্ত জীবনের  
কেজীর চরিত্র হ'য়ে ওঠে সে-ই। এ-ভূমিকা যে ও উপভোগ করে না—  
এ হোলা থেকে ও যে অব্যাহতি চায় মনে প্রাণে, তা আনি বা স্বপন  
কাকুরই চোখ এড়ায় না অথচ সেটাকে আদল না দিয়েই চলতে হয়

দুজনকেই। আরও মুক্তি এই যে, আনার ভাব-ভজিতে বেশ বোঝা যায় যে সন্ধ্যার করুণার বাশ্পও সে সইতে অক্ষম, অথচ তবু সন্ধ্যাকে বেশি ক'রেই ভদ্র হ'তে হয় এ অতিথির প্রতি—বেশি ক'রে মনোযোগ—হাসির প্রফুল্লতার ছগ্নতার ঠাট বেশি ক'রেই বজায় রাখতে হয় যখন ওর সামনে থাকে। স্বপনের এ-সব ভালো লাগে না, কিন্তু কী করবে ও? কোনো পথই খুঁজে পায় না—যাকে ইংরাজীতে বলে “মধ্যপথ”;—স্বপন বুঝতে পারে যে সন্ধ্যা তার প্রবর্তমান কুণ্ঠা ও অস্বাচ্ছন্দ্যকে প্রাণপণে গোপন করার চেষ্টা করে তাকে আরাম দিতেই, কিন্তু এই আশ্রয়দানের আশ্রয় প্রয়াসই তার কাছে হ'য়ে ওঠে দুঃসহ। চেষ্টার অসাধা কাজ নেই! স্বপন ব্যস্ত হেসে নিজের বিজ্ঞ মনকেই মাঝে মাঝে এ-প্রশ্ন করেছে যে কত বারই!...

এ-ই ধরণের কপি-বৃকসম্ভব নীতিকথা যে কী অসার!...জীবনের প্রতি বাক্যে দেখা মেলে অসামান্যের—অপ্রত্যাশিতের—অবটনের—বিশেষ ক'রে এ প্রাণচঞ্চল গতিউচ্ছল যুরোপে—যারা আমাদের কামনা বাসনা আশা আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা অনিচ্ছার ধারণা ধারে না!...না, তার চেয়েও বেশি—যাদের চেষ্টা ক'রে যতই বাগ মানাতে বাওয়া যায় ততই তারা বসে বেকে।...

## সফিস্টিকেশন

অথচ কী মুক্তি! এ নিয়ে কেউ কারুর সঙ্গে মন মুলে দুটো কথাও বলতে পারে না। বোধ হয় সন্ধ্যার মন নিজের 'পরই' বিজ্ঞ ছিল সেদিন আনাকে কটাক্ষ করার পর থেকেই। ওর মনে এমনও হয়েছিল—সে কথাও একদিন স্বপনকে উৎসব অক্ষতল হ'য়ে বলে ফেলেছিল—যে, ওর ব্যর্থ ব্যর্থ চেষ্টা দেওয়া কথারই মুক্তি আনা কের পক্ষ। স্বপন তাকে

আমির ক'রে একরাশ না না দিয়ে বোঝাতে গিয়েছিল, কিন্তু সেটাও যে সন্ধ্যার কানে আতিশয্য মনে হয়েছিল সে কথা বুঝতেও ওর মেরি হয়নি। এতে ও আহত বোধ করেছিল, কিন্তু জোর ক'রে "না" বলতেও পারেনি—কারণ মিথ্যা বলার সময়েও একটা সত্যনিষ্ঠতা ওর প্রায়ই থাকত। কেমন ?

—এ সময়ে বাধা হ'য়ে ও কত মিথ্যাই না বলেছে—সন্ধ্যার কাছে, আনার কাছে—জেনে শুনে যে, কেউই বিশ্বাস করবে না।—ফলে আত্মমানি এসেছে বৈ কি। কিন্তু তবু একটা সত্য আবিষ্কার ক'রে খানিকটা কতিপূরণও মিলেছে—একটা আত্ম-আবিষ্কার। ও এই সময়ে নিজের নানা মিথ্যাচরণের মধ্যে দুটো স্পষ্ট অগাধা ভঙ্গি দেখতে পায় : একটা সত্যনিষ্ঠ মিথ্যাভঙ্গি, অপরটা কপট মিথ্যাভঙ্গি। বড় বিচিত্র অতুষ্টি সে! অথচ এত স্পষ্ট...! ও দেখেছে—প্রত্যক্ষ—যে, এক রকম মিথ্যাচরণ আছে যা অগরে মিথ্যা ব'লে টের পাবার উপক্রম করতে-না-করতে পৌঁ ধ'রে নিজের কাছেও প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস পায় যে, এ আবিষ্কার, যেহেতু মিথ্যাটা আসলে সত্যই। আর বলতে বলতে নিজেকে সেটা আধাবিশ্বাস ক'রে বসে। এতে দৃষ্টি ধার আবিষ্কার হ'য়ে, মিথ্যার পলি পড়তে পড়তে সত্যের স্রোত আসে প্রায় ক্রম হ'য়ে...

এরই নাম ও বেয়—কপট মিথ্যাভঙ্গি। কিন্তু আর একটা মিথ্যাভঙ্গি আছে যা ওর সত্যদৃষ্টিকে এমনভাবে আবিষ্কার করে না। বরং সে মিথ্যাকে নতই অগরে বিশ্বাস করে, ততই সে বেশ হ'য়ে বাজে, নিজেকে যেন হয় বিশ্বাসহীন। এ মিথ্যাভঙ্গিতেও অধোগতি হয়, কিন্তু তা সত্যও উদ্ধারহণের পথ থাকে খোলা—মিথ্যার চেতনা থাকে উন্নতভাবে সতর্ক। এর ফলেই আসে অতুষ্টি। তাই একে ও নান দেয় সত্যনিষ্ঠ মিথ্যাভঙ্গি। এ-ওতে যখন ও মিথ্যা বলে তখন আত্মসন্ধানজ্ঞান ওর

একবারে লুপ্ত হয় না—বরং মিথ্যার প্রতি ওর সহজাত ঘৃণা আরো প্রবলই হ'য়ে ওঠে। মনে মনে শপথ করে—আর কখনো মিথ্যা বলবে না—কিন্তু পাকে-চক্রে পারে কই! কিন্তু না পারুক, তবু সত্যাচরণের অভীশাটুকু আপস হ'য়ে যায় না।

কিন্তু এ-অভীশারও আবার বিপদ আছে। মিথ্যার মধ্যে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে পারলে একটা স্বপ্নি মেলে। কিন্তু সত্য ও মিথ্যার দুখামান ভঙ্গির মোহানায় পড়লে সেটা হ'য়ে দাঁড়ার ছ-নোকোয় পা। এরকম অবস্থায় না পায় নিজে কোনো সাহসনা, না দিতে পারে আনা বা সজ্ঞাকে কোনো প্রবোধ। সাত-পাঁচ ভেবে-চিন্তে শেষটায় বোঝে যে এ-সব ক্ষেত্রে বাধ্যতা, আত্মসম্মানের রূপা প্রয়াস, ওদের দুজনকে অতি আপ্যায়নের বহর—এ-সব বঁত কমানো যাবে ততই বেশি বজায় রাখা হবে ঐ সত্যনিষ্ঠ মিথ্যাভক্তি। বাধ্য হ'য়েই এ-ধরণের বেশি অস্বস্তিকর মিথ্যাভক্তিকে নেয় ও বরণ করে : ও দুর্বল, কিন্তু স্বভাব-বল্ক নয়। তাই সত্যিই ওর সত্যাচরণের একটা উচ্চ আদর্শ ছিল বরাবরই। পারে না অনেক সময়েই সে আদর্শ অল্পস্বারে নিজের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করতে—কিন্তু ওর অন্তর্যামী তো জানেন যে এ-অভীশা তাই ব'লে ওর মিথ্যা নয়। কিন্তু সেইজন্যই আবার ও দুঃখও পায় এত বেশি। মনে হয় যে, জীবনে 'এই বাকটাতে' এসে যেন ওর সব সরল আচরণের ছাঁপওঁড় গেছে ভেঙে। এরই নাম সফিস্টিকেশন। কী যে সর্ব্বমুখে মোহ এ!—এর জটিল আবাদ যে একবার গেরেছে সে হাজার দুঃখ পাক না কেন এর ধনায়মান আবর্ত থেকে মুক্তি আর পায় কই? মুক্তি তো দুবের কথা, বরং এ-ঘোরালো পোলক-ধাঁধার আরও পথহারা হ'তেই চায়। সরল আচরণ করবে কী?—মন নিজে রকমারি মুক্তি যোগায় যে প্রতি সরল পরিক্ষণের বিপক্ষে! অথচ মুক্তিতে মেলে না তো কোনো

মুক্তির উদ্দেশ্যে। কুদ্রুতম আচরণও হয়ে দাঁড়ায় বুহৎ, স্বচ্ছতম বিন্দুও হয়ে দাঁড়ায় অনচ্ছ জাভাল, এককথায় মনটা প্রতি তৃণশীর্ষেও ঠোকর খেতে খেতে হয়ে পড়ে দিশেহারা। ও কত সময়েই যে আনার একটি নত দৃষ্টিতে রাজ্যের বিবাহের ইতিহাস পড়ে—সন্ধ্যার একটি অধর-কুকনে দেখতে পায় ওর পাহাড়-প্রমাণ ব্যথা-মিষ্ণু চালা সংলাপ—এমন কি নিজের কল্পনার উদগ্র আত্মনির্ঘাতনের প্রবণতায়ও পড়ে ও দিশেহারা হয়ে!... সে-সব এমন উদ্ভট যে বর্ণনা করাও কঠিন। করতে গেলে যে অশ্রদ্ধা জাগে নিজের 'পরেই। অথচ তাই ব'লে নিজের আত্মজরুর অবস্থাকেও তো আর কাল্পনিক বলতে পারে না। বাইরের উপলব্ধ যতই কেন না কাল্পনিক হোক—নিজের মনের প্রতিক্রিয়া যে জাজ্জল্যমান—অতিপ্রত্যক্ষ! সফিস্টিকেশন দূর হতে পারে, তার আত্মনির্ঘাতনের পদ্ধতি বাস্তবসূচক হ'তে পারে—কিন্তু অবাস্তবতার লেশও তাতে নেই। স্বপন মাঝে মাঝে ভাবে : এরই নাম কি জন্মের যুক্তিবোধ! কিন্তু এতে লাভ কতটুকু। এ-ধরনের বিকাশ না হ'লে, সহজ সরল পথে চললে কি জীবন যাত্রায় আনন্দের পাথর ডের বেশি মিলত না? কে জানে? ...দীর্ঘনিঃশ্বাসে ওর বুক আসে ছেঁবে—যা করলে আনন্দের পাথর জীবনের পথচলার অক্ষর হ'য়ে ওঠে তা করা যতই সহজ হয় ততই মেন কে তাকে ঠেলে ধরে সে-পথ থেকে।

থেকে থেকে গভীর বিবানে ওর বুক আসে কালো হ'য়ে—অথচ সে-কথা কাউকে বলবারও যো নেই। শুধু ও-ই না। তিনজনের কেউই কাউকে খোলাখুলি কোনো কিছু বলতে ভরসা পায় না। সকল হাসিঠাট্টা করতে-গেলেও এসে যায় একটা তির্যক্ চাল—নিবেদন ক'রে সন্ধ্যার মধ্যে। অথচ পরে একত্রে সন্ধ্যাই হয় সব চেয়ে বেশি অদৃষ্টপূর্ণ। সে অদৃষ্টাপ এত সত্য যে শ্রদ্ধা জাগে। সব কালো মেখেই যে সোনার

রেখা থাকে বলে—কথাটা সত্য। সন্ধ্যার উনার ব্যবহারের আন্তরিক চেষ্টা ছিল এই স্বর্ণরেখা। ও যে চাইত না ছিবোইন হ'তে—ও যে চাইত আত্মবিশ্বাস—ও যে আনাকে চাইত মনে-প্রাণে ভালোবাসতে এইটাই ছিল স্বপনের প্রধান গোরব—বলতে গেলে একমাত্র গোরব এ-অবর্ণনীয় বেকনার অধ্যায়ে। বাকি সব বড় জোর—সামান্য প্রবোধ।

কিছু হ'লে হবে কী?—সব চেয়ে মুচ্ছিল এই যে, এ-কথাও সন্ধ্যাকে বলা যায় না, আনাকেও এ অসুস্থ অবস্থায় অসু কোথাও যেতে বলা চলে না সন্ধ্যাকে স্বস্তি দিতে চেয়ে।



অনেক ভেবে-চিন্তে স্বপন মসিয়ে বেনারকে সব খুলে এক দীর্ঘপত্র লিপন-কৃতীকে আসতে এ-অকুলের কাণ্ডারী হ'য়ে।

## চাং ও নীরা

মসিয়ে বেনার স্বপনের চিত্রি পেয়েই তার করলেন যে চাং পারিসে একা—একটা হাসপাতালে বিশেষ অসুস্থ, তাই তাঁর নীস রওনা হ'তে দিন দুই দেরি হ'তে পারে—ওরা যেন কিছু মনে না করে—ইত্যাদি।

যখন তারটা এল তখন ওরা মধ্যাহ্নভোজনে আসীন। স্বপনের মুখ অন্ধকার দেখে আনা ও সন্ধ্যা উঠল উদ্বিগ্ন হ'য়ে। স্বপন মুখ ভুলে জ্বলন্ত লজ্জুরে বলল : “না—ভেমন কিছু খারাপ খবর নয়। তবে চাং—এই দেখ না।” আনা ও সন্ধ্যা হুঁকে পড়ল তারটা দেখতে। আনা বলল : “কিছু চাং পারিসে একা কেন?” স্বপন বলল : “সেটা

আমিও বুঝতে পারছি না।” সন্ধ্যা বলল : “ইসাবেলাকে তার বাবার গুণারা ধরে নিয়ে গেছে-টেছে নাকি?”

• স্বপন বলল : “কী ক’রে জানব? ওদের কাছ থেকে কোনো চিঠিপত্রই তো সম্প্রতি পাইনি।”

আনা বলল : “না না—অতশত কিছু নয়—তা হ’লে মসিয়ে বেনার লিখতেন। সম্ভবতঃ—” ব’লেই থেমে গেল। চাণ্ডের “বিশেষ অনুপেত্র” সময়েও ইসা কাছে নেই! সবারই মনে হয় এক সঙ্গে যেন।

খানিকক্ষণ কেউই কথা কইল না।

সন্ধ্যা বলল : “তোমার পেটটার সঙ্গে তোমার ভ্যালিট অপেক্ষা করছে যে।”

স্বপনের চমক ভাঙল : “ও—।” ব’লেই ওয়েটারকে বলল নিয়ে যেতে!

আনা বলল : “ছ’লে না যে আর?”

• স্বপন বলল : “খেয়েছি যথেষ্ট।”

সন্ধ্যা বলল : “কই খেয়েছ?” বলেই উদ্যত ওয়েটারকে হাতের টাকিতে নিরস্ত ক’রে বাংলায় বলল : “আমার মাথা খাও ও-মাছটা শেষ করো। এটা তুমি ছুঁতেই কুলে গেছ যে।”

স্বপন বলল : “ওহো।” ব’লে অজ্ঞানমনস্কভাবে এক টুকরো মাছ মুখে মিল। তার দৃষ্টি দূর সমুদ্রের জ্বাল আতরণে নিবদ্ধ। সন্ধ্যা ও আনার চক্ষু বিনিময় হয় কিঞ্চ ওয়া কথা কয় না। ঘরের হাওয়াটাও যেন তারি হ’য়ে ওঠে মূর্ত্তে। কিঞ্চ এতে একটা ভালো হয় এই যে, ওদের মধ্যে ঘনায়মান অস্থির ভাবটা আসে কিকে হয়ে। প্রত্যেকের অজস্র মিতা যেন-পরের কথা ভেবে বহিমুখী হ’য়ে ওঠে—পলকে।...

আনা প্রথম নিশ্বাস ভাঙল, বলল : “তুমি যদি পারিসে থাকতে এ-সময়ে—চাং কত খুসি হ’ত!”



সন্ধ্যা প্রতিধ্বনি ক'রে বলল : “সত্যি। যাবে?”

অপন একটু আশ্চর্য হ'য়ে বলল : “কেমন ক'রে যাব?”

আনা বলল : “যাওনা অপন তোমরা দুজনে। আমি তো বেশ ভালো হ'য়ে উঠেছি এখন।”

সন্ধ্যা বলল : “দূর। তা কখনো হয়? তুমি যে দুর্বল আছ।”

কলেই অপনের দিকে চেয়ে বলল : “আমি বলি কি তুমি একলাই যাওনা কেন?”

অপন বলল : “সে কি?” বলতেই যন্ত্রচালিতবৎ আনার সঙ্গে ওর দৃষ্টি-বিনিময় হয়।

সন্ধ্যা রাগত সুরে বলে : “আ—হা, আকাশ থেকে পড়লেন একেবারে। কেন। ওকে কি আমি দেখতে পারি না—না, ওকে আমার হাতে সুপে দিয়ে যেতে পারে না তোমার মন?”

আবার সেই পাক। আনার মুখ লাল হ'য়ে ওঠে কিন্তু সে অপনকে ঘেন বাঁচাবার কল্পেই হেসে বলে : “পারে সন্ধ্যা। পুরুষরা বন্ধুর সঙ্গে বান্ধবীসের এককথায় ছেড়ে দিতে পারে কোনো—আর সেটা পৌরুষের সঙ্গে!”

অপন বলে : “আ—হা, ঘেন নীরার সঙ্গে তোমারই তোমার বন্ধুকে ভালো করে দিতে এতটুকু বাধত। যদি সে লিখত একবার ‘এসো’—তবে দেখতাম মনামি, দেখতাম।”

আনার মুখ গভীর হ'য়ে ওঠে : “কথাটা তোমার কাছে ভাঙিনি অপন, ভয়েই। আমাকেও হয়তো দু-একদিনের মধ্যে তার কাছে যেতে হবে।”

অপন উদ্বিগ্ন হ'রে জিজ্ঞাসা করে : “কি?”

আনা বলে : “কালই সন্ধ্যার তার একটা ছোট চিঠি পেয়েছি।

তার দিন বুঝি কুড়িয়ে এসেছে।” বলতে বলতে ওর কণ্ঠস্বর ঈষৎ গাঢ় হয়ে এল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল : “লিখেছে তাঁর মেয়েকে আমাকেই দিয়ে গেল—আর যদি সম্ভব হয় তবে ও তাঁর করলে একবার শেষ দেখা—”

ওর চোখে জল উপছে পড়ে কের। আজকাল ওর কথার কথার চোখে অশ্রুর এমন ঢল নামে !...

স্বপন সম্বৃত হয়ে ওঠে : “ছি আনা—”

আনা চোখের জলের মধ্যে দিয়ে হাসে : “ভয় নেই মনামি, হিস্টিরিয়ার কবল থেকে মুক্তি পেয়েছি বোধ হয়। তবে বুঝতেই তো পারো—আজকাল—” বলে রুমাল দিয়ে চোপ মুছে একটু থেমে : “কি যে ছাই হয় কথার কথায় এই ছোটো পোড়া চোখে—” বলেই সন্ধ্যার দিকে চেয়ে খুব চেষ্টা করে লঘু হেসে : “ভাবছ, নবাবদের বড়াই বড় সব মুখে, কাজের বেলায় ওরা যে-অবলা সেই অবলা ?”

সন্ধ্যা হেসে বলে : “ঠিক তা ভাবিনি। তবে মনে হচ্ছিল—” বলেই থেমে যায়।

স্বপন বলে : “কি ?” মনের কোণে ঊকি দারে কিন্তু স্বাক্ষর একটুকরো উড়ো মেঘ।

সন্ধ্যা বলে : “না, তেমন কিছু নয়।”

আনা ধরে পড়ে : “বলতেই হবে—তবু।”

সন্ধ্যা বলে : “মনে হচ্ছিল গিসি নব্য কি না !”

ওরা দুজনেই উৎস্রক নেত্রে সন্ধ্যার মুখের পানে তাকায়।

সন্ধ্যার কথাটা বলেই মুখে কৃত্তার ছায়া আসে কের। সে তাঁর গ্রেটের 'পরে মনোনিবেশ করে।

আনা বলে : কিন্তু একথা মনে হ'ল কেন ? স্বপন সন্ধ্যা

পত্নীকে ছেড়ে নব্য বন্ধুকে দেখতে উধাও হ'তে সত্যিই পারে কি না, ভেবে ?”

সন্ধ্যা বলে : “থাক ও সব কথা আনা।”

ওর মুখ কেমন বেন দেখায়। স্বপন ফের ভয় পেয়ে যায়। স্বরপোড়া জীব সেই সিঁদুরে—

হঠাৎ মেড আনাকে একটি টোতে ক'রে একটি তার এনে দেয়।

আনা ত্রস্ত হস্তে ধোলে। এবং খুলেই ওর মুখ অন্ধকার হ'য়ে যায়।

স্বপনের উদ্বেগ কানায় কানায় ভ'রে ওঠে, খুব মূঢ় স্ত্রীর বলে : “সীতার বুঝি ?”

—“হাঁ—এই দেখ”—বলে তারটা ওর হাতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই আনা ব্যালকনির উপর গিয়ে দাঁড়ায়। স্বপন ও সন্ধ্যা পড়ে একত্রে :

“একবার আসবে আনা ? যদি কাল রাত অবধিও এ জীবনের তেলটুকু থাকে—তবে সে শুধু তোমারই পথ চেয়ে। তবে যদি কমা করতে পারো তবেই এসো—”

ওরা দুজনে একযোগে আনার দিকে তাকায়। ব্যালকনির কাছে একটা ছোট খামে মাথা তেঁপ দিয়ে ও দাঁড়িয়ে বাম বাহুর 'পরে গাল রেখে। শতীর ওর স্পষ্ট কাঁপছে থর থর ক'রে।

## ওলট-পালট

সন্ধ্যা আনার কাছে গিয়ে একহাতে তার কটিবন্ধন ক'রে আর একহাতে নিয়ে তার মুখখানি নিজের কাঁধের 'পরে এমন আদরে টেনে নেয় ! স্বপন প্রতীক্ষমান ভাবিতে চেয়ে থাকে কে জানে হয়তো পরস্পরকেই ও আনার কোনো কাজে লাগবে অথবা সন্ধ্যার কোনো করণ্য খাটতে

হবে। চারধারে শুধুই গতিহীন অশান্তির মরুভূমি—সবই অনিশ্চিত, সব বাইরের কাজ শুরু, ভাষা বোবা, অথচ মন ঐ বেলাপহত উন্মিমাগার মতমই অশান্ত—জিজ্ঞাসু—নিশেধার। এ-হেন সময়ে যা-ই করতে হোক না কেন—লাগবে ভালো বৈ কি।

সন্ধ্যা বলল : “ছি আনা, অত কাঁদে না, লক্ষীটি!”

আনা ওর কাঁধে মুখ লুকিয়ে ওর গলা ধরে জড়িয়ে। এভাবে সে কখনো সন্ধ্যার কাছে এগোরনি। একদিন ও সন্ধ্যার যতই সেবা নিক না কেন, এবং মুখে সেজন্তে বতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক না কেন, ওর চোখের ভিত্তে, অধরোষ্ঠের আকৃকনে, কথার তটে—ওর শত চোঁটা সম্বন্ধে ফুটে বেরত সন্ধ্যার প্রতি একটা প্রজ্বর বিমুগ্ধভাব। এ-বিমুগ্ধতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো না গেলেও প্রত্যেকেই বুঝত। কারণ তার শিখা না থাকলেও আঁচ ছিল। সেটা টের পাওয়া যেত সেই সব সময়ে যখন সন্ধ্যার পরিচর্যা ওর কাছে হ’য়ে উঠত অপরিহার্য। কিন্তু আজ ওর প্রিয়তমা বালাসখীর কথা মনে করে মনের সব বিমুগ্ধতা গলে জল হ’য়ে গেছে! স্বপন একটা স্বপ্নি বোধ করে বুকের অনেকখানি অনপনয় তার ওর হালকা হ’য়ে যায়।

তিনজনে চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকে কিছু। তার পরে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে ওকে টেনে সোফার বসায়। আনা ওর কাঁধে মুখ দেয় আরও ডুবিয়ে। সন্ধ্যার খোলা চুল আনার গণ্ডে, অংসে, প্রকোষ্ঠে, বুকে এলিয়ে পড়ে নানা ভাবে। সন্ধ্যা বার বার দেয় সরিয়ে, কিন্তু ফের হাওয়াতে সে-সব শুক্ক ফিরে ফিরে আনার বেহের উপর ঢেঁট খেলে যায়। স্বপন সোফাটিতে একটু ব্যবধান রেখে সন্ধ্যার পাশে বসে ও মুহূর্তেই চেয়ে চেয়ে দেখে : সন্ধ্যার মধ্যে ফুটে উঠেছে ঠিক যেন একটি হাসোনার নৃষ্টি। আনা যেন একটা শিশু।

এইভাবে কতক্ষণ কাটে কেউ জানে না।

\* \*

\*

আনা মুখ তোলে। তিনজনেই একটু হুহু বোধ করে। অনিশ্চিতের আশঙ্কাটা একটু কাটে। না—আনার মুচ্ছা ফের আসবে না। অমনি স্বপনের বুকের মধ্যে জ্বপিও যেন পালকের মতন হালকা হয়ে যায়—মুহুর্তে।

আনাই সব প্রথম কথা কয় : “কী বলে তোমরা ?” চায় সন্ধ্যার দিকে।

এই প্রথম ও সন্ধ্যাকে গণনার মধ্যে আনল। সন্ধ্যার মুখ প্রীত হয়ে ওঠে। আনা ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকে সপ্রাণ নয়নে। সে উত্তর দেয় না কিছু। তিনজনেই ফের নিশ্চুপ।... চঠাং ইতি-কর্তব্যতার প্রশ্ন উপচীয়মান অন্তরঙ্গতার মাঝখানে এমন বেজুরো ভাবে এসে পড়ে!...

চঠাং স্বপন বলে : “কিছু এ দুর্বল শরীরে নীরাকে দেখতে থাকে কী করে ?”

সন্ধ্যা সাগর দেয় : “বিশেষ ডাক্তার যখন বলে গেছেন রেসট—কম্প্রাইট রেসট।” বলে সম্মুখে আনার পানে চেয়ে হাসে।

আনা বলে : “কিছু ও যে মৃত্যুশয্যা !”

এ-কথার উত্তর কী ? মৃত্যু—জীবনের সব চেয়ে বড় শত্রু যে, সব চেয়ে বড় বিদ্রোহী যে—সব ব্যবহারই দেয় সে উলটে। অথচ তার চেয়ে বড় বন্ধুই থাকে ? তার হির হৃদির পরিশ্রেক্ষণিকার ধরা পড়ে যে, জীবনের সব কুসংস্কার, কেন্দ্রিতা, চকলতা।

\* \*

\*

নিভুততাটা ধীরে ধীরে একটু আগের লম্বু ডাককে সরিয়ে ভারি হয়ে  
চেপে বসে ওদের চেতনার উপর।

• স্বপন বলে : “একটা ভালো মোটর বোটে ক’রে অধিক্তি মাসেলুসে  
বাওয়া বার সবাই মিলে—”

আনা বলে : “পাগল—আমার কক্ষে তোমাদের কষ্ট দিতে পারি?”

সন্ধ্যা দৃঢ়কণ্ঠে বলে : “ও সব ভ্রমতার সময় এ নয় আনা। আমারও  
মনে হচ্ছিল যে এক বদি তিনজনে মিলে যাই তবে হয়তো এ সমস্কার  
মীমাংসা হ’লেও হ’তে পারে বা।”

স্বপন খুঁসি হয়ে ওঠে। যাতোক একটা কাজ তো পাওয়া গেল।  
উঠে দাঁড়ায় : “তা হ’লে আমি মোটর বোটটা—”

সন্ধ্যা বাধা দেয় : “কিন্তু তার আগে একবার ডাক্তার সাহেবের  
পরামর্শ নিতে হয় না কি?”

• আনা শাস্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বলে : “না হয় না। জীবনে এমন সব  
সময় আসে বধন ডাক্তারিপনা সহজ পথকে দাড় করার কাটাবন।  
আমাকে যেমন ক’রে হোক আজ যেতেই হবে নীরার কাছে। কিন্তু সে  
কথা নয়। শোনো স্বপন, আমি বলি কি, মোটর বোটে ক’রে আমি  
একাই বাই—তুমি বরং চাংকে দেখতে যাও। অর্থাৎ আমি আমার  
বাকুবীকে দেখতে যাই, তুমি—তোমার বন্ধুকে।”

• সন্ধ্যা সান্ত্বনানে বলে : “আর আমি এখানে বসে বসে চেউ শুনি  
—বে—ব।”

আনা মিছ হেসে বলে : “জায়া তো বাবেই তাই হাজার মতন কাহার  
পিছু—ঐ পারিসেরই পথে। আমার কক্ষে তোমাকে প্রতীক্ষা করতে  
বলব তেউ সোনাকে সফল ক’রে? বাঃ—আমি কি এতই অন্ধ?”

সন্ধ্যা “কিন্তু”—ব’লে একটু ভাবে, তারপর : “আমি ঠিক করছি।

—সিসি বাক পারিলে। আমি কী করবই বা সেখানে গিয়ে—বখন ও ব্যস্ত থাকবে ওর পীড়িত বন্ধুকে নিয়ে? ও যদি পারে তবে চাং ও মসিরে বেলারকে নিয়ে কিরে আহুক এখানেই; ইতিমধ্যে আমি যাই তোমার বডিগার্ড হয়ে মাসেলসে। নীরার কাছ থেকে তার মেয়েটির জার নিতেও হবে তো—সে তুমি পারবে কেন?”

আনা হেসে বলে : “আহা—হা—যেন উনি হচ্ছেন বিশটি শিশুর গর্ভধারিণী।”

সন্ধ্যা একটু লজ্জা পেয়ে বলে : “তা না হ’তে পারি, কিন্তু দু-একটি শিশু যে মানুষ করেছি—বা তুমি করোনি।”

আনা বলে : “কেমন ক’রে জানলে?”

সন্ধ্যা বলে : “আমাদের ঘরোয়া একটা প্রবচন আছে শিকারী বেড়ালের গৌক দেখলে ঢেনা বায়।”

স্বপন মানেটা বুঝিয়ে দেয়।

আনা হাসিমুখে বলে : “কবুল করছি না হয় যে, আজ অরুচি কোনো শিশুকে মধু দেইনি। কিন্তু তা বলে তোমাকে বদুচ্ছাড়া করতে পারি?”

স্বপন হেসে বলে : “তা বটে। কোন্ স্বকেই বা করবে বলা?”  
কিন্তু হাসিটা জোর ক’রে।

সন্ধ্যা টপ্ ক’রে বলে : “সখিদের স্বখে।—না আনা, ঠাট্টা না। যদি নীরার কাছে যাওই—তবে আমি সঙ্গে যাবই—তা সিসি বাক বা না বাক—এই-ই আমার শেষ কথা।”

ঔদার্য্যে মানুষের সঙ্কল্প সত্ত্বেও ওর মুখ হ’য়ে ওঠে বন্ধ! স্বপন পূর্ব অজ্ঞতব করে। সন্ধ্যার আচরণে আনার প্রতি বিস্ময়তার বাস্পও নেই আর।

অশ্বন বলে : “কিছু—”

সন্ধ্যা বলে : “কিছু না, তুমি যাও পারিসে। সত্যি, চাং তোমার প্রিয় বন্ধু, তাকে তোমার দেখা কর্তব্য যে—বিশেষ তার এ-হেন সঙ্কটাপন্ন অস্থিৎ।”

অশ্বন বলে : “কিছু সঙ্কটাপন্ন অস্থিৎ কে বলল ? আর—” বলে একটু ইতস্ততঃ ক’রে বলল : “কি জানো সন্ধ্যা—তোমরা দুজনে মাসে মাসে ছুটবে গলাগলি সখিত্ব করতে করতে, আর আমি বেচারী একা ছুটব বিহুঁয়ে—দূর পথে—নাঃ, অতটা রোমান্টিক হ’তে ঠিক পারছি না।”

সন্ধ্যা বলল : “রোমান্স বুদ্ধি তা হ’লে শুধু মেয়েদেরই একচেটে থাকবে চিরদিন ? না, বন্ধুত্বের সম্বন্ধে যত ঘটাপটা রিজার্ভ করো তোমরা শুধু কাণ্ডেরই পাতায় ?”

অশ্বন একটু অপ্রতিভ বোধ করে, কিছু মুখে বলাসাধ্য সহজ সুরে বলে : “ওগো সমা-কটাকিণি ! পুরুষের বন্ধুত্ব নিছক কাণ্ডিক হোক বা না হোক, বন্ধুত্ব কাকে বলে তার বিম্ববিসর্গও মেয়েরা জানে না এটা মনে রেখো। তোমরা কথা কও রামাবতার, অতিথি-সংকারেব, স্বরস্বর-সভার-প্রত্যাখ্যাত বৈদ্যদের অকণা দহনকার—মন দিয়ে শুনব—কিছু জেনো বন্ধুত্ব তোমাদের অনধিকার-চর্চা।”

সন্ধ্যা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে : “জানা আছে গো, জানা আছে, তবু যদি একটি এলোকেলীর ভয়ে লাগে বন্ধুদের মধ্যে কুকর্কেত্রের ইতিহাস কবিতা সেই মাছাতার আমল থেকে লিখে না আসতেন ! সেখান আমরা কোমল জবলা তাই এ-হেন অব্যবহিত-চিকিত্সকের নিয়োগ দর করি—অস্ত্রস্ত্রি অপরাধ কমা ক’রে।”

ওরা তিনজনেই হাসে—কিছু করিক। জানা বলে : “কিছু ঠিক হ’ল কী ?”



স্বপন চিন্তিত হুয়ে বলে : “আচ্ছা মসিয়ে বেনারকে একটা তার কপরে জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয় ?”

আনা হান হুয়ে বলে : “সময় নেই। নীরার যে অস্তিত্ব অবস্থা তোমরা কেবলই ভুলে যাচ্ছ ?”

—“ও হো।” স্বপন লজ্জিত বোধ করে। নীরার কথা ওর একেবারেই মনে ছিল না—সত্যিই তো।

সন্ধ্যা বলল : “কিন্তু শোনো আনা, আমি বলি কি : মিসিও আসুক না কেন আমাদের সঙ্গে ? আমরা তো কালই কিরে আসব। দরকার হয় তার পরে ও বাবে না হয় পারিসে। এ-সময়ে একজন তারবাহীর সঙ্গে থাকা মন্দ কি ?”

হঠাৎ মেড আর একটা টেলিগ্রাম নিয়ে এসে হাজির। স্বপনের নাম। স্বপন খুলতে খুলতে বলে : “নিশ্চয় মসিয়ে বেনারের তার।”

আনা বলে : “বোধ হয় চাণ্ডের অবস্থা—”

স্বপন চোখ বিস্ফারিত ক’রে বলে : “কী আশ্চর্য্য !”

ওরা দুজনে প্রায় একসঙ্গে বলে : “কার তার ?”

স্বপন বলে : “ইসাবেলার। সে ইজিপ্টে একটা বোডিং হাউসে।” বলে পড়তে থাকে ফের।

সন্ধ্যা বলে : “ইসাবেলা ! একা ! ইজিপ্টে ?—কোথায় ?”

আনা বলে : “কারোতে। বোডিং হাউসে ! এ যে প্রায় নভেলের মতন শোনাচ্ছে ! ব্যাপার কী ?”

স্বপন পড়ে মুহূর্তে : “স্বপন, আমি ইংল্ড থেকে পালিয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছি। কেউ জানে না। বড় বিপদ—চাং কোথায় আনি ন। তুমি কি একবার আসতে পারো ? কতিনেটাল শান্তর হোটেলের ট্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলে আমি যেখানে আছি, নিয়ে আনবো।”

তোমাকে। তোমার উপর এমন কোনো অধিকারই আমার নেই খার  
জ্ঞোরে তোমাকে আসতে বলতে পারি। তবে তোমাকে যেটুকু জালি  
তাতে মনে হয় অধিকার নেই ব'লেই তোমার সদর ক'বে তার প্রতি—  
যে একদিন তোমাকে সত্যি বন্ধু ব'লে বরণ করেছিল। যদি আসো—  
সাতায় হোটেলের ম্যানেজারকে তার কোরো। ইসাবেলা।” ওরা  
তিনজনে বায়ুচের মতন পরস্পরের দিকে তাকায়।

• •

স্বপন তার ক'রে দিল : “মার্সেল্‌স্ থেকে পরের জাহাজেই রওনা  
হচ্ছি। আজ রাতেই আলেকসান্ড্রিয়ার বোট পাব খোঁজ নিলাম।  
যদি এরোপ্লেনে সার্ভিসের সুবিধা থাকে তবে তাই নেব। নিশ্চিত  
থেকে—আমি বত তাড়াতাড়ি পারি পৌঁছতে চেষ্টা করব।”

• •

একঘণ্টার মধ্যেই ওরা তিনজনে রওনা হ'ল মার্সেল্‌স্। কিন্তু মোটর  
বোটে নয়—হোটেলেরই এক সেডান করে। নইলে আলেকসান্ড্রিয়ার  
জাহাজ ধরার সময় থাকে না।

• •

নীয়ার আরোগ্যালয়ের নিচের বৈঠকখানায় গভীরে বসিয়ে, আনা  
গেল নীয়ার কাছে।

সন্ধ্যা বলল : “মাথার দিবি রইল সিসি—কায়রো পৌঁছেই লম্বা  
তার কোরো।”

স্বপন ওর মাথা বুকে টেনে নিয়ে বলল: “করব গো শকুনি! করব। পকাশ টাকা খরচ করে তোমারই মতন এক দীর্ঘ চিঠিলাহিনী তার করব সব ইতিহাস দিয়ে।”

সন্ধ্যা হঠাৎ ওর গলা জড়িয়ে ধরল।

—“একি? ছি সন্ধ্যা? কীদছ? কেন?”

—“আমি মাহুষ তো সিসি। তোমাকে কতদিন বাধে পেতে না পেতে এমন ভাবে—বোঝো না কি—এ ক’দিন—”

—“শু—শু। ঐ আনা আসছে বুঝি।”

—“না,—প্রধানা নার্স।”

সন্ধ্যা বলল: “কেমন আছেন তিনি?”

নার্স বলল: “মনের ভালো—স্বাসের কষ্টটা একটু কম।”

স্বপন বলল: “বাচার—”

নার্স ঘাড় নাড়ল: “বড় জোর আজকের রাতটা। কিন্তু যদিও দুপল্লী বলছিলেন আপনি নাকি আজ রাতের জাহাজেই আলো—গুয়া রওনা হবেন?”

—“হ্যাঁ। কেন?”

—“তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন আপনি সম্ভব হলে এয়ারোপ্লেনে রওনা হ’তে চান, আপনার নাকি তাড়াতাড়ি আছে?”

—“আছে। কিন্তু এয়ারোপ্লেনের খোজ করার এখনো সময় পাইনি, সোজা নীস থেকে এখানে এসেছি ট্যান্ডিতে। খোজ করতে চাই এবার। এবাবোড্রোমটা কোথায় জানেন?”

—“কাছেই। কিন্তু খোজ করতে হবে না—আজই সন্ধ্যার মেল নিয়ে এয়ারোপ্লেনে রওনা হবে—রাত বারটার আগেই কাররো পৌছে দেবে। আমার ভাই-ই পাইলট।”

স্বপন খুলি হঠাৎ বলল : “বিশেষ দৃষ্টবান বাবান, আমি এই-ই চাইছিলাম।”

• —“Pas de quoi Monsieur.” • বলে দিচ্ছিলেন প্রবোধী নারী  
বিদায় নিলেন।



সন্ধ্যা স্বপনের দুই কাঁধে দুই হাত রেখে বলল : “পারো তো  
এয়ারোপ্লেনেই কিরো কিছু—কালই।”

স্বপন দোরের দিকে চেয়েই আলগোছে ওর মুখ-চুখন ক’রে বলে :  
“কালই ? বাপ্পে :

‘নয়নের মণি আমার সঙ্গিনী, তিলেক আড়ালে রাখিতে—’”

—“ঠাট রাখো, ও-সব এখন ভালো লাগছে না একটুও। শোনো !  
কালই কিরবে তো ?”

—“যদি পুষ্পকরথ পাই।”

—“পাবে। সাধুর ভবিষ্যদ্বাণী।”

—“তবে সাধুও কিরবেন।”

—“তিন সত্যি ?”

—“সত্যি, সত্যি, সত্যি, সত্যি, সত্যি—তিন ছেড়ে তিনার রইল ?  
কেবল একটা প্রল্ল।”

—“কি ?”

• —“যদি সাধুর ভবিষ্যদ্বাণী বার্থ হয় ?—যদি কাল কিরতি  
এয়ারোপ্লেন না মেলে ?”

• কিছু না।

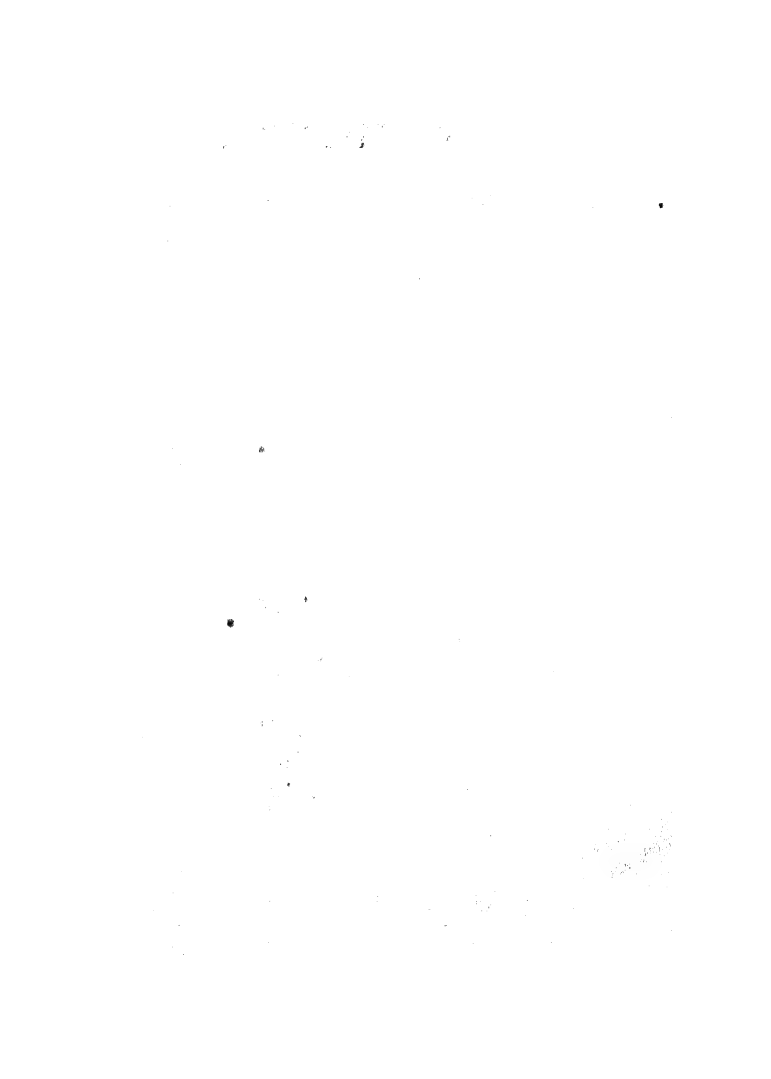
—“তা হ'লে সার্ব সমস্ত দিনটা কারবার অসাক্ষীর সঙ্গে অসাধু  
আচরণ করতে পারবেন—পাঞ্জা রইল।”

হুজনেই হেসে ওঠে।...

কেবল সন্ধ্যার হাসির মধ্যে ছিল প্রভাতী আলো না—প্রদোষ  
ছায়া।...

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

ইসাবেলা .



## কারো

শুধু দুচোখ দেখা যাচ্ছে—নাক অবধি কালো বোঝা টানা—গারে  
কী এক রক্তের সগোত্র তীব্র গন্ধ—এ-চেন রক্তময়ী দোর ছিলেন খুলে।  
সান্ত্বনের ম্যানেজার—সে-ই স্বপনকে ট্যান্ডি ক'রে ইসাবেলার বোজিং  
হাউসে নিয়ে এসেছিল—অবগুণ্টিতাকে আরব ভাষায় কী বলল স্বপন  
কিছুই বুঝল না তবে বার দুই আল্লা শুনে একটু শক্তিত না হ'য়েই বা ক'রে  
কী? ইসাবেলার কি কোনো সাংঘাতিক অসুখ, না গুত্তারা ফের—  
চিপ্তাস্রোতে তার বাধা পড়ল, ম্যানেজার ভদ্রলোক তাকে বললেন :  
"Monsieur, Madame veut vous voir tout seul." \* মিসর  
দেশে এরা সব কী পরিষ্কার ফরাসী বলে! স্বপন এ-উদ্ভাস মুহূর্তেও আশ্চর্য  
হ'য়ে ভাবে! কী সুন্দর ওদের উচ্চারণ! ভেবেই তার আশ্চর্য লাগে-  
যে, এ-সময়েও এ-সব সে লক্ষ্য করে!

\* \* \*

এ কী চেহারা! স্বপন চমকে ওঠে!...সেই ইসাবেলা! কোটিরগত  
চক্ষু—চোখের পাতা ক্ষীত। রং বিবর্ণ। চুল কতদিন ধেন অবহ্নে  
অবহ্নে জট-পাকানো মতন, পরশে মলিন চন্দন-রঙের একটি ব্লাউস।  
অজ্ঞাত: ঘরের স্তিমিত আলোর ঐ-রঙেরই দেখাছিল। কেবল এ-চন্দন-  
রঙে ঝিকিঝিকিটুকু নেই, আছে শুধু তার বিবস্ত্রতাটুকু।

ঘরটিও—উঃ এমন গরম। হাওয়া-চলাচল নেই। তুটো ভাঙা মতন

\* মাঝে মাঝে দেখা করতে চান নিরাশার।



চেয়ার ...একটা পুথোনে শত-তালি-দেওয়া শতরঞ্চি...তার উপরে একটা টেবিলে এঁটো একটা থালা মতন ও দুটো কানা-ভাঙা বাটি...আরও কী কী। কোনো ঘরের আসবাব-পত্র ওর কখনো চোখে পড়ত না—কিন্তু ইসাবেলার মলিন মূর্তি ওর নিরীক্ষাশক্তিকে দেয় উকে। স্বপন ওর দিকে এগোয় অব্যবহিত চিত্তে!...তখন চমকে ওঠে—পায়ের কাছ দিয়ে ও কী—ইসাবেলা রান হেসে বলে : “ও কিছু না—ইঁহুর, এসো বল্ল!” বলেই ছ’হাত দেয় পাড়িয়ে।

স্বপনের গার মধ্যে জুগুন্সায় শিঙ্ক শিঙ্ক ক’রে ওঠে। সন্তর্পণে পা ফেলে।...ইসাবেলা একটা লম্বা মতন বাঁকে না কিসে বসেছিল—সেটি ঘরের ঘোরের গায়ে এসে শেষ হয়েছে; তার অর্ধেকটা দেয়ালে ঢোকানো। ইসাবেলা বলল : “বোসো—এখানে।”

—“ভার সইবে!” ঘরের মধ্যে এমন রেলওয়ে বাক সে কুত্রাপি দেখেনি।”

—“সইবে—এটা কাঠ নয় লোহা।”

লোহা? ঘরের মধ্যে দেয়ালে প্রোথিত লোহার বেঞ্চি! স্বপনের কী রকম যেন মনে হয়! স্তম্ভ নিজের বিষয়ই নয়—ইসাবেলা হেন কুৎসে-কঙ্কা এখানে, এ-সময়ে, এ-ভাবে?...চক্রব্যং পরিবর্ত্তে—

—“দাঁড়াও—ও জানলাটা একটু খুলে দিয়ে বসবে? আমি উঠতে পারি না।”

স্বপনের বকের মধ্যে কোথায় লুক ক’রে উঠল : “সে কি! উঠতে পারো না?”

—“পারি—কিন্তু কষ্ট হয় বড়, বা-পায়ের ছাড়টা এখনো জখম আছে।”

—“জা-ড়—জখম?—” স্বপনের কেন বিশ্বাসই হয় না!...

—“কিন্তু সব। কিন্তু জানলাটা খুলে দাও—একটু হাওয়া আবহুক।”  
স্বপন খুলে দিল।

—“কিন্তু—না—ঐ দেখ—আলোটা বড়ই কাঁপছে—”

ঘরের মধ্যে একটা পিলুজ মতন—ঠিক পিলুজও না একটা মাটির  
লম্বা হরতন আকৃতির বাতকোষ মতন জিনিষ—একটা বামন ইষ্টকথণ্ডের  
উপর তুলত—তার ওপরে একটা টোবিল ল্যাম্প—কেরোসিনের। তারজ্বৰ্ব  
ছেড়ে এই প্রথম স্বপন কেরোসিনের আলো দেখল। ঘরের মধ্যে এ-রকম  
পামও অভাবনীয়! ..

স্বপন ফের জানলাটা বন্ধ ক’রে দেয়।

কিন্তু অসহ্য গরম যে! কপালের ঘাম মোছে।

ইসাবেলা ঘান্না হেসে বলে : “আমাদের স’রে গেছে—দেবেছ ? কিন্তু  
তোমার জন্তে কী কর তাই ? হয়েছে, এই নাও আমার হাতপাখাটা।”  
.. স্বপনের বকের মধ্যে কোথায় ফের একটা স্থিতির তার ওঠে বেজে...  
এটা তার আঁত পরিচিত আপানী হাতপাখা...স্বপনই ওকে উপহার  
দিয়েছিল—একটা বাজিতে ছেরে...এ নিয়ে চাং ওদের কী ঠাট্টাই না  
করত!...

ইসাবেলা টপ ক’রে ধরেছে : “সেই পাখাটাই বটে!”

আশ্চর্য! মেয়েরা কী ক’রে টের পায় ?

স্বপন ওর পাশে বসে বলল : “পাখার দরকার নেই ইসাবেল, কিন্তু  
এ কী ব্যাপার ?”

—“চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না, না ?”

—“থরছে।” ব’লেই ওর একটি হাত নিজের দু’হাতের মধ্যে চেপে  
ধরে কোমল সুরে বলল : “কী ব্যাপার ইসা।”

ইসাবেলা মুখ নিচু ক’রে থাকে।...কোথেকে চাং চাং ক’রে ছুটো

বাজে। রাত দুটো। দেখা করবার সময় বটে ভদ্রমহিলার সঙ্গে!... স্বপনের মনের কোণে জাগে অবিবাহিতের আবেগ!...এ-সব কি বাস্তব, না নিছক স্বপ্ন? হঠাৎ জেগে উঠে দেখবে সব মিলিয়ে গেছে?... রোমান্স—কথাটা ঘুর ঘুরে বাজে ওর কানের আশে পাশে। এদেশে রোমান্সের ছন্দ ঢের বেশি স্বচ্ছন্দ—ও মনে মনে বলে—জীবনে আকস্মিকতার ঢেউ ঢের বেশি ঝিকমকে। কিন্তু তবু...এ যেন—কী বলবে? রোমান্সের শিখর-মুহূর্ত। দেশে ফিরে এ-সব—ধরো যদি কোনো উপজ্ঞাসে লেখে কোনোদিন—কেউ কি বিশ্বাস করবে?...বলবেই নভেলিয়ারা, না বলে পারে?—

হঠাৎ ইসাবেলার দীর্ঘশ্বাসের শব্দে ওর চমক ভাঙে : মনে প'ড়ে যায়—ইসাবেলা ওর শেষ প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। ইসার কাঁধে হাত রেখে গাড়ি ঘেঁষে প্রশ্নটি করে ফের : “কথা কইছ না যে?”

তবু ওঁ কথা কয় না, মুখ নিচু ক'রেই থাকে। স্বপনের সন্দেশ হয়... বুঝি ও—ওর মুখ তুলে পরীক্ষা করতে ওর চিবুক স্পর্শ করে : সেই মুহূর্তেই ও স্বপনের কোলে ডেঙে পড়ে।

—“ছি ইসা! শোনে—লক্ষ্যটি—আহা—আমি বলছি—”

\* \* \*

মিনিট দুই ধরে ইসাবেলার শরীরের উপর দিয়ে যেন একটা দমকা ঝড় ধরে গেল। সে-কাপনে স্বপনের বুকও জেগে ওঠে অতীতস্মার তুকান। এ-ধরণের করুণার উপলব্ধি ওর জীবনে প্রথম। আনার কাছারও এমন হয়নি। তার কাছার স্মৃতিতে হুটে উঠেছিল বুঝি শুধু ক্ষমতার আবেগ। এর কাছার চারধারে তরঙ্গিত হ'য়ে ওঠে—করুণার ত্রিমোহও,—বুঝি আবেষ্টনীর একান্ত কৃত্রিমতার কন্ডে। স্বপনের সমবেদনার

পিছনে এই কুস্তীভার পটভূমিকা থমকে দাড়িয়ে। তাই বুদ্ধি এ-কাকণ্য  
এত হুঃসহ ! এ যে ওদের পদবীর ধনাত্মক জীবনের সঙ্গেই খাপ খায় না।  
এ যেন...কী বলবে...কত কথা মনে হয়...এ যেমনার মধ্যে যেন কোথায়  
লুকিয়ে আছে মিনতির একটা ছায়াকরাল মুক্তি। না, তার চেয়েও  
বেশি...ককালের মুখে হাসি !...ওর বুকের মধ্যে যেন এক রাশ দড়ি কে  
পাকাচ্ছে...ককণার সঙ্গে জুড়ুপা এমনভাবে ও কোনোদিন উপলব্ধি  
করেনি। করবে কেমন ক'রে? এ-রকম যোগাযোগ জীবনে শুধু যে  
অঘটনীয় তাই নয়—অচিন্তনীয়।

\* \*

স্বপন ওর মাথাটি নিজের কাঁধের উপরে রেখে ওর আলগা চুলে বীজে  
ধীরে হাত বুলায়।...সংসারে অসহন্য অভিজ্ঞতাও স'য়ে যায়...স্বপন  
ক্রমে আশপাশের হুঃসহতা আর ততটা বোধ করে না...বোধ হয় তার  
সম্মুখে ইসাবেলার কয়েকটা চূর্ণালক ও অসহ্য দেহের উপর পড়ে ব'লে  
বাইরেটা ও ভুলে যায়।...ওর ককণার শ্রোত অসহ্য ইসাবেলার দিকে  
বয়...একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচে নিজের রক্ত অবিগল আত্মসচেতনতার হাত  
থেকে মুক্তি পেয়ে।...মাছুষ মাছুষের কতই আপন।—নইলে এ-বারে এত  
সহজে ও নিজেকে হুঃ বোধ করতে পারত কখনো? হুঃ বোধ করা  
তো দুঃের কথা—এক মিনিটও ত্রিটোতে পারত কি?—মনে এ-প্রশ্ন তর্কে  
কেবলই।

কিন্তু ওর মনে এক একবার তবুও সেই প্রশ্ন আগে—এ স্বপ্ন নয় তো?  
কোথায় ও আজ? ওখানে কী জলছে ওটা? কেরোসিনের বাতি?  
সত্যিই কি একটা লোহার দেয়াল-বেকির উপর লতরক বিছিয়ে ওরা  
ব'সে?—সত্যিই কি পদ্ম ইসাবেলা ওর কাঁধে মাথা রেখে?...ও কী

বধু ?...ওর মেঝেও দিয়ে শির শির ক'রে ভয়ের একটা প্রবাহ কিলিক  
যেয়ে যায়।...না : একটা প্যাটার মতন ডাক। এদেশেও প্যাটা আছে  
না কি ? কিন্তু তার চেয়ে ঢের কুৎসিত শব্দ।

একটা দম্কা হাওয়া আসে। জানলাটা খুলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে  
আলোটা কি রকম লাগচে মতন হ'য়ে ধূম উদ্গার ক'রে দুবার পিঙ্গল জ্বিত  
বের ক'বে দপ্ ক'রে নিতে যায়।

কিন্তু ইসাবেলা তেমনিই ওর কাঁধে মুখ ডুবিয়ে...ওর গলা জড়িয়ে চুপ  
ক'বে!...হঠাৎ স্বপনের চোপ পড়ে...পায়ের কাছে এককালি চাঁদের  
আলোর উপর বাইরের একটা গাছের পত্র-পুঞ্জের ছায়া পড়েছে...এ  
কী! আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেলা চলেছে!...কী সুন্দর!

বিছাৎ খেলে যায় ওর মনে। কিসের ?—স্ট্রট ক'রে ধরতে পারবে  
না...অথচ এত মধুর মনে চর কী একটা হারানো স্বর বেজে ওঠে যেন  
ওই আলোছায়ার নাচে!...এমন অন্তরীণ কুস্মিতার মধ্যেও এমন অসঙ্গ  
ইয়মা! কে এ মেয়েটি! ক'দিনের আলাপ ওদের? কাল ও কোথায়  
ছিল? কিসের ডাকে এসেছে আজ এত কষ্ট ক'রে এখানে—এই  
কুস্মিতার মধ্যে!...ইসাবেলার কোমল কণ্ঠে গ্রীবার পিঠে হাত বুলাতে  
বুলোতে নাখুয়োর সঙ্গে ওর মনটা টস্ টস্ ক'রে ওঠে।...কী মধুর ঐ  
চাঁদের আলোয় ফালিটুকু!...কী মায়াময় ঐ আলো-ছায়ার হাতছানি!  
এ যেন...কী বলবে...সব-হারানো বনানীর মধ্যে সব-কিরে-পাওয়ার  
ভরসা—দূর লোকালয়ের বস্তিকাদিশা!...না : দেবালয়ের। সত্যিই  
দুগন্ধ পার—রাগে, শব্দশব্দনি বাজে—অবশ্যে।

...ইসাবেলার পিঠে চূলে গভীর মেহে হাত বুলায় ও...কতকণ বে!

ইসাবেলা থেকে থেকে খব খব ক'রে কেঁপে ওঠে...যেন কী একটা  
জিন্ন-দ্বিতিকে প্রতিহত করতে চায় ও!

স্বপন এক একবার ব'লে ওঠে : “ভয় কী ইসাবেল ! আমি আছি।”  
আবার ঘরের মধ্যে শুধু একটা ছোট টাইমপীসের টিক্ টিক্ টিক্। আবার  
ইসাবেলা ওর গলা আরও সাগ্রহে জড়িয়ে ধরে। স্বপনের মন বর্তমান  
উত্তীর্ণ হ'য়ে কোথায় যে চারণ করে!...সেই হঠাৎ-মেলা মন্দিরের শাঁক  
ঘণ্টা আবার ওঠে বেজে...আশে পাশে বিছিয়ে যায় ফের সেই ধূপারতির  
সৌরভ-কুসুমগন্ধ! এ তো করুণা নয়-তবে। সত্যিই সে শোনে  
ঘণ্টাধ্বনি—সেই গ্রামের শাঁক...শুধু সামনের ঐ চক্কালোকের কালি-  
টুকুতে খটে যায় এমন অবটন!...

তার চেতনার সোনার-তরী ভিড়ায় যেন কোন্ স্বপন-পসারীর  
কূলে!...অসম্ভবও হ'য়ে ওঠে সম্ভব! ছুটো হৃদয় আসে কাছে...একজন  
চায় ভরসা, অপরিজন দেয় বরাভর!...মনে হয় এ-বরাভরে ওর জন্মস্থান!...  
ছদ্মনি আগে বার নিজেকে মনে হ'ত এত অসহায়...আজ তার রোমে  
রোমে আগে এ কী বিপুলের ছোঁওয়া...উপচিহ্ন হ'য়ে ওঠে এ কী অক্ষয়  
পাথের! ...মুহুর্তের জন্মে ও ভুলে যায় জীবনের কুক্ষতা, ক্রিয় মোহমত্ততা;  
অসহায়তা...শুধু আগে এক অপার আনন্দ-সৌরভ...ও ভগবানকে  
ধন্তবাদ দেয় যে, ওর ক্ষুদ্র উদ্ভাস্ত চেতনার তটে কদমতরুও দোলা  
লাগে এ অচিন কম্বোলের...এ-বিভূয়ে—বিদেশে!...ভাড়া ধরে কুটে ওঠে  
চাঁদের আলো!...

## পথে

হঠাৎ ইসাবেলা বেন বড় বেশি স্থির!...ভয়ের বিহীনাম খেলে যায়  
ওর মনে : ইসাবেলার নিঃশ্বাস পড়ছে তো!...পড়ছে...বীচা গেল!  
কিন্তু ওর কাঁধে ঘুমিয়ে পড়ল না কি?—যুহু স্বরে ডাকে : “ইসাবেল !”

স্তর চমক ভাঙে। ও তল্লাবিট চোখে স্বপনের দিকে চায়।...  
প্রথমে দৃষ্টির মধ্যে ফুটে ওঠে যেন অপরিচয়ের ভয়—কিন্তু না... পর  
দুরুন্ডেই সখিঃ ফিরে পায় যেন!.. স্বপনের বুকের মধ্যে কী যেন একটা  
মোচড় দিয়ে ওঠে: “ধ্বংসাবশেষ” কথাটা ওর মনের দিগন্তে খেলে যায়।...

ইসা নান হেসে বলে: “আশ্চর্য লাগে, না?—আমার এ-দশা  
ভাবতে?”

স্বপন সান্দনার সুরে বলে: “না। বোধ হয় বড় ক্লান্ত, না?”

ইসাবেলা চোখ দুহাতে ঢেকে বলে: “কাল রাতেও ঘুমতে পারিনি  
—মকিয়া ইজ্জত করছিল কি না। থেকে থেকে কেমন যেন ঘোর  
লাগে... আচ্ছন্ন নতন...”

—“পায়ের বাধার জন্তে ইজ্জেকশন!”

—“না। পায়ের হাড়ে মাত্র একটু চোট লেগেছে। কি রকম ভয়  
ভয় করে মনে হয় বুঝি পাগল হ’য়ে যাব। আর ভাবতেই বুকের মধ্যে  
কি রকম একটা... সে বর্ণনা করাও মুশ্কিল... বেদনাও না, কারণ চেতনা  
হারাতেই তো চাই—অথচ পারি না,—তাই তো এমন বয়না। এক  
নিঃসাড়, অথচ চেতনা এমন তীক্ষ্ণ... থেকে থেকে মায়ুগুলো হ’য়ে ওঠে  
যেন বালিতারা... উ—”

স্বপন কী বলবে ভেবে পায় না... ওর চুলে কশালে গালে গাঢ় ঘেছে  
হাত বুলাতে থাকে। ইসাবেলা এমন কাটাকাটা ভাবে থেমে থেমে  
যেন দম্ব নিতে নিতে কথা বলছে—[—সেই মেয়ে—যার কথার ধারা-  
প্রপাতের তোড়ে টাল-সামলানো ছিল এক দায়!—ইসাবেলা সাড়া  
ধেয়—ওর হাতটাকে চুষন করে।

—“তুমি এত ভালো কারো মিরো! তুমি যে এসময়ে আসবে  
ভাবিনি সত্যি।”

—“কেন ?”

—“পুরুষ মানুষ ব’লে।”

• স্বপন ওর চোখের পর্বে চোখ তেখে বলে : “হুসিনে হ’ল কী তোমার ইসাবেলা ?”

—“আমিই কি জানি ? যেন একটা ছায়াবাজি খটে গেল—একটা বিপ্রব।” ব’লেই ছ’হাতে মুখ লুকোলো।

স্বপন ফের ওর চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলে : “ছি ইসাবেলা ! এত অধীর হ’লে চলে ?—শোনো, আমি বলি কি, চলো তোমায় নিয়ে বাই এখান থেকে—এ-ঘরের দুর্ভিত হাওয়ার আমারই মন যায় বিবর্ণ হ’য়ে যে।”

—“আমার হাতে একটি পিয়াস্তাও\* নেই স্বপন।”

—“সে সব হবে এখন। বলি একটা ট্যাক্সি ডাকতে ? পারবে উঠতে ?”

ওর মুখ একটু হালকা হ’য়ে ওঠে : “পারব মনামি—কেউ ধরলে চলতে পারি কোনোমতে।”

স্বপন বাইরে গিয়ে ডাকাডাকি করতে সেই অন্ধাধুন্ডিতার পুনরাবির্ভাব। স্বপন বলল : “Taxi—auto—”

• •  
•

এক বৃদ্ধ এসে হাজির : “মানামের বিল—”

• স্বপন তার মুখে বাবা দিঘে তৎক্ষণাৎ চুকিয়ে দিল, চেজ নিল না। মোটা চেজ।

• ইক্সিটের মুহূর্ত।



বৃদ্ধ সসন্মমে ইসাবেলার অন্ত্রে কোথেকে এক কোলামতন নিয়ে এসে  
হাজির।

স্বপন মনে মনে হাসল : রূপচাঁদ !—

ওরা ইসাকে সেই কোলায় বসিয়ে ট্যান্ডিতে নিয়ে ওঠাল। বৃদ্ধ  
কুনিস ক'রে বলল : “Où voulez-vous—”†

—“সাতয়।”

\* \* \*

বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ইসাবেলা একটু স্নহ বোধ করে। স্বপনের  
হাত ওর মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে : “স্বপন !”

—“কী ইসাবেল ?”

• —“আমাকে নিয়ে চলো—সন্ধ্যা ?”

—“কোথায় যাবে বলো ?”

• ও দুহাতে মুখ লুকোয় ফের : “আমার যাবার জায়গা কোথায়  
স্বপন ?”

স্বপন বিপন্ন হয়ে একটু ভাবে, তারপরে বলে : “নীসে যাবে ?  
আমার জী দেথবে শুনবে তোমায়।”

—“তোমার জী ! সেই সন্—দা ?”

স্বপন হাসে : “নইলে আর কে !”

হঠাৎ ইসাবেলার অপাঙ্গে সাবেককালের বিদ্র্যৎ কিলিক মারে :  
“তোমাদের কাণ্ডকারখানা কে বুঝবে ভাই ?”

স্বপন অপ্রতিভ হয়েও খুসি হয় ওর হঠাৎ প্রকল্পরূপ দেখে, “দুঃ—”  
বলে ফুট হাসে।

† কোথায় আগনি—

আশ্চর্য্য! ইসাবেলার মুখে সেই আগেকার হঠুনি মুহূর্তে উঠেছে  
কৃটে : “শোনো কারো মিয়ো, আমাদের স্পেনে একটি ছড়া আছে :

প্রথম বাক্য আসে                      নট বলে লাজ হাসে :

‘সাবধান লো দ্বিতীয়া! অর্দ্ধচন্দ্র সাঝা’—

শুধু, যবে সে-নর্তকী      বাজায় রি নি নি—ও কী ?

তৃতীয়া চতুর্থীদেরও লাগে খাসা তাজা !”

ওরা খুব হাসে, এ-ভাবে হাসি যে কায়রোর আবহেও সম্ভব তা কে  
ভেবেছিল ?

হাসি থামলে স্বপন ওর হাতের 'পরে চাপড় দিয়ে বলে : “হঠুনি  
তোমার বাবে কোথায় ?”

—“করণ হাসির বড় ভক্ত স্প্যানিয়ার্ডরা—শোনোনি কি ?”

—“তুনেছি। কিছ—” স্বপনের মুখ গভীর হয়ে ওঠে : “আনা  
বড় অসুস্থ—সন্ধ্যার তদারকেই তাকে রেখে এসেছি।” কথাটা একটু  
কেমন-কেমন শোনায় যেন !

ইসাবেলার মুখের হাসি মুহূর্তে ঢেকে যায় : “তবু আমাকে নিয়ে  
বেতে চাইছ নীসে ?”

স্বপন একটু আশ্চর্য্য করে বলে : “তাতে কী ?”

—“অনেক কিছু। না স্বপন, এ শোনার পর আমি আর নীসে বেতে  
পারি না তোমার সঙ্গে। আহা! বেচারী !”

—“বেচারী ? কে ?”

—“হুনিয়ার বত অপোগণ্ডের তারবাহী ঐ কাঁধ। ও নিরীহ  
হাওনাটি আপত্তি করে না বলেই যে আমাদের সিক্রান্দ নাবিক দ্বার  
অধিকার কায়ম হয়ে গেছে এ তো আর প্রশংসা নয় না।”

—“পাগলামি রাখো ইসাবেল—এ-কাঁধের হাওলাটি এত কম ভারে—”

—“তু ধুয়ে পড়া নয়—বাধবে আরও বিলটি, আমি ভুক্তভোগী যে।”

—“অর্থাৎ ?”

—“আমি বড় অপরাধপন। জানো তো—তোমার মতন স্নেহের ক্ষেত্রেও কী হব হব হয়েছিল ?”

—“ছি—ইসাবেল। দুর্ভাগ্যতা কার নেই ?”

—“দুর্ভাগ্যতা নয় মনামি,—সত্যি। আমি যেখানেই যাই—আনি অলক্ষ্যের ছোঁয়াচ—” স্বপন ওর মুখ চেপে ধরে : “খানো :। তুমি যাবে যাবে যাবে আমার সঙ্গে।”

ইসাবেলা মুখের-ওপরে-রাখা ওর হাতটায় চুষন করে বলল : “না স্বপন—” ব’লেই স্বর বদলে বলে : “তবে বেতে পারি তোমার সঙ্গে যদি কথা দাও—” ব’লেই যায় থেমে।

—“কী ?”

—“না, তা-ও হয় না। তোমাকে এত কষ্ট করতে বলি কী করে এখন—বিশেষ বখন সন্ধ্যা তোমার অপেক্ষা করেছে নীসে ?”

—“পাগলামি কোরো না ইসাবেল। বলা কী করতে হবে।”

—“যদি—যদি মসিবে বেনারের কাছে পৌঁছে দিতে পারতে।”

—“তিনি দু-তিন দিনের মধ্যেই নীসে আসছেন যে।”

—“বেড়াতে ?”

—“ঠিক না।”

—“তবে ?”

একটু ইতস্ততঃ করে স্বপন সংক্ষেপে বলল—মাত্র ইয়ার অধ্যায়টি গোপন করে।

ইসাবেলা শুনে একটু চূপ ক'রে থেকে বলে : “এখানেও সেট—  
চিরন্তন—”

• —“কী ?”

—“ত্রয়ী ।” ইসাবেলার মুখে হাসি কুটে ওঠে ।

স্বপন হাসে : “এখানেও মানে ? তোমাদেরও ?”

ইসাবেলার হাসি বার নিভে : “ঠিক না ।”

—“মানে ?”

—“আমাদের ছিল চতুষ্কায়ী ।”

—“চারজন ?”

—“বাটনের কথা চাং তোমায় লিখেছিল, নয় ? সত্যি বোলো কিছ ।”

স্বপন একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলে : “লিখেছিল ।”

—“আর এজেলার ?”

• —“এজেলা ? না তো ।”

—“তাকে নিলে চার হয় কি না বোলো তো—শুণে

ট্যান্সি সাভরের পেটে ঢোকে ।

## দৌহে

স্বপন ইসাবেলার জন্তে কক্ষি ও কুটি-মাখন আনতে বলল—স্বপনের  
একটু টাট আধা-আরবীর আধা-ফরাসী । স্বপনের হঠাৎ মনে হয় একটা  
বিদ্বেষী সভ্যতার প্রভাবে শুধু মনই না, খাওয়ার পদ্ধতির মধ্যেও কী  
বিশ্ববই না ব'টে যায় ।...

ইসাবেলা একটু স্বহ বোধ করে। স্বপন জিজ্ঞাসা করে : “পেট ভ’রে খাওয়াও হয়নি বুঝি ?”

ইসাবেলা ম্লান হেসে বলে : “হবে কী ক’রে বলো ? হাতে একটা পিয়াল্‌টাও ছিল না আজ। এরা শুকনো রুটি ছাড়া কিছু দিতে চায় না—নগদ না দিলে—”

স্বপন বাধা দিয়ে ঈষৎ উদ্ভার সঙ্গে বলল : “আমার কাছে টাকার জন্তে তার করতেও বাধত না কি ? না হয় ধার হিসেবেই নিতে।”

ইসাবেলা হাসে : “শোধ দিত কে শুনি ?”

স্বপনের উদ্ভা রাগে পরিণত হয় : “তাই বলে না খেয়ে না দেয়ে মরতে হবে না কি শুকিয়ে?”

—“অতটা বীরনারী এখনো হইনি বন্ধু, রাগ কোরো না। তবে টাকা চাইতে—অভ্যস্ত তো নই—কমা কোরো—তাই মনকে রাজি করতে পারছিলাম না। শেষটার অবশ্য হাত পাততেই হবে জানতাম—তবু—”

—“তবু আমাকে বন্ধু ব’লে সম্বোধন করাটি আছে।”

ইসাবেলা ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে : “রাগ করো না ভাই। আমি ঠিক করতে পারছিলাম না টাকার জন্তে কাকে তার করব—তোমাকে, না মসিয়ে বেনারকে।”

—“তবু ভালো যে শেষটার আমার ভাগ্যে—”

—“ঠাট্টা কোরো না কুবের-বন্ধু ! তুমি কি বুঝতে পার না—এসব ক্ষেত্রে কত সঙ্কোচ হয় মেয়েদের ? এ-জগৎটা নিয়ত পরিক্রমা করে ঐ টাকা জিনিষটির চারধারে বে। ক’টা বন্ধুকে বলা যায় বলো—টাকা ছেড়ে বান্ধবীর চারদিকে চক্র দাও।”

কাছের গির্জার খড়িতে ঢং ঢং ক’রে তিনটে বাজল। স্বপন চমকে বলল : “ঘুমও এখন একটু, কেমন ?”

—“না স্বপন। ঘুম হবে না আমার। তবে যদি তুমি—”

—“না না, আমি কফি খেয়ে বেশ চালা হ’য়ে উঠেছি। আমি ভাবছি তোমার কথা : ও-ভাবে সারারাত কথার চল নামালে কাল তোমাকে এর্যরোপেনে ক’রে নিয়ে যাবার শক্তিদ্বারা কিছু উদ্ধৃত থাকবে কি ? That is the question.”

ইসাবেলা হাসল : “ব্যস্ একেবারে ঠিক হ’য়ে গেছে বৃদ্ধি—  
এর্যরোপেনে তোমার সঙ্গ আমাকে নিতেই হবে ?”

—“নিশ্চয়। আমি এইমাত্র মসিয়ে বেনারকে তার ক’রে দিতে বলেছি।”

—“সে কি ?—কখন ?”

—“কফি আনতে বলার সময়।”

—“কী লিখলে ?”

—“যদি সম্ভব হয় চাংকে নিয়েই নীসে আসতে।”

ইসাবেলার মুখ চা-খড়ির মতন শাদা হ’য়ে গেল : “চাং ! মসিয়ে বেনার জানান সে এখন কোথায় আছে ?”

“হাসপাতাল” কথাটা স্বপনের মুখে এসেছিল কিম্বা সে সামলে নিল : “জানবেন না ? সে যে পারিসে, জানো না ?”

ইসাবেলার মুখ বিষয়ে উৎসাহে মুহূর্তের জন্যে দপ্ ক’রে জলে উঠেই গেল নিভে। কম্পিতকণ্ঠে বলল : “সে কি ? আমি তো জানি সে চীন-রঙনা হয়েছে !”

—“তুমি এমন ঢঙে কথা কইছ যেন আমি—”

ইসাবেলা অত্যন্ত উত্তেজিত হ’য়ে উঠেছিল, একথা কানে না ভুলে বলল : “পারিসে ? কী করছে ? কোথায় সে ? মসিয়ে বেনারের সঙ্গে ? সঙ্গে এঞ্জেলা আছে ?”

—“কেউ নেই। একা সে।”

—“কোথায় বলো—তোমার পায়ে পড়ি স্বপন। কিছু গোপন কোরো না। তার কোনো বিপদ হয়নি তো?”

স্বপন অগত্যা বলল : “মসিয়ে বেনার কাল তার করেছিলেন সে হাঁসপাতালে।”

ইসাবেলার মুখ চা-খড়ির মতন শাদা হ’য়ে গেল : “হাঁসপাতালে ! কী অসুখ ? সীরিয়াস ?”

—“না না”—স্বপন ভ্রুসার সুরে বলে।

—“তুমি লুকোছো।”

—“সত্যি কথা বলতে কি ইসাবেল, আমি জানি না।” সংক্ষেপে বলল মসিয়ে বেনারের চাংকে হাঁসপাতালে দেখতে শুনতে হচ্ছে।”

ইসাবেলা একটু চুপ ক’রে থেকে খপ্ ক’রে স্বপনের হাত চেপে ধ’রে বলল : “স্বপন—এতই যখন করলে—আর একটু করো। লজ্জাটি !”

—“কী !”

—“আমাকে পারিসে পৌছে দাও—নীসে না।” ব’লেই বর ক’রে কেঁদে ফেলল।

—“কানছ কেন ইসাবেল !” এ আর বেশি কথা কি ?”

\*  
\*  
\*

—“ইসাবেল !” ব’লে ওর মুখ তুলে ধ’রে বলল : “সব ঠিক হ’য়ে যাবে—শোনো। হি। তবু এত কান্না ?”

ইসাবেলা চোখ মুছে বাষ্পাক্ত কণ্ঠ পরিষ্কার ক’রে নিয়ে বলল : “না। আর কীলব না স্বপন। কিন্তু—না কেঁদে পায়ে দাঁড়ব ? ভাবো

তো—আমি পলু—চাং হাঁসপাতালে—যদি তুমি আজ না থাকতে—”  
ওর কণ্ঠ কের বাশরুহ হ’য়ে আসে।

—“আহা! আমার কথা যেতে দাও না।”

—“কিন্তু কেমন ক’রে সেই বলো তো। তুমিই যে আমাকে প্রথম  
চাণ্ডের খবর এনে দিলে। কত ধনী যে আমি—”

—“তা হ’লে সে ধন শুধতে একটু চেষ্টা করলেই বা।”

—“আমি যে একেবারে নিঃস্ব ভাই! কী ক’রে শ্রমব তোমার ধন  
বলো দেখি?”

—“তোমার কাহিনী ব’লে।—যদি অবশ্য আপত্তি না থাকে—”

—“শুনতে সত্যি চাও? কিন্তু বড় করুণ কাহিনী যে বন্ধু!”

—“অমনি কাহিনীই তো বন্ধু বন্ধুর কাছ থেকে সব আগে শুনতে  
চায় ইসাবেলা।”

ইসাবেলা একটু চুপ ক’রে থাকে। পরে ওর মুখের ‘পরে অচঞ্চল  
দৃষ্টি রেখে স্তান হাসে। তারপর বলে : “শোনো তবে—”

## চতুষ্ঠয়ী

ইসাবেলাকে স্বপ্নন খুব উচু বালিশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে শুইয়ে দিল।  
ঘরটা যে কী চমৎকার মনে হয় স্বপ্ননের!...হোটেল কখনো ওর অন্ত  
ভালো লাগেনি। “নীল মসজিদেহ” কাছে সে গলিটার মধ্যে সে  
জ্যাংস্ত্রিতে ঘরটার কথা কেবল মনের পটভূমিতে কালো দুর্গন্ধের মত  
দাঁড়িয়ে থাকে।...

ইসাবেলা বলল : “খুব কাছ বেঁবে বোসো স্বপ্নন—যেমন নীচে  
বসতে, মনে আছে?”



—“নেই ? বাঃ, সঙ্গে-সঙ্গে তোমার হাতটা হ’ত আমার খেলার বস্তু, দেখ তা-ও মনে আছে ।”

ইসাবেলা ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে হাসল, তারপরই অকস্মিক হয়ে পড়ল হঠাৎ ।

—“কী ভাবছ ?”

ও সে কথার জবাব না দিয়ে সোজা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল : “বার্টনকে এড়াতে আমরা হ্যাম্পস্টেড ছেড়ে ঈলিঙে উঠে এসে এ-অবধি তোমায় চাং নিশ্চয়ই লিখেছিল, লেখেনি ?”

—“লিখেছিল ।” স্বপনের সুরের মধ্যে একটু ইতস্ততঃ ভাব, কিন্তু এখন আর গোপন ক’রে ফল কী ?—ভেবে ও একটু সান্ত্বনা পায় ।

—“তারপরে ? এজেলার কথা ? সত্যি বলা ।”

—“তারপরে কোনো টিটিই পাইনি আজ অবধি ।”

—“আর একটু কফি আনতে বলবে স্বপন ! রক্তের মধ্যে এখনো কেমন যেনু ঠাণ্ডা মনে হয় থেকে থেকে ।”

\* \* \*

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ইসাবেলা বলতে লাগল :

“ঈলিঙে আসার পর আমার নিজের মধ্যে কোণায় একটা নড়চড় হ’য়ে গেছে, মনে হ’ল । প্রথম প্রথম ভাবতাম—এ আমার কল্পনা । কিন্তু পরে যখন একদিন চাংও একথা বলল, তখন মনে হ’ল কল্পনা নয় ।”

—“চাং একথা আমাকেও লিখেছিল । কিন্তু ঠিক কী ধরনের নড়চড় ?”

ইসাবেলা চিন্তাক্রান্ত সুরে বলল : “ব’লে বোঝানো মুকিল । কেমন জানো ? জাগরণ থেকে তন্ত্রার সীমান্ত যখন আমরা ছুঁই তখন যেমন

খানিকটা বুঝি এটা আগ্রহ অবস্থায় অথচ তজ্জার অবস্থা বলেও সন্দেহ করতে পারি না খানিকটা সেই রকম। চেতনার একটা মোড় বদলানো আর কি? অথচ ঠিক কখন যে মোড় বদলে গেছে তাহর করতে পারি না—নয়?”

স্বপন বাড় নেড়ে সাই দেয়।

ইসাবেলা বলে চলল : “অনেকটা সেই রকম। আমিও বুঝি ও কোথায় যা খেয়ে ঘুরে গেছে খানিকটা, ও-ও বোঝে আমার মন কোথায় একটা ছোট্ট বেক নিয়েছে। দুজনের মনের কিনারার ঢেউ গেছে খানিকটা উলটো পালটা হ’য়ে, অথচ এর ফলে দুজনের মধ্যে মনের-মিলের-স্রোত যে একটু মন্দা হ’য়ে আসতে বাধ্য একথা স্বীকার করতেও বাধ্য—আপসা ঠেকছে?—”

—“না ইসাবেলা।” স্বপন ওর হাতের পরে চাপ দেয়। “আমি বেশ কল্পনা করতে পারছি।”

—“এক এক সময়ে আমার কী মনে হ’ত জানো?”

—“কী?”

—“যেন প্রণয়-প্রণয়িনীর জীবন, নদীর মতন চলে সময়ে সময়ে। খানিকটা পথ এমনই মিলে-মিশে চলে যে মনে হয় বুঝি ওদের দেহে-মনে একই স্রোতের ধারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলেছে। কিন্তু—” ওর একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে : “এটা শুধু দেখতে। হঠাৎ দেখা যায় মিলন-নদীর বুকে ঝুলকিয়ে ছিল, দুটো স্বতন্ত্রগতি উপনদী, তারা চলে আপন গতিতে আলাদা আলাদা পথ কেটে নিয়ে। তার পরে সঙ্গমের স্থলে যতই গাঢ় মিলন-চিহ্নের ছাপ থাক না কেন—সেটা হ’য়ে লাড়ায় অতীতের ইতিহাস।”

স্বপন চুপ ক’রে থাকে।

—“রাগ কোরো না স্বপন। সকলের অভিজ্ঞতা হয়তো এমন তিক্ত নয়। কিন্তু যুরোপে কত দাম্পতীর মিলনের মধ্যেই যে আমি এ-প্রকার বিরহের বিরোধের সুর দিনে দিনে করুণ হ’য়ে, তিক্ত হ’য়ে, উগ্র হ’য়ে বাজতে শুনেছি—” ব’লেই থেমে বলল : “কিন্তু শোনো আমাদের ব্যাপারটা, তা হ’লেই বুঝবে।”

ইসাবেলা কক্ষিতে ফের চুমুক দিয়ে বলতে লাগল :

“আমি প্রাণপণে চেষ্টা করতাম প্রথমটায় চাং-কে আমার মনের এ-আশঙ্কার ছায়াপাতের কথা না বলতে—এ আসন্ন বিচ্ছেদের সুর বুঝতে না দিতে। ও-ও ঠিক ঐ চেষ্টাই করত। অথচ আমরা উভয়েই বুঝতাম। শেষে একদিন যখন চাং ব’লে ফেলল একথা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে—কী কান্নাই যে কান্দলাম স্বপন—”

ইসাবেলা বলতে লাগল : “কিন্তু এ-কথা আমরা দুজনে প্রকারে স্বীকার করার পর থেকে মনের ভার আমাদের কেমন যেন একটু ক’নে গেল, একটু হালকা বোধ হ’ল দুজনারই—যদিও ব্যবধান তাতে ঘুচল না। এট হ’ল যে, আমরা এখন থেকে পরস্পরকে একটু ছেড়ে ছেড়ে থাকতে আরম্ভ করলাম।”

—“কী ক’রে ?”

—“ও নানা জায়গায় ঘুরতে লাগল বেশি ক’রে—ওর ছবি-টবি বিক্রির দানায়—যদিও অর্থের আস্ত দরকার ছিল না।—তবু ‘সফর ক’রে রাখা ভালো’ ব’লে। কারণ আমাদের প্রাণ ছিল আমেরিকা হ’য়ে, আশান হ’য়ে পিকিনে ফিরব। মজা এই যে, আমরা একত্রে পিকিনে ফিরব—না দু’পথে উধাও হব সে-বিষয়ে কেউই নিশ্চিত ক’রে কিছু বলতে পারত না, অথচ দুজনের যে দাম্পত্য-স্বপ্ন সেটা দুজনেই জানতাম। বুঝেছি কি ?”

—“কুকেছি বোধ হয়। কিন্তু তোমার সময় কাটুক কী করে? ওর না হয় ছবি ছিল।”

—“আমি কীউ গার্ডেন, মিউজিয়াম, থিয়েটার, আর্টগ্যালারি—এই সব করে বেড়াইতাম। জানোই তো আমি কি রকম চঞ্চল! এ-সব করতাম যে ভালো লাগত বলে তা নয়—এক-এক সময়ে থিয়েটারের টিকিট কিনে মধ্য অঙ্কে উঠে চ’লে আসতাম—এক-এক সময়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে রাস্তার রাস্তায় রেস্টুরাঁয় রেস্টুরাঁয় ঘুরে বেড়াইতাম—”

—“একা?”

—“না। এঞ্জেলার ব’লে একটি মেয়ে প্রথম প্রথম কখনো কখনো সঙ্গে থাকত। সে ছিল আমাদের টেলিভিওর পৃথকজীবীর একমাত্র মেয়ে। তখন কি জানতাম—”

—“হাঁদি বলতে কষ্ট হয়—”

—“না না—শোনো—সবই বলব। আর কফি আছে?”

স্বপন কফি ঢেলে দিল।

—“ধন্যবাদ। এঞ্জেলার বয়স হবে সাতাশ আটাশ। অত্যন্ত চাপা মেয়ে। দেখতে সুন্দরী—কিন্তু সুন্দরী বলা চলে না। তাকে দেখলে মন টানত, আবার সঙ্গে-সঙ্গে কেমন যেন ভয়-ভয়ও করত।”

—“ভয়?”

—“ঠিক ভয় না। সমীহ বলতে পারো। মনে হ’ত সে যেন সবই বোঝে। তাই তাকে বিশ্বাস করে মনের কথা বলা ছিল সহজ—এমন কি না ব’লে উপায় ছিল না—চুখকের মতন ও যেন মনের কথাকে টানত—অথচ ব’লেও স্বস্তি ছিল না। কলার পরেই মনে হ’ত কেন বলতে গেলাম?”

“একদিন এ-কথা চাংকে বললাম। চাং হঠাৎ কেমন যেন গুরু হুঁরে বলল : আমাদের মন বোঝা ভার। এঞ্জেলার অতি চমৎকার মেয়ে।

“বেশ মনে আছে এই সামান্য একটা কথার সেদিন সারা রাত ঘুমতে পারিনি। কী কারা!”

—“এই কথায়?”

—“শুধু এই কথায় নয়। মাঝ রাত্রে কারার মাঝে চাং জেগে উঠল—বলল আমি কঁাদছি—কিন্তু না করল কারণ জিজ্ঞাসা, না করল একটু আদর। পাশ ফিরে ঘুমতে লাগল—অকাতরে।”

—“সে কি? বিরক্ত হওয়া বুঝতে পারি কিন্তু—” স্বপন কথাটা শেষ করল না।

—“রাগ?—সত্যিই তাই। সেদিন ও খুব রাগ করেছিল।”

—“না না। এতে কখনো এত রাগ হ’তে পারে যে—”

—“শোনো না স্বপন, তা হ’লেই বুঝবে কল্পনা কি না।” ব’লে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলতে লাগল : “চাংকে সন্ধ্যাবেলা বথন বলছিলান যে, এজেলাকে আমার মনের কথা বলা সঙ্গেও কেমন যেন বিশ্বাস হয় না, ঠিক সেই সময়ে আমার একবার যেন মনে হ’ল দোরের ওপাশ দিয়ে কে গেল চ’লে। ভাবলাম মনের ভুল। কিন্তু পরদিন যেই এজেলার বললাম ওস্তাভিক্-এ ম্যাক্বেথের ক্ষেত্রে ছোটো টিকিট কিনেছি সেই ওস্তাভিক্ : না, ওর মাথা ধরেছে। এত শুক সুর, যে কী বলব?”

“আমার বুঝতে দেরি হ’ল না যে কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু ভাবতেই পারিনি যে এ-বিষয়ে চাং ওকে কিছু ব’লে থাকতে পারে।”

—“চাং! কখনো হয়?”

—“শোনোই না তাই।” ব’লে কফির পেয়ালায় আর একটু কফি ঢেলে নিরে বলতে লাগল :

“এজেলা বথন গেল না আমি চাংকে বললাম তুমি যাবে? একটা টিকিট রয়েছে। চাং বলল : ওর কান্না আছে। কাজেই আমি একাই

বেকলাম। গর্বী যেহে আমি—হু-হুজনকে নিমন্ত্রণ ক'রে প্রতিদানে পেলাম শুক 'না', বুঝতেই পারছ মনটা কেমন খিয়েটার সেবার অবস্থায় ছিল!

“পথে যেতে যেতে মনের মধ্যে স্বপ্ন ক'রে কী একটা আশুন উঠল জ্বলে। যত তাকে চাপা দেই তত সে ধোঁয়ার। চুপি-চুপি কিঙ্কাম। পা টিপে টিপে অতি সম্বর্ণে আমাদের বাসাটার সামনের উইকেট গেটটি টপকে নিঃশব্দে ঢুকলাম। ওরা জানে আমি তো বহু দূরে ওজ্জ্বল খিয়েটারে।”

—“এক কথায় ধ'রে নিলে—”

—“সারা রাত কেঁদেছিলাম যে—তুলছ কেন। তা ছাড়া বলো তো, এ-সব সন্দেহ মনের তলায় চাপা না থাকে কার? ঠিক বাকদের মতনই জমা হ'য়ে থাকে না কি—শুধু একটা ফুলিঙ্গের অপেক্ষা।” ব'লে একটু থেমে করুণ হেসে বলল: “অথচ স্বপন, লোকে ছারগারের দৃষ্ট দেখে, ফুলিঙ্গেরই ওজন ক'রে অবাক হয়—অযুৎপাতের সঙ্গে উপলক্ষের অতুপাত ক'বে!”

ইসাবেলা বলতে লাগল: “সম্বর্ণে ঢুকবামাত্র মনে হ'ল চাং সেই যে লুকিয়ে বাটন ও আমাকে দেখেছিল তার শোখ তুলব। আশ্চর্য্য, ও যে সন্দেহ ক'রে কিরে আসেনি এ-কথা শুধন একবারও মনে হ'ল না। আমার ঈর্ষার সমর্থন পুঁজলাম খানিকটা ধ'রে নিয়ে যে, ও-ও ঈর্ষা নিয়েই কিরেছিল আমারই মতন আড়ি পাতে। মাজুর নিজের আচরণের সাক্ষ্য যে কত ছলেই যায় স্বপন!” ব'লে রান হাসল একটু। পরে বলতে লাগল: “দরজার কী-হোলে চোখ দিলাম। ওরা জানত যে, আমি খিয়েটারে—পুব নিশ্চিত হ'য়েই একটি সোকার ব'সে গল্প করছিল।

“প্রথমটার ওদের কথাবার্তার স্বর ভালো বরতে পারিনি। কিন্তু

একটু পরেই উঠল আমার কথা। চাং ওকে বলল আমি যে এজেলাকে খুব বিশ্বাসের চোখে দেখি না এটা ওর জেনে রাখা ভালো।”

—“বলল !”

—“হ্যাঁ।”

—“তার পর ?”

—“খানিকক্ষণ বিমর্ষ তর্কাতর্কি চলল ওদের। সে অনেক কথা—শেষটায় ওরা দুজনেই প্রকৃত হ’য়ে উঠল।”

ইসাবেলা একটু থেমে বলতে লাগল : “সভাব-গম্ভীর এজেলা যে এত হাসতে পারে কে জানত ? চাং-এর প্রতি কথায় ও হেসে গড়িয়ে পড়ে।”

—“আর কিছু দেখলে ?”

—“দেখলে হয়তো ভালোই হ’ত—অনেক ব্যঙ্গা ও ইতস্ততঃ করার হাত থেকে বেঁচে যেতাম—কিন্তু দেখিনি দুষ্ট কিছুই। এমন কি, ওরা এক সোফায় খুব কাছাকাছি বসে-সবেও ও এজেলা পরিষ্কার চাওয়া সঙ্গেও চাং ওকে ছোঁয়ওনি একবারও।”

—“কতক্ষণের মধ্যে ?”

—“প্রায় এক ঘণ্টা।”

—“তার এক-ঘণ্টা কী-হোলে চোখ দিয়ে ছিলে তুমি ?”

—“যেহেতু এক যুগ পারে এক পারে গাড়ির দাকতে যদি আড়ি পাততে বসো। জানো না এক-কথা ?”

স্বপন বৃহৎ হেসে বলে : “জানি ইসাবেল, আমি ভুলতোগী। তবে এক পারে যুগ যুগ হ’য়ে পারে—এতটা জানতাম না।—কিন্তু সে-কথা থাক, কী দেখলে—কী শুনে বলে।”

—“প্রথমটার বিশেষ কিছু শুনেও পাইনি—আবার আমার দেহের

মধ্যে রিগ-কিম করছিল—একেলাকে ওর অত কাছে ব'সে থাকতে দেখে।\*

• —“কিন্তু কাছে-বসাটাকে দৃষ্ট ভাবলে কেন?”

—“মনামি, আমি, নিজেকে মেয়ে যে—জানি না—কে কাছে ব'সে কী মংলবে? যেখানে তারা কিছু চায় সেখানে যে-ভাবে বলে—যে-বোকা ভজিতে ডাকে, তার প্রতি ঠমক যে আমাদের চেনা। নৌকার ইসাবেলার কথা মনে নেই?”

স্বপন ঈষৎ অপ্রতিভ সুরে বলল : “আছে, কিন্তু একেলা কি—”  
কথাটা শেষ করা হঠাৎ এত কঠিন মনে হয়...

ইসাবেলার পাখুর মুখে রক্তাভা দেখা দিল, বলল : “তার আর কথা আছে?—ওর যত গাভীরা, শোভনতা মেয়েদের কাছে। পুরুষদের কাছে ওর অস্ত্র মুষ্টি। কুকণে ওকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম।”

• —“উত্তেজিত হোয়ো না ইসাবেলা।” ওর হাতে হাত বুলোতে থাকে ও।

—“না হ'য়ে পারি না যে স্বপন। ও কী রকম করছিল ভাবলে আজও তুফান জাগে আমার রক্তে। ওর সেই দরদী ঠাট, ওর সেই মেহকরা কথা, ওর সেই নানা সামান্ত কথাও কত চং ক'রে কা—”

—“কিসের গল্প চলছিল?”

—“ও জিজ্ঞাসা করছিল নানান কথা কিন্তু কেবলই ওর ইচ্ছে দেখছিলাম ঘুরিয়ে-কিরিয়ে চাংকে আমার কথা বলাতে—pour être sa confidente.” •

—“কী ভাবে?”

—“ঘরো, বলল একবার : ‘জাচ্কা চাং, তোমরা আজকাল আর

• ওর বিশ্বাসঘাতী হতে।



এক সঙ্গে খিয়েটারে বাও না কেন ?' আর একবার অনেক অবাকের কথার পরে : 'তোমার নয়নতারাকে এ-ভাবে একলা ছেড়ে দিতে চাও কোন্ প্রাণে ?' বেশ একটু ঠেশ ছিল ওর এ-ধরণের প্রতি প্রশ্নেই। আর একবার : 'তোমার কথাটা ঠিক, আমার ওর সঙ্গে অতটা ঘনিষ্ঠতা না করাই ভালো।' এ রকম যে কত ইঙ্গিত ! গা জ্বালা করে ভাবতে—এখনও।"

—“চাং কী বলছিল এ-সব ইঙ্গিতে ?”

—“বেশি কিছু না। ‘ও বেশি শুনছিল এঞ্জেলার অর্থহীন কথা। পুরুষেরা যে কী শোনবার পায় এ-সব মেয়ের আগড়ম্ব বাগড়ম্ব কথার মধ্যে !”

—“যাক যাক। তুরপর ?”

—“মন দিয়ে শুনতেও পারছিলাম না যে, তার পরের খবর দেব কোথেকে ? বুকের রক্ত বাজছিল বুকে তো না—কানে। মুখচোখ ঝাঁ ঝাঁ করছিল। সময়ে সময়ে মাথাটাও ঘুরে উঠছিল যেন।—তার ওপর চাঙের সদাপ্রসন্ন হাসি-হাসি মুখ দেখে—”

—“এ তোমার আবদার ইসা। তুমি কি চাও, ও তোমার অপর্ণনে পৈচার মতন মুখ ক’রে কথা কইবে অল্প মেয়েদের সঙ্গে ?”

ইসাবেলা ঈর্ষ্য বিরক্তির সুরে বলে : “পৈচার মতন মুখ করতে বলছে কে ? কিছ ওর মুখের প্রতি প্রশ্নের ভক্তিমায় আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে এঞ্জেলার সাহচর্য ওর ভালো লাগছে।”

—“তা-ও লাগতে পাবে না ?”

ইসাবেলা রাগ করল এবার : “বা-ও, তোমাকে কিছ বলব না আর। এ-সব তুমি বুঝবে না—মিথো মিথো—”

অপর্ণ ওর মাথাটা দুই হাতের মধ্যে নিয়ে আদর ক’রে বলল : “বুঝি

গো রাগিনি, বুঝি। কেবল বলি—এ-সবের মধ্যে সত্যি যদি থাকে নাবা-প্রমাণ আমাদের শঠ করনা ঠাকুরটি ফাপিয়ে তাকে দাঁড় করার পর্বত-প্রমাণ।—কিন্তু রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটি! আমি এখন মানছি ওদের মধ্যে তোমার কথাও কিছু না কিছু হ'ত, নইলে এ-রকম দরদ গ'ড়ে ওঠে না। এরূপ ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ প্রণয়ী চায়ই যে সন্তপরিচিতির মরমিয়ানা।" ব'লেই ওর দিকে চেয়ে হেসে মিষ্টত্বের বলল : "কিন্তু এতে তুমি অ'লে ওঠো কেন ইসা? চাডের কথাটাও ভাবো—তুমি বাটনের ব্যাপারে ওকে যে-আবাত দিয়েছিলে তার ফলে যদি ওর মনে একটু বিষয় নিঃসঙ্গতার ভাব এসে থাকে তবে ওকে কি তোমারও একটু অন্তঃকল্পার চোখে দেখা উচিত নয়? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এজেন্সা ওর এটুকু কাছে আসতে পেরেছিল তার এই দরদেবই জন্মে। যদি তোমার কাছে এ-দরদ ও পেত তবে এজেন্সা তোমাদের মধ্যবর্তিনী হ'য়ে তুদওও টি'কতে পারত না।"

ইসাবেলা একটু ভাবল : "তোমার একথাটা বোধ হয় সত্যি, স্বপন।—কিন্তু কী জানো? এ-ভাবে কেউ আমায় তো বোঝায়নি। চাং যদি একটুও বোঝাতো আমার ক'রে—তা হ'লে যে আমি গ'লে যেতাম—সত্যিই গ'লে যেতাম।"

স্বপন ওর কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল : "ইসাবেল, এ-সব 'যদিরা' যে জীবনে কেন আমাদের ইচ্ছানত আসে না কে বলবে বুলো? কার প্রাক্কর ইচ্ছিতে যে শত শুভইচ্ছাও কল্যাণে সার্থক না হ'য়ে বিধেব মনাস্তর হিংসার মকড়েরে বার্থ হ'য়ে যায় কেউ কি জানে? চাডের ওপর রাগ কোরো না তাই। জেনো, ও-ও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি।"

—“কেমন ক'রে জানলে?”

—“ও আমার বলেছিল একটা কথা মার্সেলসে—বা আমার মনে গাঁথা হ'য়ে আছে।”

—“কী ?”

—“প্রেমের মণিপুরিকার চাবি আমরা আজও খুঁজে পাইনি ; তাই জানতে পারিনি যে, আমরা পরীর প্রাসাদের বাইরের চোখ-ঝাঁঝানো কয়েকটা বর্ণ-বাটিকাকেই প্রেমের গোপন অন্তঃপুর ব’লে ভুল করি। এসব কথা যে অসুভব করে এমন ক’রে—জেনো সে জঙ্গ-অশ্বেষ।”

ইসাবেলা যেন চমকে উঠল, ওর চোখের পানে চেয়ে বলল : “এসব কথা তোমাকে চাং কবে বলেছিল ? আমার প্রসঙ্গে ?”

স্বপনের কানে কথাটা গেল না, সে ব’লে চলল : “মনে আছে, সেদিন আকাশে একটা মেঘ উঠেছিল ও হাওয়া ছুটেছিল উতলা হ’য়ে। চাং সেইমিকে চেয়েই বলেছিল যে মানুষ প্রেমের অভিসারে পথ হারিয়ে কেলেছে ব’লেই আজও প্রেমের পথিকরা পাহাড়-পর্বতে ছুটে বেড়ায় ঐ হাওয়ার মতনই দীর্ঘশ্বাসে, হৃদয় থেকে থেকে বেজে ওঠে ঐ নিরাস্রর জলধীরারই মতন ঝর ঝর ক’রে।”...

\* \* \*

—“বলেছিল কার প্রসঙ্গে বললে না তো।”

স্বপন ওর দিকে চাইল : “ও—তুনিনি, কমা কোরো।”

—“এমন বলো তবে। কি কথা উঠেছিল হাতে এসব বলল ও ?”

স্বপন একটু ইতস্ততঃ ক’রে বলল : “উঠেছিল মারিয়ার কথা।”

—“মারিয়া ! তার কথা বলেছিল ও তোমাকে !”

—“হী, কেন ?”

—“আমাকে সে কখনো ফুলেও মারিয়ার কথা বলেনি যে ! তা হ’লেই দেখ স্বপন, আমাকে সে কত কম বিশ্বাস করত।”

স্বপন ওর কপোলে হাত বুলাতে বুলাতে বলে : “ছি ইসাবেল,

এ-ও কি তোমাকে বলে বোঝাতে হবে—কেল তোমাকে মারিয়ার কথা ও বলেনি ?”

• ইসার চোখ ছলছল ক’রে ওঠে : “কিন্তু এ কি অসুখল্যা নয় ?—এ-ভাবে আগলে আগলে সত্য গোপন ক’রে—চাই না এমন মোমের পুতুল হ’য়ে বাঁচা । তার চেয়ে মরণ ভালো ।”

স্বপন স্নিগ্ধস্বরে বলল : “অবুঝ হোরো না ইসা । যদি কিছু না মনে করো—” ব’লেই ধেমে গেল ।

—“কী ?”

—“না থাক ।”

—“না বলা । নইলে আর তোমার সঙ্গে কথাই ক’ব না জীবনে ।”

—“তুমি এ-সব সময়ে তেমনি আব্দেরে শিশুটিই আছ !” ওঃপ্রাণের ওর হাসির রেশ ।

—“ও-সব ছেলে-ভোলানো কথায় ভোলাতে পারবে না—আমাকে । বলো ।—বলবে না তো ? আচ্ছা বে—শ ।” ব’লে ও মুখ কিরিয়ে বালিশের স্তূপে মুখ ডুবোর ।

স্বপন ওর চিবুক ধ’য়ে মুখ কেরার, বলে : “বলছি ইসা, কিন্তু তুমি যে দপ্ ক’রে অ’লে ওঠো ভাই, ভরসা হয় ? তুমিই বলো তো ?”

—“আর উঠব না, কথা দিচ্ছি ।”

—“দিচ্ছ ?”

—“হাঁ গো হাঁ । এখনো কি কচি খুঁকীটিই আছি যে—”

—“এ-সব ব্যাপারে যে সজ্ঞ ভরসীরা কচি খুঁকীরও বাড়ী ইসা !”

—“কখনো না । প্রমাণ ?”

স্বপন মুহু হেসেই গম্ভীর হ’য়ে বলে : “এরও প্রমাণ দিতে হবে ? এ-কথা মানো না কি যে, মানুষ যে-সব উপাদানে সব চেয়ে সহজে নীক

বাঁধে তার মধ্যে মুক্ত আকাশের নীলিমা বহি থাকে এক আনা, তবে মিথ্যা কল্পনার খড়্‌কুটো থাকে অন্তত পনের আনা।”

—“মানি, কিন্তু এ-কথাও নিশ্চয় মানবে যে, সত্য নইলেও সে বাঁচে না—বিশেষ ক’রে প্রীতির প্রেমের সম্বন্ধে?”

স্বপন মানি হাসে : “একদিন মানতাম ইসা—তোমারই মতন।”

—“মানে, আজ মানো না? না, মানতে ইচ্ছে হয় না?”

—“মানতে ইচ্ছে খুবই হয়। কিন্তু ঐ দেখ, সত্যের একটু আভাষ পেয়েছি ব’লেই এ-মিথ্যা সাঙ্ক্যনাকে মানতে না পারলে ব্যথা পাই।”

—“কী মিথ্যা? যে, প্রীতি প্রেম সত্য-ভিত্তি নয়?”

স্বপনের মুখে হাসির রেশ যায় উবে : “ইসা, প্রীতির আয়নায়ই মিথ্যার ছায়া পড়ে সব চেয়ে বেশি এ-কথা কি চাঃ বলত না তোমার কাছে প্রায়ই?”

—“চাঙের সব কথাই বেদবাক্য নয়।”

—“নয়—মানি। কিন্তু ওর একটা অসামান্য গুণের কথা তুমি জানবে : নিশ্চয়তম আলোকে-ও মনে-প্রাণে চাইতে পারা।”

—“নিশ্চয়তম? আলো হ’ল নিশ্চয়—”

—“ইসা, আলোর চেয়ে নিশ্চয় এ-জগতে কে?—বিশেষ ছায়াজীবী মাগুনের কাছে।”

—“কী বলতে চাইছ তুমি শুনি?”

—“একটা ছোট দৃষ্টান্ত দেই। চাঙের সে-কথাটা মনে পড়ে তোমার যে, বন্ধুরা আমাদের যে নিষ্করণ চোখে দেখে সেটা বহি আমরা কল্পনার বসন ক’রে রঙীন ক’রে না নিতাম তবে জগতে বহুত্ব হ’ত কর্পূরের চেয়েও উজ্জ্বল পদার্থ।”

—“ঈ—শ্—বন্ধুরা সর্বদাই মনে মনে আমাদের হীন ভেবে বাইরে কপটাচরণ করে বৃদ্ধি ?”

—“ঐ, তুমি শত্রু শত্রু কথা উচ্চারণ ক’রে রাগ করছ ফের ইসা। আমি কপটাচরণের কথা বললাম কবে? আমি বলছিলাম বন্ধুরা আমাদের যে-চোখে দেখে আর আমরা নিজেকে সন্মুখে তাদের যে-প্রশংসার দৃষ্টি করনা করি তাদের মধ্যে তফাৎ এত বেশি যে জানতে পারলে বাণা বাজেই। আর এত বাজে যে সে আঘাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্ধুত্বের নীলান্ন চূড়া ভুমিসাৎ হ’ত দুমিনেই যদি বন্ধুরা সত্য-পরিচয় দিত তাদের বন্ধুত্বের।”

—“সিনিক !”

—“মোটাই না। আমরা নিজেকে যতদিন প্রাণপণে ভালোবাসা ততদিন এ না হয়েই গতি নেই যে। আর এ-ট্রাজিডির মূল হ’ল বাসনা—কাজেই চিরন্তন।”

—“বাসনা?—কিসের?”

—“আত্মদরের, আত্মপ্রশংসার, ভোগের, প্রতিষ্ঠার—কিসের নয়?”

—“তুমি এমন ঝাপসা চঙে কথা কইছ ফের! আমার বক্তব্যের সঙ্গে এসবের কী সংক্র? আমি বলছিলাম তো প্রেমের কথা।”

—“বাঃ, প্রেমের এলাকায়ই যে বাসনার জরাজরকার!” স্বপনের মুখে ঈষৎ ব্যঙ্গের আভা।

ইসাবেলা একটু ভাবল : “তাই জন্মেই চাং মারিয়ার কথা আমার কাছে গোপন করেছিল?”

স্বপন ঘাড় নাড়ল : “সে চেয়েছিল তোমাকে বেদনা থেকে বাঁচাতেই ইসা। আমাদের বাসনা ছোটো উলটো-পালটা গতিতে, কাজেই যে আমার ভালোবাসে তার পূর্ণবহুর-বাসনার সঙ্গে আমার নিজের

বৈচিত্র্যের বাসনার লাগে সত্যাত। সত্যাতে ব্যাথা বাজেই—আর সাধ ক’রে ব্যাথা চায় কে? তাই তো বলছিলাম সত্য সইতে পারাই যে একটা সাধনা।”

—“কিন্তু সত্য যে সইতে পারে না সে বাঁচবে কেমন ক’রে এ জগতে?”

স্বপন মুহূর্ত হাসল : “তুমি ফের ছেলেমাছবি নির্ভরে ধ’রে নিচ্ছ ইসা, যে, এ-জগতের কাঠামোটা হ’ল আসলে সত্যের উপাদানেই গড়া। তা যদি হ’ত তবে মিথ্যার চালচিলে বাঁচা অসম্ভব হ’ত মানি। কিন্তু তা তো নয় মনাশি, আর নয় ব’লেই মিথ্যার অককূপে মাছুষ শুধু যে বাঁচে তাই নয়—কৃপমণ্ডকের মতনই বেশ গোলগাল নদরকান্তি হ’য়ে ওঠে—সর্বমুগ্ধে—সর্বদেশে।”

—“অন্তসব ক্ষেত্রে এ-কথা সত্য হ’তে পারে, কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে এ-কথা সত্য নয় নয় নয়।” ইসাবেলা কথো ওঠে।

—“প্রেমের ক্ষেত্রেই এ-কথা সব চেয়ে বেশি সত্য ইসা।” স্বপন হাসে।

—“কেন হ’তে বাবে শুনি?”

—“কেন না, মাছুষের বাসনা সব চেয়ে উদ্দাম এই প্রেমেরই ক্ষেত্রে, আত্মাদির সব চেয়ে প্রবল এই প্রেমেরই ক্ষেত্রে; কাজেই, কবিতা বা-ই বলুন না কেন, স্পর্শকাতরতা ব্যাথা হাহাকার সব চেয়ে বাজবেই বাজবে এই প্রেমের ক্ষেত্রেই। বলা তো, প্রেমের ক্ষেত্রে সুশীলতম মাছুষও ওথেলো হয় না কি? আর যারা ভাগ্যক্রমে সে নির্ভুর অগ্নি-পরীক্ষায় পড়েনি তারা যদি সত্যকে নিঃস্বভাবে মানতে পারত তবে মনে করো কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারত যে ওথেলো হওয়া তাদের পক্ষে একবারেই অসম্ভব ছিল—অমন অবস্থায় পড়লে?”

ইসাবেলা চুপ ক'রে থাকে।

অশন তার দুই হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল : “রাগ কোরো না ইসা, একটাক আমি তোমাকে উল্লেখ ক'রে করিনি। এ হ'ল বিশ্বজনীন ব্যাধি—প্রেমের ক্ষেত্রে। তুমি আমি তো রেণুর রেণু—সাধ্য কি বাঁচব এর আক্রমণ থেকে ?”

ইসাবেলা চুপ ক'রে রইল। অশন বলতে লাগল : “এই ব্যাধিকেই চাং সেদিন বলেছিল ‘চাওয়ার দুর্বলতা—কাড়াকাড়ির দুর্বলতা—যে-সব শক্তিকে দেখতে পাই না আত্মসম্মত খুঁজে তাদের হাতের খেলার পুতুল হ'তে চাওয়ার দুর্বলতা।’ কাজেই বাসনা, আত্ম-প্রেম, প্রতিষ্ঠার রোমান্স এসব বতরুণ থাকবে ততরুণ অনারুত সত্যকে চাওয়া হবেই হবে আকাশকুহুম কবিকল্পনা। এটুকু আমি বুঝবার কিনারায় এসেছি।”

ইসাবেলা চোখ বুঁজে চুপ ক'রে রইল।

অশন বলতে লাগল : “চাওঁর সে-রাতের শেষ কথাস্তো আমার মনে গাঁথা হ'য়ে গেছে। সে বলেছিল : প্রেমের রাজ্যে পুণ্য মুহূর্তে এক টুকরো সত্যের রশ্মি কচিং বদি বা ভেসে ওঠে—এই জগৎঝোড়া অন্ধকারের পিছু টানে অর্ছোদয়েই যায় ডুবে। তাই বুঝি সে বলেছিল : আমরা যা চাই তা পাই না, যা পাই—পেলে দেখি তা চাই না।...আর তাই—কমা কোরো ইসাবেল, প্রেমের ক্ষেত্রে আমাদের ঠিকে-ভুল হয় এত বেশি—বার কলে আত্ম-প্রতিষ্ঠাকেই আমরা ভেবে বসি আত্মদান, চাওয়াকে মনে করি দেওয়া।”

\* \* \*

খানিকক্ষণ ওরা কেউ কথা কর না।...

অশন অন্তমনস্ক হ'য়ে বাইরের দিকে থাকে চেয়ে।...



পূর্বদিগন্তে সোনার একটা কালি মনস্থির করতে পারবে না—ঠিক পিদ্দামিডের সীমন্তে আগবে কি না।...

হঠাৎ ইসাবেলার দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনে স্বপন ওর মুখের দিকে চাইল। ওর দুই গুণ্ড বেয়ে ঝর ঝর ক'রে জল পড়ছে।...এতক্ষণ দেখেও নি সে!

—“এ কী ইসা! ছি, ভাই।”

ইসাবেলা উদ্গত অশ্রু গোপন ক'রে বলে : “না। আর কঁাদব না। কা হবে বলাও কেনে?” বলে স্বপনের দিকে চেয়ে বলে : “আজ এত দুঃখ হচ্ছে কী ভেবে—জানো?”

—“কী?”

—“যদি আগে এটা জানতাম! যদি আমার একটু কল্পনা থাকত! যদি আমি স্বার্থপর হ'য়ে কেবল নিজেরই দাবিদাওয়ার কথা না ভেবে ওর অভাবের কথাটাও একটু বুঝবার চেষ্টা করতাম!”

—“এজন্তে দুঃখ কোরো না ভাই। ও-সব অক্ষমতার মধ্যে দিয়েই আমরা বুঝি প্রেমে আমাদের কত খাদ, কত আত্মপরতা লুকিয়ে থাকে। চাং একবার বলেছিল : লোকে প্রেমকে অপমান করে বড় বৈশি, তাকে শুধু রোমান্স মনে ক'রে অপলকা আবেগের পংক্তিতে বসিয়ে। বিশেষ ক'রে যুরোপে।”

ইসাবেলার মুখ গম্ভীর হ'য়ে গেল।

—“বাক, বলাও ইসা। এ-সব বাক। কিছু মনে কোরো না—লক্ষীটি।”

—“না স্বপন। মনে করবারই বা পথ কোথায় বলা? কথাটা যে চাঙের সত্যি।—আমরা প্রেমের নামে শুধু কাব্য লিখতেই জানি, প্রেমকে ইচ্ছাকৃত রঙে এঁকে করতে শিখি বর্ণবিলাস।—অথচ তবু যুরোপের রোমান্সের দস্তুর আর অন্ত নেই।”

স্বপন ওর ছোটো হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে :  
“অতটা বললে একটু বাড়াবাড়ি হবে ইলা। প্রেমকে দেহের স্তর থেকে  
সুকুমার স্তরে ওঠাবার সময় রোমান্সই যে সব চেয়ে বড় বন্ধু এ-কথা  
ভুলো না—কিন্তু যাক এ-কথা, দেরি হ’য়ে যাচ্ছে, বলো তোমার  
কাহিনী।”

—“কতদূর বলেছিলাম ?”

—“ওদের মধ্যে বনিষ্ঠতাটা স্বচক্ষে দেখলে।”

—“হ্যাঁ, আর সেই থেকে আমাদের মধ্যে ব্যবধানটা যেন আরও  
বেড়ে গেল। চাঁওর মনে কি হ’ত জানি না—তবে বুঝতে পেরেছিলাম  
যে ও থানিকটা টের পেয়েছে। অথচ এমনি তাব দেখাত যেন ও  
সম্পূর্ণ নির্দোষ।”

—“হয়তো ছিল নির্দোষ—মানে, দেহের দিক দিয়ে।”

• —“হয়তো ছিল। কিন্তু ছিল না ভাবতেই আমার মন চাইত।”

—“চাইত ?”

—“হ্যাঁ। তাতে বুকের কোথায় উঠত জ্বলে, কিন্তু তবু আগত—  
একটা অসহ্য উত্তেজনা—একটা মাদকতা।” ব’লেই খেদে বলল :  
“আমাকে তোমার খুব থারাপ মেরে মনে হচ্ছে, না ? সত্যি বলো তো ?”

স্বপন ওর হাতের ‘পরে একটা হাত রেখে বলে : “ছি ইলা।  
যে-সব উলটো-পালটা উপাদানে তুমি গড়া কোন্ অধিকারে আমি ধ’রে  
নেব—আমি সে-উপাদানের অনাস্বীয় ? এ-রকম অবস্থায় আমি পড়িনি  
তো কখনো—কাজেই কী ক’রে বলব যে, তোমার মতন পরীক্ষায় পড়লে  
আমিও অমনি বোধ করতাম না ?”

ইসাবেলা আত্মকণ্ঠে বলে : “ধন্যবাদ, বনামি। কিন্তু আমার  
উপাদান সত্যিই বড় মলিন স্বপন, বিবাস কোরে। আমার বাহুবের

তোমোটা বিশ্বাস করার চেয়ে আগে খারাপটা বিশ্বাস করার দিকেই প্রবণতা। তোমাদের তো তা নয়।”

স্বপন বলে : “এ-ও তো তোমার অনুমান। কিন্তু বাক, বলো তারপর কি হ’ল।”

ইসাবেলা অন্তমনস্ক হ’য়ে পড়ে : “সে বড় বিচিত্র ব্যাপার স্বপন, একরকমে ব’লে শেষ করা যাবে না। কত কী। কখনো মনে হ’ত চাংকে আমি ঘৃণা করি, কখনো মনে হ’ত বৃষ্টি এত ভালো ওকে কোনো-দিন বাসিনি। কখনো মনে হ’ত ওর সমস্তটাই মুখোষ : ও আর এঞ্জেল—বুঝতেই পারছ—কিন্তু পরেই আবার মনে আগত দিক্কার—অকারণ কেন এ-সব ভেবে কষ্ট পাই? কেন এ-আত্মনির্ঘাতনে এমন উদ্ভাস আসে আমাদের? কে বলবে?...”

বলতে বলতে ওর স্বর আসে মুহূ হ’য়ে। স্বপন চূপ ক’রে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। সোনার ফালিটা একটু রাঙিয়ে উঠেছে পিরামিডের নীমস্তে। কিন্তু তবু দিগন্ত এখনো যেন মনমরা!—“তার পর?”

ইসাবেলার চমক ভাঙে : “কী বলছিলাম যেন?”

—“ব্যবধান আরও—”

—“হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কিন্তু শুধু ব্যবধানই নয়—একটা ভুল বুঝবার ইচ্ছেও উঠল জেগে। • যেন একটা ছুতো চাই-ই।” ব’লে থেমে বলল : “কে বলেছিলেন যেন যে, ভগবান যদি না থাকেন তবে তাঁকে মানুষের সৃষ্টি করে নিতেই হবে?”

—“ভলটেয়ার।”

—“তিনি একথাও ও-কথার উপসংহার হিসেবে বলতে পারতেন যে, আত্মনির্ঘাতনের হেতু না থাকলে প্রণয়ীদের তাকে সৃষ্টি ক’রে নিতেই হবে। নইলে প্রণয়ের নাটকে না থাকে রসমাধুর্য, না থাকে গুণাপজা।”

স্বপন কি-একটা উত্তর দিতে গিয়ে চূর্ণ করে বার।

ইসাবেলা বলে চলে : “আমিও তাই এ-সবর থেকে ওদের ভাব-  
অঙ্গির মধ্যে নিতাই রকমারি ছদ্ম ইঙ্গিত, ঢাকাঢাকির চেষ্টা, অহিলা—  
আরও কত কী দেখতাম। আর বেধে যতই স্বপ্নার নিম্নেকে করতাম  
ভৎসনা—ততই চাইতাম আত্মজর্জর হ’তে। ততই যেন কামনা করতাম :  
আমার সন্দেশ যে ভিত্তিহীন নয় এটা প্রমাণ হোক।—কি? আশ্চর্য্য  
লাগছে?”

—“ঠিক না। তবে একটু কল্পনা ক’রে নিতে হচ্ছে বৈ কি।”

—“নিতে হবেই যে। যারা এ অবস্থার না পড়েছে তাদের বোঝানো  
এত শক্ত!—বাক, শোনো।

“আমার বাহ্য ব্যবহার যে এ-অন্তর্দৃষ্টি ঋণিকটা বদলে গিয়েছিল  
এটা আশা করি তোমাকে বিশদ ক’রে বলতে হবে না? অবশ্য আমি  
কাঠেরে চেষ্টা করতাম কোনো ভাব-বৈলক্ষণ্য না দেখাতে, কিন্তু চাং  
পরিকার বুঝতে পারত। অপর পক্ষে ওর যে প্রেঙ্কলার সাহচর্য্য ভালো  
লাগছে এটা বুঝতে পেয়ে আমি সাধামত দেখাতে চেষ্টা পেতাম যেন  
আমার ভাবান্তর হয়নি এক তিলও।”

—“অভিমান?”

—“না হ’য়ে পারে? যে আমাকে চায় না—”

—“কিন্তু এটা ধ’রে নিচ্ছ কেন? আমি একথা কিছুতেই বিশ্বাস  
করতে পারি না ইসা—বে, চাং এত চকলচিহ্ন কখনই নয়।”

—“তখন ধ’রে না নিয়ে উণায় ছিল না যে! কিন্তু বলি শোনো,  
তা হ’লেই বুঝবে।

“মনে রেখো, এ-সময়ে আমার মনের বাহ্য চলছিল একান্ত গোপনে—  
ও এমন কেউ ছিল না যার পরামর্শ চাইতে পারি, বা বাক্যে সব বলে

হাওয়া হ'তে পারি আর জানো হয়তো, যে-কোনো ঊষা একলা লালন করতে করতে বিপর্যয় ফুলে ওঠে। তখন আর দিগ্বিদিক জান থাকে না। কারণ তখন চেতনার অবস্থা এমন উদ্ভ্রা হ'য়ে ওঠে যে, ছোটকে সে মত্ত ক'রে না দেখেই পারে না। তাই তো শেখটার আমি এই উদ্ভেজনা-রূপে মরীয়া হ'য়ে উঠে চাংকে চেঁচা করলাম আখাত করতে।"

—"সন্দেরটা প্রকাশ ক'রে?"

—"অত ছীন আমি নই এখন। আমি ডাকলাম বাটনকে। একা আমিই গুলব?"

—"বাটনকে?" এখন যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

—"হ্যাঁ। ফোন করলাম যে, চাং নানা কাজে ব্যস্ত ও আমি একলা বোধ করছি—যদি বাটন রাজি থাকে তবে তার বক্তৃত্ব নিজে পেতে চাই।"

—"সর্দুনীশ! কিছ সে তো শু শুদ্ধে তপ—"

—"কে বলছে হ'ত? কিছ তখন অত-শত ভাববার অবস্থা কি আমার ছিল? আমি দু'জছলাম কী ক'রে চাংকে দেখিয়ে দেওয়া যায় যে, আমি শুকে ভয় করি না। ভয় করি বলেই এটা মেঝাবার উদ্দেশ্যে বোধ হয় এত প্রবল হ'য়ে উঠল। ঊষাবশে ভয়কাতুরেও ওঠে কবে, সারি প্রাণের দ্বারে যেন—না?"

এখন চুপ ক'রে বইল।

ইসাবেলা বলতে লাগল : "বাটনকে অবশ্য এমনভাবে বাগপাকটা খাটতে বললাম যাতে চাং বুঝতে না পারে যে, শুকে আমি ভেঙেছি। ও একটি মহিলার বাড়িতে যাতে মাঝে মাঝে যেত, আমি হঠাৎ দ্বিগ করলাম সেখানেই যাব—বখন বাটন থাকবে।

"কিরে এসে বললাম চাংকে যে, বাটনের সঙ্গে আচম্ভকা দেখা হ'য়ে

গেল। মুহুর্তের ভিত্তে ওর চোখ উঠল অ'লে—কিছু ও যে কি-রকম স্বভাব-সংযমী জানোই তো—৭৭ মুহুর্তের এমন সহজভাবে কথা কইল যেন—কিছু থাক এসব খুঁটিনাটি।”

—“না না বলে। এ-সব স্তন্যে আমার অস্তিত্ব—”

—“না স্বপ্ন, তা হ'লে রাত পোহাবে, কিছু কথা শেষ হবে না। শোনো।” ব'লে একটু থেমে ফের বলতে লাগল : “চার-পাঁচ দিন ধ'রে শুধু মন যে বাটনের কথা ভেবে অলিচ্ছল এটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম। ও ও জানত সেটা। এবং তাই আরও মন নিচ্ছিল এজেনার দিকে। সেটা হ'লে উঠল আমার অস্তিত্ব। বুঝত ?”

—“এটা গোটা খুব কঠিন নয় : আত্মহতের বদলে প্রত্যাখ্যান।”

—“শুধু তাই নয়, আরও একটা বিচিত্র উপাধান থাকে এসব ক্ষেত্রে : নিজের পিঠের একটা রোপ চেপে যায়—মেঘি, কতটা যত্নপূর্ণ আমনক পাই।”

স্বপ্নন প্রস্তোতনক নেড়ে চেয়ে দাঁড়।

—“নিজেকে যত্নপূর্ণ দিতে দিতে সেটাও যে নেশার মতন হ'য়ে যায় বলছিলাম না ?”

—“ড্রামা।”

—“কিছু জীবনের এইসব পট-পরিবর্তনেই যে ড্রামার রস অপরিহার্য হ'য়ে ওঠে জানো না ?”

—“কল্পনা করতে পারি। একেই সাচ্চিন্দ্র বলে পড়েছি। এ-বস্তুর সম্বন্ধে—”

—“তোমাদের কতটা প'ড় জানতে হয়। আমাদের কাছে এ তেমনি আত্মবিক যেমন আত্মবিক তোমার কাছে ফের পা উদারতা।”

—“তোমার কথাই বলে ইসাবেলা। আমি অতটা উজ্জ্বলত যোগা নট।”

—“যোগ্য স্বপন। তোমরাই যোগ্য। এশিয়ার মানুষের মধ্যে আজও একটা বৈর্য আছে—চোখে দৃষ্টি আছে—প্রাণে স্বপ্ন। আমাদের মধ্যে শুধু নাটুকেপনা ও অস্থিরতা।”

—“চাণ্ডের কথা বলো, বুঝি। সে স্বভাব-সংঘর্ষী। আমি তো তা নয় ইসাবেল—জানোই তো।” স্বপন মুখ নিচু করে।

ইসাবেলা বলল : “সে মনুষ্যের উদ্ভাটনা—”

—“শুধু সে উদ্ভাটনাই তো নয় ইসা।” ইসাবেলা ওর চোখের ‘পরে চোখ রেখে বলল : “কী ? জানা—?”

—“হাঁ।” ইসাবেলার দিকে ও তাকাতে পারে না।

ইসাবেলা ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে জোর ক’রে চেপে ধ’রে বলল : “অভিনন্দন, স্বপন। তা হ’লে জীবনকে হয়তো একটু বুঝবে এখন থেকে।”

—“বুঝি ইসাবেল। শুধু তোমরাই আমাকে স্বভাব-উদার স্বভাব-সরল ভাবো—কিন্তু যাক আমার কথা। তোমার কাহিনীটা ডের বেশি শোনার মতন। বলো।”

—“বলব। কিন্তু পরে তোমার কাহিনী বলবে বলো ?”

—“বলব—সব। পরামর্শ চাইতেও বটে।”

—“শোনো তা হ’লে।” ওর মুখ উজ্জল হ’য়ে ওঠে।

• •

—“একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি—এজেলার মাঝে একদিন খুব মাথা ধরায় চাং আমাকে বলে ওকে কিউ গার্ডেনে বেড়াতে নিয়ে যেতে চায়, আমি ঘাব কি না। আমি শুক স্বরে বলি : না।

“সেদিন ওরা একটু রাত্ত ক’রে ফেরে। আমার ঘনে হয় বেন

এঞ্জেলার চোখের পাতা লাল। কিন্তু ও আলো এড়িয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে যায় ব'লে দেখতে পাইনি ভালো ক'রে।”

—“তারপর ?”

—“তারপর থেকে আমি আরও জলতে লাগলাম। কিন্তু বাইরে উঠলাম আরো দৃঢ় হ'য়ে। চাণ্ডের সঙ্গে খুব ভালো মৌখিক ব্যবহার বজায় রেখে শুধু দূর দূর ব্যবহার আরম্ভ করলাম। খুঁজে খুঁজে যেখানে ওর বাজবে আঘাত দিতে শুরু করলাম। এঞ্জেলাকে তো ওর সামনেই নানাভাবে অপমান করতে লাগলাম—আরও কত কী। সে এক ইতিহাস।”

—“তারপর।”

—“তারপর আর কি ? যা হবার তাই : প্রায় ছাড়াছাড়ি মতন হ'য়ে এল ভেতরে। শুধু বাইরে একটা একত্র থাকার ঠাঁট।”

—“যেমন বাটনের দরুণ হয়েছিল ছান্সট্রেডে ?”

—“প্রায়। তবে এবার ব্যাপারটা আরও একটু জটিল হ'য়ে উঠেছিল। কারণ, প্রথমতঃ, এঞ্জেলা চাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এ-সম্বন্ধে আমার সন্দেহ না থাকলেও চাঃ ওর প্রতি ঠিক কী ভাব পোষণ করে সে-সম্বন্ধে প্রমাণাত্মক কোন নিশ্চিত ধারণায় আমি পৌছতে পারিনি। দ্বিতীয়তঃ, বাটন আমার জন্তে পাগল হ'লেও আমি বাটনের প্রতি কের আকৃষ্ট হচ্ছি কি না এটাও চাঃ নিশ্চিত ক'রে বুঝতে পারিনি।”

—“কেমন ক'রে জানলে ?”

—“ব্যাখ্যা করা শক্ত। তবে মনে হ'ত ওর ধরণ-ধাকপ দেখে। কিন্তু সে-সব খুঁটিনাটি বলার সময় নেই—ভোর হ'য়ে এলো। তাই এই অনিশ্চিত্যের ওপরই ফেলি এ চকুটেরী জ্ঞানার উন্মেষণ অঙ্কের ধবনিকা।”



—“একটা প্রশ্ন কেবল। বাটনের সঙ্গে মোলামেশা কি তোমার দস্তুর মতন সুরু হয়েছিল নাকি?”

—“না। সে চেষ্টা করত ক্রমাগত একলা আমাকে পেতে—কিন্তু চাং যেখানে মশক নেই সেখানে তাকে একলা পেয়ে কী হবে আমার? কি?  
—ভাবছ—

“অলুনির যত্ননা বুকেও প্রেমাস্পদকে পালটে অলিয়ে-পুড়িয়ে মারবার কেন এমন রোখ?”

—“না। তবে আশ্চর্য্য লাগছে বৈ কি একটু, চাং কেন কিছু বলত না ভেবে! তাকে তুমি নিশ্চয়ই বলতে যে, বাটনের সঙ্গে দেখা হয় মাঝে মাঝে?”

—“বলতান না? হাঁ! না যদি বলব তবে বাটনকে ফের জড়াতে গেলাম কেন? আমার লক্ষ্য তো ছিল সেইটেই।”

—“কিন্তু উপলক্ষ্য বাটন বেচারার কথা কি একটুও মনে হ’ত না?”

—“মেয়েরা যে নিচুর-নিশানী মনামি, উপলক্ষ্যের কথা ভাবতে পারে কখনো? আমার কেবল এক নিশানা ছিল—এক কথা ছিল—চাংকে যে ক’রে পারি আমার দিকে ফেরাব। তাইতো ওকে দেখাতে চাইতাম যে, ওর এজেলার দিকে নেকনজরকে আমি গ্রাহ্যও করি না।”

—“ও কি বলত?”

—“কিছুই না। কিন্তু মনে ওর যে বাজত তা বুকেছিলাম। আর তাতেই তো পেতাম আমি আনন্দ।”

—“কেন? তুমি কি ধ’রে নিয়েছিলে যে এজেলার সঙ্গে—”

—“ঠিক ধ’রে নিইনি, তবে মনে হ’ত কিছু একটা ঘটেছে।”

—“কেন?”

—“সেও অনেক খুঁটিনাটি ঘটনা, কিন্তু সে-সবের সাক্ষ্য-মূল্য নেই এই মহা মুক্তি। তাই বলা কঠিন।”

—“তবু—।”

—“একটা মাত্র ঘটনা বলি।”

—“একদিন নোএল কাওয়ার্ডের শক্তি নাটক “This Was a Man” দেখতে গিয়ে মাঝামাঝি ভিটুতে না পেরে উঠে আসি। ইলিং টিউব থেকে উঠেই দেখি আমাদের রাত্তার মোড়ে চাং ও একেলা বেড়াচ্ছে। ওরা বেশ নিবিষ্টভাবে কথা বলছিল। আমি খুব কাছে এসে হঠাৎ ইচ্ছে ক’রেই পিছন থেকে চাংকে ডাক দিয়ে ওদের চমকে দিলাম।”

—“তারপর?”

—“একেলা বিতর্কিত করে পাড়াল—ওর মুখে সে-ভয়ের চিহ্ন আমি ভুলব না।—মনে হ’ল এ হচ্ছে দোবীর হাতে হাতে ধরা পড়ার চেহারা।”

—“আর চাং?”

—“হেসে বলল : ‘হঠাৎ ফিরে এলে যে? অমন outré জিনিষও ভালো লাগল না? বা!’ ওর সংঘম জানোই তো। সাধ্য কি ওর পাখা-কঠিন মুখের এতটুকু আকুনও ধরা পড়ে। তাইতো বলছিলাম এ-সব প্রমাণ হয় না।—হ’তে পারে না। জীবনের নানা অজুতব তর্কের আয়নার ছায়া কেলে না।”

—“এ-ধরনের ঘটনা বা বোগাযোগ আরও কিছু তোশে পড়েছিল কি?”

—“হু-একটা পড়েছিল বৈ কি। কিন্তু মুক্তি কি জানো? এ-ধরনের বোগাযোগ প্রায় প্রতি মল্লভীর জীবনেই লটে ও তাতে উভয়ের আদান-প্রদান একটু-আধটু বাধলেও কোনো কিছুই ওলট-পালট ঘটে না যদি তাদের মন থাকে সূঁহ।”

—“বুকেছি। ছোটও বড় হ’য়ে ওঠে। কিন্তু কী স্থির করলে তুমি শেষটার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।”

—“প্রথমটার শুধু আত্মদাহে জর্জর হ’য়ে নানারকম উলটো-পালটা উদ্ভট মংলব আঁটতাম। কখনো ভাবতাম—সব ছেড়ে ফিরে ঘাই স্পেনে, কখনো ভাবতাম—চাঁদের সামনে এঞ্জেলাকে তীব্র ভাবায় অপমান করি। কখনো বা ভাবতাম—কয়েক দিনের অস্ত্রে অস্ত্র কোথাও যাক্ছি ব’লে হঠাৎ ফিরে এসে ওদের হাতে-নাতে ধ’রে অপদস্থ করি—সে কত কী।—এ-সব সময়ে মূহু বয়স্করাও বে ছেলেমানুষ হ’য়ে যায়—বর্ধর হ’য়ে যায়।” ব’লে ইসাবেলা ব্রান হাসল।

—“শেষটার কী স্থির করলে?”

—“উদ্ভেজনার আঁধি কেটে গেলে একটা মংলব আঁটলাম। স্থির করলাম বাটন, আমি ও আমার সেই ধনী বান্ধবী চাঁদের ঠিক পিছনের সীটেই বসব খ-র একটা নাটকে।”

—“কেমন ক’রে?”

—“চাঁ ও এঞ্জেলাকে আমি নিমন্ত্রণ করি এই নাটকে। বসি, একটা পাঁচ থেকে আমি ওদের সঙ্গে যোগ দেব। কিন্তু পথে আমার টিকিট হারিয়ে ফেলে বসি বে-সীটে বাটনের একটি বান্ধবী আসেনি। অবশ্য একখাটা মিথ্যা-সাক্ষানো বুদ্ধিতেই পেরেছ—আমি চাঁকে বললাম টিকিট হারিয়ে ফেলেছিলাম ও অতিনয় আরম্ভ হ’য়ে গিয়েছিল ব’লে পোল না ক’রে পিছনের সীটে টিকিট পেয়ে সম্ভরণে বসতে হ’ল, ও গিয়েই দেখি বাটনের পাশেই বসতে হবে। সমস্তটা হাকে বলে টেক ম্যানেজ্-ড্ অঞ্চল চাঁ এটা প্রমাণ করতে পারে না, বুঝলে না?”

—“এটা বোঝা শক্ত নয়, কিন্তু সে হাক। কী করলে তুমি—বলো শুনি। এ প্রায় নাটকের মতন লাগছে।”

—“আশ্চর্য্য, ব’সে যখন সামনে ওদের আমি লক্ষ্য করছিলাম তখন ঠিক এই কথাই আমার মনে হচ্ছিল।”

—“ওরা তোমায় দেখতে পায়নি বুঝি?”

—“না, ওরা আশা করছিল আমি ওদের পাশেই এসে বসব। আমি যে পিছনে ব’সে জানবে কী করে?”

—“কি দেখলে?”

—“দেখলাম—যা দেখতে চাইছিলাম, যে, ওরা বেশ অস্তরঙ্গ হ’য়ে উঠেছে। আর অগতে লাগলাম দেখে—।”

—“তারপর!”

—“প্রথম অঙ্কের শেষে আমি চাণ্ডের কাঁধে টোকা দারলাম।”

—“একটা কথা। তুমি ওদের কী-রকম অস্তরঙ্গ ব্যবহার করতে দেখলে—বার অঙ্কে এত চাতুরী?”

—“দুঃ কিচ্ছুই না। খুব স্বাভাবিক ব্যবহার। আমি জানতাম যে চাং প্রকান্তে কখনো এতটুকু দুঃ ব্যবহার করবে না—করতে পারে না। তবু অস্তরঙ্গ ব্যবহার তো।”

—“তবে এটা করলে কেন—যখন বেশ জানতে যে ওরা বেশ অস্তরঙ্গ হ’য়ে উঠেছে?”

—“বুঝতে পারছ না?”

—“ঠিক না।”

—“বার্টন আমার পাশে ব’সে এটা দেখে ওর মুখচোখ কেমন হর সেটা দেখতে, ও পরে ও কী রকম ব্যবহার করে আমার সঙ্গে তার আলাদা পুতে।”

—“ও—।”

—“ভাবছ আমরা বড় কুটিল, না যখন?”

—“কুটিলা না হও, জুটিলা বটে। কারণ সত্যের খাতিরে আমাদের মানতেই হবে যে এ-ধরণের মৎসব আমাদের মাথায় স্বপ্নেও আসত না। কিন্তু সে-কথা বাক, তারপর? চাং কী করল তোমাদের দেখে?”

—“চাং বাটনকে দেখে কথা কইল না অবশ্য, শুধু সামান্য একটু মাথা হেলালো। আর আমি মহা উল্লাসে ফিশ্ ফিশ্ করে কথা বলতে লাগলান।”

—“তারপর?”

—“একটু পরেই ও বিনা বাক্যব্যয়ে এঞ্জেলাকে নিয়ে উঠে গেল।”

—“তুমি রইলে?”

—“না, ওদের চ’লে যেতে দেখে আমার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। ভয় হ’ল, অস্থতাপও। বুঝলাম বাড়াবাড়ি হ’য়ে গেছে। যতই বলি না কেন স্বপন, অশোভন আচরণ সব চেয়ে কম সাজে মেয়েদের।”

স্বপন হাসে : “অর্থাৎ? পুরুষদের বর্ষরতা বেশি মানায় এই না?”

—“তবু ঋণিকটা মানায়। কিন্তু মেয়েরা স্বভাবশোভনা।”

—“অন্ততঃ স্বভাবনম্রা বটে—ধন্যবাদ।”

ওরা হাসে একসঙ্গে।

ইসাবেলা বলে : “এখন হাসছি বটে স্বপন, কিন্তু মনে আছে সে-সময়ে কী কড়ই বয়েছিল বুকে!...সে-অন্ধ শেষ হবার আগেই আমি মাথা ধরার অজুহাতে বাটন ও আমার বান্ধবীকে শুভরাত্রি ব’রে চ’লে এলাম।”

—“রোসো। বাটনকে কি চাং ও এঞ্জেলার ব্যাপার কিছু বলেছিলে এর আগে?”

—“একদিন একটু অভ্যাস নিয়েছিলাম মাত্র—একটা সাল” পাটিতে

এক সোপ্রানোর চিৎকারের পরে—কিন্, কিন্, ক'রে। সেই সময়েই ও বলেছিল যদি ও আমার কোনো কাজে আসে যেন ডাকি।”

—“কিছু পেত না, তবু বল ডাকতে?”

ইসাবেলা হাসে : “শোষা কুকুরকে যদি একটুকরো মাংস পকাশ বার দেখিয়েও না দাও, একামোবারের বার সেটা দেখিয়ে ডেকেছ কখনো? পুরুষে!”

স্বপন মুখ নিচু করল। এত রাঁঝ এখনো!...

ইসাবেলা ওর কাঁধে হাত রেখে বলল : “রাগ কোরো না স্বপন, সব পুরুষদের আমি কুকুরের সঙ্গে তুলনা করিনি—তবে মোহে পড়লে অনেক পুরুষকে কুকুরের চেয়েও বেশি শোষা হ'য়ে পড়তে এত দেখা যায়...”

—“বুকেছি ইসা। অত আপলজির দরকার নেই। আমি মামি—একসঙ্গে পুরুষরা সত্যিই অম্মনি হুঁকল। আমি একটি বন্ধুকে জামি, তিনি অতি আত্মসন্মানী মানুষ ছিলেন কিন্তু একটি মেয়ের প্রেমে প'ড়ে যা হাংলামি করতেন দেখে আমার মনে হ'ত—ধরগী বিধা হও। অথচ আমার সে বন্ধুটি স্বভাব-হাংলা ছিলেন না। হঠাৎ গেলেন বহলে!”

—“স্বভাব কেবল এইসব ক্ষেত্রেই বনলার স্বপন—দুর্ভুর্ভে। তুঃখ এই যে, নিচু দিকের ডাকে সে বিদ্রোহেগে সাড়া দেয়—কিন্তু উচু দিকের আহ্বানে পায় হাজারো ভয়—জাগে লাগে সংশয়।” বলতে বলতে ওর স্বরের মধ্যে আসে কের সেই উদাস করণ সুর। ও বলতে লাগল : “এক একবার আমার অন্তর মথিত ক'রে কান্না উপ'ছে গড়ে স্বপন—একথা ভেবে। সব জেনে সব বুকেও ধূলোর, পাকে লুটিয়ে আত্মগরানির কশাঘাতে যে মানুষ কী আনন্দ পায়—কিন্তু যাক এ আক্ষেপ, শোনো।” বলে একটু খেমে বলতে লাগল : “ফিরে দেখলাম চাঁদ কেবেনি।

বুকের মধ্যে ফুলিখ বন্ধ ক'রে হ'য়ে উঠল চিত্ত। কিশোর মতন ঘর-বার করতে লাগলাম। কোথায় গেল ওরা? নিরেছিলাম ওকে যত্না নিতে বাটনকে উপলব্ধ ক'রে, কিন্তু যদি শোধ তুলতে ও এজেলাকে নিয়ে কোনো হোটেল—উঃ, সে কথা ভাবতে আজও বুকের ভিতরটা মুচড়ে ওঠে এখন।”

অপন ওর হাতের 'পরে হাত মূলোতে বুলোতে বলল : “যদি কষ্ট হয় থাক না এখন।”

ইসাবেলার করণ হাসি আরও করণ হ'য়ে উঠল : “কষ্ট আর কি? শোনো।” ব'লে একটু ভাবল, তারপর বলতে লাগল :

“সে-রাতটা আমি তুলব না আমরণ। উঃ অত অসহ যত্না বোধ হয় কোনো রাতে পারিনি। রাত দশটা এগারটা বারটা চঃ চঃ চঃ ক'রে বেজে চলল—ওদের দেখা নেই। মনের মধ্যে দাঁট দাঁট ক'রে জ্বলতে লাগল আক্রোশ। এজেলার প্রতি—” ব'লেই থেমে বলল : “মাতৃব যে মাতৃকে এত যত্ন করতে পারে এখন তা কোনোদিন ভাবতে পারিনি। এর তীরতাও একটা বিষয়—একটা নতুন ধরণের দাঁচ, না?”

অপন চুপ ক'রে রইল।

ইসাবেলা বলল : “ও—তুলে নিয়েছিলাম, এটা তুমি কেমন ক'রে জানবে?—তুমি থাকেই চাও না কেন পেরেছ—থাকে পেরেছ সে অত কাকর হিকে ঘেঁকেনি তোমার ছেড়ে।”

অপন চুপ ক'রে হাতের 'পরে সেই ভাবেই হাত মূলোতে থাকে।

ইসাবেলা ব'লে চলল : “ওরা যখন ফিল তখন রাত দেড়টা। আমি চাকে দেখে হাতে যেন স্বর্ণ পেলাম। অথচ অভিমান ভর লজা—ছি ছি কী কলাম ব'লে। ও যে সবই বুঝতে পেরেছে সে-বিষয়ে আমার মনে ভিলাওও সন্দেহ ছিল না—অথচ সে-কথা বীকার করতে মাথা কাটা

বেত—বে, ওকে ঊষাধিত করতেই বাটনের সঙ্গে বড়বয়্য করেছি।  
গরবিশী সেরানো-দুহিতা এত নিচে নামতে পারে কে ভেবেছিল? অথচ  
তবু গর্জের আমাদের অস্ত্র নেই আনাকে আমি চিনি হ'লে! আমার  
কোনটা 'আমি' হল? "

হলন কথাটা বুঝিয়ে নিতে বলল : "চাওঁর সঙ্গে কোনো কথা হ'ল  
না কি—সে রাহে ?"

—"সামাজ। আমি বললাম : 'কোথায় গিয়েছিলেন!' ও বলল :  
'একটা কাবারে-তে।' আমার বুকের মধ্যে জ'লে উঠল। লওনের  
কাবারে—নাট্ট রাখে যে কী সব কাণ্ড হয় জানি তো। আমি হঠাৎ  
বললাম : 'টিকিটটা হারিয়ে গেল বাস্তায়। অস্ত্র একটা টিকিট কিনে  
বসতে গিয়েই দেখি বাটন পাশে ব'সে—আশ্চর্য, না ?' চাওঁ আমার  
মিকে চকিত কটাক্ষ ক'রেই মুখ ফিড়িয়ে বলার টাই সব খুলতে খুলতে  
বলল : 'হ'।' আমি ভেবেছিলাম ও কিছু জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু  
ও কথা দিল না। চুপ ক'রে শায়তানী প'রে বাতি নিবিয়ে গুয়ে পড়ল।

"রক্তের মধ্যে অপমানের প্রবাহ আমাদের ঝিক ঝিক করতে লাগল।  
হি ছি, যেতে কেন মিথ্যা বললাম? কেন কৈফিয়ৎ দিতে গেলাম?  
বাটন যে আমার বড়বয়্যই এসেছিল—টিকিট হারানোর অজিলা যে  
আমার বোলো আনাই মিথ্যা বুকেছিল ও এক হুজুর্টেই। বুকে—  
জানতামও। কিন্তু ভেবেছিলাম, যখন বুকে তখন ও অন্যবে আর  
আমার হবে উল্লাস। কিন্তু হ'ল কই? কেবল এই কবাই মনে হ'তে  
লাগল যে, ওর চোখে ছোট হ'য়ে গেলার চিরদিনের জ্বলে।...

বুকেই তো পারছ—এ-সব কেনিয়ে বলার ব্যর্থকার নেই। তা হাড়া  
অন্যেরকে ব্যর্থ করে বেধানোর মধ্যে তীক্ষ্ণ অন্ত্রোপচারের কেনা  
আছে, না? বসিও নিচুর আনন্দ আছে তাতে—"



স্বপন বলল : “থাক এ-সব গল্প আজ, ইসাবেল।”

—“না। বাকিটুকু ব’লে ফেলি আর বেশি নেই। আমার ক্লাসি লাগছে না তো?”

—“না ইসা। তবে তুমি অস্থির...”

—“তা হোক। যখন আরম্ভ করেছি—”

ইসাবেলা বলতে লাগল : “তার পরে সাত-আট দিনের মধ্যে ঘ’টে গেল যে কত কী...অথচ কিছুই না। অর্থাৎ অস্থিরতার জগতে ঘ’টে গেল বিপ্লব অথচ ঘটনার জগৎ রইল পাথরের মতন থমকে। শুধু যে অস্থিরতার তীব্রতা দিয়ে একটা ঘূর্ণি রচনা করা যায় বুঝলাম যেন ফের নতুন ক’রে।”

—“ছাড়াছাড়া হয়ে গেল একেবারে?”

—“না, সেই তো মজা। দুজনেই অতি তদ্র ব্যবহার করতে লাগলাম, দুজনেই উদ্ভূত পরস্পরের কাছে আসতে, অথচ কী যে একদল শক্তি টেনে রাখে—কত রকম নিরুৎসাহের যুক্তি, ভয়ের যুক্তি, অভিমানের যুক্তি...সে ব’লে বোঝাবার নয় স্বপন। শেষে দুজনের উদ্ভূততা কোমলতা জ’মে পাথরের মতন কঠিন হ’য়ে গেল।”

ব’লে একটু থেমে ইসাবেলা ফের বলতে লাগল : “কিন্তু কঠিনতার প্রতিযোগিতায় আমি পারব কেন ওর সঙ্গে বলো? এ-সব ক্ষেত্রে সংঘর্ষের সঙ্গে উচ্ছাসিনী পারবে কখনো? সে একটা কল্প-প্রবাহ ব’য়ে চলল মৌন সংঘর্ষের। সে-সব বলার সময়ও নেই, প্রতিবাদও না।”

—“দরকারও নেই ইসা।—কেবল, কী স্থির করলে শেষটায়—বলো।”

—“তা-ই কি একটা, যে, বলব স্বপন? কত সময় কত রকমই যে ইচ্ছে হ’ত!... কিন্তু উদ্বেজন তবু থিতুয়ে যায়ই—” ব’লে ইসাবেলা হাসে : “শেষটায় যে সঙ্কল্প গ’ড়ে উঠল তা-এই যে, শেষ করতেই

হবে এ বিড়ম্বনা। কিন্তু কী ক'রে শেন করব তাঁও আবার—ভবে পাওয়া দার। কারণ ইতিমধ্যে ও এঞ্জেলার সঙ্গে প্রকটভেই—একটু বেশি মিশ্রিত ব'লে ওকে ছেড়ে বাব বলতেও পারছিলাম না। নইলে হয়তো যেতাম। কিন্তু আমি বাব চ'লে আর ও এঞ্জেলাকে নিয়ে সুখী হবে এ-কথা ভাবতেও—সে-বর্ণনা করার দরকার নেই বোধ হয় ?” ব'লে ইসাবেলা হাসে, সে হাসিতে আত্মমানির সঙ্গে ব্যঙ্গের অন্তর্ভুক্তি গেছে মিশে। এমন তিক্ত হাসি যে ইসাবেলার মুখেও ফুটতে পারে।— একটু চুপ ক'রে থেকে স্বপন বলল : “কেবল একটা কথা জানিতে চাও—বাটনের সঙ্গে আর মিশতে না ?”

—“ঐ যে বললাম পাউ-টাউতে দেখা হ'ত। কিন্তু আর ওকে চাইতাম না। স্বতন্ত্র ওর কাছে থাকতাম বরং রাগ হ'ত যে, ওর জন্মেই চাং এঞ্জেলার দিকে কুঁকল।”

—“কুঁকেছিল সত্যিই—না, করনা ?”

—“শোনোই না।”

—“একটা কথা আগে : এঞ্জেলার ভাবগতিক কী রকম ছিল ?”

—“ও যে চাংকে ভালোবেসেছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ করার শরৎও ছিল না। এ-কথার সব চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, এঞ্জেলার চাংয়ের কাছে থেকে আমার কথা সব জেনে নিয়েছিল, এবং যে-মেয়ে কোনো পুরুষকে ভালোবাসেনি সে এটা পারে না।”

—“তা বটে, কিন্তু চাং ওকে তোমার ও বাটনের কথা নিশ্চয়ই বলেনি ?”

—“বলেছিল। অন্ততঃ বাটনের সঙ্গে ওদের সেই খিরেটারে দেখা হওয়ার পরে যে বলেছিল এ অবদারিত। ও আমার দিকে চেয়ে হাসত : ওর মুখ না—চোখ। ব্যঙ্গের হাসি, করুণার হাসি। তাতে আমি আরও অ'লে-পুড় মরতাম ভেতরে ভেতরে।”

—“আর চাং ?”

—“মনে করতে চেষ্টা করতাম যে, ও-ও অলছে, কিন্তু ওর অটুট সংযমের কাঠিন্ত ভেদ ক’রে ওর মনের অতলে ডুবুরি হবার পাথের তো আঁর ছিল না আমার : ওর বিশ্বাস আমি হারিয়েছিলাম যে সম্পূর্ণ।”

ওর গলা ধ’রে এসেছিল, পরিষ্কার ক’রে নিয়ে বলতে লাগল : “এ অন্তঃশীলা যন্ত্রণার কথা আর বর্ণনা করব না। এর পরে ছোটখাটো ঘটনা আরও কয়েকটা ঘটেছিল যার ফলে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে স’য়ে যাচ্ছিলাম। তার মধ্যে একটা ঘটনা প্রায়ই ঘটত : ও এঞ্জেলাকে মাঝে মাঝে থিয়েটারে নিয়ে যেত যখন আমি যেতাম পার্টিতে। ফিরে এসে আমি বলতাম বাটন এই এই কথা বলল। ও সে-বিষয়ে কোনো প্রশ্ন না ক’রে শুধু শাস্তভাবে পালটে বলত—এঞ্জেলার আজ খুব ভালো লাগল অমুকের অভিনয়, আজ অমুক নাচ—ইত্যাদি। আমার মনে যেন লাগে ছুঁচ কুটত, অলত তুবানল—কিন্তু হ’য়ে গাতে গাত দিয়ে মুখে হেসে বাটনের কথা আরও তুলতে চাইতাম, কিন্তু ও কানেই তুলত না সে-সব। অথচ এমনি দুর্বলতা ছিল আমার যে, এঞ্জেলার-সংক্রান্ত কোনো কথা জিজ্ঞাসা না ক’রেও পারতাম না—অর্থাৎ এ-অজুত যুদ্ধে প্রতিবার ওর শাস্ত সংঘত অথচ কঠিন আবরণের কাছে যেতাম হেরে! তবু চৈতন্য হ’ত না।”

—“প্রতিশোধ দিল তা হ’লে ও-ই ?”

—“তা ছাড়া কী বলব ? অথচ দিতে পারল এইজন্তে যে, ও গায়ে প’ড়ে প্রতিশোধ দিতে চায়নি—আমি কথা তুললে তবেই ও-ও রংগন করত।”

—“ও প্রতিশোধ দিতে চায়নি এ-কথা তোমার মনে হ’ত কেন ?”

—“অনেক সময়েই যে ওর চোখে বেদনা-ভরা কল্যাণে আভা উঠত

ফুটে—কিন্তু তেমনি নিজে বেত আমার ঠেস-দেওয়া কথার। এক এক সময়ে মনে হ'ত বুদ্ধি আমাদের প্রাণ দুটো গারে গারে ঠেকল ব'লে—একটা কথার মতন কথা জিতে ফুটল ব'লে—বাতে পরিতাপ্রমাণ বাধাও সরে। কিন্তু ঠিক ফুটবার আগেই একটা-না-একটা অদ্ভুত বাধা আড়াল হ'য়ে এসে দাঁড়াবেই। কখনো বা অভিমানের, কখনো বা কুষ্ঠার, কখনো 'ও আগে বলুক' এই প্রত্যাশার—আরও কত রকমের। সে একটা অশরূপ সূক্ষ্মবোধের জগৎ—যার রং গন্ধ রূপ রস সবেসে ভজিই আলাদা—যার উপলব্ধির স্থান আছে কিন্তু বোঝাবার ভাষা নেই। বাক, এবার শেষ অকটা বলি, শোনো।

“চাং আমেরিকা রওনা হবার বন্দোবস্ত করছিল—বলেছি। ও লণ্ডনে ওর আরও কয়েকটা ছবি বিক্রি করার জন্তে ঘোরাঘুরি করছিল এ-কথাও বলেছি, কিন্তু সেই সঙ্গে ও আর-একটা কাজ করছিল যা বলিনি।”

—“কী?”

—“আমার অজান্তে ও ওর টুডিয়োতে এঞ্জেলার অনাবৃত দেহ আঁকছিল।”

—“এঞ্জেলার!! সে মডেল ছিল নাকি?”

—“না। কিন্তু বার্টনের কাছে একবার শুনেছিলাম যে, ওর কণ্ঠ ও বুকের গড়নের জন্তে বার্টনের দু-তিনটি আর্টিষ্ট বন্ধু ওকে মডেল হ'তে খুবই পীড়াপীড়ি করেছিল—মোটী ফী দিতে চেয়ে। কারণ ওদের অবস্থা তো ভালো ছিল না।”

—“ও রাজি হরনি তবু?”

—“না। বার্টনকে ও নাকি বলেছিল যে, ভদ্র মেয়েরা একজনকে কাছেই কেবল বে-আক্র হ'তে পারে।” ব'লে ইসাবেলা শুক্নু হ'য়ে বলল : “কাজেই বুঝতে পারছ আমার সন্দেহ ভিত্তিহীন ছিল না?”

—“কিন্তু চাণ্ডের ষ্টুডিয়োতে দিনের পর দিন ওকে চাং আঁকত অল্প ক্ষুধা অনুভব করত আনতে পারেনি—এ কী করে সম্ভব হ'ল?”

—“ভুলে যাচ্ছ কেন যে, আমাদের মধ্যে প্রায় ছাড়াছাড়ি হ'য়ে এসেছিল? আমি কি চাণ্ডের ষ্টুডিয়োতে ঢুকতাম ভুলেও?”

—“চুকলে কেন তবে? সন্দেহ করে?”

—“না, এ-সন্দেহ আমার একবারও হয়নি—কেন জানি না। হ'লে চাণ্ডের ষ্টুডিয়ো কী—ওর যেখানে বা আছে তন্ন-তন্ন করে দেখতাম। কিন্তু হবি তো হ', একদিন মসিয়ে বেনার হঠাৎ এসে হাজির পাবিস থেকে। আমি তাঁকে চাণ্ডের ষ্টুডিয়োতে নিয়ে যেতে বাধ্য হলাম। চাং ছিল না। মসিয়ে বেনার বললেন : ষ্টুডিয়োতেই এক কাপ চা খেয়ে বিদায় নেবেন। জানলাটা যেই খুলে দিয়েছি অমনি একটা দমকা ছাওয়া এসে একটা ক্যান্ডাসের পদ্ম গেল প'ড়ে : দেখলাম, নম্র এঞ্জেলার মুখ থেকে প্রায় কোমর অবধি আঁকা একটা ছবি।”

—“তারপর?”

—“মসিয়ে বেনার 'ব্রাভো' বলে উঠলেন—মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন : 'বুকটাই হয়েছে সব চেয়ে ভালো, দেখেছ ইমা?' আমি বললাম : 'হঁ।' হঠাৎ আমাদের দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। বুদ্ধ আমার ভিতর পর্যন্ত দেখে নিলেন বোধ হয়—তার শানিত দৃষ্টি দিয়ে। পরে একথা সে-কথা। এঞ্জেলার কথা আর একটিবারও না। শুধু বাবার সময়ে আমার গালে চুমো দিয়ে বললেন : যদি কখনো কিছুর দরকার হয়—বে-রকম দরকারই হোক না কেন—তাঁকে জানাতে যেন একটুও সঙ্কোচ না করি—বিদ্বাস করি যেন।”

—“তোমাদের মনোভঙ্গের কথা চাং ঠিকে কিছু লিখেছিল নাকি?”

—“চাং সেই পাত্র? তবে বুদ্ধ আমার মুখের ভাবগতিক দেখেই

বৃক্ষেতে পেরেছিলেন যে, একটা বড় আসন্ন। তা ছাড়া তাঁকে সে সময়ে বোধ হয় তুমি বার্টন-সংক্রান্ত ঘটনা লিখেছিলে, লেখোনি।”

• স্বপন কুণ্ঠিত ভাবে বলল : “এমনি উল্লেখ করেছিলাম।”

—“তা ঠি বথেষ্ট—চতুর বুদ্ধের পক্ষে। শুধা হলেন কল্পনার খাল-তালুকের বনেদি জমিদার, তাঁদের অজানা কিছু থাকতে পারে?”

স্বপন মুখ নিচু ক’রে রইল।

—“তুমি কিছুই অগ্রায় করোনি স্বপন, মিছে কুণ্ঠিত হচ্ছ। বৃদ্ধ আমাকে আমার কৈশোর থেকে জানতেন—আমার এ-খলনকে তিনি তেনন কিছু দৃষ্টি মনে করেননি। কেবল তিনি পারিসে ফিরে আমাকে এটুকু লিখেছিলেন যে, তিনি আমার যে-শুভাখী সেট শুভাখীই আছেন—আমার খলন বা পতন, সুখ বা দুঃখ, প্রেমোচ্ছ্বাস বা ঈর্ষা কিছুতেই তাঁর গভীর মেহের এতটুকু পরিবর্তন হ’তে পারে না।”

• বৃদ্ধের সদাশ্রয় মেধাকোমল মুখ স্বপনের স্মৃতিপটে কেমন ভরে।

ইসাবেলা বলতে লাগল : “বেশ মনে আছে, তাঁর এ-চিঠিটি পড়তে পড়তে কেমন যেন ক’রে উঠল বৃদ্ধের মধ্যে। তবে কি আমার আশঙ্কাই সত্য?—একটা বড় ফাঁড়া স্প্রাইট আসন্ন? আমি টলিঙে এসে অবধি এটা যেন আকাশে বাতাসে বোধ করছিলাম। বাক, চাঙের কথাটা শেষ করি।

“মসিয়ে বেনার চেষ্টায় ছিলেন চাংকে সাহায্য করতে। পরদিনই চাং ছবিটি পারিসে পাঠায় তাঁর কাছে ও তার জমিন পরে তিনি একটা মোটা টাকার চেক পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন যে ব্রেজিলের কে এক মৌবীন কোটিপতি এঞ্জেলার ছবিটি দেখে মুগ্ধ হ’য়ে ভীষণ বহাগ হ’য়ে পড়েছেন ও বাকি হেসে বলেছেন এ-মেয়েটির বাকি সবটুকুর ছবি যদি এ-অর্ডার পাঠান তবে ডবল দেবেন।”

—“এ-কথা বলল তোমায় কে?”

—“বার্টন। এঞ্জেল তাকে এ-কথা হেসে গর্জ ক’রে বলেছিল ইচ্ছে ক’রেই—অর্থাৎ আমার কানে উঠবে জেনে।”

—“হুঁ। এইটি বুদ্ধি হ’ল তোমার ‘শেষ খড়’?”

—“হ্যাঁ। সব সম্বন্ধ করতে পারতাম, কিন্তু এঞ্জেলার আড়াল-থেকে ছোড়া-বাগ আর সইল না। আমি সেদিন রাতেই কৌণিকের মাথায় ইঞ্জিন্ট রওনা হলাম ও জাহাজে উঠে চাংকে ‘তার’ করলাম বে, আমি বিদায় নিলাম, কারকো হ’য়ে হয়তো ভারতবর্ষ বেড়াতে বাব।”

—“হঠাৎ ভারতবর্ষে?”

—“মসিয়ে বেনার বলেছিলেন তুমি হয়তো শীঘ্র ভারতবর্ষে ফিরবে। ইচ্ছে ছিল যদি তোমাকে সঙ্গী পাই তবে একত্রে পাড়ি দেব। তা ছাড়া—কারকো থেকে নীস বেশি দূর নয়। ইচ্ছে ছিল হয়তো তোমার দ্বন্ধে কুপ্ ক’রে ভর করতেও পারি। আর কেই বা আছে বলাে আমার?”

স্বপন ওর দুটি হাত নিজের হ’হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে চূপ ক’রে রইল খানিকক্ষণ। পরে বলল : “কেবল যত কুঠা বুদ্ধি দুটো ট্রাকা চাইবার বেলায়ই?”

ইসাবেলা ওর হাত চুম্বন ক’রে বলল : “রাগ কোরো না স্বপন, যে-নোকোরক ভর ক’রে জাহাজকে বিদায় দিলাম সে-ই যখন বানচাল হ’ল এমন দাসদাস কা’ঠব নোঙরে কতটুকু তরঙ্গা বাধতে পারা যায় কলো?”

স্বপন মুখ নিচু ক’রে রইল। একটু বাদে মুখ তুলে বলল : “তারপর?”

ইসাবেলা বলতে লাগল : “চাংকে ‘তার’ ক’রে জানালাম শুধু আলেক্সান্ড্রিয়ায় কোন্ হোটেলেরে উঠব। শেষটার লিখলাম : বেন এঞ্জেলাকে নিয়ে ও হুখী হয়, আমি ওর অব্যোপা—বেশ মেলা-ছায়ায় জুড়ে অবত।”

—“ভারপর ?” স্বপনের এত করুণা আগে মনে !...

—আলেক্সান্ড্রায় এসে তিন দিন শুধু হোটেলের ঘরে শুয়ে কাঁদতে লাগলাম। মাঝবের চোখে যে সমুদ্র লুকিয়ে থাকতে পারে এ কথা—” বলতে বলতে ওর কণ্ঠস্বর ধরে এল।

—“এখন থাক এ গল্প ইসা, কেমন ?”

ইসাবেলা মাথা নেড়ে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে নিয়ে বলতে লাগল :  
“তিন দিনের দিন হঠাৎ দেখি বাটন এসে হাজির।”

—“বাটন !!”

—“হ্যাঁ। বলল : এজেন্সি ওকে বলেছে সব, ও আমাকে জানাতে বলেছে যে সে অত্যন্ত অসুস্থ যে, তার জন্মেই এত শত ঘটল।

“আমি অ’লে উঠলাম ভেবে—চাং এজেন্সিকে সব বলল—আমার কথা! হয়তো বেশ কিছু বলেনি, কিন্তু মনে দৃঢ় ধারণা হ’ল এজেন্সি সবই জানে। বাটনের সঙ্গে কাররো রওনা হলাম। তবু কোথায় আশা ছিল—এক কথামাত্র, তবু সেটাও তো আশা—যে, চাঙের চিঠি পাব হয়তো একখানা,—এখনো হয়তো পুনর্নির্লন ঘটতে পারে। তাই আলেক্সান্ড্রায় হোটেল-ম্যানেজারকে বললাম : কোনো চিঠিপত্র এলে বেন কাররোতে কন্টিনেন্টাল সাতয়ে রেজিস্ট্রি ক’রে পাঠিয়ে দেন।”

—“ভারপর ?”

—“কাররোতে এসে দেখলাম : বাটনের এক নতুন মূর্তি। আমি জাম্পস্টেডে তাকে ছেড়ে চ’লে আসার পর থেকে ও মন বাগরা ধরেছিল—খেলা-টোলা প্রায় সবই দিয়েছিল ছেড়ে। কাররোতে প্রায় হোজই মাতাল হ’য়ে পড়ত সন্ধ্যাবেলায়।

“মাতালের প্রতি আমার কেমন একটা বিপর্যয় বিতৃষ্ণা আছে। অথচ তাবতাম আঁহা, আমার জন্মেই তো ওর এ-অধ্যাতন—কাল



আগে ও সিগারেটটি অবশি থেত না, অত বড় থেলোরাড খুব সংখ্যে থাকতে হ'ত তো!—মনে হ'ত আমার প্রেমে না পড়লে তো এ-দশা ও হ'ত না। ভেবে না বলতে পারতাম ওকে চ'লে যেতে, না মনস্থির করতে পারতাম ওকে ছেড়ে যেতে। এ এক নতুন গ্রন্থির অধ্যায়। কিম্বদন্তী সলিল, মনামি—বলতে না ?”

স্বপন ব্রহ্ম হাসল—কিন্তু কিছু বলল না।

—“ও কিন্তু আমার কল্পণকে ভুল বুদ্ধি—ভাবল পুষ্করিণী বুঝি। ভেবে আমার উপর একটু একটু ক'রে ফের জুলুম শুরু করল। এমন কি একদিন জোর করে চুষনও করল। আমি বারণ করতে—কিন্তু ও ছাড়ত না। বেশি কঠিন হওয়াও মুশকিল ছিল—মস্ত অবস্থায় একদিন ওকে ঝাড়া দিয়ে তেলে ছিঁয়েছিলাম বলে ও নীল নদীতে ডুবতে গিয়েছিল। এ হ'ল আবার এক নতুন সমস্যা। অনাদৃত অতিথি নয়—অন্যায়িত বন্ধুবৈষ্ণব প্রণয়প্রার্থী। ও কিছুতেই ভুলতে পারত না যে, একদিন ও আর-একটু হ'লেই আমার প্রণয়ীয় পদবী পেয়েছিল আর কি। ওর খুব দোষও ছিল না। পুষ্করিণী জানবে কেমন ক'রে বলে যে, মেয়েদের প্রেমের মেজাজ নদীর জলের মতন—দাঁড়িয়ে থাকতে জানে না। হয় ছুটেবে জোয়ারে, নয় পেছনে ভাঁটার।

“কিন্তু মনটা ওর প্রতি দীর্ঘে দীর্ঘে বিকল্প হ'য়ে উঠছিল। কারণ ক্রমে ও বুঝছিল যে আমার প্রাণটা ত্বরিত হ'য়ে রয়েছে শুধু ঐ চাড়েরই জন্তে। এক একবার এমনও মনে হ'ত যেতো এখনো সময় আছে, কিরি। হয়তো ভুল বুঝছি—কিছুই তো প্রমাণ পাইনি—তবু কিসে যে কী ঘটল!...আর বাটনের দরুণই এ-মনাস্করের শুরু ভেবে ক্রমে ক্রমে ওর পক্ষেও বিমুখতা বেড়েই যেতে লাগল। এটা দেখে ও মনোভ্রমে আরও মন খেঁদে কেঁপে হ'য়ে পড়তে শুরু করল। আগে শুধু রাতে মন খেত—

এখন দিনেও করল শুরু। আমার বিমুখতা ক্রমে তুলায় দাঁড়াল। আমি দ্বির করলাম—পালাব।

“কিন্তু ও-ও ছাড়েনা। এ আবার এক নতুন ক্যান্সাস! হোটেল ম্যানেজারকে হঠাৎ কিছু টাকা খুঁষ দিয়ে বললাম : আমাকে কোথাও পুঁকোতে পারেন?”

—“রোসো। অল্প কোথাও হঠাৎ চ’লে গেলে না কেন?”

—“ঐ যে বললাম : চাণ্ডের একটা চিঠি পাব আশা ছিল। রোজই ভাবতাম আজ আসবে—অতুরোধ। ‘আলেক্সান্ডার’ হাট হোটেলে রোজ ‘তার’ করতাম কোনো চিঠিপত্র এলেই যেন বেজিষ্টি ডাকে কার্যকো পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাই সাততের ম্যানেজারকে বললাম : খুব গোপনে কোথাও দু-একদিন আমায় যদি লুকিয়ে রাখতে পারেন—দু-তিন দিন বাবে নিশে যাব বাব ভাবছিলাম।

“এদিকে আমার হাতে টাকাও এল ফুরিয়ে—কাজেই কোনো হোটেলে না গিয়ে ঠিক করলাম সস্তা বোডিং-হাউস মতন কোথাও থাকি, দু-তিন দিন চাণ্ডের চিঠির অপেক্ষায়।

“উঠে এগান একটা ছোট ঘরে নীল মসাজদের কাছে। অল্পতঃ বাটনের হাত এড়িয়ে একটু স্থগিত পেলাম। কিন্তু ওহা, একদিন আমার ঘরে এসে হাজির। বলল : ম্যানেজারের ত্যাগেট জানত, তাকে খুঁষ দিয়ে বার ক’রে নিয়েছে আমার ঠিকানা। আমি ওকে ছেড়ে এসেছি ব’লে ওর লে কী রাগ! চোখ রক্তবর্ণ—মাতাল অবস্থা। যা মুখে আসে তাই ব’লে গাল দিতে লাগল। শেবটার বলল : আমিই ওর এই হুঙ্কার। কুরলাম গলিকার মতন লোভ দেখিয়ে।

“আমি দাউ দাউ ক’রে অ’লে উঠলাম : ওর গালে শপাং ক’রে মারলাম আমার একটা বেত ছিল তাই দিয়ে। ওর মস্ত অবস্থা ছিলই

তো, এবারে স্কেপে গিয়ে আমাকে চেপে ধরল। বেতটা কেড়ে নিয়ে চিংকার করবার আগেই আমার গলা টিপে ধরল। ধস্তাধস্তি করবার সময়ে পাথরের টেবিলে লেগে আমার পায়ের একটা হাড়ে লাগল চোট, মাথায় ঠোঁটের—তার পর আর মনে নেই।”

ইসাবেলা একটু দম নিয়ে বলতে লাগল : “যখন চেতনা ফিরে এল—বুঝতে পারলাম কী ঘটে গেছে। রক্তশ্রাবে দেহ ঘর সব ভেসে যাচ্ছে। শুনলাম বাটনকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু অচেতন অবস্থায় আমার টাকাকড়ি সমস্ত গেছে অদৃশ্য হয়ে। হাতে মাত্র একটি আংটি ছিল, বেচে ঐ জঘন্ত গুপ্ত পল্লীতে আশ্রয় নিতে হ’ল—খানিকটা বাটনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে। কী জানি কবে ছাড়া পেয়ে কেব আসে ও। টেলিফোন ক’রে সাতয়ের ম্যানেজারকে বললাম : আমার ঠিকানা কাউকে না বলতে, তাঁর ড্যালেটকেও না—কেবল আমার কোনো চিঠিপত্র এলে আমাকে এনে দিতে আর তোমাকে একটি তার ক’রে দিতে।”

\* \* \*

ইসাবেলা ক্লান্ত হয়ে স্বপনের কোলে মাথা রাখল।

বশন গাঢ়স্নেহে ওর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলল : “জীবনে এই প্রথম বুঝির কাজ করেছ ইসা, কেবল—যদি একটু আগে করতেন!... ইসা, একটা কথা শুধু জিজ্ঞাসা করবার আছে : চাং যে চীনে রওনা হয়েছিল বলছিলেন শুনে কার কাছে ?”

—“বাটনের। কিন্তু ও যখন একা পারিসের হাসপাতালে—তখন বুকেছি।”

—“কী ?”

—“যে বার্টন মিথ্যে বলেছিল ইচ্ছে ক’রেই।—কারণ অবশ্য স্বচ্ছ। যদিও আমি তখন আধা-বিশ্বাস করেছিলাম।”

• স্বপন একটু চূপ ক’রে থেকে হঠাৎ বলল : “কিন্তু তুমি চ’লে আসার পর চাং আমেরিকা রওনা হ’ল না কেন ?—আর হঠাৎ পারিসের হাসপাতালেই বা কেন ?”

ইসাবেলার চোখে জল ভ’রে এল : “কী ক’রে জানবো বলো ? হয়তো ওও—কিন্তু হয়তো—আমি চ’লে এলাম ব’লেই ভেঙে পড়েছে।”

স্বপন ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল : “না না ইসাবেল। ও নিশ্চয় সেরে উঠবে তুমি কিরে গেলেই।”

“কিন্তু তুমি ঠিক জানো ও একলা ? লক্ষ্মীটি, স্বপন আমাকে গুকিয়ে না এখন।”

—“আমি ঠিক জানি ইসাবেল। কারণ ওর কাছে কেউ থাকলে মসিয়ে বেনার আনাকে দেখতে কালই রওনা হ’তে পারতেন।”

ইসাবেলার মুখে হাসি ফুটে ওঠে : “হয়তো...ও এজেন্সিকে ভালোবাসেনি তা হ’লে।”

—“তোমার কি মনে হয় বেসেছিল ?”

—“তোমার হয় না ? সত্যি বলো।”

—“না। চাংকে আমি জানি। সে অত চপলচিত্ত নয়। তবে তোমার অকারণ সন্দেহ যে তাকে কিপ্রকার ক’রে ভুলেছিল একলা আমার খুবই মনে হয়। তা ছাড়া বার্টনের সঙ্গে তোমার ইচ্ছে করেই মাথামাখি করাটা—বুঝলে না ? নইলে এজেন্সার প্রতি অতটা ইচ্ছে ক’রে হুকুঁকে দাঁলটে তোমাকে আঘাত করত না সে কখনই।”

—“তোমার কি মনে হয় যে, এসব করেছিল ও শোধ তুলতে চেয়ে ?”

—“হয়। ও চাপা হ’লেও প্রচণ্ড রাগী, জানি তো।”

—“কিন্তু এঞ্জেলকে—”

—“না ইসাবেল, না। পড়ো তার চিঠি—এ থেকে বুঝবে তোমাকে সে কত ভালোবাসে—এখনো ভালোবাসে।” ব’লে স্বপন ওয় হাতে চাঙের দীর্ঘ পত্রটি দিল।

\* \* \*

ওর কোলে মাথা রেখে ইসাবেলা কঁাদে—নিঃশব্দে।

—“কৈদো না ভাই, ছি। সব ঠিক হ’য়ে যাবে।”

ওর গলা জড়িয়ে ধ’রে ইসাবেলা কাতরকণ্ঠে বলে : “যাবে স্বপন—যাবে ? সত্যি বলছ ?”

ঘরের দোরে আঘাত হ’ল।...

ম্যানেজার বললেন : “এয়ারোপ্লেনে কি আজই রওনা হবেন ?”

ইসাবেলা সাগ্রহে বলল : “হাঁ হাঁ আজই—একুনি—বদলি সম্ভব হয়।”

—“ইচ্ছে করলে সম্ভব। সকাল সাতটায় পারিসের এয়ারোপ্লেন ছাড়বে।”

—“এখন ক’টা ?”

—“সময় আছে, ছ’টা। কফি আনব ?”

—“না, চা—আর ডিম—মার্নালেড—আর—হ্যাঁ পরিজ্ একটু।”

## আলোছায়া

আশ্চর্য্য এই দেহমনের সম্বন্ধ আমাদের।—স্বপন ভাবে। মন সকলতা ও আশার আশাদ পেলে কি দেহের আয়ত্ত্বীও রাতারাতি যায় বদলে !

এয়ারোপ্লেনে যখন ওরা ধরাধরি ক'রে ইসাবেলাকে তুলতে গেল তখন স্বপন আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল ইসাবেলার "না" বলাতে; ও বলল : "শুধু তুমি আমাকে একটু ধরলেই হবে স্বপন।"

প্রাচ্যের শুভ্র সূর্যালোক...নির্মল আকাশ...হেলিয়োট্রপ রঙের ব্লাউসে ওকে কী সুন্দরই দেখায়! আর কাল রাত্রে! কী ঘরে ও ছিল! স্বপনের হৃদয় আর্দ্র হ'য়ে ওঠে!...এমন অপূর্ণ আনন্দের আত্মদ সে কত দিন বোধ করেনি যে!...নয়নারীর অনিচ্ছ আকর্ষণে উভয়েরই মনের উপর যেন একটা স্নানির মেঘ যায় ছেয়ে...ওর মনে হয় যেন অকস্মাৎ ও মুক্তি পেল এই ক্লিষ্ট উষ্ণ অথচ দুর্নিরোধ আকর্ষণের বৃষ্টি থেকে।...বিমান যেন মাটির শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের মুষ্টিমান প্রতীক। তাই তো পাখী মন টানে এতো।...

এয়ারোপ্লেন আকাশে উড়ে চলে, পায়ের তলায় দূরবিসর্পিনী নীল নদী দেখায় যেন ঠিক চিত্রাঙ্কিত একটি স্বপ্ন। এখানে ওখানে কতগুলো পিরামিড! স্থনতে যায়...এক দুই তিন চার পাঁচ—কিন্তু গোনা বড় শক্ত। বে দোলে পুষ্পকরথখানি!...দীর্ঘ দীর্ঘ উপরে উঠতে থাকে ওরা। বাড়ি দেখায় কোথাও বা নিকমিকে পারার মতন—কোথাও বা নানারঙা পাথরের মতন। সবুজ ক্ষেতগুলি—যদিও মিসরে ক্ষেত বড়ই কম—দেখায় ঠিক সবুজ মধ্যমলের গালিচার মতন। আর মরুভূমি? কী চকচকই করে! সবয়ে সময়ে চাওয়া যায় না যেন। ইসাবেলার হাত ধ'রে ও কানে ছিপি এঁটে চেয়ে থাকে বাইরের দিকে। ইসাবেলা কমলালেবু খেতে থাকে। এক মুসলি—বিপর্ষ্য ঘর্ঘরে কথা বলা অসম্ভব—কানের ছিপিও অশান্তিকর। কিন্তু অস্বস্তি তখন যায় উবে। মনের মধ্যে ওর এক অপূর্ণ চেউ ধেগে উঠেছে আজ...মাদুর্যের রসে হৃদয়ের প্রতি রক্ত উঠেছে ভ'রে। পাশে ইসাবেলার উদ্ভাসিত মুখ চেয়ে

চেয়ে দেখে আর ওর দেহের প্রতি অণু গৌরবে মেহে উড়াসিত হ'য়ে ওঠে। কী মধুর উচ্ছ্বাস! আর প্রীতির মেহের প্রেমের আদান-প্রদানে সব চেয়ে মধুর বৃষ্টি এই নির্ঝরক উচ্ছ্বাস। হৃজনেই হৃজনের প্রতি তাকায়, যেন কতদিনের চেনা...কোথাও এতটুকু মানি নেই ওদের সহজ সরল অনাবিল নিকট-পরিচয়ের দৃষ্টি-বিনিময়ে। ইসাবেলার ডাগর চোখে কৃতজ্ঞতা টল টল করে। কী সুন্দর! প্রতি কৃতজ্ঞতার চাহনিই সুন্দর সুন্দর নয়নতারা য় তো সে হ'য়ে ওঠে শিশিরের মতন অবর্ণনীয় সুসম্ভার! সে যে স্বীকার করে প্রীতিকে নিজের নিরভিমান গ্রহণে! ওর মনে আজ নানা রঙা ছাতি ঝিক্‌ঝিক্‌ ক'রে ওঠে। অসহায়! মনটা কোমলতায় ভ'রে ওঠে।...কাল কী মুছমান অবস্থায়ই কেটেছে ওর!...আহা বেচারি! কিন্তু আজ? ওর মধ্যে যেন বরাভরার কান্ধি উঠেছে ঝলমল ক'রে...ওর ঋজু দেহভঙ্গিতে...মিষ্ট আত্মপ্রত্যাশী দৃষ্টিতে...নবজীবনের নব স্বত্রপাতের নিশ্চিত আশায়...প্রতি ছোট হাসিতেও। মুহূর্ত্তে অবসাদ গেছে কেটে। স্বপনেরও। হৃজনেরই মন যেন শুভ্রপক্ষ বলাকার মতন উড়ে চলে এয়ারোপ্লেনের সঙ্গে পাল ভুলে।...

হঠাৎ পায়ের নিচে যেন আলাদিনের দৈত্য জাগিয়ে তোলে নীলের মেলা। শুধু নীল না—কোথাও পাটল, কোথাও গৈরিক, কোথাও চিকণ হরিৎ। উদ্দাম গতির দৃশ্য। ছোট ছোট হীরার মুকুট প'রে যেন নানা রঙা জলবালা নেচে নেচে চলেছে লুটোপুটির আশ্বিন লাগিয়ে দিয়ে। থেকে থেকে মেঘের চাপা মৃদঙ্গ যায় শোনা। ওর কানে জ্বলন্তে ওঠে পুরীতে এমনি এক কনকোজ্জল প্রভাতে সন্ধ্যা একটি গান রচনা করেছিল :

এ কী অগণন জলবালা পাখারে

মেলে হোলি হীরক-কাগে!

## ইসাবেলা

যতদূর দিগ্ধি চলে

খেলে তারা কুতূহলে

ঠমকে ঠমকে আলো-করতালে সিঁদুরাগে !

উলটি পুলটি তা'রা

মিলনে আপনহারা

ছুটিল—

পবন পুলকভরে

চুষন-মধু তরে

লুটিল !

গগনে কিরণ কাঁপে

কুহেলি পলায় তাপে

কার নব আগমনী জীবন-মুদ্রা জাগে ।

দ্যালোক ইঞ্জালে

বঙ্কিত ধূলিভালে

জ্বাকিল

কাস্ত কমল-টীকা,

লাঞ্ছনে জয়শিখা

ভাতিল !

কোন্ অনাগত বাণী

শুনে সুধা-সন্ধানী

ধরা আজি ? ফুটে গ্রেম রসহীন চিত্ত-বাণে !

নিস্ত এ আনন্দ সে ধরে রাখতে পারে কই ? ক্রান্তের তট  
ছুঁতে-না-ছুঁতে মেঘেরা দল বেঁধে ধরে আসে । ওপরে মেঘ, নিচে মেঘ,  
আশেপাশে সর্বত্রই ঘন মেঘের কুয়াশা । কিছুই আর দেখা যায় না ।...



ইসাবেলার শীত করে। স্বপন নিজের কবল ও ওভারকোট ওর ওপর চাপিয়ে দেয় ওর আপত্তি সবেও।...এয়ারোপ্লেন এত কাঁপে!...হঠাৎ এক-একটা জ্বাংগায় হু—শ ক'রে নামতে থাকে—কেমন যেন অস্থির করে তখন!...তার পরেই এমন দোলে!...ওর শরীরের মধ্যে কেমন যেন ক'রে ওঠে। পাইলট বলে বাইরে প্রবল হাওয়া উঠেছে—বিরুদ্ধমুখী, তাই এত দুলছে। স্বপনের মাথা ঘুরত সহজেই দুগুণিত। সেই রোগে ধরল ফের—হায় রে!

কাব্যের বোমচারণ থেকে এক টানে মনের হুম ক'রে ভূমিশেজ। ইসাবেলারও। গত রাতের ক্লাস্ট্রি—যুগের পুঞ্জিত অবসাদ—যেন ছেয়ে আসে। অথচ ঘুমও অসম্ভব। ইসাবেলা কেমন যেন নেতিয়ে জড়বৎ প'ড়ে রইল। কিন্তু স্বপন ঠায় জেগে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভিড় ক'রে এল রাজ্যের দুর্ভাবনা? কোথায় গেল খানিক আগের উচ্ছ্বাস? রাঙা আলো, বসন্ত হিল্লোল? ওর মনটার মধ্যে ব্যথিয়ে ওঠে...আনন্দের স্রোত কী পলাতক!...মাত্র্য তাকে ধ'রে রাখতে পারে না কেন? এতটুকু জ্বলো হাওয়া—ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির একটু মেঘলা ভাব—অমনি মন উঠবে আতুর হ'য়ে? যদি বা এক মুহূর্তে বিরল আনন্দের—rare spirit of delight—এর—দেখা মেলে—পর মুহূর্তেই ছেয়ে আসে জীবনের গম্ভীরতা, মাটির অভিশপ্ত পিছুটান...দেহের ধূলি-কামনা প্রাণের চমক-তৃষ্ণা...মনের সংশয়পাক!...ইসাবেলার সঙ্গে কি চাওঁর মিলন হবে ফের? আর হ'লেই কি সেটা থাকবে? আনার কী গতি হবে? এখন সন্ধ্যা কী করছে? কত দৃশ্টিভাষাই না কাটাচ্ছে ওরা?...কী ভাবছে দুজনে ওর টেলিগ্রাম পেয়ে? কী কারণ দিচ্ছে ওরা পরস্পরকে—ওদের হঠাৎ পারিসে যেতে বাধ্য হওয়ার জন্তে? আনা নীরার স্বভাব পরে কি আরও মুহূর্তমান হ'য়ে পড়েছে?...

ইসাবেলা তন্ত্রাচ্ছিন্ন অবস্থায় কি একরকম যন্ত্রণাসূচক অশ্রুট ধ্বনি করে শূণ্য হাত ছোঁড়ে। ও তার মাথায় হাত বুলাতে থাকে। ইসাবেলা চোখ মেলে বলে : “বড় মাথা ব্যথা করছে যে ভাই।” ও বলে : “একটু ঘুমতে চেষ্টা করো তো। আমি মাথা টিপে দিচ্ছি।”

ইসাবেলা ফের এলিয়ে পড়ে। আর সঙ্গে-সঙ্গে স্বপনকে আক্রমণ করে বিবাদের অনীকিনী। একে চোরাগলি ছাড়া আর কী-ই বা বলা যাবে? কেন এমন হয়? কোন্ অদৃষ্ট বিধানের চাপে মানুষ এত দুঃখ পায়? এত অর্থহীন মানিকর দুঃখ? ইসাবেলা কেন এ অসহ্য যন্ত্রণা ও আশা-নিরাশার দোলার মধ্যে দিয়ে চলেছে? আনা কার অপরাধে আজ ভেঙে পড়েছে? সন্ধ্যা কেন আজ দিশাধারা—মলিন?

সব চেয়ে বেশি মনে হয় আজ ইসাবেলারই কথা। কিসের লোভে ও চাংকে দুঃখ দিতে গেল? অকারণ এ-ঈর্ষা-ই বা কেন বোধ করল? স্বপনের মনে সন্দেহ ছিল না যে, চাং এঞ্জেলার প্রতি আনক্ত বাক্যে বলে তা হয়নি। একটু আকৃষ্ট হ’য়ে থাকতে পারে। কিন্তু এমন সময়ে কে না হয়...সহানুভূতি কে না চায়? যখন মানুষ একান্ত নিঃসঙ্গ বোধ করে তখন সে যে এতটুকু দরদেও কাঁড়াল হ’য়ে ওঠে। এটা ইসাবেলা কেন বুঝল না? বাটনের কথাও মনে হয়। তারই বা কী অপরাধ? প্রাণশক্তিমান্ বুঝক...ইসাবেলা পরত্নীও না...অমন সুন্দরী রূপবিলোলা...মুগ্ধ হ’ল...এ কি তার অপরাধ? কে ওকে দোষ দেবে ও চাংয়ের কাছ থেকে ইসাকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল বলে? এরূপ ক্ষেত্রে কার না এ ইচ্ছা হয়? বিশেষতঃ যুরোপে—যেখানে একনিষ্ঠা, পাতিব্রতা, মর্যাদা-এ সবই কুসংস্কারের কোঠায় এসে পড়েছে সেখানে—প্রাপোক্ষণ নরনারীর বাসনার সীমান্তরেখা টানবে লোকে কী দিয়ে?...স্বাধীনচিন্তা—স্বাধীনচিন্তা—স্বপন আওড়ায় দু-একবার অস্তমনস্কভাবে...প্রমদ আগে

একটা : গাছকে যদি তার ফল দিয়ে বিচার করা সমীচীন হয় তবে স্বাধীনচিন্তার অহুমোদন করা চলে কি? কেন না স্বাধীনচিন্তা তো মানুষকে আশ্রয় দিচ্ছে না—দিশেহারাই ক’রে দিচ্ছে। কিম্বা এই-ই চিন্তার ধর্ম? বুঝি পথের দিশা সে দেখাতে অক্ষম—বুঝি তার কাজ শুধু প্রতি পথের ঝড়ঝাপটার প্রতি সচেতন ক’রে দেওয়া? বুঝি পথ দেখাতে পারে এক ব্যক্তির অতিরিক্ত কোনো আলোক—অনুভবের সহজ রশ্মি?

হবে। কিন্তু তবু একথা ঠিক যে, চিন্তায় একটা মাদকতা আছে। বিশেষ ক’রে চিন্তার বিদ্রোহের। যখন চিন্তা মানুষকে নিরাপদের লোভ থেকে ফেলে দেয় অচিন দিগ্ভূত মোহানার উত্তাল তরঙ্গে, তখন সে-দিশেহারী আকুলতার মধ্যেও আছে কী যেন এক আত্মসন্ত্রমবোধ!

কিন্তু তবু প্রশ্নের সমাধান চিন্তায় কই মেলে না তো! বিশেষ ক’রে হৃদয়-জগতের দুর্বোধ্য সমস্যার বেলায়। কে ব’লে দেবে—স্বপ্নের মনে বিষাদ-প্রশ্ন জাগে বারবার—প্রেমের ক্ষেত্রে মানুষ কার দ্বারা চালিত হয়? নিজেকে সে জিজ্ঞাসা করে : প্রেমকে নিয়ে কবির এত যে মাতামাতি করেন প্রেম কি তার যোগ্য?...কে বলবে?

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

মসিমে বেনার



## পারিস

মসিয়ে বেনার ইসাবেলার জন্তে তাঁর মোটর নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। গ্র্যারোড্রোমের বাইরেই। ইসাবেলার চেহারা দেখে স্পষ্ট শিউরে উঠলেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

ইসাবেলা তাঁর বাছবেষ্টনে ধরা দিতে না দিতে জিজ্ঞাসা করল :  
“কেনন আছে চাং—বলুন। কী হয়েছে?”

মসিয়ে বেনার ওর শিরশ্চুখন ক’রে বললেন : “কাল রাতে ডাক্তার ব’লে গেছে বিপদ কেটে গেছে শেরি, ভয় নেই।” ব’লে ওর গলা জড়িয়ে ধ’রে বললেন : “তুমি এ-সময়ে নিজে থেকে এসে পড়েছ ব’লে কত খুসি হয়েছি, বলতে পারিনে।”

মোটরে ওঠে ওরা।

\* \* \*

স্বপন বলল : “চাংয়ের অস্থখটা কী?”

মসিয়ে বেনার গম্ভীর মুখে বললেন : “অস্থখ না। হয়েছিল কি, লগুনে ওর খোঁজ পায়নি শুওরা। পারিসের ষ্টেশনে ষ্টেশনে ওং পেতে ছিল। নামতেই—”

ইসাবেলা অশ্রুট চীৎকার ক’রে ওঠে।

—“ভয় আর তো নেই শেরি, ওর ভাঙা হাতটাও জুড়ে বাবে বলেছে ডাক্তারে।”

স্বপন সত্ৰাসে বলল : “হাতটা ভেঙে গিয়েছিল? কোন্ হাত?”

—“ভাগ্য ভালো, বাঁ হাত। আর ভাঙা ব’লে ভাঙা—কজির কাছে ছ’খানা হাড়ই জখম।”

ইসাবেলা কেঁদে ওঠে ।

—“ছি শেরি । এখনো ভয় ? আর তুমি কি না—” বলেই  
খেঁদে গেলেন ।

ইসাবেলা প্রাণপণ বলে আত্মসংবরণ ক’রে বলল : “আর অমন  
করব না মসিয়ে ।”

—“Une brave demoiselle.” \*

স্বপন হেসে বলে : “কিন্তু কায়রোতে, যে-ঘরে ও বেচারীকে গত  
ছ’দিন কাটাতে হয়েছে সে-ঘরে আপনাকে দু’ঘণ্টা কাটালেও তেজস্বিতায়  
আপনার একটু ভীতি প’ড়ে আসত এ-কথা জোর ক’রে বলতে পারি ।”

—“কী ব্যাপার ইসাবেল ?”

স্বপনই সংক্ষেপে বলে ওর হ’য়ে ।

\* মসিয়ে বেনারের চোখ দুটি অশ্রু-আভাষে চিক্ চিক্ ক’রে ওঠে ।  
স্বপনের মন আর্দ্র হ’য়ে ওঠে । এ বৃদ্ধবয়সেও মন এত কোমল রেখেছেন  
বৃদ্ধ কোন অফুরন্ত অন্তঃশীলা রসধারার সিকনে ?

\*  
\*

মসিয়ে বেনারের সুন্দর লাল কাঁকর বিছানো গেটে মোটর বেক  
নেয় । ইসাবেলা বলে : “আমি নামব না এখানে—সোজা আমার  
নিয়ে চলুন হাসপাতালে ।”

মসিয়ে বেনার ছুটু মিভরা ছেসে বললেন : “কী দুঃখে ?”

—“বাঃ”—ইসাবেলার গালে রক্তিমভা দেখা দেয় ।

মসিয়ে বেনার বাধা দিয়ে ওর গালে ঠোনা মেরে বলেন : “তোমারই  
জীবনের জন্তে শেরি, ওকে কাল রাতে আমার বাসায় এনে

\* ভেজখিনী কুমারী একেই বলি ।

রেখেছি। ইসপাতালে তো চুটিরে প্রেম করতে দিত না। আর আমি ভবিষ্যদ্বাণী করে চাংকে বলছিলাম যে, তুমি আসবে নিয়ামিবাশিনী হ'য়ে না।”

ইসাবেলা হেসে বলে : “ডেল্ফির অয়েক্ল এ-কলিগুগে আবিত্তাব হ'ল ফের।” ওয়া তিনজনেই হেসে ওঠে।

## যাযাবর

নানেৎ ইসাবেলাকে চাঙের ঘরে ধ'রে ধ'রে নিয়ে যায় স্বপনের হাতে একটি তার দিয়ে।

মসিয়ে বেনার বলেন : “আহা ব'সেই তারটা পড়ো না ছাই।” ব'লেই একটি স্পিডের কাউচে ধপ্ করে ব'সে বললেন : “আঃ! এঁরা করবেন প্রেম, আর ঝক্কি বইতে হবে এই বড়োকে—কী? মুখ-ঘেঁ অঙ্গকার? ওখানে দুই সতীনের বেধেছে বুঝি?”

স্বপন অপ্রতিভ হেসে বলল : “না মসিয়ে, তবে আনার একটি শিশুকন্যা লাভ হয়েছে।”

—“সে কি হে? তুমি সময়কে ব'য়ে যেতে দেওয়ার বিশ্বাস করো না জানতাম বটে, কিন্তু সে-অবিশ্বাস এত শীঘ্র ফলপ্রসূ হবে ভাবিনি তো।”

—“যান, আপনি ভারি দুষ্ট। নীরার মেয়ে।”

বলতেই বৃদ্ধের মুখ স্নান হ'য়ে গেল : “আহা—সে আর নেই বুঝি?”

—“না। কালই রাতে শেষ হ'য়ে গেছে। সন্ধ্যা আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে লিখেছে—নইলে আনাকে সামলানো যাচ্ছে না।”





মসিয়ে বেনার প্রথম নিতরুতা ভঙ্গ করলেন : “আমার মনে হয় স্বপন—”

—“কী ?”

—“বড় ক্লান্ত ? বেচারি !”

—“না মসিয়ে । এয়ারোপ্লেনে শেষের দিকে ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে নিরেছি, খুব চাঙ্গা এখন !”

—“তা হ’লে আমি বলি কি তুমি আমি যাই চলো আজই সন্ধ্যার টেনে ।”

—“ওরা ?”

—“আহা, ওদের এখন তৃতীয় ব্যক্তির দরকার নেই, বোঝো না কেন ?”

—“চাণ্ডের সঙ্গে একবার দেখাও করব না ?”

—“এখন না স্বপন । ওদের ছেড়ে দাও একত্রে । তা ছাড়া ওর বেশি কথাবার্তা কইবারও হুকুম নেই—যেটুকু উদ্ধৃত্ত শক্তি আছে ইসাবেলাকেই দিক না । জানোই তো একরত্তি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতেও কতখানি শক্তির দরকার করে ?”

স্বপন চেষ্টা-সব্ধেও অপ্রতিভ না হ’য়ে পারে না, বলে : “জানি । কেবল—”

—“বলো নিঃসঙ্কোচে ম’ণের ।”

—“ওদের মিল হবে তো কের ?”

মসিয়ে বেনার চিন্তাবিষ্ট সুরে বললেন : “এখন হবে—কেন না যা খেয়ে, দুঃখ পেয়ে, অ’লে-পুড়ে, বিরহে ছুজনেই এসেছে নরম হ’য়ে । কিন্তু—” ব’লে অস্ফুটমন্ডভাবে পাইপ টানতে লাগলেন ।

—“কিছু ?”

—“বুঝছি তো, ওদের মধ্যে প্রকৃতিগত এমন কোনো সভ্য মিলের  
তিত্ত্বি নেই বার উপরে দাম্পত্যের ইমারত ভরসা ক’রে তোলা যেতে  
পারে। একটু ঝড়-ঝাপ্‌টায়ই কাঁচা গাঁথুনি উঠবে টলমল করে!” বলেই  
ফের পাইপ টানতে টানতে স্বপনকে ঘেন ভুলেই গেলেন।

স্বপনের মনে কোথায় আক্কেপের সুর বনিয়ে আসে, কথাটাকে  
উলটে পালটে নানা দিক দিয়ে ভাবে, কিন্তু কোনো কুলই ঘেন পায় না।  
হঠাৎ দেখে : বৃদ্ধের চোক দুটি তার মুখের ‘পরে সংবদ্ধ!

ওদের দৃষ্টি-বিনিময় হতেই মুহূর্তে হেসে বললেন : “কি ভাবছ এত?”

স্বপন মুহূর্তে সুরে বলে : “ভাবছিলাম... এমন হয় কেন... দাম্পত্য  
রোমান্সে? এর সৌরভ এত মাদকতাভরা, অথচ এর মধুরতা এত  
পলাতক কেন?”

—“মাদকতাভরা বলেই তো পলাতক হে। রাজ্যের কর্তার ছায়া-  
পবাগ দিয়ে রোমান্সের নীড় বাঁধি আমরা। তাই তো এতটুকু অশ্রুস্রব  
মানি ধুলো বালির ভরও সয় না।”

—“কিন্তু তবু রোমান্স ক’রে-যে বিবাহ—”

—“মনামি, এক সময়ে আমারও তাই মনে হ’ত। ভাবতাম বিবাহকে  
যদি চির-রঙীন রাখতে হয় তবে তাকে রোমান্সের নীলাকাশে লক্ষ্য রেখেই  
চলতে হবে। কিন্তু পরে বুঝেছি যে, সমস্তটা রোমান্সেরও নয় বিবাহেরও  
নয়।”

—“তবে কিসের?”

—“কে জানে?” বৃদ্ধ ঘেন স্বপ্রাণিষ্ট সুরে ব’লে চললেন : “আমরা  
নানা রকম ভাবি, জল্পনা-কল্পনা করি, কিন্তু বাস্তব এসে সবই তো দেয়  
চুরমার ক’রে! আর কী নিষ্করণ ভাবেই না সব-কিছু ধুলোর লুটিয়ে  
দেয় বলো তো?”

অপন চূপ ক'রে থাকে...বুকের মধ্যে কোথায় একটা অনির্দেশ্য অথচ অভি-পরিচিত তার ওঠে রণিয়ে।

বুক সেই ভাবেই ব'লে চলেন : “এক সময়ে মনে হ'ত—বুঝি সমাজ-ব্যবস্থার কোনো ভুলচুকই দাম্পত্য-সম্রাট্য এমন দুর্ভেদ্য র'য়ে গেল। কিন্তু আজকাল মন মাথা নেড়ে বলে : উঃ, এ-অমিলের মূল আমাদের প্রকৃতির গহনতম স্তরে আছে প্রাণপণে লুকিয়ে। চাং ঠিকই বলে : যত দিন সেখানে আমাদের দৃষ্টি না পড়ছে ততদিন দেহতত্ত্ব, যৌনতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব, কিছুতেই সমাধান মিলবে না, উজ্জ্বলতম মিলনও দুদিনেই আসবে নিশ্চয় হ'য়ে—যেমন হ'য়ে এসেছে আবহমানকাল।”

—“কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যে, এ-সব সন্ধানের মধ্যে দিয়েই কিছু-না-কিছু আলো মিলেছে?”

—“কি রকম?”

—এই ইসাবেলার সঙ্গে চাঙের রোমান্সই দেখুন না। যতই বলি না কেন—এই যে বলিষ্ঠ স্বাধীনতার আদর্শ—আগেকার যুগের প্রেমে কি এ-জিনিষ ছিল?”

—“না। কিন্তু চাং বলে গাছকে যদি তার ফল দিয়ে বিচার করি?”

—“কী বলতে চাচ্ছেন?”

—“চাং বলে—আমি উত্তর দিতে পারিনি তার কথার, তাই তার কথাই উদ্ধৃত করছি—বর্তমান সভ্যতার এই স্বাধীনতার বুলিটা লোককে এত বেশি পেয়ে বসেছে ব'লেই দাম্পত্যসংক্রান্ত এখন এত দারুণ হ'য়ে উঠেছে। বলে : এতে যে-প্রত্যাশা আগানো হয় সে-প্রত্যাশা আজকের মানবচরিত্র পূর্ণ করতে পারে কি?”

—“কী বলছেন আপনি মসিয়ে? একেবারে যে গোড়াকার

প্রিলিপ্ল নিয়ে টানাটানি? প্রেম স্বাধীন না হওয়াই ভালো বলতে চান নাকি শেষটায়?”

—“স্বাধীনতার দায়িত্ব কত বেশি সেন, ক’টা লোক বোঝে বলো তো? যারা ‘ফ্রী লাভ’ ‘ফ্রী লাভ’ ক’রে আমাদের বধির-প্রায় ক’রে তোলে ভাবো কি তারা জানে তারা কী বলছে? তোমাদের পরমহংস-দেবের একটি উপমা পড়ছিলাম : সবার পেটে কি সব সয়? আমরা হলাম জন্ম-পেটরোগা—বিশেষ ক’রে এই প্রেমের ক্ষেত্রে—অথচ হজম করতে চাই স্বাধীনতার পোলাও-কালিয়া।”

—“ঠিক কী বলতে—”

বৃদ্ধ এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হেসে বললেন : “বুড়ীতা মাক কোরো ম’শের, তুমি আমাকে যে চিঠি লিখেছিলে সে-কথা মনে করো একবার, তাতে অবশ্য তুমি সমস্তাটাই খুলে লিখেছ, সে সত্বে তোমার কী মনে হচ্ছে গেছ চেপে। কিন্তু মনামি, সন্ধ্যা আমার পর থেকে কী মনে হচ্ছে তোমার সত্যি ক’রে বলো তো—সব বুলি-টুলি রেখে? বৃকে হাত দিয়ে বলো তো, মনে হচ্ছে কি যে, স্বাধীনতার মধ্যে তোমাদের তিন জনের প্রেম-বৃক্ষ ফলে ফুলে ভ’রে উঠেছে, না কাঁটায়-মাগাছায় চাপা পড়বার জোগাড় হয়েছে?”

অপন মুখ নিচু করল, বৃদ্ধ তার কাঁধে হাত রেখে বললেন : “মাক কোরো সেন, এজন্তে আমি খানিকটা দায়ী। কিন্তু চাং ও ইসাবেল্যা আমার চোখ অনেকখানি খুলে দিয়েছে। চাঙের এ-কথা আমাকে বড়ই ভাবিয়ে দিয়েছে যে, মানুষের প্রকৃতির খানিকটা মূলগত পরিবর্তন না হ’লে শুধু শিক্ষা বা সমাজব্যবস্থায় প্রেমের মন্দিরে শান্তির ধূপারতি জ্বলে উঠতেই পারে না। তেতরে তেতরে-বে আমরা আজও প্রায় আনারের গুহাবাসী পূর্বপুরুষদের মতনই বর্কর আছি—অনেক ক্ষেত্রে আরও বেশি

বর্ষর হ'য়ে উঠেছি—এ-কথা ভুলে শুধু বড় বড় আদর্শের কথা বলা বিড়ম্বনা বৈ আর কি? ওতে ভোলানো যায় শুধু এমন লোককে যারা সত্যি প্রেমে পড়েনি।”

বুদ্ধ একটু থেমে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলতে লাগলেন : “চাং কাল বলছিল যে, মানুষ যত জটিলতার আশ্রয় পায় ততই তাদের বুদ্ধির স্বচ্ছতা যায় ক'মে। তাই ভোলে যে, আগুনের প্রকৃতি না জেনে বারুদ নিয়ে খেলা করতে নেই। বলছিল : প্রেমের স্বরূপ বা নিজের প্রকৃতির বিন্দু-বিসর্গও জানি না অথচ ফ্রী লাভ প্রচার ক'রে বেড়িয়েও আমরা আবার পতঙ্গকে বলি অবোধ, যখন সে মহানন্দে আগুনে দেয় কাঁপ।” ব'লে বুদ্ধ ফের অন্তমনস্ক হ'য়ে পাইপ-সেবনে মগ্ন হ'য়ে পড়েন।

স্বপনের এত আশ্চর্য লাগে : ইসাবেলার সম্পর্কে এয়ারোপ্লেনে তার কেবলই মনে হয়েছে এই উপমাটাই নানা ছন্দে। যদি ও জানত প্রেমের মানে কী, তা হ'লে বাটনের হাতে ওর অমন লাহুনা হ'তে পারত কখনো? ইসাবেলার “স্বখাত-সলিল” কথাটা মনে পড়ে বারবার।

বুদ্ধ আপন মনেই ব'লে চলেন : “কিন্তু মুক্তি হয়েছে এই যে, প্রেম কথাটা উচ্চারণ করতে না করতে আমাদের কণ্ঠ হ'য়ে পড়ে গদ গদ, চক্ষে বয় ধারা, বুদ্ধি দেয় লম্বা। চাং ঠিকই বলেছিল হেসে যে, এজন্তে দায়ী সব চেয়ে বেশি হচ্ছে আর্টিষ্টরা, যারা একটুখানি রংমাখা চশমার মধ্যে দিয়ে প্রেমের সামনেকার ঝিকিমিকি দেখে মনে করে ঐ বুদ্ধি ওর চরম দান; কিন্তু যদি আমরা শাস্ত নেত্র খোলা চোখে মানুষের হৃদয় ও প্রকৃতিকে দেখতে শিখতাম, যদি সত্যিই একটু মানুষ চিনতাম, তা হ'লে দেখতাম সচরাচর আদর্শ প্রণয়ী প্রণয়িনীরা প্রেমের নামে বার স্তব-গান করেন তার নাম আশ্রয়দান নয় আশ্রয়দর। আমরা প্রেমাস্পদের কাছে নিজেকে ধ'রে দিই কই?—শুধু তো চেয়েই মরি। চাং বলছিল বেশ :

আমরা দেহ-মনের অজস্র স্বার্থ মানি ধুয়ে মুছে ফেলতে প্রেমের নদীতে নামি না—নামি সে-জলে নিজের মোহন মলিন রূপের প্রতিবিম্ব নানা ভাবে দেখে ‘বাহবা’ বলতে।” ব’লেই স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন : “চাং বড় অমংকার বলে এক একটা কথা, না ?”

—“সত্যি। ওর কাছে কত-যে শিখেছি।”

—“আমারও কয়েকটা ধারণার ও বড় বা দিয়েছে, জানো ?”

—“কী রকম ?”

—“যেমন—ও বলে—কিছু মনে কোরো না মনামি—যে, আমি ভারি একটা ভুল করেছিলাম আনাকে তোমার স্বন্ধে চাপিয়ে। বলে : এ রকম বেপরোয়া ভাবে পাকের পর পাকের সৃষ্টি ক’রে কোনো স্ত্রীলই ফলে না। বলে : প্রেম বড়ই অপলকা জিনিষ—এ-ভাবে তাকে নিয়ে তছনছ করা উচিত নয়—বুদ্ধি দিয়ে-গড়া কয়েকটা ধারণার পরশ করতে গিয়ে। বলে : প্রেমের পথে কঠিন পরীক্ষা এমনিই এত বেশি যে, সাধ ক’রে নতুন পরীক্ষার আবর্তে ঝাঁপ দিতে যাওয়া মৃত্যু।”

স্বপন মুখ নিচু করে। হঠাৎ কেমন যেন বিবাদ ছেয়ে আসে ওর মনে।—এ তো হ’ল সেই তয়েরই কথা ! তা হ’লে নির্ভীকতার আদর্শের হবে কী ?...

\* \* \*

—“সেন !”

ও মুখ তুলে চায় তাঁর দিকে।

—“আমাকে ক্ষমা করো।”

—“সে কি মসিয়ে !”

—“চাং ঠিকই বলেছে : প্রেম জিনিষটা এত মহার্ঘ যে, তাকে নিয়ে

বেশরোয়া হ'য়ে একস্পোরিমেন্ট করতে যেতে নেই স্বদেশীয় বৈজ্ঞানিক মতন।”

—“কিন্তু—

—“কী?”

—“এমন কিছু না, তবে ইসাবেলা বলছিল যে, আন্তর্জাতিক হওয়ার মধ্যেও এমন একটা মানকতা আছে যে, আধুনিক মন তাকে ছেড়ে সরল নিরাপদ স্বস্তির পথে স্থখ পাবে কি না সম্ভেদ। কারণ এ হ'ল ভয়ের পথ।”

—“কথাটা একটু বেশি বলা হ'ল। তবে ভয় খানিকটা আছে বৈ কি সব সাবধানতার মধ্যেই। আমার তো আজকাল মনে হয় ভয়ের সব রূপই হয়তো অশুভ নয়।”

—“আপনার মুখে এই কথা মসিয়ে?”

বুদ্ধ হেসে বললেন: “খুশি-বিমুখ দানবের মুখে একটু অভিনব শোনাচ্ছে, না? কিন্তু আমি ভয় বলতে ঠিক প্রাণের ভয় বুঝে না।”

—“তবে?”

—“সব মহামূল্য জিনিষকেই একটু সন্তর্পণে রক্ষা করতে হয় না? অধুচ এ-সন্তর্পণতার মধ্যে এ-সম্মনের মধ্যে একটু বিপদ-এড়ানোর চেষ্টা নেই কি?”

স্বপন চুপ ক'রে রইল।

—“এই দেখ না তোমাদেরই ক্ষেত্রে। সন্ধ্যাকে যদি আগে জানতাম তবে তার প্রতি মেহ আমাকে এতটা বেশরোয়া করত না কখনই—আনাকে নির্ভয়ে তোমার হেফাজতে রাখবার এত চেষ্টা করতে বাধ্যত। সন্ধ্যা এখানে এসে স্থখ পাচ্ছে কল্পনা ক'রে নিজেকে তাই অপরাধী মনে না ক'রে পারছি কই বলো?”

স্বপন মাটির দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইল।

মসিয়ে বেনার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শাইশটা পকেটে পুয়ে বললেন : “যাক—যা হ'য়ে গেছে তার ভো আর চারা নেই, এখন বেয়ে-চেয়ে দেখি—বিষবৃক্ষটিকে তার আসল কল-প্রসব করা থেকে তৈরীকানো যায় কি না?”

স্বপন চোখ নিচু ক'রে জিজ্ঞাসা করে : “কী করবেন কিছু স্থির করেছেন?”

—“খানিকটা করেছি, বৈ কি। সে সব পরে। আপাতত চলো তো বাওয়া যাক নীসে।”

—“সেখানে গিয়ে?”

—“প্রথম কাজ হবে আনাকে মাইভে বলা।”

—“তার পর?”

—“সবাই মিলে এখানে ফেরা।”

স্বপন একটু ইতস্ততঃ ক'রে জিজ্ঞাসা করে : “আমাদের দুজনকেও?”

—“বাঃ। তোমরা না এলে পঞ্চম অঙ্ক জমবে কেন মনামি?”

—“তা হ'লে আমার ও ফ্যাট্টা ছেড়ে একটা বড় ফ্যাট্টা আগে—”

—“সে পরে নিলেই চলবে। তোমাদের দুই মঙ্গলতীকে দেব আমরা তেতলাটা ছেড়ে। আমি ও আনা থাকব দোতলায়। সে হবে অখন।”

স্বপন হাসল : “অতিথির বোঝা ব'য়ে ব'য়ে কাঁধে চড়া প'ড়ে গেছে বুঝি?—না, এসবকে ঝগ্গাট ব'লে চিনতেই পারেন না?”

—“মনামি—তা যদি বলা, তবে জীবনটাই তো একটানা ঝগ্গাট।—কিন্তু শোনো হে কুস্তিগ, শুধু ঝগ্গাট বইতেই তোমাদের ডাকছি না এখানে।”

স্বপন হাসিভরা মুখে চাইল : “তবে?”



—“একটা পরফ করতে।”

—“কী পরফ?”

—“দেখতে চাই রোমান্সে টেকা দেয় কে?—স্পেন, না চীন, না ফ্রান্স, না সনাতন ভারতবর্ষ? আর পাশাপাশি তুলনা করতে না পারলে এ মহা সমস্তার নিষ্পত্তি হবে কেমন ক’রে বোলা?” বুদ্ধের অট্টহাস্যে ঘরটা কেঁপে উঠল। তক্ষুনি প্রায় জ্বিত কেটে বললেন : “ঐ দেখ, স্বভাব কি শুধরায়? চাং ওপরে অশুস্থ ভুলেই গিয়েছিলাম—বেমানুম।”

## সাক্ষ্য

স্বপন ও মসিয়ে বেনার যখন হোটেলে পৌঁছলেন তখন প্রায়ের নীললোহিতাভ ছায়া প’ড়ে সমুদ্রের বুক এক অপক্লপ রঙে উঠেছে রঙিয়ে। পূর্বদিগন্তে একটি মাত্র তারা স্থির পাণ্ডুর চোখে চেয়ে।...

স্বপন ‘তার’ ক’রে দিয়েছিল মসিয়ে বেনারের জন্তে ছ’টি ঘর রিজার্ভ ক’রে রাখতে : একটি শয়নকক্ষ, একটি বৈঠকখানা। বুদ্ধের কয়েকদিন আগে একটু বাতের মতন হয়েছিল। তাই ঘে-ঘরে সব চেয়ে বেশি স্থয়ালোক সেই ঘর তাঁর জন্তে রিজার্ভ করা হয়েছিল। হাঁটুতে তাঁর সামান্য ব্যথা ছিল; স্বপন তাঁকে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে সমুপলব্ধ বসাল। বৈঠকখানাটির সংলগ্ন বেশ বড় একটি গাড়ি-বারান্দা।

মসিয়ে বেনার চুকেই ঘরটির ভারিফ ক’রে বললেন : গাড়ী-বারান্দার দোরটা খুলে দিতে। স্বপন তাঁর বাতের জন্তে একটু আপত্তি করতেই হেসে বললেন : “অত বিজ্ঞতা করতে হবে না গো বন্ধু, বাত আমার—অস্থিতে, যৌবন হুঁসছে—মজ্জায়। আরো—একেবারে খুলে দাও—ঘাতে সমুদ্রটা ভালো ক’রে দেখা যায়। এইবার হয়েছে।

এসো—বোলো এখন। না, তোমার বালিকা বধুকে ডেকে পাঠাব—  
তোমার স্বর যদি না সয়।”

স্বপন হেসে বলল : “সত্যি বালিকা হ’লে হয়তো সইত না মসিয়ে,  
কিছু দুঃখের বিষয়, সে sweet sixteen-এর কোটা পেরিয়ে গেছে।  
সাক্ষাৎ বাইশ।”

—“কুঃ—বাইশ কি আবার একটা বয়স হ’ল না কি হে? ও বয়সে  
আমাদের মেয়েরা পুতুল-খেলা করে।”

—“আমাদেরও করে, কেবল সে-জীবন্ত পুতুলদের ওরা অল্প  
নাম দেয়।”

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন : “কী আশ্চর্য্য! আমিও অনেকদিন  
খ’রে ঠিক এই কথাই ব’লে আসছি, জানো?”

স্বপন হেসে বলল : “অনেকদিন থেকে, না বেচারি আমাকে দেখার  
পর থেকে?”

দোরো টোকা মেরে ভ্যালিটের আবির্ভাব।

স্বপন বলল : “মাদামদের খবর দাও। বলো, আমরা দুজনে  
মসিয়ের জুয়িং-ক্রমে তাঁদের জন্তে অপেক্ষা করছি।”

—“তাঁরা এখনো ফেরেননি মসিয়ে। বস্টাখানেক হ’ল বেশির  
গেছেন।”

—“কোথায় জানো?”

—“ছোট্ট মেয়েটির জন্তে কি-সব কিনতে বুঝি।”

স্বপন মসিয়ে বেনারের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করল। ভ্যালিটকে  
সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মসিয়ে বেনার বললেন : “আচ্ছা—  
ধন্যবাদ। তুমি এখন যেতে পার।—হ্যাঁ, তাঁরা ফিরলে এ-ঘরে একবার  
আসতে বোলো—কেমন?”

ভ্যালটে অভিযান ক'রে গ্রহান করলে মসিগে বেনার আঁকা স্বপনের দিকে চাইলেন। সে জানালার দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে নিভাবছিল। মসিগে বেনারও সেই দিকে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলেন।

চতুর্দশীর নিটোল চাঁদ সামনের একটি হরিত-পীতাম্ব ওড়না-পর মেঘের নরম বাহকে নিশানা ক'রে উড়ে চলেছে পাখা মেলে। কখনও মনে হয় বেন মেঘই চলেছে, কখনও—চাঁদ। নিচে সমুদ্র আধ-রাখি আধ-চাঁদ হ'য়ে ঝিক্‌ঝিক্‌ঝিক্‌ করছে...কড়া হুঁধোর আলো তখনো তার প্রতি পাঁজ্রে লেগে।

\* \*  
\*

কতক্ষণ ওদের এই ভাবে কাটে যে!...

হঠাৎ স্বপনের কানে গেল মুহু—“আঁহা”।—

রুদ্ধ তখনও আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে। মেঘটা পাতলা হ'য়ে এসেছে—তার মধ্যে দিয়ে চাঁদের রঙ যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে ধরে।...

রুদ্ধ সেইভাবেই চেয়ে বললেন : “ভালোই হল।”

—“কী?”

—“নীরার মেয়েটিকে ওর পাওয়া। এখন অনেক বিরহই ওর সহাবে—অন্ততঃ তার দুঃখ নিয়ে বিলাস ক'রেও হোঁচলতে পারবে—শিশু-সেবার অজুহাতে।” স্বপন চুপ ক'রে রইল।

রুদ্ধ বললেন : “রাগ কোরো না ম'শের। মেয়েদের কাছে শিশুর সেবা করতে পাওয়া বোধ হয় সব চেয়ে বড় সাহসনা। ওদের সব কোমলতা, দর মাধুর্য্য ওরা কোনো একটা আধারে ঢালতে চায়। পুরুষ হ'ল দায়বদ্ধ—পারবে কেন—এত হুঁসনা ধারণ করতে! উন্টে অতিষ্ঠ

হ'য়ে ওঠে। তাই না নারী হ'ল—না! এমন কি, মেয়েরাও একথা মানে।”

যখন একটু চুপ ক'রে থেকে বলল : “একথা আমিও খানিকটা মানি মসিয়ে, যদিও আনা বলে যে, এ-সব হচ্ছে পুরুষেরই কথা—পুরুষই তাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছে।”

—“যথা!”

—“একদিন তর্ক হচ্ছিল ওর সঙ্গে আমার। ও বলছিল : চাঁদ তুল করেছিল ঐখানেই—ইসাকোকে অত কোমল বলে বলে তাকে সত্যিই ভবুর ক'রে তুলল। বলছিল : ওর সব চেয়ে রাগ হয় একজনে কবিদেরই উপর—যেমন যখন শেকসপীয়র তাঁর দজ্জাল কাথারিনার মুখ দিয়েও শেষটায় বলিয়ে নিলেন পুরুষ জাতের কামনাটিকে :

রমণি, রমণি লো! কোমল ঢল ঢল!—

হানিলে ফুলও ভূমে লুটাও বিহ্বল...

তঃখ অম মানি

তব্বী দেহ খানি

বহে না ;—

তেমনই করয়ও কি তোমার সুপেলদ

বাহির অন্তরে মিলিয়া সৌরভ

বিছায় সুবনার—

রুঢ় আঘাত বার

সহে না ?” \*

- \* “Why are our bodies soft, and weak, and smooth,  
Unapt to toil and trouble in the world,  
But that our soft conditions and our hearts  
Should well agree with our external parts?”

—Taming of the Shrew

মসিয়ে বেনার একটু অসহিষ্ণু স্বরে ব'লে উঠলেন : “জানি ভা জানি—এসব বাণিতা আমার অজানা নেই, আজ বিশ্ববৎসর ধরে শুনে আসছি, এজ্ঞা শেফপীয়রের কোমলিমা বা ইব্‌সেনের পদ্ধতি কিছুই নজির দিতে হবে না। আমি এমন কথাও বলি না যে ওফেলিয়ার দলই হ'ল ভ্রান্ত আর নোরার দলই হ'ল প্রফেট। এসব হ'ল এক-একটা দৃষ্টিভঙ্গি, এবং প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কিছু-না-কিছু সা আছে। কিন্তু সব তর্ক শেষ হ'লেও একটা কথা কি বলা যার না তুমিই বলো না—ইসাবেলার সেই তো তোমাকেই তার করতে হ'ল। ব'লে একটু থেমে : “মেয়েদের কি সত্যিই আশ্রয়ের প্রয়োজন—নীড় গাথা প্রয়োজন—পুরুষদের চেয়ে বেশি নয়? প্রকৃতির কি একটু ইসারা নেই যাতে নারী পুরুষের তুলনায় কোমল হয়?”

—“তা থেকে কি প্রমাণ হ'ল?”

—“প্রমাণ নয় মনামি। আমি তর্ক করতে কোমর বেঁধে আসিনি এ যাত্রা। তর্ক-স্পৃহা আমার মোলারেম হ'য়ে গেছে—বিশেষ করে আনা ও ইসাবেলার কথা ভেবে।”—বলতে বলতে বুদ্ধের মুখ এল নরম হ'য়ে তিনি থেমে চিন্তাবিষ্ট স্বরে বললেন : “কিন্তু তোমার কি মনে হয় না যে, জীবনের দুঃখ বেদনা সব চেয়ে বেশি পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে নারীদেরই অস্থূভবে! না, অকৃতভাবে বলি কথাটা : মনে হয় না কি যে ওদের মনের আয়নায়ই জীবনের মানির প্রতিবিম্ব সব চেয়ে বেশি স্পষ্ট পড়ে?”

—“আমি ঠিক ধরতে পারছি না আপনি—”

—“না, শুধু নরনারীর টান বা সেক্সের মোহ এইটুকুই না—আমি বলতে চাচ্ছি—আঃ, কথাই খুঁজে পাই না ছাই কী করে তোমায় বোঝাই ঠিক বলো তো?” ব'লে একটু থেমে হঠাৎ বললেন : “হয়েছে, খুব স্বপ্ন লাড়ি-পাল্লা দেখেছ তো—আমাদের বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরিতে?”

—“দেখেছি।”

—“আমার মনে হয় মেয়েদের মনের প্রকৃতির গঠন একটু ঐ ধরনেরই—হুম। তাই যে-সব দুঃখ অমর্যাদা ক্ষতভার ব্যথাকে পুরুষ হেসে উড়িয়ে দিতে পারে সে-সবকে নগণ্য মনে করতে ওরা পারে না। অর্থাৎ, পুরুষের চেতনার দাড়িপাল্লায় একদিকে বেদনার ওজন একটু-আধটু বেশি-কম হ’লে ধরা পড়ে না, যেমন পড়ে মেয়েদের চেতনার ওজনে। তাই ওদের অভাব অসুভব আনন্দের চেয়ে বেশি হুম। এটা আমরা পুরো বুঝি না ব’লে যখন অল্পেই ওরা প্রলয় বাধায় তখন ভাবি : কী সামান্য আপটায়ই না করে ওরা তরাডুবি! এবার বুঝছি কি ঠিক কী বলতে চাইছি আমি?”

স্বপন চিন্তিত সুরে বলল : “বোধ হয় একটু পারছি আজকাল মসিয়ে। বিশেষ ক’রে ইসাবেলার যত্নগা স্বচক্ষে দেখার পর থেকে যেন... কী বলব!...যেন দেখার পরিধিটা সামান্য বেড়ে গেছে—একটা অনেক-দিনকার-বোনো যবনিকা গেছে স’রে। গত দু’রাত ধ’রে কেবলই মনে হয়েছে—” ব’লেই ও যায় থেমে।

বৃদ্ধ স্নিগ্ধ হেসে বললেন : “বলো না মনামি, আমি ঠাট্টা করব না ভরসা দিচ্ছি।”

স্বপনও একটু হাসল, কিন্তু তার পরেই গভীর হ’য়ে বলল : “এমন নতুন কথা কিছু নয় মসিয়ে, তবে মনে হচ্ছিল যে, মেয়েরা সংসারকে গ’ড়ে তোলাবার দিকে—বাকে আপনি বলছিলেন এইমাত্র নীড়-বাণী—নিজেদের দেহ মন প্রাণের চের বেশি অংশ উৎসর্গ করে—পুরুষের তুলনায়। হয়তো সেটাজেই...আমার মনে হচ্ছিল ক’দিন থেকে ওদেরকে কঠোরভাবে, শুধু বিচারের দৃষ্টি দিয়ে মাপতে গিয়ে আমরাও ঠেকি দায়ে, ওরাও পার দুঃখ। যেমন ধরুন না, চাং ও ইসাবেলার ক্ষেত্রে ঘটল।

ইসাবেলা ডের বেশি ছেড়েছিল চাঁদের অস্তে তবু সে মুখে বলত যে, কেউ কারুরই তার হবে না, কিন্তু মসিয়ে, ঐ লেনসেনের দাঁড়িপাল্লায় একজন যদি ডের বেশি দেয়—তবে সে অন্ততঃ খানিকটাও ফিরে না গেলে ওজনের গরমিলে সম্বন্ধটা একটু বেশি রকম কাৎ হ'য়ে না প'ড়ে পারে কি ?”

বুদ্ধ সোৎসাহে ব'লে উঠলেন : “মনামি, প্রায় মানুষ হ'য়ে উঠেছে যে বেশি। কিন্তু এ কি শুধুই ইসাবেলা-চাং-সংবাদে ?” ব'লে চোখ মিট মিট ক'রে হেসে উঠলেন।

স্বপন অপ্রতিভ হ'য়ে একটু হাসবার চেষ্টা করতেই বুদ্ধ তার পিঠে সজোরে এক চাপড় মেরে বললেন : “লজ্জা কি ভায়া ? আমি অনেক কিছুই করনা করেছি গো করেছি। কিছু না হোক, প্রায় আশি বৎসর ধ'রে আটের চর্চা করেছি তো।”

স্বপন অপ্রতিভ হেসেও সহজ সুরেই বলবার চেষ্টা করল : “কল্পনা করেছেন, কতটুকুই বা মসিয়ে ?” কিন্তু কোথেকে যে ওর সুরে একটা উদাস সুর ওঠে বেজে !...

মসিয়ে বেনাতের মুখ মুহূর্তে গম্ভীর হ'য়ে গেল : “পার' ম'শের। এ-সব নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত নয়। আহা—বেচারি সন্ধ্যা ! ইসাবেলার চেয়ে কম দুঃখ তাকে পেতে হয়নি।”

স্বপন মুখ নিচু ক'রে রইল।

বুদ্ধ হঠাৎ বললেন—যেন প্রসঙ্গটার মোড় ফেরাতেই : “তাই তো বলছিলাম যে এইমাত্র যে, সন্তান মেয়েদের মত আশ্রয়। অন্ততঃ শিশুকে পেলো মেয়েদের অস্ত্র অনেক শুল্কতা করে তাদের দেহমনপ্রাপ্তের শিশুসুখিতা দিয়ে। কিন্তু হয়েছে কি, পুরুষদের এ-প্রয়োজন তত বেশি নয় কি না, তাই কতানবীনা জননীর বেদনা তারা ঠিক তেমন ভাবে বহন করতে পারে না।—

মার পারে না ব'লেই সেরেদের দাবি-বাওয়া তার কাছে খানিকটা পরিমাণে  
জার হ'য়ে উঠতে বাধ্য।”

বশন মুখ নিচু ক'রে বলল : “কিন্তু সন্তান গেলে কি আনা—”

—“অনেকটা অর্থ পাবে বৈকি বেঁচে থাকার।”

—“কিন্তু—”

—“এটা ভাবতে প্রণয়ীর একটু ব্যথা লাগে, না? কিন্তু ওদের  
দিকটাও না হয় একটু ভাবলে গো।—কম ব্যথা তো পার না ওরা  
প্রেমে—অপণ্ডিত পুরুষের কাছে হাত পেতে। তাই ঐখানেই যে ওদের  
সব চেয়ে বড় ক্ষতিপূরণ মেলে।”

—“অর্থীৎ?”

—“আ-হা সব কথাই এত খুলে বললে রস থাকে কখনো? যদি  
কখনো তোমার সন্তান হয় তখন মিলিয়ে দেণো আসলে তোমার ‘ভাঁর’  
কাছে তুমি কতটা গৌণ ছিলে। নীতশে ও ট্রিওবার্গ এই কথাটাকে  
একটু রূঢ়ভাবে বলেছেন ব'লেই লোকে অগ্নিশর্মা হ'য়ে ওঠে, কিন্তু তবু  
ঐদের কথাটা ভাববার নয় কি যে, নারীর কাছে পুরুষ হল means—  
বার end হ'ল ঐ সন্তান?”

—“এ-ও কিন্তু আবার বাড়াবাড়ি মসিয়ে।”

—“তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—না! ওহে ভায়া, এ যদি না হ'ত  
তা হ'লে বিশ্বকর্মা ওদের ‘মেয়ে’ নাম দিলেন কেন? একটা জড়তরঙ্গ,  
অকর্মণ্য, কাঁহনিসর্কর মাংসপিণ্ডকে অকারণ দিনের পর দিন পালন ক'রে,  
রাতের পর রাত লালন ক'রে মানুষের মতন একটা জীব দাঁড় করানো—  
উঃ!—এ-কাজ কি মেয়ে ছাড়া আর কাউকে দিরে সম্ভব হ'ত মনে করো?  
না, বাবের দেহ মনের এতখানি শক্তি এই কাজে ব্যয় করতে হয় তাদের এর  
পরেও সত্যিকার প্রেমের জ্বলে কিছু ঠেংত থাকতে পারে কখনো?”



—“দাঁড়ান, মেয়েদের সখকে আপনার ধারণাটি যে কী—তা সন্ধ্যাকে আজই দিচ্ছি ব’লে।”

—“সর্বনাশ। অমন কাজটি কোরো না। জেনো মেয়েদের ‘পুরুষ নও’ বললে তাঁরা যত চটেন কানাছেলেকে ‘পদ্মলোচন নও’ বললেও সে তত চটে না। আমার সমস্ত রঙীন রোমান্স অমন ক’রে মাটি কোরো না মনামি—দোচাই।”

স্বপন হেসে বলল : “কিন্তু ভাগ ক’রে রোমান্স কতদিন চালাবেন তনি ?”

—“আরে—রোমান্সের একমাত্র খোরাকই ত ভাগ হে! সাফ্ সাফ্ কথা বলা মানেই ত রোমান্সের আশানপূর্ণ। নইলে মেয়েদের মেয়ে বললে তারা চটেবেই বা কেন বলো ?” ব’লে মসিয়ে বেনার হো হো ক’রে হেসে উঠলেন। স্বপনও সে হাসিতে যোগ দিল।

হঠাৎ দ্বারে আঘাত। মসিয়ে বেনার বললেন : “Entrez.” \*

## সপ্রতিভা

সন্ধ্যা। মসিয়ে বেনার তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মাথা হেলানেন। স্বপনও উঠে ইংরাজিতে বলল : “মসিয়ে—আমার তিনি—ধীর সঙ্গে আপনি পরিচয় করতে এত ব্যগ্র হ’য়ে উঠেছিলেন।”

মসিয়ে বেনার দুই হাত বাড়িয়ে সন্ধ্যার দুটি হাত টেনে নিয়ে অতি-পরিচিতের মতনই বললেন : “Bon soir Madame. †”

\* আদৃত পারে।

† শুভ রাত্রি, মাঝামাঝি।

সন্ধ্যাও অত্যন্ত সপ্রতিভ হুয়েই বলল : "Bon soir Monsieur, comment vous portez-vous ? †

বুদ্ধ একগাল হেসে বললেন : "Eh bien, vous parlez francais, chère Madame ! Vous avez un accent charmant—raiment." §

স্বপন হেসে ইংরাজীতে বলল : "ওকে ঠাওরান কি মসিয়ে ? প্রতি রীকার ফাষ্ট হ'ন, সামান্ত ফরাসী ভাষার উচ্চারণ দোরস্ত করা তো হান্ কথা ?"

সন্ধ্যা বাংলায় বলল : "খামঃ।" ব'লেই মসিয়ে বেনারের দিকে কিসে ইংরাজীতে বলল : "মাক করবেন মসিয়ে, আমার ফরাসী ভাষার দোড় ঐ অবধি। তবে সেটুকু জানি সেটুকু জাহির করতে কার লোভ হয় বলুন ?"

মসিয়ে বেনার হেসে ইংরাজীতে বললেন : "বটেই তো। তবে মাকে অতি সলজ্জবদনে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, ইংরাজী ভাষাটার আমার অজানা না হ'লেও আমার উচ্চারণটা খুব—"

সন্ধ্যা টপ ক'রে বলল : "Mais vous avez un accent charmant". \*

বুদ্ধ হো হো ক'রে হেসে স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন : "Vous ez une femme bien spirituelle mon cher, je vous en

† শুভরাত্রি মসিয়ে, কেমন আছেন ?

§ বাঃ—আপনি ফরাসী বলতে পারেন ! আর চমৎকার উচ্চারণ তো—সত্যি !

\* কিন্তু আপনার উচ্চারণ ত চমৎকার !

félicite."† বলে সজ্জার মিকে তাকিয়ে ইংরাজিতে বললেন :  
“আপনাকে দিখ্যা কম্মিমেণ্ট দেবার জন্তেই যে আপনার উচ্চারণের  
সুখ্যাতি করেছি তা মনে করবেন না মাদাম সেন।”

সজ্জা হেসে বলল : “আমিই কি করেছি নাকি ? কিন্তু সে ঘাই  
হোক আপনি আমাকে মাদাম সেন বলে না ডেকে সজ্জা বলেই ডাকবেন।  
আনার চেয়েও আমি বয়সে ছোট।”

কুছ পুসী হওয়া সবেও বললেন : “ছোট হ'লেও প্রথম পরিচয়েই কি  
একেবারে নাম ধ'রে ডাকাটা সঠিক ?”

—“সঠিক মসিয়ে, যেহেতু আপনার সঙ্গে পরিচয় আমার মোটেই এত  
প্রথম নয়।”

—“আনা কাল থেকে অনর্গল বলেছে বুকি আমার কথা ?”

—“তবু তাই নয়—আমার স্বামীর চিঠি আপনার কথায় প্রায় ভুলি  
থাকত বললেই চলে।”

মসিয়ে বেনার করাসী কারদার হেট হ'রে সজ্জার হস্ত চুখন ক'রে  
বললেন : “Merci bien Madame—pardon—S'excuse—উজ্জ্বল  
ঠিক হয়েছে ?”

সজ্জা সম্মিতমুখে হাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

শুপন বলল : “জানো সজ্জা, মসিয়ে বেনার এতকাল আমাকে আমার  
বালিকা বধূটির সখকে যত রাজ্যের প্রের ক'রে—মেয়েরা হাতে প্রেমিকা  
নয় বলে—”

—“বিশ্বাসঘাতক ! গোপন কথা বলে কেওয়া ? বিশেষতঃ যখন

† বাঃ—তোমার স্ত্রী যে যেখনি থাকা চান—আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি  
এ জন্তে।

ভানো তরুণীর সামনে আমি কি দরম অজ্ঞাতস্বরূপ কিশোরের মতন দুখচোরা হ'য়ে পড়ি !”

সন্ধ্যা হেসে কেলল। বশন সম্বিত জুরে বলল : “আজ্ঞা আজ্ঞা মসিয়ে, আর বেশি চাটে হাঁড়ি ভাঙব না, ভয় নেই। কিন্তু তরুণীর সামনে আপনার আলা কিশোর লাফুক হ'য়ে পড়ার কথাটা সত্য হোক বা না হোক—বাতগ্রস্ত পায়েও যে তার মতন জোর আসে এটা নিশ্চয়।”

সন্ধ্যা অশ্রুতপু জুরে বলল : “তাই তো মসিয়ে—আমার যে কথাটা এতক্ষণ মনেই হয়নি—হাঁড়িয়ে হাঁড়িয়েই পর সরছিলাম। তুলেই গিয়েছিলাম আপনি সম্প্রতি বাস্তে কই—”

—“সেজ্ঞে তোমার কোনো ক্রটিই তো হয়নি মাল—সন্ধ্যা—আমারই তো আগে তোমাকে বসতে বলা উচিত ছিল।”

সন্ধ্যা কোমলকণ্ঠে বলল : “বহুন ঐ সোফার ওপরে—পা বেশ ছড়িয়েই বহুন—যদি তাতে আরাম পান। আমার সঙ্গে ভদ্রতা করলে কিছু ভারি রাগ করব।”

মসিয়ে বেনার আবিষ্টবৎ সোফার ওপর পা ছড়িয়ে রেলান দিয়ে বসে বললেন : “দয়বাহ সন্ধ্যা। কিন্তু তা হ'লে কথা দিতে হবে যে তুমিও আমার সঙ্গে ভদ্রতা করবে না।”

সন্ধ্যা হেসে বলল : “এতক্ষণের কথাবাতীর পরেও কি আপনার মনে তর হচ্চে নাকি যে, আমি তা পারি—বিশেষতঃ আপনার সঙ্গে ?”

—“Merci.” \*

—“Merci-র প্রেতে কিছুই নেই। আমি ইমাবে চ'ড়ে অবধিই

মনে মনে মুসাবিকা করছি—আপনার সঙ্গে এমন সুরে কথা বলব যাতে বাঙালী মেয়েদের সখকে আপনি ‘শকুন্ড’ হ’য়ে যান।”

—“কেন বলো তো! তোমার কি ধারণা যে, বাঙালী মেয়েদের সখকে আমার মনোভাব—”

—“আপনার ছাত্রটি সেই শ্রীমতী তুর্কানীর সম্পর্কে—যাকে আলগোছে পিয়ানো শিখিয়েছিলেন—আপনার অভিজ্ঞতা আমাকে লিখে জানিয়েছেন মনে রেখে তবে পর্দানশীনদের সখকে কমপ্লিমেন্ট দেবেন কিছ্।”

মসিয়ে বেনার হেসে উঠলেন। তারপর স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন :

“ও—ভেতরে ভেতরে বৃষ্টি এইসব কথা-চালাচালি চলছিল এতদিন?”

স্বপন হেসে বলল : “যদি চ’লেই থাকে তবে আপনার না-রেগে তো কৃতজ্ঞই হওয়া উচিত মসিয়ে, নয় কি?”

—“কেন শুনি?”

—“নইলে পর্দানশীনা কি মুহূর্তের আলাপে আপনার সঙ্গে নিরবগুষ্ঠার মতন ব্যবহার করতে পারতেন?”

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন : “বলেছ ভালো সেন, তোমার সাতকান থাক।” স্বপন ও সন্ধ্যা হেসে পরস্পরের দিকে তাকায়।—ঘরের মধ্যে এমন একটা সহজ অনাড়ম্বর দৃশ্যতার সুর বেজে ওঠে!.....

হাসি খামলে মসিয়ে বেনার সন্ধ্যার দিকে চেয়ে ভিজ্যাসা করলেন : “আনা কোরায় সন্ধ্যা?”

সন্ধ্যার মুখের ভাব কেমন যেন বদলে যায়। দুজনের চোখে পড়ে—ও চোঁটা করছে মুখের ভাবকে সহজ রাখতে—কিন্তু পারছে না।...ঘরের মধ্যে মুহূর্তকালের ক্ষণে একটু আড়ষ্ট ভাব যেন ঘনিষে এসে। কিন্তু সন্ধ্যার ভাবান্তর রইল না। সে একটু বামেই সহজ সুরে বলল : “আনেথেকে দুধ খাইয়ে আসছে। ও-হো—আমি কুলেই গিয়েছিলাম

মামাকে সে জিজ্ঞাসা করতে বলেছিল, আপনি আনখেকে এখন দেখতে চান কি না ? তা হ'লে সে তাকে ঘুমপাড়াবার আগে এখানে নিয়ে আসবে ।”

—“এর মধ্যেই উৎসাহ যে তার-সপ্তকে চড়েছে দেখছি। বেশ তো, আমুক না।—যদিও সজোজাত শিশুর মতন কিছু ক্রিমাকার জীব জগতে মেলা তার—তবু কিস্তিকিমাকার হ'লেও তার চিত্তাকর্ষক হবার তো বাধা নেই—বিধাতার খামখেয়ালির নমুনা হিসেবে।”

সন্ধ্যা রাগ ক'রে বলল : “তা হ'লে আর এনে কাজ নেই।”

“মসিয়ে বেনার ঈষৎ করুণার হাসি হেসে স্বপনের দিকে কোতুকোজ্জল চোখে চেয়ে বললেন : “দেখছ তো সেন, ঠিক বলেছিলাম কি না ? মেয়েরা যদি শিশুকে পুরুষের মতন সহজ চোখেই দেখতে পারবে তবে তাদের মেয়ে বলেছে কেন ?”

সন্ধ্যা আরও রাগ ক'রে বলল : “কিন্তু যোগ্যতম পুরুষকেও কষ্টাবার সময়ে ঐ অযোগ্য মেয়েদেরই কাছে করুণভাবে হাত পাতে হয় এখনো—সেটা ভুলবেন না তাই ব'লে।”

মসিয়ে বেনার করুণ স্বরে বললেন : “অত রাগ কোরো না সন্ধ্যা—তা হ'লে আমার গতি কী হবে বলা ?”

স্বপন বলল : “সামলান এখন ঠেলা !—পেলেন তো খানিকটা স্বাদ খালিকা-বধুর প্রতাপের ?”

—“এটুকু স্বাদে কি আপ মেটে বন্ধু, না প্রাণ তরে ? অন্ততঃ তোমাদের প্রেমালাপটা একদিন আড়ি পেতে না শুনলে বয়ফালান্বিনীর প্রতাপের দৌড়-সঙ্কে ধারণাটা যে আবছা থেকে বাবেই যাবে।”

সন্ধ্যা বলল : “তা হ'লে না হয় ধারণাটাকে স্পষ্ট ক'রে তোলবার জন্যেই একবার চলুন না আমাদের দেশে ?”

স্বপন সোৎসায়ে বলল : “সত্যি মসিয়ে থাকেন ? নেহাৎ  
এয়ারোপ্লেনেই পাড়ি দিন না একবার আমাদের সঙ্গে ।”

বুদ্ধ করুণভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন : “এ-বয়সে এয়ারোপ্লেনের দুন্দু  
যদি থাকে সয়, তোমাদের দেশের অল্পঃপুত্রিকাদের চাহনি ও বাকাব  
দ্রাপট সইবে না কখনোই ।—কিন্তু ঠাট্টা যাক—আমার সত্যি ভারত  
যাবার তারি ইচ্ছে করে আত্মকাল—জানো ? তাই বেশি নীড়ার  
কোয়ো না বেন, হঠাৎ তোমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক’রেও ফেলতে পারি  
স্বপন ও সন্ধ্যা প্রায় একসঙ্গেই ব’লে বসল : “বেশ তো ।”

মসিয়ে বেনারের সুর গভীর হ’য়ে গেল, বললেন : “হয়তো সচি  
য়েতাম এবার—যদি না শীঘ্রই একবার আমেরিকায় যাওয়ার দর  
খাক্ত আনাকে নিয়ে ।”

স্বপন বিস্মিত হ’য়ে বলল : “সে কি ? আপনার আনাকে নি  
আমেরিকা যাবার এ-প্রান তো শুনিনি কখনো ?”

—“আরে বন্ধু—সব প্রানই কি মাজুঘের কাছে অসময়ে ফাঁস কর  
আছে ? আমি দু-একটা তারও করেছি কাল—দু-একজনকে । যে  
এখনো নিশ্চিত ক’রে বলতে পারিনে—আমার তারের ঝিঙের ও  
অনেকটা নির্ভর করেছে । বিশেষ ক’রে চাণ্ডের মনস্থির করার ওপর  
সে যদি যায় তবে আমরাও যাব—এইরকমই ভাবছি ।”

খানিকক্ষণ কেউ কথা কইল না । ঘরের মধ্যকার সহজ ছাওয়া ও  
একটু জমাট হ’য়ে উঠেছিল ।

সন্ধ্যা প্রথম কথা কইল : “তু ধু দেশ দেখতে ?”

—“হ্যাঁ তা-ও বটে—আর আনাকে জগৎটা দেখাতেও বটে  
জা ছাড়া আমেরিকায় আমার একটি বোনের বান্ধবী আছেন—কাতো  
ওখানে আতিথ্য-গ্রহণেরও একটু সুবিধে আছে ।”

স্বপন হঠাৎ বলল : “তা হ’লে আমাদের দেশ দিয়েই শুরু ক’রে ওদেশে ঘুরে ঘান না কেন ? আপনি যদি ঘান তবে আমরাও সব নিই।”

মসিয়ে বেনার একটু চুপ ক’রে থেকে বললেন : “এ ব্যাপার বোধ হয় তা হবে না। তবে আমেরিকা হ’লে ভূপ্রদক্ষিণ করার একটা বাসনা আছে। হয়তো সে-সময়ে জাপান ও জাভা হ’লে তোমাদের ওখানে অতিথি হ’তে পারি—যদি ভরসা দাও অবিজ্ঞ।

সন্ধ্যা বলল : “ভরসা খুবই দিতে পারি—যদি আপনিও ভরসা দেন যে, নিমন্ত্রণের মর্যাদা রাখবেন। উড়ো-কণার বেসাতিতে আমার শ্রদ্ধা নেই। আমি নিশ্চিতের পসারিণী।”

মসিয়ে বেনার সন্ধ্যার দিকে চেয়ে দ্বিধা হয়ে বললেন : “কথা অস্ত ক’রে আদায় করতে হবে না সন্ধ্যা। কারণ একথা অন্ততঃ এখন অস্বকোচে বিশ্বাস করতে পারো যে, তোমাদের দেশের ওপর লোভ আমার দলগুণ বেড়ে গেছে। সেন জানে, সমস্ত দিনরাতের মধ্যে সন্ধ্যাদেবীর সোনালি সন্ধিলয় আমার কত প্রিয়—তার ওপর আবার তোমাদের দেশের বাসিন্দা সন্ধ্যা। কাজেই একেই কথা দেওয়াটাই কি বাহ্যিক নয় ?”

সন্ধ্যা সন্তোষিত ভাবে বলল : “করাসী কম্প্রিমেন্টের প্রকৃতি-সম্মত আমাকে বস্তুটা অজ্ঞ ভাবছেন আমি কিন্তু ঠিক ততটা অজ্ঞ নই মসিয়ে—”

মসিয়ে বেনার তার একখানি হাত নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন : “কম্প্রিমেন্ট নয় শেরি, টাভের আলো প্রথম দেখা দেয় কি সন্ধ্যাবেলায়ই নয় ? না, দিনের আলোর রঙীন স্বপন কোটে কখনো ?”

সন্ধ্যার গালে প্রথম রক্তিমাতা দেখা দিল। সে সন্ধ্যা চেপে তাড়াতাড়ি বলল : “ও-হো—আনাকে যে আমার ব’লে আসার কথা। সে হয়তো আমার ঘেরি দেখে তবে এসেছে আপনি তার আদরিত্বটিকে



সেখতে মোটেই উৎসুক নন। হরতো সে অভিমানে তাকে এতকণ ঘুম-  
পাড়িয়েই ফেলেছে। তবু দেখি।” ব’লে সে উঠে দাঁড়াল।

মসিয়ে বেনার বললেন : “আরে করো কি শেরি? তুমি এসময়ে  
গেলে চলে? বোসো বোসো। আমিই তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।”  
ব’লে তিনি হাত বাড়িয়ে পাশে চেয়ার মেডের বস্টার বোতাম টিপলেন।

\* \* \*

চেয়ার মেড এসে হাজির হ’তে তিনি বললেন : “মাদামকে বলবে—  
যদি তাঁর মেয়েটি ঘুমিয়ে প’ড়ে না থাকে তবে তাকে নিয়ে এ ঘরে এলে  
ভারি খুশি হব? কিন্তু যদি ঘুমিয়ে প’ড়ে থাকে তবে বোলো : আমিই  
গিয়ে দেখে আসব।...Merci.”

চেয়ার মেড অভিযান ক’রে নিজস্ব হ’লে মসিয়ে বেনার তাঁর  
পাইপটি খেন স্তম্ভমন্ড ভাবেই ধরালেন। স্বপন ও সন্ধ্যা একবার মাত্র  
পরস্পরের দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। সন্ধ্যা সামনের নীল-  
খিলিমিলি কাঁড়টার নীল-নীতান্ত বিজ্জ্বলি বাতির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে  
রইল। স্বপনের দৃষ্টি পড়ল বাইরের সমুদ্রের দিকে। একথও ছাই-  
পাণ্ডুর মেঘ চাঁদকে চোখ ঠারছে। নিচে তাদের পানে চেয়ে—একথও  
ছায়াবীণ। তিক্ত ডিমের মতন আকার কী মিষ্টি।...তারপর পাশেই  
সোনার আলো অলমল করছে।...বীণটিকে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে  
চলেছে যেন বিগবের এক মেঘের নেয়ে অদৃষ্ট হাওয়ার শুণ টেনে।...

সে গতির সঙ্গে সাগর-কক্ষের ঝিকিমিকি খেন সাথে সাথে চলে পাল  
ফুলে—শান্ত কল্লোলের মন্দাকিনী তালে তালে।...

\* \* \*

নিস্তরতা ভাঙল স্বপন : “আমেরিকা বাওয়া-সব্বন্ধে চাঙের সঙ্গে কথাবার্তা হ’ল কবে ?”

প্রশ্নটা স্বপনের নিজের কানেই কেমন যেন অসংলগ্ন মতন শোনায়।  
মসিয়ে বেনার তার দিকে চেয়ে বললেন : “হঠাৎ এ-প্রশ্ন ?”

—“এমনিই।”

মসিয়ে বেনার একটু চুপ ক’রে থেকে বললেন : “চাং বলছিল যে, ইসাবেলাকে নিয়ে আমেরিকা গেলে হয়তো...বুঝ্ছ তো ?—বাটনের হাত থেকে ওকে—কী ? সন্ধ্যাকে সব বলেছ তো ?”

স্বপন মুহূর্তে বলল : “বলেছি।” সন্ধ্যা মসিয়ে বেনারের দিকে তাকিয়ে বলল : “আমার সামনে যদি এ-সব বিষয়ে খোলাখুলি কথাবার্তা কইতে আপনাদের—”

মসিয়ে বেনার তার হাতের ‘পরে মেহের চাপ দিয়ে বললেন : “কিছু আপত্তি নেই শেরি—যদি কেবল তোমার আপত্তি না থাকে।”

—“আমার আপত্তি থাকবে কেন ?” সন্ধ্যা প্রশ্নটা করেই মুখ নিচু করল।

মসিয়ে বেনার তার দিকে তাকিয়ে বললেন : “বুঝতে কি পারো না ?”

সন্ধ্যা তেমনি ভাবেই বলল : “না।”

ওর স্বপ্নের মধ্যে কী যেন একটা চাপা কোত্তের রেশ...মসিয়ে বেনার একটু ইতস্তত ক’রে বললেন : “জানো তো শেরি—”

সন্ধ্যা বাধা দিয়ে বলল : “জানি মসিয়ে। কেবল আমার অজ্ঞতা, আমাকে ছদ্মপোস্ত শিশু ভাববেন না। কুলের বায়েও কিছু আমি বুঝা বাই না।”

মসিয়ে বেনার কোমলকণ্ঠে বললেন : “জানি সন্ধ্যা। তবে কি

জানো ? এ-সব আলোচনায় কখন যে আচম্কা কী এসব এসে পড়ে—  
বুঝলে না ?”

সক্কা জেমনি অবিলম্বে কণ্ঠেই বলল : “বুঝেছি মসিয়ে। বিশেষ  
এ-কয়দিনে। কিন্তু—” ব’লে থেমে বলল : “এ-সবে বাজে কি কেক  
মেয়েদেরই ?”

স্বপ্নও মুখ নিচু করল। কী যে বিল্ডী একটা অস্বস্তির গুমট...  
মসিয়ে খেনার সক্কার দিকে একবার চেয়েই অস্বস্তময় হয়ে কী যে ভাবতে  
থাকেন !...



বুদ্ধ বললেন : “এজন্তে তোমার ফোভ আমি করনা করতে পারি  
শেরি। কিন্তু মানুষ এসব বিষয়ে...খোলাখুলি আলোচনা করতে...  
বুঝলে না ?” ব’লে কণ্ঠ পরিষ্কার ক’রে নিয়ে বললেন : “তবু আমি  
সত্যিই অনেক ভেবে-চিন্তে স্থির করেছি যে এ-বিষয়ে সকলে মিলে  
খোলাখুলি কথাবার্তা কইব আজ।—অবশ্য যদি তোমার এবং—” ব’লে  
কের থেমে বললেন : “অর্থাৎ তোমাদের ছাত্রদের ও আনার আপত্তি  
না থাকে।”

সক্কা বলল : “আনার ও আমার আপত্তি নেই। তার সঙ্গে  
আমার সম্পূর্ণ খোলাখুলি কথাবার্তা হ’য়ে গেছে।”

স্বপ্ন বিম্মিত জিজ্ঞাসনেনে ওর দিকে তাকাতেই সক্কা বলল :  
“পরন্তু। নারা নারা বাগুরার পর সমস্ত রাত আমরা ছিলাম জেগে।”  
ব’লে একটু ইতস্তত ক’রে বলল : “আনার সে কী কারা ! তাইতেই  
হয়তো ওর মনের আগল সেল খুলে। অস্তিত আমরা পরস্পরকে হয়তো  
একটু টিনতে পেরেছি—এই হয়ে।”

মসিহে বেনার ও স্বপনের দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। বুদ্ধ বললেন : “কী লা ?”

স্বপন মুখ নিচু ক'রে বলল : “হয়তো ভালোই হবে।”

সন্ধ্যা দৃঢ়ভাবে বলল : “হবে। যদি তুমি ও আনা প্রথম থেকেই বিষয়ে আমার কাছে খোলাখুলি আলোচনা করতে—তা হ'লে আরও আগেই ভালোটা হ'ত।”

মসিহে বেনার ওর হাতের উপর হাত বুলোতে বুলোতে মিথ্য স্বপ্নে বলেন : “ছি শেরি, রাগ কোরো না। এ-সব ক্ষেত্রে সহজ আচরণের যে কতিন কাজ যে দম্পতীর মধ্যে কমই আছে একথা হয়তো তুমি আজ কবে না, কিন্তু—”

—“কেন আমাকে এত শিশু মনে করছেন মসিহে যে আমি ভুলছি—”

—“মোটাই না শেরি, তোমার মনটি পরিণত ব'লেই যে কুঠা। মন করো কি যে, এ-বুগের—অর্থাৎ—নানান সংঘর্ষে প'ড়ে যে তোমার তন বুদ্ধিমত্তী মেয়ে শিশু থাকতে পারে না তা আমি বুঝি না? না, টুকু জানবারও বয়স আমার হয়নি যে অসুখবন্দের তীক্ষ্ণ ও নিবিড় অভিজ্ঞতার প্রসাদে আমাদের মন দেহের বয়সকে ছাড়িয়ে যায় হ হ 'রে?—কিন্তু—মাপ কোরো সেন,—” বললই সন্ধ্যার পানে কিরে বলেন :

“এক্ষেত্রে যে দাম্পত্য অপরাধ করে তার কুঠা, তার ভাববৈপরীত্য, তার বিদ্রোহ বিদ্রোহের পরে অসুস্থতা, অসুস্থতায় পরে কের আত্ম-অর্পণ—তার পরে আবার সেই বিদ্রোহের পুনরুত্থান—এবং সবশেষে একটা কলঙ্কাক্ত শব্দ—এ-সব ব্যাপার এতই জটিল ও দুর্বলগাহ যে, ধর্ম্মশিক্ষার পক্ষেই সে কখনই সে-আবর্তকে কলঙ্কার বৃত্তে নিতে পারে

না। চাং পরশুই বলছিল আমাকে যে ও নিজে প্রথম ইস্যাকোকে  
বৃকতে শেখে : এঞ্জেলার প্রতি একটু আকৃষ্ট হওয়ার পরে। আর  
তাইতো ওদের আজ পুনর্মিলন একটু সহজ হ'য়ে এসেছে।”

অশ্বন বলল : “সে কি ? তবে কি চাংও—” ব'লেই থেমে গেল।

মসিরে বেনার একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন : “ঠিক তোমার মত  
‘অতটা নয়।’ ব'লে আর একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন : “তার একটা  
সুবিধে হ'য়ে গিয়েছিল—ওদের টানটা দেহের চৌকাটেই গিয়েছিল খেদ  
—নানা কারণে। তাই ওকে সে-ঘূর্ণির মধ্যে পড়তে হয়নি—না—”  
ব'লেই থেমে নিয়ে তাঁর অভ্যস্ত বিজ্ঞপী ভঙ্গিতে বললেন : “যে  
ভুক্তভোগী সেই জানে মনামি, যে, নরনারীর টানের শান্ত সমুদ্রে ঢলবে  
নিমেয়ে কী প্রলায় জেগে ওঠে ঐ একটুখানি দেহ-মলয়ের কল্যাণে !  
সত্যতার প্রসাদে আমাদের এমনি প্রকৃতিই গ'ড়ে উঠেছে যে, প্রেমের  
কেন্দ্রে আমরা সবকেই হতম করতে পারি—কেবল যদি প্রেমটা অর্থাৎ  
কিনা দত্তি প্রেমের কোঠার এসে না পড়ে। অর্থাৎ যদি উদ্ভট প্লেটনিক  
হয় তবে উদারতার সীমা থাকে না—”

দোরে হঠাৎ আঘাত।...

আনা।

তিনজনেই উঠে পাড়ায়।

• •

কী পাণ্ডুর যে দেখার ওকে!...অশ্বনের বৃক্কের মধ্যে কেমন ক'রে  
ওঠে।...আনার সঙ্গে হয় চোখোচোখি। ওর মুখে এক কলক রক্ত দীপ্ত  
হ'য়ে উঠেই নিভে যায়। অশ্বন চোখ কিলিয়ে নিতে যেতেই চোখে  
পড়ে লজ্জা একদৃষ্টে তারই দিকে চেরে। ওদের দৃষ্টি-বিনিময় হ'তেই

সে-ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। স্বপনের মনে হয় তার নিজের বুকে দু'টি আঁর রক্ত নেই : সবটুকু যেন ঘাড়ের পাশ দিয়ে...কানের পাশ দিয়ে...কপাল রেয়ে শির্ শির্ ক'রে মাথায় উঠছে।...এত তুচ্ছ ঘটনায় এত উত্তেজনা যে কেন আসে?...বললেই কি কেউ বিশ্বাস করবে?...বলবে গল্প—কল্পনা...। হারবে!—স্বপন ভাবে।

## তর্কালোচনা

আনা মসিয়ে বেনারকে ধবে কড়িয়ে। তিনি তার দুই গালে দুটি চুখন দিয়ে তার কটিবেষ্টন ক'রে বললেন : “Tu as bonne mine ma petite !” \*

—“হ্যা—আমার শরীর খুব সেরেছে।”

মসিয়ে বেনার অতর্কিতে প্রফুল্ল হ'য়ে ব'লে ফেললেন : “তা তো! সারবেই শেরি, বেড়াতে এসে রাতারাতি না হ'য়ে পড়লেও যদি শরীর না সারে তবে সারবে কিসে ?”

স্বপনের কণ্ঠস্থ দৈবৎ রক্তিনাভ চ'য়ে ওঠে। সন্ধ্যা ব্যালকনির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়—সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে। আনার গালে কপালে কে যেন ফাগ মাখিয়ে দিয়েছে...সে তাড়াতাড়ি বুকের বুকে মুখ লুকিয়ে বলে : “শু—শু।”

বৃদ্ধ কণ্ঠাটা ব'লেই তারি অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছিলেন। গতমত খেয়ে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে বললেন : “Pardon—Madame—c'est que” †

\* ফ্রান্সের চেহারা যে তারি ভালো দেখার লক্ষ্যী করে।

† কখন কোরো মাঝার—এই শুধু—

ব'লেই থেমে গেলেন। কমা চাণ্ডার বাপারটা কেমন যেন আরও ঘোরালা হ'য়ে ওঠে !...

সমস্ত বাপারটা যেন বিজুলির মতন নিমেষে থেলে যায়...এই একটা কথার মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রত্যেকেই ঘরের অপর করজনার অবস্থিকর উপস্থিতি সম্বন্ধে যেন পূর্ণভাবে সচেতন হ'য়ে ওঠে !...কী গুরুভার সচেতনতা সে ! ...একটা মার সহজ কথার অপেক্ষা—অথচ কারুর মুখ দিয়েই সেটা বেরোয় না !...

শেষটায় আনা মুখ তুলে যেন জোর ক'রেই বলে : “আনেং ভারি কীদছিল তাই আনতে পারলাম না—ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলাম।”

মসিয়ে ঘেনার একটু সহজ হুবে বলতে চেষ্টা করলেন : “বেশ করেছে।” কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে অপ্রতিভ বেসুখটুকুর রেশ এত স্পষ্ট হ'য়ে ধ্বনিত হয় !...

এবার সন্ধ্যা কথা কইল—আশ্চর্য্য রকম সহজ হুবে : “আনা, মসিয়ে কি বলছিলেন জানো ?—যে, সন্ধ্যাজাত শিশুর মতন কিছুতকিমাকার জীব নাকি এ-জগতে দুটি নেই এবং মেয়েরা একান্তভাবে মেয়ে ব'লেই নাকি এমন জীবকেও দেখে সুন্দর।”

আনা ঠোঁট ফুলিয়ে বলে : “এমন কুটি নইলে কি আর চিত্রকর হয় ? না, ফুলের মতন শিশু ছেড়ে যত অপদার্থ হোমরাও জোমরাওদেরকে স্বাকার ভূতের বোকা ব'য়ে ব'য়েই বেড়াতে হয় সারা জীবন ?”

মসিয়ে ঘেনার হেসে বললেন : “কিন্তু এ ঘোর অবিচার ! শিশু যে সুন্দর হ'তে পারে না এ কথা আমি বলিনি—আনি বলেছি সন্ধ্যাজাত শিশুর কথা—যখন তাঁর সঙ্গে একতাল থকথকে দপদপে লোল মাংসপিণ্ডের কোনো তকাংই থাকে না—”

আনা কুণ্ডিতস্বরে সজোরে ঘাড় নেড়ে বলল : “ককনো ও ভাবার

কথা বলতে দেব না শিশুদের সম্বন্ধে—তা ব'লে রাখছি। বার যে-বিষয়ে চোপ নেই, দরদ নেই তার আবার সে-বিষয়ে মন্ত-প্রকাশ করার বিড়ম্বনা কেন ?”

মসিয়ে বেনার হাসিমুখে বললেন : “এ যে একতরফা ডিক্রিয়ারি আনা। সম্ভোজাত শিশু দেখতে সুন্দর কি না সে-বিচারের ভার নেবে কি মা'র চোপ ?”

স্বপন বলল : “ঠিক কথা। এ-বিচারের সব চেয়ে যোগ্য লোক যদি কেউ এখানে থাকে তবে সে আমি।”

সন্ধ্যা বলল : “কথ'খনো না। আমি।”

স্বপন বলল : “কোন বৃত্তি বলে, মহাপাণী ?”

সন্ধ্যা বলল : “শিশু-সম্বন্ধে পুরুষদের রায় নামছুর ব'লে। শুধু সমালোচনার নিমারিক দৃষ্টি দিয়ে রসবস্তুকে কোনো দিনই কেউ বুঝতে পারেনি ব'লে।”

স্বপন বলল : “কিন্তু এর উত্তরে যদি বলি যে, শুধু সেটিমেটেও হয় উলটো উৎপত্তি—রসবস্তুর ভোগ হয়ে ওঠে ভাববিলাস ? কি বলেন মসিয়ে ?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “না—আমি এ-তর্কে সন্ধ্যার দিকে। অস্বস্তিঃ কৃতজ্ঞতা দেখাতেও হ'তে হয়।”

আনা বলল : “কৃতজ্ঞতা ? কিসের ?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “ও আমার খানিক-আগের প্রগল্ভতা নিজের আত্মকর্জ্বরের স্তম্বে সেরে নিল যেখেও এ-প্রশ্ন ?”

স্বপন হেসে বলল : “সন্ধ্যা, কানে আঙুল দাও, কানে আঙুল দাও—জানো তো আমাদের শাস্ত্রে বলে গরের নিন্দা, নিজের প্রশংসা কানে শোনা মহাপাপ।”



সন্ধ্যা বলল : “ঈশ—ভূতের মুখে রামনাম ! উনি পাড়েন শাস্ত্রের দোহাই !”

স্বপন হতাশ ভাবে বলল : “হায় রে—শাস্ত্র তো মানেনই না, তার উপর সতীর স্বামীকে অমানুষ অপবাদ ! ধরনী দ্বিধা হও ।”

সন্ধ্যা মসিয়ে বেনারের দিকে তাকিয়ে বলল : “দেখুন তো মসিমে, অজ্জায়টা একবার ! এত কাণ্ডের পরে কিনা আমার কাছ থেকে এ-আদর্শ হিন্দু পতিটি সতীপনা করছেন দাবি !”

আনা মুগ্ধা একটু আড় ক’রে বসে আলো থেকে । স্বপন বিপর্যাসিত হলে । মসিয়ে বেনার পর পর ত্রয়ীর মুখের পানে চেয়ে বললেন : “কথাটা তুমি মিথ্যা বলানি সন্ধ্যা । তবে কি জানো ? ইঞ্জিট স্পেন-টেনের মতন সাত সমুদ্র তের নদী পারের দেশে লাক দিয়ে পড়ে দুমুহু রাজকল্যাকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগাতে হ’লে তোমাদের মামুলি নিরীহ পতিপনা চলে কি ? বেচারির পরে অবিচার কোরো না—একটু দাঁড়াশ ছেড়ে ।”

কপাটা অত্যাশঙ্কিতার দিকে বেক নিতে সকলেই যেন আঁতরা পায় একটু ।

আনা মুখ ফিরিয়ে যথাসম্ভব প্রকৃমস্তুরে বলে : “খুব সত্যি কথা, বিশেষ স্বপন ভারত হ’ল এখনও—আ লা বৈদিক—আধ্যাত্মিক । লাকটা দিতে হয়েছে কোথাকি কোথাকি প্রায় তোমাদের সেই লঙ্কা-কাণ্ডকারীর মতন, না স্বপন ?”

স্বপন হেসে বলল : “কিন্তু তার চেয়েও প্রচণ্ড লাক দিতে চাচ্ছিলেন যে তোমার অভিভাবকটি স্বয়ং—আনা জানো কি ? চাচ্ছিলেন এনারোমেয়ে ক’রে আমাদের দেশে হ-শ্ ক’রে উড়ে যেতে ।”

বুঝ হলে বললেন : “আমার দোষ নেই কিন্তু সন্ধ্যা, একে খোঁজ

কর্তার নিমন্ত্রণ তার উপর কর্তার বাধ্যবাধ। শেখটার হয়তো সত্যিই দেব পাড়ি তোমাদের বালিগঞ্জের বাড়িতে।”

সন্ধ্যা হেসে বলল : “ভয় দেখাচ্ছেন কাকে মসিয়ে ? আমাদের দেশে একটা প্রবচন আছে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু—তুনে থাকবেন হয়তো। এমন মেয়ে আছে কি—যে পুরুষদের দিয়ে এস-তা ক’বে নিতে তার পায় ?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “মৃত্যুর কথা বলতে পারিনে সন্ধ্যা, তবে যদি পাপের কথা বলো তো তোমার মতন শ্রীমুখের একটি ডাকে সারা-জীবনের পুণ্য নিতে পারি ভলাগুলি।”

সন্ধ্যা হেসে বলল : “সত্যি পারেন ? তিন সত্যি ?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “পারি, কেবল একটি সন্তে।”

সন্ধ্যা বলল : “যথা ?”

—“যে, সে-শ্রীমুখের সিঁথেয় সিঁদ্ব থাকবে না। যে সব মেয়ে, সে সব চাইবেও তো—এইমাত্র বলছিলাম আমরা, না সেন ?”

স্বপন হেসে বলল : “কিন্তু কসু ক’রে তাই বলে অতটা করুস ক’রে তেলদেন না মসিয়ে। কারণ প্রথমতঃ সীমস্তিনীদের নোঙ্কর থাকার দক্ষণ বিপদ একটু কম। দ্বিতীয়, অ-সীমস্তিনীদের সঙ্গে প্রেমলাপ করা যত সহজ ঠাসাঠাসি ঘরকরা করা ঠিক ততটা নিরাপদ না হ’তেও পারে মনে রাখবেন। তাই আমেরিকায়ই যান বৎ। তুচ্ছভোগীর কথা শুধুন।”

মসিয়ে বেনার একবার উত্তর দেবার আগেই আনা বলল : “আমেরিকায় যাচ্ছেন না কি মসিয়ে ? কই, আমায় তো কিছু বলেননি ?”

—“আরে, বলবার কুসৎ পেলাম কই ?”

—“যাচ্ছেন কবে ?”

মসিয়ে বেনার আনার দাল টিপে দিয়ে বললেন : “দ্বিহ্ন এখনো

করিনি—তবে খোঁজ-খবর নেওয়া শুরু করেছি সবে দিন দুই।” বৎ একটু থেমে প্রকৃত সুরে বললেন : “তুমি আসবার একটু আগেই আমারে এ-বিষয়ে কথা হচ্ছিল। একবার যাবে আমেরিকায় আনা? আন এইমাত্র বলাবলি করছিলাম যে তুমি এলেই এ-বিষয়ে একটা খোঁজাখুঁজ আলোচনা ক’রে যথাকর্তব্য স্থির করা যাবে। সন্ধ্যাও তাই চায় কি বলো?” অনার মুখে ঈষৎ রক্তাভা দেখা দিল, কিন্তু সে আর সংবরণ ক’রে বেশ সহজ সুরেই বলল : “আমারও ইচ্ছা খোঁজাখুঁজ কথাবার্তা কওয়ার—কেবল—” ব’লে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বলল “বদি—”

সন্ধ্যা ঈষৎ আহত সুরে বলল : “তোমাদের সকলেরই দেখা ভাবনা হয়েছে আমাদের নিয়ে। যেন সকলেই এ-বিষয়ে খোঁজাখুঁজ আলোচনা করতে সক্ষম—এক দুর্বল আমি ছাড়া। কাজ নেই তোমাদের অত সঙ্কোচের। আমি না থাকলে যদি তোমাদের খোঁজাখুঁজ আলোচনা একটুও সহজ হয় তবে আমি আর তোমাদের বাধা হ’য়ে থাকব না একুনি আমি যাচ্ছি—তোমরা খুব স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা ক’য়ে চালাও হও।” ব’লেই উঠে পাড়ায়।

মসিয়ার বেনার খপ্ ক’রে এক হাতে ওর একটা হাত চেপে ধ’রে টেবিলের কাছে এনেই অপর হাতে তার কটিবেষ্টন ক’রে বললেন “তোমাকে কী যে ঠিক বলব সন্ধ্যা, ঠাউরেই উঠতে পাচ্ছি না, সত্যি।—যদিও বুঝতে পারছি—কেন—” ব’লেই হেসে : “বোসো শেরি, একটা ঠাণ্ডা হ’য়ে আলোচনা করি এম্মা না কেন—এই সোফাটাতে শুধু আমরা দোহে। বলো তো, আর সবাইকে বলি বেরিয়ে যেতে?”

সন্ধ্যা বলল। বৃদ্ধ তার মাথার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন “আচ্ছা ক্রমাগত এক-কথা তোমার মনে হচ্ছে কেন বলো তো যে, তোমাদের

আমরা এড়াতে চাচ্ছি, বা অবশ্য হুর্দল মনে করছি, বা ওয়ানিতর একটা কিছু? বিশ্বাস কোরো শেরি, আমরা বুঝি যে, আমাদের সকোচে তোমার মনে আঘাত লাগাটা অস্বাভাবিক নয়—কিন্তু তুমিও একটু বুঝলেই বা—আমাদের সকোচটা আসে কেন—তা সবেও?”

সন্ধ্যা সান্ত্বিনানে বলল : “কেন যে আসে আপনাবাই জানেন।”

মসিয়ে বেনার স্নেহমিশ্র স্বরে বললেন : “শুধু আমরাই না, আমাদের দিক থেকে একটু দেখবার চেষ্টা করলে তুমিও জানতে, দেখতে পেতে স্পষ্ট।”

—“কী?”

—“যে, এ-সব বিষয়ে খোলাখুলি কপাবাস্তা কওয়াটা খিওরিতে যত সহজ কাজে তত নয়।”

এ-নরম স্বরে সন্ধ্যার চড়া স্বর একটু ষাদে নেমে এল : “কিন্তু এতই কী শক্ত?”

মসিয়ে বেনার মুহূর্তে হেসে বললেন : “সন্ধ্যা, অস্বস্তি একটা জিনিষ হয়তো তুমি মানবে : যে, আমি জীবনে তোমার চেয়ে একটু বেশি দেখেছি। জ্ঞানের দোহাই পাড়ছি না—পক্ষীটি, উপদেষ্টা ভেবে না আমাকে—কিন্তু শুধু বয়সেও কিছু বুঝবার গমতা তো হয়। মানো কি? না, এটাও অগ্রাহ?”

সন্ধ্যা একটু হেসে বলল : “কী যে বলেন! আমি কি বলছি যে আমার অভিজ্ঞতা আর আপনার—”

বুদ্ধ বাধা দিয়ে বললেন : “তা হ’লে আমার অভিজ্ঞতার এই একজাহারটি একটু মন দিয়ে শোনো অস্বস্তি : যে, সাহসিক হ’তে চাওয়াটা কল্পনার ‘বরে’ যতটা সহজ বাইরের ‘কল্পায়’ ঠিক ততটা সুসাধ্য নয়।”

সন্ধ্যা বলে : “এর সমর্থ তো এই যে, আমি এ-বিষয়ে খোলাখুলি কথাবার্তা কইতে চাচ্ছি নিছক ঝোঁকের মাথায়—না বুঝে ?”

মসিয়ে বেনার সন্ধ্যার গালে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন : “একটু ঠাণ্ডা হ’য়ে ভেবে দেখ তো। নিছক ঝোঁক না হ’লেও ঝোঁক কি এর মধ্যে একটুও নেই—রাগ কোরো না—আমি তোমার জেবা করছি না—”

সন্ধ্যা বাধা দিয়ে বলল : “তা জানি, কিন্তু ঝোঁকটা কি সত্যিই এত খারাপ জিনিষ সব সময়ে ?”

—“সব সময়ে কে বলছে ?—কে না জানে বলো যে ঝোঁক বা আবেগ দিয়ে এমন অনেক অসাধা-সাধন করিয়ে নেওয়া যায়—ঠাণ্ডা রক্তের বুদ্ধিতর্ক যার নাগাল পেতেই পারে না। কিন্তু একটা জীবনের পথ-নির্দেশে কি তা বলে ঝোঁককেই দিশারী বলে মেনে চলে কেউ—না, চলা উচিত ?”

সন্ধ্যা বলল : “তা কেউ বলে না। কিন্তু—না—থাক”।

—“কী ? থামলে যে ?”

—“প্রস্তুত করতে পারি যদি কিছু মনে করবেন না কথা দেন।”

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন : “মনে-করা-কটির মতন রোমাটিক গরম রক্ত এখনো কি আর আছে শেরি ?”

সন্ধ্যা বলল : “আচ্ছা, তা হ’লে বলি।—বলুন তো আপনার সঙ্কোচ কি বাস্তবিক এইজন্মেই নয় যে, আমি যুরোপীয় মেয়ে নই ?”

মসিয়ে বেনার ঈষৎ গম্ভীর হ’য়ে বললেন : “এবার কিন্তু আমাদের শরে একটু অবিচার হচ্ছে সন্ধ্যা। তুমি যুরোপীয় নও ব’লেই যে তোমার ঘরের জোর সঙ্কোচ সংশয় প্রকাশ করব এরকম আত্মসত্তার chauviniste আমাকে মনে করলে কেন ?”

দক্ষা উদ্ধর দিল না। মসিয়ে বেনার তার উত্তরের জন্তে ঊষং অপেক্ষা  
 রে হাসি মুখেই বললেন : “এটা ফরাসী কমপ্লিমেন্ট হিসেবে বলা নয়  
 বি, যে এরই মধ্যে তোমার সতেজ মনটির যে-পরিচয় পেয়েছি তাতে  
 মোর সন্দয়ের একটা নীরব তার উঠেছে বেজে। তোমার সঙ্গে  
 চারটে মাত্র কথাবার্তা ব’লেই আনার মনে হয়েছে যে তুমি হুক সেই  
 বীর আলাপিনী যারা মুহূর্তের আলাপে অচেনাকে নিতে পারে চিনে,  
 হুক করতে পারে আপন। নইলে ভেবে দেখ না কেন, মাত্র আনিক-  
 ণের আলাপে কি তুমিই আমার সঙ্গে এতটা আত্মীয়ের মতন কোর জুলুম  
 বতে পারতে? না, আনিই তোমাকে এ-হেন বিজ্ঞের মতন উপদেশ  
 দে ব’সে যেতাম?” ব’লে তার দুটি হাতট নিজের কোলের মধ্যে টেনে  
 থর বললেন : “কিন্তু কিছু মনে কোরো না শেরি, এখানে ব্যাপারটা যে  
 দু-একটু বটীন তাই নয়—আমকা কথাবার্তায় পরস্পরের মনে আঘাত  
 দে সতীন হ’য়ে ওঠাও বিচিত্র নয় : ইংরাজিতে Treading on  
 dangerous ground ব’লে একটা কথা বলে জানো তো?”

দক্ষা আরও নরম স্বরে বলল : “আমি হয়তো কোন্‌ভাবে একটু উদ্ভা-  
 কাশ ক’রে ফেলেছি মসিয়ে ; কিন্তু, ক্ষমা করবেন, আমার মনে হয়  
 দুজনেই কথাটাই সব চেয়ে ডেঞ্জারাস : নিরীহ জিনিষকেও ওর মস্ত  
 ণে তোলে সতীন। ঠিক তেমনি ক্রমাগত মেয়েদের আঘাত থেকে  
 চানোর এই উৎকণ্ঠার বেলায়ও। বারবার মেয়েদের যদি শোনান,—  
 —ওগো তোমরা কুলের পাপড়ি দিয়ে গড়া—তা হ’লে একটু ধূলোর ফুঁয়েও  
 বেই যে সে শুকিয়ে।”

মসিয়ে বেনার স্বপনের দিকে অর্থব্যস্তক ভাবে তাকিয়ে বললেন :  
 দেখেছ সেন, সেই তোমার ও আনার তর্ক? কিন্তু এ-থেকে  
 একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার বিষয় : যে, আজকালকার মেয়েরা

কোমল হওয়াটাকে ভারি দুঃ মনে করা শুরু করেছে ম দেশেই, নয় ?”

সন্ধ্যা তৎক্ষণাৎ বলল : “কোমল হ’লে তো আপত্তি নেই, মাগি মোমের পুতুল হওয়ায়।”

স্বপন বলল : “তুমি মসিয়ে বেনারের ওপর এবার অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর করছ সন্ধ্যা। কেন তুমি এমন কথা স্বতঃসিদ্ধের মতন ধ’রে নেবে যে তোমাকে উনি বাঁচাতে চেয়েছেন মেয়েরা মোমের পুতুল ব’লেই? এক কি হ’তে পারে না যে, তুমি এতে আঘাত পেতে পারো—হেনসন যোগাযোগে যার উপর আমাদের কোনো হাতই নেই?”

আনা বলল : “একথা ঠিক, সন্ধ্যা। কারণ মেয়েরা ঠুনকো ঐ যদি উনি ভাবতেন তবে আমার সঙ্গেই বা খোলাখুলি আলোচনা করে চাইবেন কেন বলা দেখি?”

সন্ধ্যা বলল : “ঐখানেই তো আমার ক্ষোভ।”

আনা বলল : “কিন্তু ক্ষোভ কেন? বুঝতে কি পারো না যে তোমার ও আমার মধ্যে একটু তফাৎ করছেন উনি?”

—“পারি : তুমি এদেশের মেয়ে, আমি ওদেশের।”

স্বপন বলল : “না।”

—“তবে?” সন্ধ্যার স্বরে রোখ ফুটে ওঠে।

স্বপন একটু চুপ ক’রে থেকে বলল : “তুমি আমার স্ত্রী ব’লে।”

সন্ধ্যা রোখকে একটু নরম ক’রে নিয়ে বলল : “আমার চোনের দিকে যদি একটু উয়া প্রকাশ হ’য়ে গিয়ে থাকে তবে আমি মসিয়ে কোনো কাছে কমা চাইছি—কিন্তু সেই সঙ্গে আমি বলতে বাধ্য যে, তোমার যে স্ক্রুটিটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। কারণ আমি কারুর স্ত্রী কি না সেটা খোলাখুলি আলোচনার ক্ষেত্রে একটু অবাস্তব নয় কি?”

দ্বন্দ্বন বলল : “মোটাই না।”

—“কেন ?”

—“সেটা... একটু... মানে কুক না হ'য়ে শাস্ত মনে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে।”

সন্ধ্যা আবার ঈষৎ কুক করে বলল : “ঐ তো! ঐ জন্তাই তো আমি কুক বোধ করি। আবার থেকে আমাদেরকে এ-ভাবে ক্রমাগত বাচিয়ে বাচিয়ে কথা বলতে গেলেই যে আমাদের সব চেয়ে বেশি বাজে একথাটা তোমরা কেন বুঝবে না?”

এবার মসিয়ে বেনার কথা কইলেন : “এটা আমরা বে বুঝি না তা নয়, সন্ধ্যা। তবে কি জানো? তোমাকে এ-আলোচনা থেকে বাদ দিতে চেয়েছিলাম এইজন্তে যে, তুমি বতই কেন না ভরসা দাও—এ-ধরনের আলোচনায় ঐ সেন বা বলল—আবার আসে অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। আর সে-সব আবারের প্রকৃতি এমন যে, তাতে ক'রে কোভ বাড়ছে বৈ কমে না। শুধু তাই নয়, হয়তো সহজভাবে এ-আলোচনা করতে গিয়ে আমরা—অন্যতঃ আমি—মুখ ফসকে এমন কথা ব'লে ফেলব যাতে ক'রে তুমি নিজেকে অসম্মানিত বোধ করতেও পার। আমাকে জানো না তো? আমি মরালিটি বিবাহ প্রকৃতি কিছুই মানি না।”

সন্ধ্যা বলল : “তা হ'লে আনাকেও তো আপনাদের বাদ দেওয়া উচিত?”

মসিয়ে বেনার একটু চুপ ক'রে থেকে দীর্ঘ করে বললেন : “না। প্রথম কারণ, আনা আমাকে জানে। দ্বিতীয় কারণ, আনা—অর্থাৎ সেনের মানে—ঠিক ব্রী তো নয়।”

সন্ধ্যা ঈষৎ লাল হ'য়ে উঠল, কিন্তু আত্মসংবরণ ক'রে বলল : “তাতে কি! আনা মুখ নিচু করল। মসিয়ে বেনার তার দিকে চকিতে



দৃষ্টিপাত ক'রে তার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে সজ্জার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন : “তুধু এই যে, যে-আলোচনায় তোমার সম্মানে আঘাত লাগতে পারে সে-আলোচনার অসম্মান বা ইঙ্গিত ওকে স্পর্শও করবে না। আমাদের পদবীর সম্মান যে কত স্পর্শকাতর, শেরি, তা আমরা অনেক সময়েই খুব সজাগভাবে উপলব্ধি করি না, একথা হয়তো পরে বুঝবে একদিন।”

সজ্জা এ উদ্ভূত আশা করেনি। তবু সে ঘাড় বেকিয়ে রোখালো হারে বলল : “কিছু তা কেন? অসম্মান তো সর্বত্রই অসম্মান?”

স্বপন বলল : “এ-তুচ্ছ ব্যাপারটা নিয়ে তুমি কেন এমন গোঁ ধ'রে তর্ক করছ সজ্জা? এ সাদা কথাটাও কেন তোমার মাথায় ঢুকছে না যে, আমাদের সামাজিক পারিপার্শ্বিকের প্রভাব আমাদের মনের উপর খুবই বেশি?”

স্বপনের আকস্মিক প্রতিবাদের মধ্যে ঈষৎ উদ্বার আমেজ ছিল। সজ্জার মুখচোখ বাড়া হ'য়ে ওঠে মুহূর্তের ভেত্রে। কিন্তু সে আত্মসংবরণ ক'রে বলল : “তাতে প্রমাণ হ'ল কি?”

স্বপন বলল : “এই যে, নানা প্রভাবে গ'ড়ে ওঠা মনের রূপক জালা, গতিভঙ্গিও বিচিত্র। তাই একই আচরণকে নানা লোক নানা ভাবে গ্রহণ ক'রে থাকে। কাজেই একের কাছে যা গোরব অপরের কাছে তাই হ'তে পারে অপমান।”

মসিয়ে বেনার বললেন : “সেন ভুল বলেনি সজ্জা, এবং এটা এতই জানা কথা যে, প্রায় প্র্যাটিটিউডের কোঠায় পড়ে। তবু তুমি তর্ক করছ ধ'লে খুব একটা চল্টি দৃষ্টান্তই দেই। ধরো, কোনো বল-ডান্ডে গেছ তুমি সেখানকার নিয়ম-কানুন না জেনে। একজন অচেনা বৃক এসে তোমাকে বলল : আহুন না আমার সঙ্গে একটা নাচ নাচতে। তুমি

মুখে যা-ই বলো না কেন মনে মনে হয়তো এ-নিমন্ত্রণকে নেকনজরে দেখতে পারবে না কিছুতেই ; কিন্তু আনা আশ্চর্য্য হবে : তুমি এমন জুলী বুকের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে কেমন ক'রে ! অবশ্য এটা একটু বেশি দুল দৃষ্টান্ত হ'ল হয়তো, তবু এ-থেকেও বুঝবে আশা করি—কী বলতে চাইছি আমি ।”

সন্ধ্যা একটু চুপ ক'রে বইল, পরে মসিয়ে বেনারের দিকে তাকিয়ে বলল : “আমাকে কমা করবেন মসিয়ে । ছেলেবেলা থেকে তর্ক ক'রে ক'রে ঐ আমার এক ভারি দোষ জন্মে গেছে—দুল করলেও তা স্বীকার করতে যেন মাথা ধায় কাটা । কলে গুটিপোকার মতন অনবরত তর্কের তরু বুনতে বুনতে শেবটায় সে আমার গুটিতে নিজেই পড়ি আটকে ।” ব'লে একটু হেসে বলল : “তখন কেবল এই একটিমাত্র সাধনা পাকে যে, এ-গুটির বাধন আমার নিজেবই রচিত ।”

আনা বলল : “এ সামান্য তর্কাতর্কির জগে এত সাঁকাই পাওয়ার তাই ব'লে দরকার নেই সন্ধ্যা ।”

মসিয়ে বেনার খ্রীতপুরে বললেন : “সত্যি । তা ছাড়া উপস্থিত ক্ষেত্রে তুমি যে সব সময়ে ওজন ক'রে কথা কইবে এতটা আমরা কেউই আশা করতে পারি না শেরি ।” ব'লে একটু হেসে বললেন : “কিন্তু দেখছ তো, ত্রিক এইজন্মেই যে এ-বিষয় তোমার সঙ্গে খোলাগুলি আলোচনা করার পথে এত বাধা ।”

সন্ধ্যা ঈষৎ লজ্জিত হুয়ে বলল : “আমি কথা দিছি মসিয়ে যে, এ-রকম বাধাকে আর প্রেরণ দেব না ।”

—“কিন্তু এ তুমি একটা ভারি কাঁচা কথা ব'লে ফেললে সন্ধ্যা । এ-সব ব্যাপার কি তোমার সচেতন মনের সৃষ্টি যে, সতর্ক থেকে তুমি নিবৃত্ত্য পাবে ? তোমাদের রানারগেই আছে না, যে তাদের সব ক্ষেত্রে সৃষ্টি করতেন সেই

তীরন্দাজটির সঙ্গে যুদ্ধ করতে যে মেঘের আড়াল থেকে বাণ ছুঁড়ত আমাদের আবেগ জগতের দাবি-দাওয়া অতৃপ্ত কামনা-বাসনা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্তি বারালো বাণগুলি আসে তো আমাদের চেতন মনের মর্জারায় থেকে নয় শেরি, আসে ঐ অবচেতনের পাতাল রাজ্য থেকেই যে এড়িয়ে চলব বললেই কি সে অদৃশ্য তুণের অবাধ্য শরজাল শোনে ?”

সন্ধ্যা একটু চুপ ক’রে থেকে বলল : “প্রগল্ভতা ক্ষমা করবে মসিয়ে, কিন্তু অবচেতনের গুণগান নিত্য নিয়ত শোনা-সব্ধেও আমি কি জানি কেন কেবলই মনে হয় যে, আজকালকার যুগে চেতন জগতের একটু বেশি খাটো ক’রে ধরার একটা ধূয়ো উঠেছে। আর সে ধূয়ো এত বেশি জয়-জয়কার শুরু হয়েছে সেটা হালের ফ্যাশন ব’লে। কা এর মোহে এই সাদা সত্যটা আমরা প্রায় ভুলে যাবার জো হয়েছি যে চেতনের যত ফ্রন্টাই থাকুক না কেন আমাদের সমাজের শান্তিরক্ষকও সে বিচারকতাও সে।”

মসিয়ে বেনার বললেন : “আমি চেতন জগতকে ছোট ক’রে দেখতে চাইনি সন্ধ্যা। একথাও আমি অস্বীকার করিনি যে অবচেতন রাজ্য এখনো আমাদের কাছে প্রায় পাতালপুরীর মতনই অজানা। কাজেই খুব বেশি কাজে লাগাতে শিখিনি ওকে আমরা। কিন্তু ত একথাটা বোঝ হয় সবাই লক্ষ্য করেছে যে সব সমস্তারই মূল খুঁজতে এই ছায়াবাজোরই অন্তর মহলে হাতড়ে হাতড়ে যদিও তার রূপ রূপকরা প্রকান্ত দল মেলে আলোরই সদর বাগানে।”

আনা বলল : “তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে, চেতন জগতের সমস্তা তত গভীর নয়—এই তো ?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “ঠিক তা-ও নয়। কারণ চেতন রাজ্যের চৌহদ্দির মধ্যেও যে-সব সমস্তা খাড়া হ’য়ে রয়েছে তাদের নিশ্চয়ই বিন

সমাজ হয় অচল। অপরদিকে অবচেতনের একটু দিশা না পেলেও দেখি হোকব খেতে খেতে গ্রাণ হয় গুঠাগত।”

আনা বলল : “কথাটা বড় ঝাপসা লাগল মসিরে। ঠিক কী বলতে চাইছেন আপনি ?”

মসিরে বেনার বললেন : “কিন্তু মুষ্টিগই যে ঐখানে আনা। মাহু জলের মধ্যে দেখে পরিষ্কার, আমরা দেখি ঝাপসা। চেতনার ইন্দ্রিয় দিয়ে তর তর ক’রে অবচেতনের গহ্বর—” বলেই থেমে বললেন : “কি জানেন ? নিজেকে একটু বিচ্ছিন্ন করতে হয় আগে এই বহিষ্কৃতনার কাজ থেকে। ডুব দিতে হয়।—এই কথাটাই কয়েকদিন আগে চাং বলেছিল আমাদের বড় হুন্দর ক’রে।”

বপন সা গ্রহে গিজাসা করল : “কী বলেছিল ?”

—“বলেছিল যে, তার যুরোপে এসে অবধি কেবল কেবলই মনে হয় লাওংসের সেই কথাটা যে, আমরা জীবনের চকল স্নোত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন না করলে তাকে ঠিক মতন দেখতে শিখি না। আর এই আশেখার ফলে বাইরের ফেনা বুদ্ধ কলরবের বিক্ষোভকেই মনে করি জীবনের ধারার স্বরূপ—নিজ মূর্তি। বলেছিল : মসিরে, জীবনে আমরা থাকে ক্রমাগত ঠেলে ঠেলে দেই সে শেষটায় অন্ত ব্যয়ট—অভিমনে। তাই এসব বুদ্ধ ফেনার অন্তলে প্রবহমান শাস্তিধারা শেষটায় ব্যয় লুকায় ! আর তখন আমরা ব্যক ফোটে বলি শাস্তি তৃপ্তি এসব হ’ল কবি কল্পনা—আকাশকুশুম।”

আনা হেসে বলল : “কিন্তু চাংয়ের পাল্লার প’ড়ে আপনার হ’ল কি বলুন তো ? আপনার নিজের বাক্য ফিলসফিও যে প্রায় সোজা হ’লে আকার বোগাড় !”

মসিরে বেনার জীবৎ রান হেসে বললেন : “আনা, তোমার সোব

নেই। চাঙের কথাই সত্যি। আমারও জীবনে বার বার এসেছিল—  
এখনও কখনো কখনো আসে—একটা ক্ষণিক চেতনার ডাক। কিন্তু  
আমি ঐ অবিখ্যাসের যুক্তিবাদের মোহে তাদের ক্রমাগতই দিগ্বেশি  
ঠেলে। তাই তারা গেল মিলিয়ে... আমার এই বিজ্ঞাপী রূপই হ'য়ে  
রইল আমার নামাবলী।”

আনা অস্থতপ্ত স্বরে বলল : “আমি কিছু ভেবে—”

বুদ্ধ প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন : “তোমার কোনো ক্রটিই হয়নি আনা।  
কারণ আমরা যেক্ষেপে ক্রমাগত পরিচিত হ'তে চাই শেষটায় সে-পরিচিতি  
রটলে দুঃখ পাওয়া অসম্ভব।... অথচ তবু এমনিই আমাদের মন যে  
দুঃখ হয়ই একটু।”

সজ্জা বলল : “কিন্তু হয় কেন?”

—“বলা শব্দ; তবে একটা কারণ হয়তো এই যে, আমাদের মনের  
গোপন স্তরে একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে নিহিত—যে লোকে আমাদেরকে  
বুঝুক—চিন্তুক—জানুক। এটা আমাদের আত্মাদরের একটা অভাব—  
need—দাবি; কাজেই যেক্ষেপটা আমাদের ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে ভেদে  
ওঠে তার দামেই আমাদের বাচাই হ'লে অতল মনটার কোথায় যেন  
গুন্ডরে গুন্ডরে ওঠে।”

ব'লেই স্বপ্নের দিকে চেয়ে হেসে বললেন : “আমার মুখে আজ  
এ ধরণের উদাসী কথা শুনে মনে হচ্ছে : ‘বুড়োর হ'ল কি আজ?’  
না?”

স্বপ্নন কুণ্ঠিত স্বরে বলল : “না মসিরে—”

মসিরে বেনার বাধা দিয়ে বললেন : “কিন্তু অত কুণ্ঠা কেন মনানি?  
হ'লে খুব অস্বাভাবিক তো হবে না। কারণ আমারও মধ্যে যে একটা গভীর  
মিস্টিক আকাঙ্ক্ষা আছে এটা আমি বরাবর লুকিয়েই এসেছি, কাজেই

হঠাৎ সে-রূপটি প্রকট হ'য়ে পড়লে তোমাদের আশ্চর্য লাগাই তো স্বাভাবিক।" ব'লে চিন্তাবিষ্ট হ'য়ে বললেন : "কিন্তু কি জানো ? আজকে আমার এ-রূপটি প্রকাশ হ'য়ে পড়ত না হয়তো—বদি না সস্ত্রীতি চাং ও ইলাবেলা আমাকে এতটা নাড়া দিত। তা ছাড়া কাল তোমার ঐ কথাটাও আমাকে তারি স্পর্শ করেছে—জানি না কেন—যে, আমাদের কুলপরিণতি কখন যে কোন্ বক্ষ্যা পথ বেয়ে আসে কে বলতে পারে ?"

স্বপন চূপ ক'রে রইল। মসিয়ে বেনার ব'লে চললেন : "এক-একটা দৃশ্যতঃ সামান্য কথাও আমাদের অসম্ভব নাড়া দেয়, নয় ? কিন্তু নিউটনের সামনে আপেল পড়ার মতন ও-কথাগুলো আসে নৈমিত্তিক হ'য়েই—উপলক্ষের মতন যেন। নইলে কি আর আপেল পড়ার দৃষ্টেই সত্যি সত্যি কারুর মনে গতি-তত্ত্বের বিপ্লব ছেগে উঠতে পারত ? কত রকম চাপে প'ড়ে মনটা উগ্ৰুথ থাকে একটা বিশেষ দোলা পেতে—দোলাটা আসে ফুলিঙ্গ হ'য়ে—ঘটে লঙ্কাকাণ্ড।"

আনা হেসে বলল : "কিন্তু আপনার মনে এত রকম তাপ যে জ্ব'নে উঠছিল কই বলেননি—বা লেখেননি তো ভুলেও ?"

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন : "সব কথা কি বলা যায় শেরি ? না, বললে তার মর্যাদা থাকে ? তা ছাড়া—" ব'লে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন : "ধরো যদি বলি যে সক্ষ্যা আসার খবর পাওয়ার পর হু-দুটো রাত আমার এক পলকও ঘুম হয়নি তোমাদের জয়ীর সন্তট কল্পনা ক'রে—তা হ'লে কতটুকুই বা বলা হবে ? অথচ...তবু আমরা...না ব'লেই বা পারি কই ?..."

স্বপন ও আনা মুখ নিচু করল। একা সক্ষ্যা চেয়ে রইল তাঁর দিকে একজুটে। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টির পিছনে সখিৎ ছিল না—মন ছিল যে কোথায় উধাও...

মসিহে বেনার বললেন : “খোলাখুলিই সব বলব সন্ধ্যা এবার—  
বিশ্বাস করতে পারো তুমি। কুষ্ঠা সঙ্কোচ ক’রে তোমাকে আবাত করব  
না আর।”

সন্ধ্যা মুখ নিচু ক’রে বলল : “আমি শুনছি।”

মসিহে বেনার বলতে লাগলেন : “তোমাদের তিন জনার সমস্তার  
কী সমাধান যে হ’তে পারে সত্যিই না যুমিয়ে ভেবেছি ক’দিন।...  
কত কথাই যে মনে হয়েছে ভাবতে ভাবতে...কত বিচিত্র স্তর মিড়  
ইকিত্তই যে ছায়ানৃত্যের মতন পর পর খেলে গেছে আমার স্মৃতিপটে...”

কেউই কথা কইল না। বৃদ্ধ পাইপে দীর্ঘ টান দিয়ে বললেন :  
“শোনো একটা রাতের কথা বলি—যখন উঠলই এ-প্রসঙ্গ।”

সকলেই রইল উৎসুক মেত্রে চেয়ে।...

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন : “মাত্র কয়েকদিন আগে চাঁড়ের সঙ্গে এই  
নিরেট-শুয়েছিল আমার বড় গভীর অলাপ...যে-রকম আলাপ জীবনে  
পূর্ব বেশি হয় না মাসুখে মাসুখে।” ঘরের মধ্যে উজ্জল নৈশক ঘাঘ  
বিছিয়ে।...

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন : “সেদিন চাঁড়ের অস্ত্রখেরও সঙ্কট অবস্থা :  
হাটের অবস্থা এত দুর্বল যে, ডাক্তার ভয় পেয়েছিলেন—হঠাৎ বন্ধ হ’য়ে  
যায় বৃত্তি বা। মন এমনিতেই খারাপ ছিল আমার...তার ওপর...”

“ওর শিরে সন্ধ্যাবেলা বসতেই ও ধরে ফেলে। কী সুন্দর করুণ  
হাসি হাসে! বলে : ‘কেমন এত ভাবছেন? কী আসে যায়?’...  
তার পর সে কত কথা!...ও অনর্গল ব’লে যায় ওর জীবনের মানা  
কাহিনী। শেষে বলল : ‘শুনে রাখুন—করতো ইলা জিজ্ঞাসা করবে,  
কি কখনো দেখা হয়...বলবেন তাকে—যদি—যখন আমি থাকব না আর  
এ-জগতে।’ আমি চুপ ক’রে রইলাম।...ওর কথাগুলির মধ্যে কুটে

উঠেছিল সে এক নতুন রেশ। যেন ওর কণ্ঠস্বরই নয়। বোধ হয় এ গভীর কন্ডোল আমাদের কণ্ঠস্বরে কুটে ওঠে এক মৃত্যুরই অদৃষ্ট বন্ধারে। জীবনের স্বাস্থ্যের উজ্জল আলোর এ-স্বরকে মনে হয় যেন...কী বলব?... ছায়াবাজি কাব্য-বিস্তাস। কেন যে এমন মনে হয় আগর মৃত্যুর প্রদোষ-আলোয় !”

স্বপন মুহুর্তে বলে : “হয়তো একটা নতুন চেতনার আভাষ পাই ব’লে ?”

—“আশ্চর্য্য ! এই কথাটা চাঃও আমার সেদিন বলেছিল মনে প’ড়ে গেল।” ব’লেই আনার পানে চেয়ে বললেন : “তোমার মনে হয় না আনা যে, চীন ও ভারতের ভাবধারায় কোথায় একটা মিল আছে— তাই ওরা যে-ভাবে পরস্পরকে চেনে আমরা সে-ভাবে ওদের চিনি না ?”

আনা বলল : “হয়। কতবারই যে স্বপনের মুখে চাণ্ডের নানা কথা শুনতে শুনতে মনে হয়েছে—চীনদেশের জীবনভঙ্গি বা জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিকে ও অত্র স্থলর ক’রে কখনই ফোটাতে পারত না—যদি ওর নিজের দৃষ্টি-ভঙ্গির সঙ্গে তার কোনও গুঁচ মিল বা যোগস্বর না থাকত। কিন্তু সেদিন কী সব কথা হ’ল চাণ্ডের সঙ্গে বলুন না।”

—“বলি”—ব’লে বৃদ্ধ ঋণিকজ্ঞ অশ্রুমনস্বতাবে পাইপ টানতে টানতে যেন ওদের উপস্থিতিই গেলেন তুলে। তারপর হঠাৎ যেন আপন মনেই তাঁর স্মৃতি উঠল কথা ক’রে : “সেদিন বাইরে অশান্তি কড়। ওর হার্টের অবস্থা খুবই মিশ্লেজ—তার ওপর রক্ত বিষিয়ে ওঠায় সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এক কথায় ক্রাইসিস যাকে বলে। আর ঠিক কি সেই রাত্তিই প্রকৃতির বুক জুড়ে উঠেছিল যেন সে সবটের প্রতিধ্বনি ! সে কী বড়-বড়ির রোল, গাছপালার উন্নত উজ্জ্বল, বিহ্বলতার চোখরাঙানি !... আর সব ছাপিয়ে একটা উদাসী বীর্ঘবাসি—বুক-পেকে-গুঠা—ঠিক যেন



মানুষের!...সেই পটভূমিকায় ওর কথাগুলি শোনাতে তো পারব না—” বলতে বলতে তাঁর মুখে ফুটে উঠল স্নান হাসি, বললেন : “তবুও বলি।” ব’লে একটু থেমে পাইপ টানতে লাগলেন। পরে আনার পানে চেয়ে বললেন : “চাংকে ওর কাহিনী শেষ হওয়ার পরে বলি আমি তোমাদের তিন জনের কথা। শেষে প্রস্তাব করি : কেনই বা এ-ধরণের জটিলতা আনে ব্যর্থতাই বহন ক’রে—যা জীবনের উৎসবালোককে চিরদিনের মতন ধানিকটা নিস্ত্রাভ ক’রে দিয়ে যায়? ও স্নান হাসল। বলল : ‘মসিয়ে, বাইরে ঐ অশ্রান্ত বিদ্যুৎ ঝিলিক মেয়ে উঠছে—হু—হু ক’রে বাতাস উঠছে গুম্বে গুম্বে। ঐ দেখুন, আপনার বাগানের সাম্নেকার আর্ক-ল্যাম্পটারও চোখ বেন সে বাপ্পে এসেছে কাপ্লা হ’য়ে। ঐ শুধুন পাতায় পাতায় লে-কাঁপনে তাল দিচ্ছে বৃষ্টির অশ্রুপূর।...মনে হয় না কি আপনার যে, প্রকৃতির এ আর-একটা চেতনা—আর-একটা ছন্দ? এই যে কান্নার রেশ, কাতরানির গমক মনে হয় না কি যে এটা নিরাশার নয়—আসলে গোজারই ছন্দ? মনে হয় না কি যে, দীপমালা প’রে যখন রাজধানী নটীর মতন নেচে চলে তখনকার ডামাডোলে এ-অদ্ভুতপের, এ-জিজ্ঞাসার সুরথানি যায় একেবারে ঢেকে? মনে হয় না যে, থেকে থেকে এই যে চাপা বিবাদ নিজেকে ধ’রে রাখতে না পেয়ে দীর্ঘশ্বাসে রণিয়ে ওঠে তা অকারণ নয়? আমার তো কত সময়েই মনে হয়েছে যে, সন্ধানের উচ্ছ্বাস যদি এই রকম বিবাদের সুরে আমাদের জীবনে থেকে থেকে না বেজে উঠত তা হ’লে হয়তো আমরা আমার পাখরের মতনই নিজীব প্রাণহীন জড়ের মতন দিনগত পাপক্ষয় ক’রে চলতাম...হয়তো কেন, নিশ্চয়ই।’”

বলতে বলতে বৃষ্টি ফের যেন অস্ত্রমনস্ক হ’য়ে পড়লেন, তারপর হঠাৎ জেগে উঠে আনার পানে চেয়ে বললেন : “আনা, কথাগুলির রেলের

সঙ্গে এমন সঙ্গত করছিল বাইরের ঝড়ের সেই স্পন্দিত হু-হুচ্চাস...সে যেন একটা সিম্ফনি।...মনে পড়ে এ-উপমাটির কথা ওকে বলাতে ও বলেছিল : ‘জানেন মসিয়ে, আমাদের বিখ্যাত চিত্রী কু-কাই-চি বলেছিলেন এই ধরনেরই একটা কথা এমনি একটা উপমা দিয়ে : যে, মহৎ চরিত্র আঁকতে হ’লে পিছনে পর্বতশিখর বা অতল কন্দরের পট-ভূমিকা থাকা দরকার।’” বলে বৃদ্ধ একটু থেমে আবার যেন আপন মনেই বলে চ’ললেন : “কত সত্য!...কতবারই আমার মনে হয়েছে যে, এত কথা আমাদের বার্থ হয় শুধু পিছনে পটভূমিকার সাথ থাকে না ব’লেই। মনে হয়েছে এ-সাথ থাকলে কত সুন্দর কথা শুধু সুন্দর না—জীবন্ত অভীপ্সা হ’য়ে উঠত কুটে—যেমন সেদিন সন্ধ্যায় চাঁদের কথাগুলি উঠেছিল মুন্ডাছায়া ও ঝড়ের মিলনের রেশে। মনে হচ্ছিল : ঠিক যেন একটি জীবনের পুঞ্জ জিজ্ঞাসা কুটে উঠেছে ওর কথার প্রতি চটে...রঙে...ভঙ্গিমায়।”

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর যেন একটা তারের কাঁপনের রেশ হ’য়ে বেজে ওঠে আপনা আপনি।...কেমন যেন আপনারই লীয়ামান ছন্দে যায় মিশিয়ে। ধরের মধ্যে শোনা যায় কেবল সাগর কল্লোলের নিয়মিত ঢংগুনি—দীর্ঘক্ষন্দ স্বাস-প্রশ্বাসের মতন।...আর থেকে থেকে বেজে ওঠে পাতায় পাতায় বাতাসের কিয়ৎ কিয়ৎ শব্দ।...বাইরের আকাশে একটির জায়গায় তিনটি তারা স্তব্ধায়িত শিখায় উঠেছে অ’লে।...তাদের ঠিক পাদমূলে একটি ধূসরাভ মেঘ...ধীরে ধীরে একটি শাড়ীপরা মেয়ের আকৃতি কুটে ওঠে তার কেন্দ্রে...আশ্চর্য, ঠিক যেন একটি শাড়ীপরা বাঙালী মেয়ে—চোখে তার অমর্ত্য উদাস দৃষ্টি...কপালে স্বর্ণাভ তারার টিপ...বুকে একটি নীললোহিতাভ মালা!

বৃদ্ধের চোখ সেদিকে অনেককাল নিবদ্ধ থাকে...পরে হঠাৎ নিস্তব্ধতা

জাঙে : “চাঁদের কথা ঐ মেঘবালার মতনই জ্বলর রঙে রাঙিয়ে উঠেছিল যেন সেদিন। মনে আছে একবার বলেছিল : ‘জানি, খানিকটা কবিত্বের কুয়াশার মতনই সোনাক্ষে আমার কথা আজ, কিন্তু এ-সব কবিত্ব সত্যিই নয়...নানে, বার্থ করনা নয়—আমার কথার প্রতি রঙই এখনকার চেতনায় তার আসল রঙ—সাজসজ্জার দীপ্তি নয়।’... আর একবার বলেছিল : ‘হয়তো—কে জানে—এ-রাতটাও আমার আর কাটবে না : হয়তো ঐ ঝড়ের শেষ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সজ্জাই আমার শেষ নিঃশ্বাস যাবে মিশে...হয়তো ইসা যদি কখনো পারিসে আপনার কাছে কেরে—শুনবে যে, অস্তিম সময়ে তার প্রতি আমার এতটুকু ক্ষোভ ছিল না—মনের আকাশে এক সোনার শাস্তি গিয়েছিল বিছিয়ে—মুখের কথা হ’য়ে উঠেছিল জাগন্ত রঙের নিভন্ত মেলা। কিন্তু তবু—শুনে হয়তো সে-সময়ে তার প্রাণোচ্ছলতার অবিধ্বাস নিয়ে সে মনে মনে হেসে বলবে এ-মূলাবালির জগতে আবার এত রঙচঙে আবেগ কেনই বা—যেখানে এই সোনার শাস্তিই মায়া...মিলনমুহূর্তই মিথ্যা...যেখানে শুধু বিরহ বিচ্ছেদই প্রেমের সব চেয়ে বড় বাণী!...’ ব’লেই হঠাৎ তার চোখের কোনে এক বিন্দু জল উঠেছিল কিকমিকিয়ে, জিজ্ঞাসা করেছিল আনার হাত চেপে ধ’রে : ‘সত্যি ক’রে বলবেন একটা কথা?—মনে হয় কি আপনার যে, এই যে অকারণ উদাস আনন্দে মন আমার কানায় কানায় ভ’রে উঠেছে এইটেই মায়া, আর সত্য শুধু মানিময় দিনাঙ্ক-দৈনিক পথ-চলা—যার সঞ্চল নেই, নেই প্রত্যয় : রং নেই, নেই ছন্দ?’ আমি আঁর্জি স্বরে বলেছিলাম : ‘না ; এতটা আমারও মনে হয় না...’

তবে কি জানো? এ-ধরণের একান্ত-বিচ্ছিন্ন অন্তলয়ের সোনালি রং যে ঠিক কোনো বাস্তব চক্রবালের জন্মই নহি তাও তো মনে করতে ভরসা পাইনে...কারণ এ-সব যে একান্ত অসংলগ্ন...পলাতক...এই আছে এই

নেই।' ও বলল : 'কিন্তু তাতে কী ? না-হয় মেনেই নিলাম, মেঘের অমলধারা মাটির বৃকে পড়বার সময় হাওয়ার অজস্র ধূলিকণায় মলিন হ'য়ে যায়ই যায়...না-হয় মেনেই নিলাম, আকাশের জ্যোতিষ্কগুলি নীলিমার রং চিত্রীর পাখির তুলিতে ধরা দেয় না...না-হয় মেনেই নিলাম, অমৃতের স্বাদ আমাদের রসনা পেতে না পেতে হারায়...কিন্তু তাই ব'লে একটা অভিজ্ঞতাকে অল্প অভিজ্ঞতা নামকর করবে কেমন করে ? ...বরং এই-ই কি মনে করা সম্ভব নয় যে, এই আকস্মিক স্পন্দিত মুহূর্তগুলিই আমাদের জড় চেতনার অল্প একটা পরিণতির আভাস দেয় ? রোদ্দ ও বৃষ্টির মিলনে ইন্দ্রধনু হাसे আকাশে...থাকে না—মানি। কিন্তু সেটা কি এইজন্তে যে, বর্ণহীন মেঘই বেশি সত্য ? না, এইজন্তে যে, আলো-তলের সম্প্রতি যে-উপায়ে স্থায়ী হয় সে-চেতনা মেঘের বৃকে আত্মও চিরস্থান হয়নি ?'

“আমি বললাম : ‘সবই মানি বন্ধু, কেবল যে-মেঘ ঐ ইন্দ্রধনুকে পেতে না পেতে হারাল একথার তার সাহসনা কতটুকু ? তবে হয়তো সেই জন্তেই ক্ষণপ্রভা জীবনে সে-আদর পায় না যা পায় ধূলিস্ফিট হাওয়া। ওতে যতই ক্রিয়াবেগু যতই ছুট বীজাণু থাকুক না কেন—ও কাজ দেয়—ওকে নিয়ে ঘর করা চলে। কিন্তু ক্ষণপ্রভার আলোয় পথ দেখে সারা পথ চলার আশা করা চলে কি ?’ ও বলল : ‘না চলে না...অথচ ও বধন দেখা দেয় তখন দিগন্তের শেষ বিন্দু অবধি ওঠে হেসে এও তো সত্য ?’ আমি কথা কইলাম না। ও বলতে লাগল : ‘কিন্তু আপনার যেমননা আমি যে বুঝি না, তা নয়। আমি ক্ষণিক রামধনু-রাগকে সখল ক'রে কবিত্বের উচ্ছ্বাসে আলোহীন বায়ু ও বায়ুহীন আলোর দুর্বলতাকে অস্বীকার করতেও চাই না। স্বপ্ন-চেতনার ক্ষণপ্রভা বধন বলকেই যার মিলিয়ে তখন অন্ধকার যে জনজলন পাখর হ'য়ে বৃক চেপে কলে এ-ও

আমি জানি ও মানি। কিন্তু কি জানেন?...বিশেষ করে আসন্ন  
মৃত্যুর বিচিত্র করণায় অনেক সময় জীবনকে যেন বেশি বোঝা যায় এ  
আমি আমার দু-তিনটে প্রাণ-সঙ্কটের মুহূর্তে দেখেছি। তখন দেখেছি  
যে, প'ড়ে-পাওয়া আলোর রঙ্গিমা যখন মৃত্যুর মেঘচ্ছায়ায় আসে পাংশু  
হ'য়ে তখন এক অ-ধরা আলো দেয় ধরা। সে-আলোয় দেখি কী?—  
দেখি যে, আমরা একটা বিপুল-লীলার অতিকায় বৃত্তের একটিমাত্র  
বিন্দুতে আমাদের ছোট্ট সখি-টুকুকে সংহত করে তার সমগ্র পরিধির  
চেয়েছি দিশা। চেয়েছি এই বামন মানসবুদ্ধির, এই সঙ্কুচিত চেতনার  
অণুবীক্ষণ দিয়ে অগণ্য নীহারিকার আলো মাপতে...কিন্তু এই যে গরী—  
কণিক মানস-চেতনার এই যে আত্মস্মৃতিতা—কে বলল—এ আমাদের  
পরমতম দিশা দেবেই দেবে? কেন এ-কথা ধ'রে নেই আমরা যে, জীবনকে  
এই দৃষ্টি এই চেতনায় যে-চোখে দেখছি তাই তার স্বরূপ? ব'লে একটু  
থেমে স্থান স্থরে বলল : 'জানি না হয়তো কাল যদি স্মৃতি হ'য়ে উঠে এ-দৃষ্টি-  
ভঙ্গি আমার ফের যাবে বদলে...হয়তো ফের চাইব এই কণিক চেতনাকেই  
সর্বস্ব ব'লে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে। হয়তো এই চেতনার প্রদোষালোকেই  
চলব কোনোমতে হাতড়ে হাতড়ে—প্রেমের, ক্ষুধার, জিজ্ঞাসার—এক কথায়  
জীবনের সব সমস্তার সমাধান খুঁজে খুঁজে।...এমন কি, এ-ও আমি মানতে  
নারাজ নই মসিয়ে যে, যদি আবার ইসাকে পাই তবে হয়তো আবার সেই  
আগেকার চকল ফেনিল উদ্দাম জীবনের জন্মেই উঠব উন্মুখ হ'য়ে...জানি  
না।' আমি বললাম : 'না চাও, তা হবে না আর—অন্ততঃ তুমি সে-প্রকৃতির  
মাহুত্ব নও।' ও মুহূর্তেই বলল : 'কেউ কি জানে? কে ভেবেছিল :  
বংশগৌরবী চাও ধীরে ধীরে এঞ্জেলার মতন ল্যাণ্ডলেডীর মেয়ের প্রতি  
আকৃষ্ট হবে—যাকে এক সময়ে করত সে গভীর অবজ্ঞা? কে ভেবেছিল :  
ইসা বার্টনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার দরুন তার প্রতিকূল দেবার হীন

আকাজ্জা ধীরে ধীরে জেগে উঠবে তার উদার-সুন্দর মনে ?... ভাবুন তো, এক সময় ছিল যখন আমি মনে করতাম যে ইসার জন্মে দরকার হ'লে শুধু প্রেমের তীর্থযাত্রী হ'য়ে এ-বর্ষের যুরোপেও বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি।' বলতে বলতে ওর মুখের মানিমা ছাপিয়ে ফুটে উঠল একটা নূতন প্রত্যয়ের আভা, ও বলল : 'অথচ তবু আজ জীবন-মরণের এসকলিয়ে এক সোনালি প্রত্যয় ধীরে ধীরে আমার চেতনার দিগলয়ে টুকি দেয় যেন যে, এ-সব স্বত্বো বিরোধ, এ-সব অসঙ্গতি, এ-সব মানিই অধর দুর্বোধ্য থাকবে না যদি সেই আলো একবার নামে।' আমি বললাম : 'কোন আলোর কথা বলছ ?' ওর মুখ উঠল কি রকম উদ্ভাসিত হ'য়ে, বলল : 'সেই আলো বার একটি শূলিক দিয়ে শিল্পী জালায় শিল্পের বাতি, জ্ঞানী—জ্ঞানের দীপ, প্রেমিক—প্রেমের তারা। কেবল আগে চাইতে হবে তাকে... করতে হবে তার জন্মে হুশর তপস্বী। নইলে সে-আলো তার রাঙা পা রাখবে কোথায় ? আজকের কুক্ক বামন শ্রীহীন মরচেতনার পঙ্কপুটে ? ছি। আগে প্রতি হৃদয়কে হ'তে হবে এক-একটি শুভ্র সহস্রদল বার পাপড়িতে চাঁদের হাসি, যুগলে প্রত্যয়ের আঙন, পরিমলে নীলিমার পুণ্যগন্ধ।'।

‘ও নিজের মনেই ব'লে চলল : ‘কিছু মুকিল এই যে, সাধারণ লৌকিক চেতনার চোখ দিয়ে এ অবতরণকে মনে হয়—আকাশকুসুম, কবিকল্পনা, মনে হয়—অসম্ভব একটা কিছু। সঙ্গে সঙ্গে জাগে একটা অন্ধ-গর্গর—যা সাধন করেছি তার জন্মে। তখন ভুলে যাই যে, প্রতি ষণ্ড কীর্তিরই আছে একটা পিছুটান যার নাম আত্মপ্রসাদ : যা হয়েছে তাই বেশ, যা পেয়েছি তাকেই ঘুরিয়ে কিরিয়ে সাজিয়ে আনন্দ, অল্পেই পরিপূর্ণ সন্তোষ, এতটুকু গৌরবেই মত্ততার ঘোর। আর এই অহমিকার ঘোরেই হয় আমাদের বস্ত ঠিকে-ডুল, আমরা ভেবে বলি যে, এ-খণ্ড

চেতনার রশ্মিতে যেটুকু দিগন্ত উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে তার বাইরে অদিগন্ত সত্য খোঁজা বিড়ম্বনা। মাটির টান বোঝা যায় পাখা মেললেই যে।

আমি বললাম : 'এ-কথা মানি, কিন্তু এইটে তুমি ভুলে যাচ্ছ যে ক্ষণচেতনার ধর্মই এই। দৃষ্টিকে আমাদের খানিকটা সঙ্গীর্ঘ না করলে সে যে হ'য়ে পড়েই দিশাহারা। তাই হয়তো জ্ঞানীরা অনেকে বলেন যে মোহই সৃষ্টির ভিত্তি—নির্মোহ সত্য হ'ল শূন্য, যেখানে কোনো কীর্তীসোধই দাঁড়ায় না।' ও মুহূর্তেই বলল : 'এ-কথা আমি ভুলিনি, কিন্তু এ-ধরনের বিজ্ঞ জ্ঞানে আনার, কেন জানি না, হাসি পায় একটু। অবশ্য যে-জগতে আমাদের বসবাস তার ইমারতের প্রধান উপাদান যে মিথ্যা, ভয়, শোভ ও মোহ এ-কথা আমি মানি। কিন্তু তাই বলে এ-কথা কী ক'রে নেনে নেব বলুন যে, অল্প কোনো উপাদান দিয়ে অল্প রকম জগৎ গড়া যায় না?' আমি বললাম : 'কিন্তু সৃষ্টি—' ও আমাকে বলতে দিল না, বলল : 'কিসের সৃষ্টি মসিয়ে? যে লক্ষ অপূর্ণতা অন্ধতা শোভ ও নিঃস্বপ্নতার কূট আবর্তে আমরা হাবুডুবু খেতে পেতে কোনোমতে ভেসে চলেছি—অবশ হ'য়ে, শঙ্কাজঙ্কর চিন্তে আত্মনাশ করতে কলঙ্ক—তার জন্তে এত গর্বই বা আমরা করি কোন্ পৌরুষে—আর তার বিলুপ্তির প্রসঙ্গ উঠতে না উঠতে এমন হাহাকারই বা ক'রে উঠি কোন্ লজ্জায়! ঘুণা হয় না এটুকু স্বস্তির মধ্যে কোনোমতে বেঁচে থাকতে কুপ-মণ্ডকের মতন?'—বলতে বলতে তার উদ্দীপ্ত স্বর এল স্তান হ'য়ে, বলল : 'সত্যিই সূচ কুপ-মণ্ডক বৈ আর কি বলুন? নইলে মিথ্যাহীন জগতকে অনাসৃষ্টি বলে কল্পনা করি? নইলে অন্ধের মতন ধ'রে নিই যে, চক্রবালহীন উদ্ধার সত্য হ'ল অনাসৃষ্টি? নইলে এই স্তানিময় জীবনের সম্বন্ধেও পশ্চীমজীবনে কলন ধ'রে কাব্য রচনা করি—বাস্তবতা ও বিউটি নাম দিয়ে? আর সব চেয়ে দুঃখ এই যে, যে-আলোর কণিকা-প্রসাদে বেঁচে রুখ,

ভালোবেসে আনন্দ, কর্ণে তৃপ্তি তার পূর্ণ দানকে এড়িয়ে চলার জন্তে হ'য়ে উঠি পাগল—পাছে সত্যের মুক্তরূপ এতটুকুও বিছিয়ে যায় আমাদের বহু চেতনার চকুসীমার মধ্যে !'

“ব'লে একটু থেমে শাস্ত্র কণ্ঠে বলতে লাগল : ‘কিন্তু না, আমি একটু ভুল বলছি : আমার মাথা-ব্যথা যে প্রয়োজনবাদ নিয়েই নয় মসিয়ে । জীবন যখন নিভে আসে তখন হুবন দীপ্ত হ'য়ে ওঠে একটু আলাদা রঙের আলোর যে-আলোয় মনে হয় : সব সুলভ ভোগই তুচ্ছ—অর্থহীন । তখন সার্থক মনে হয় ছোট্ট পাওয়ার স্বস্তি নয়—বড় চাওয়া বড় ক্ষুধার অতৃপ্তিই । তখন সৃষ্টি হয় গৌণ—বৃষ্টিই হয় আরাধ্য । তখন—’ ব'লেই থেমে গিয়ে বলল : ‘কিন্তু যাক একথা । কারণ মৃত্যুর সামাহীন অজ্ঞান যে এখনো পরেনি তার চোখের সামনে একথার কোনো ছবিই হয়তো ফুটে উঠবে না, কেন না এ হ'ল আলাদা চেতনার কথা—যুক্তি-তর্কের তো নয় ।—কেবল মাঝে মাঝে ভাবি এই চেতনার স্তরভেদের জন্তেই ঋষি ও ভোগী পরস্পরের অনাস্বীয় হ'য়ে রইল কি না ?—কিন্তু যাক এ-সব ছায়াবাজি ।—না, একটা অহুরোধ কেবল : আমি যদি সেয়ে আর না-ও উঠি দুঃখ করবেন না যে, শেষটার ব্যর্থতার মরুগর্ভে লীন হ'ল আমার জীবন, দুঃখ করবেন না যে, অন্তিমে মায়া সাঙ্কনাই হ'ল আমার জপমালা । আর যাই অবিশ্বাস করুন না কেন একথা অবিশ্বাস করবেন না যে, জীবনে আমি চেতনার অকুরঙ্গ রূপটি দেখতে চাইনি ব'লেই—কোন স্মৃতি বলে জানি না—মরণ দিল তার বরদান, মিলনে প্রেমের স্বরূপ মনপ্রাণ দিয়ে খুঁজিনি ব'লেই ইসার বিচ্ছেদে দেখতে পেলাম তার ধানুকান্তি—এবং যেটা এ-সবের চেয়েও বড় কথা : আমার চোখে আজ ভেসে উঠল এক অচিন্ত্য করুণার আলো-সমুদ্র—যার মধুরিমার বস্তায় আমার নিরালোক পুঞ্জ অপ্রাপ্তির দুঃখবাহ গেছে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ধূরে ধূছে



ভেসে—আর নেমে এসেছে এমন এক ছন্দ হ্রস্ব ভরসা যা ইন্দ্রিয়জগতের  
কঠিনতম পাষাণের চেয়েও বাস্তব।”

দরজায় আঘাত হ’ল।

সকলেই গুঠে চমকে।

মসিয়ে বেনার বললেন : “আসতে পারো।”

চেহার মেড ঢুকে আনাকে বলল : “আনেং জেগে উঠে কঁাদছে  
মাদাম।”

## মুখোমুখি

আনা স্বপ্নোথিতের মতন বলল : “কী ? কে কঁাদছে ?”

—“La petite, Madame.”\*

আনার চমক ভাঙে। সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

মসিয়ে বেনার বললেন : “তাকে একবার নিয়ে আসো না কি  
এখানে ?”

আনা বলল : “না, ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে তা হ’লে। চলুন তার  
চেয়ে আপনিই তাকে দেখে আসবেন।”

মসিয়ে বেনার স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন : “দেখেছ সেন, দরদটা ?  
বলিনি ?” ব’লেই অত্যন্ত ভালোমাহুরি টোনে আনাকে বললেন : “তা  
বটে, চলো তোমার সাত-রাজার ঘনকে একবার আমার অভিনয়নের  
নজর দিয়ে আসি। ব’সে ব’সে আর বক্তিত্তে ক’রে ক’রে পা-টাও  
গেছে ধ’রে, একটু ঘুরে আসা মন্দ নয়।” ব’লে আনার বাহ ধ’রে

\* বুদী—মাদাম।

ঈষৎ ঝোঁড়াতে ঝোঁড়াতে ঘরের দোরের কাছে গিয়ে দোর খুলেই মুখ ফিরিয়ে স্বপনকে বললেন : “এই অবসরে—বুঝলে কি না?...আমি কথা দিছি দোরে আঘাত ক’রে ভোমাদের অহুমতি নিয়ে তবে চুকব।”

—“আঃ, যাওয়ার মুখেও থামা ! সাথে কি ভগবান্ আপনার পুরুষ নাম দিয়েছেন—” ব’লে সহাস্ত বুককে আনা একরকম টেনেই নিয়ে গেল ঘর থেকে ।

\* \* \*

স্বপন সন্ধ্যার দিকে তাকায় । ও চোখ নেয় ফিরিয়ে । তিন দিন বাদে ওরা মুখোমুখি—এই প্রথম । তাই কি ফের সেই কুণ্ডা ওঠে ঘন হয়ে ? আশ্চর্য্য...যে-দুটি মানুষ অন্তরঙ্গতার দিক থেকে পরস্পরের সব চেয়ে কাছে ব’লে কবির কাব্য রটিয়ে এসেছে যুগ যুগ ধ’রে, সে-দুজন যে-মুহুর্তে সব চেয়ে কাছে আসতে চায়—কে দেয় বাধা ? এ তো শুধু স্বপনেরই অভিজ্ঞতা নয় । তার মনে পড়ে বৈষ্ণব কবি গেয়েছিলেন :—

নিধুবনে যতনহি দুহুঁ মিলিলা ।

ধৈর্য্য গেলা চলি সাথে চুমিলা ॥

পরম মিলন মাঝে কালিয়া বাধা ।

শ্রীমতীর হারও হার ভইল বাধা ॥

কেন এমন হয় ? যেখানে তহু মনের প্রতি কণা সান্নিধ্য-উদ্ভূত সেখানে অবাস্তব কত-কী এসে বাধা হয় কেমন ক’রে ?...

\* \* \*

ওরা দুজনে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে এক দৃষ্টে।...কী স্নায়! একখানি হরিত-রাঙা মেঘ-তরী চলেছে তর তর ক'রে...কীকে কীকে একটি ছুটি ভারার চাউনি হাল ধ'রে।...চাঁদের পাশে ছুটি স্বর্ণাভ জ্যোতির্মণ্ডল পাল তুলে।...তাদের পেরিয়ে কাটাকাটা ছোটবড় মেঘের স্তর আঁচল বিছিয়ে শরীর প্রতীক্ষায় বেন।...কিছু নিশিকান্ত রইলেন দূরেই।...এমনিই হয়...স্বপন ভাবে। ঐ-যে চাওয়ার বেদনা...তাই না বাহিতেরই বিলম্ব!...বেন নিজের ছায়ার পিছনে ধাওয়া-করার বিভ্রম। কেন এত বেশুরা অসঙ্গতির উপহাস জীবনের প্রতি পদক্ষেপে? চিরদিন একগাছি সরু হার—সে-ও সাধে বাদ?

স্বপনের মনে পড়ে সেদিন চাং ওকে প'ড়ে শোনাচ্ছিল ব্রিটন কবির একটি স্নায় স্বপ্ন। স্বপ্ন?.....এ-সব কি সত্যিই স্বপ্ন—ছায়া?—

দুলিতম্-কারাবন্দী আনন্দ-চেতনা মৃত্যুঞ্জয়

সঙ্গীতে সুধমা সম হয় উদ্বেলিত...মনে হয়;

দুজ্জের নিয়ন্তা এক আছে, আছে—কারুবরে যার

সমঞ্জস হয় নিত্য জীবনের বেশুর-সম্ভার

মিলন চূষনে।...\*

\* \* \*

হঠাৎ একটা মাগোলিনের অঙ্কার আসে ভেসে। ওরা দুজনেই কান পেতে শোনে।...অরিস্ত হয়েছিল সুরটা—বাকে ওরা নাম দেয়

\* Dust as we are, the immortal spirit grows  
Like harmony in music; there is a dark  
Inscrutable workmanship that reconciles  
Discordant elements, makes them cling together  
In one society..... ( The prelude... Wordsworth )

“মেলডি”!—ওদের অর্থহীন লাক্ষ্যাপির স্বরবিক্রাসে—কিন্তু হঠাৎ ফুটে ওঠে যেন একটা জানা স্বরবিক্রাস...ঠিক যেন—স্বপনের এত চেনা রাগ মনে হয়!...কী রাগ যেন? ঐ-ঐ? স্বপন বলে: “পূর্ববীর যতন না অনেকটা?” সন্ধ্যা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে কান পেতে আর একটু শুনলে বলে “হ্যাঁ—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটু ভৈরবীর ছোঁওয়াও আছে—ঐ—ঐ, দেখেছ?—আশ্চর্য্য, যেখানে রাগজ্ঞানের বালাই নেই সেখানে পূর্ববীর সঙ্গে ভৈরবীরও বিয়ে দেয় জ্বরদন্তি সুর-ঘটক। আমি জাহাজে শুনেছিলাম স্পষ্ট বেহাগের সঙ্গে ভৈরবীর সহবাস। ভারতে পারো?”

স্বপন হেসে বলে: “আমি কি অত শত বুঝি না কি তাই বলে?” হঠাৎ ম্যাগোলিনটা মাঝপথে থেমে যায়। কিন্তু সন্ধ্যা সেইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে জানলার কাছে—বাইরের দিকে চেয়ে। স্বপনের দৃষ্টি ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে পড়ে তিনটি সুন্দর তারার পরে।...কী দান অথচ কী তরু...শাস্ত্র...মুগ্ধ!

স্বপনের মনের মধ্যে কী একটা বাণা ওঠে দুপে।...সে ধীরে ধীরে পিছন থেকে এসে হঠাৎ সন্ধ্যার গলা জড়িয়ে ধরে। সন্ধ্যা চমকে ওঠে: “করো কি? এখুনি কেউ এসে পড়ে যদি!” নিজেকে নের ছাড়িয়ে।

স্বপনের প্রকাশোন্মুখ উচ্ছ্বাস হয় প্রতিহত। কিন্তু ক্ষুধা হওয়াও যে সাজে না।...ও তাই জোর করে ধরে সহজ পরিহাসের সুর: “ভয় নেই গো, ভয় নেই। এদেশে দোরে আঘাত না করে কেউ ঘরে ঢোকে না—জানো না?” ঠাট বজায় রাখতে ওর কাঁধে হাতটা কুতুই রাখে।

—“তবু—”

—“না—তবু-তবু পালা থাকুক এখন। বলো না, কী তাবছিলে অমন করুণভাবে তারার দিকে তাকিয়ে।”

—“কী আবার তাবব?”

—“না, বলতে হবে।”

—“কী বলব? এমনি।”

—“এমনি কি? না, অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে—না—প্রকাশ হ’ও।”

সন্ধ্যা তবু চুপ ক’রে থাকে।—

—“বলবে না?”

সন্ধ্যা হঠাৎ ওর দিকে ফিরে দোরের দিকে চকিত দৃষ্টিপাত ক’রেই ওর কাঁধে মাথা রেখে রলে : “কী বলব মিসি? ভাবছিলাম আমি বাস্তবিক ভাৱি অহঙ্কারী।”

—“দূর।”

সন্ধ্যা মুখ তুলে মৃদু হাসে, লান হাসি : “নয়?”

—“মোটাই না। বরং আমার আপত্তিটাই একটু উষ্ণ হয়ে গিয়েছিল বলতে পারো। সেজগতে কিছু মনে কোরো না—কেমন?”

সন্ধ্যা তার কটিবেষ্টন ক’রে দাঁড়িয়ে বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে বলে : “না, তুমি ঠিকই করেছিলে। আমার সময়ে সময়ে কী যে স্নেহ চেপে যায়—”

স্বপন চকিতে তার গালে একটি চুম্বন দিয়ে বলে : “ভাগ্যিস যায়—নইলে কি তোমার এখানে দর্শন মিলত কখনো?”

সন্ধ্যা চকিতে ওর মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে বলে : “সত্যি বলছি, না আমার দর্শন না মিললেই বেশি খুঁসি হ’তে?”

—“হঠাৎ এ-প্রশ্ন?”

সন্ধ্যা হেসে বলে : “না—এড়িয়ে গেলে চলবে না। আর আমাকে প্রবোধ দেবার খাতিরেও মিথ্যা না। কথা দাও।”

স্বপন ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে : “আমি কি মিথ্যাই বলি সচরাচর?”

সন্ধ্যা অল্পতপ্ত সুরে বলে : “না, ফিরিয়ে নিচ্ছি।”

স্বপন কৃত্রিম গম্ভীর সুরে বলে : “এখন কি আর হয়? কণা মুখ-ফসকে একবার বেরিয়ে গেলে কি আর ফেরে? ডিল হুদের জলে ফেললে বৃত্তদের বলা—তোমরা ঘুরে ঘুরে বাঁয়ে চোপো না তট অবধি?”

—“মানুষের হৃদয় অকর্মণ্য হুদের জল নয়। তুলতে চাইলে সে তুলতে পারে।”

—“কিন্তু প্রেমের জবরদস্তিতে আমাকে না-হয় জোর ক’রে ভোলালে, কিন্তু অস্তদের?”

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসুনেত্রে তার মুখের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে : “কেন? মসিয়ে বেনার কি কিছু মনে করেছেন নাকি?”

—“দূর পাগল। আমি ঠাট্টা করছিলাম; মসিয়ে বেনার কি কখনো এ সবে কিছু মনে করতে পারেন?”

—“সত্যি বলছ?”

—“যদি তুমি জানতে সন্ধ্যা যে কী সর্বসহা প্রাণটি তার তা হ’লে কখনো এ-শঙ্কা তোমার মনে উদয়ই হ’ত না। তরুণ তো তিনি ন’নু—তাই বিরুদ্ধ জিনিষকেও করতে পারেন আত্মসাৎ—নিজের কমা-গুণে।”

—“কিন্তু—” একটু ইতস্ততঃ ক’রে সন্ধ্যা বলে : “আনা? সে যদি ভেবে থাকে যে—”

স্বপন চুপ ক’রে থাকে। ঠিক এই কুঠাই-যে ওকেও বাজছিল। কী বলবে? মিথ্যা বলাও বুধা। সন্ধ্যা আবার ফিরে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

ঠাট্টা স্বপনের একটা দীর্ঘশ্বাস গড়ে। সন্ধ্যা চম্কে তার দিকে তাকিয়ে বলে : “কী মনে হচ্ছে তোমার? বলবে? কিন্তু অকপটে।”

স্বপন হেসে বলে : “কী মনে হচ্ছে আবার?”

—“তা হ’লে অমন ক’রে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে কেন ?”

—“এমনিই।”

—“ককনো না। তুমি লুকোচ্ছে আমি ব্যথা পাব ব’লে।”

—“সত্যি না।”

—“তা হ’লে বলো কি ভাবছিলে। আনার কথা ? সত্যি বোলো  
কিন্তু : তোমার দুটি পায়ে পড়ি।”

স্বপন খানিকক্ষণ চুপ ক’রে থেকে বলে : “পায়ে পড়ার দরকার নেই,  
—ভাবলেও এমন প্রোনাস্টিক বা ট্রাজিক কিছু ভাবছিলাম না যে—”

—“ও তো শুধু আমাকে প্রবোধ দেওয়ার জন্তে বলা।”

—“সত্যি না।”

সন্ধ্যা হঠাৎ গাঢ়স্বরে বলে : “আনার মনে হয় আমি আচম্কা এসে  
না পড়লেই ভালো করতাম। কী-যে গুণ্ডগোল উঠল পাকিয়ে—”

স্বপন ওর মুখ চেপে ধরে : “ফে—র ? বলিনি পাগলামি-টাগলামি  
আর না ?”

সন্ধ্যা মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে বলে : “পাগলামি না, সিজি। আমি  
তোমাদের সকলকে যে-ভাবনার ঘূর্ণীর মধ্যে ফেলে দিয়েছি” —‘যে’  
কথাটার ওপর ও এতটা জোর দেয় !...স্বপন কী বলবে ?...

—“কিন্তু এখন চ’লে গেলে হয় না কি ?”

স্বপন তার গাল টিপে দিয়ে বলল : “স্বর্ধ্যাসুখী—না আয়েবা ? ছাঁদটা  
কর গো ?”

সন্ধ্যা মুখ সরিয়ে নিয়ে ক্রকুটি ক’রে বলে : “কাকুরই নয় গো নয়।  
এ-রকম অবস্থায় যে-কোনো মেয়েরই মনে হ’ত এই কথাই। আমি যদি  
আজ আনা হতাম, আনা যদি সন্ধ্যা হ’ত, তা হ’লে সে-ও ঠিক এইকথাই  
বলতো কেনো।”

স্বপন এবার একটু গভীর হ'য়ে ওঠে, কিন্তু সে সহজ সুরেই বলে :  
“মানলাম। কিন্তু তুমি যখন আনা নও বা আনাও যখন সন্ধ্যা নয় তখন  
এ-সব ‘যদি’-বাদে লাভ আছে কি কিছু ?”

সন্ধ্যা এ-কথা কানেই তুলল না : “আচ্ছা, একটা কথা বলবে আমাকে,  
একটুও গোপন না ক'রে ?

—“কী ?”

—“আনাকে যদি আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে বাড়ী ফিরি তা হ'লে  
তুমি খুসি হও ?”

—“কের পাগলামি ?”

—“তুমি খালি পাগলামি পাগলামি করলে তোমার সঙ্গে আর কথা  
কইব না কিন্তু।”

—“তা হ'লে আমাকে অগত্যা বলতে হবে যে অগ্নি মৌনে, এ-সব হচ্ছে  
খাঁটি বন্ধুত্ব চং—ছদ্মবেশে।”

সন্ধ্যা রাগ ক'রে বলল : “বা—ও। তোমার মনের কোণে আমার  
প্রতি একটা ভারি তাক্কিলোর ভাব আছে। তোমার সঙ্গে আড়ি—  
আড়ি—আড়ি।”

স্বপন এবার তাকে বুকের কাছে টেনে এনে বলে : “তা হ'লে আমাকে  
বলতে হবে : ‘স্বরগরল খও—’ সহসা দোরের কাছে কী শব্দ মতন হয়।

সন্ধ্যা নিজেই নক্ষত্রবেগে ওর বাহপাশ থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে বলে :  
“আঃ—কী করো বলো দিখিন ? এটা অপরের ঘর তার হ'ল আছে ?”

—“তুমি অমন রোম্যান্টিক টোনে কথা বললে যদি মানুষ বেত'লই হ'য়ে  
পড়ে তবে সে অপরাধ কি হ'লের ?”

—“রোম্যান্টিক আবার কি ? আমি ঠিক করেছি সত্যিই—  
আনাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমাদের ওখানে নিয়ে যাবই—অন্তত কিছুদিনের



জন্মে তো বটেই। বেশ তো, আমি তার কাছে করাসী শিখব। বাবা মা তো বুলাবনে চ'লে গেছেন। অত বড় বাড়ীতে আনা থাকলে বাড়ীটা খা খা করবে না আর। মসিয়ে বেনারকে ব'লে রাজি করাবই করাব।”

—“তোমার সঙ্গে তর্ক করতাম আজ—যদি না দারুণ হাসি পেত।”

—“আজ্ঞা গো আজ্ঞা—পড়বে তোমার রামশরার কথা মনে—যখন মসিয়ে বেনারকেও ভজাব আমাদের সঙ্গে যেতে।”

স্বপন হোস বলে : “আর, বিজ্ঞভাবে ছোটো তর্ক করতে শিখলেই যে তরুণীও রাতারাতি প্রবীণা হ'ন এ-মুষ্টিযোগ কোথায় শিখলে?”

—“মানে, মসিয়ে বেনারের মতন প্রবীণ লোক আমার এ-প্রকার হেসে উড়িয়ে দেবেন, এই তো?”

—“অবিকল।”

• —“আর যদি না দেন? বাজি?”

—“দেবেনই।”

—“কী কারণে শুনতে পারি কি, প্রবীণ-চূড়ামণি?”

—“মসিয়ে বেনার সংসারটাকে একটু চেনেন ও শুধু মা'জলের মধ্যে দিয়েই দেখেন না—তরুণী শিরোমণি!”

—“উঃ—ভারি যে!—যেন নিজে সংসারকে কতই চেনেন।”

—“অন্তত তোমার চেয়ে বেশি।”

—“যেহেতু মসিয়ে বেনার এ সম্বন্ধে তোমার মতের সঙ্গে সার দেবেন?”

—“ধরেছ।”

—“আজ্ঞা তা হ'লে তোমাকে এবার শিক্ষা দিতেই হ'ল দেখছি।”

স্বপন সন্ধ্যার কৰ্ত্তালিঙ্গন ক'রে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কীৰ্ত্তনের মৃদুগুঞ্জে বলল :

“কান্নু কহে রাই, নিতি তোয় পায় কত না শিখিছ মুই”—

—“আঃ কী করো ? ছাড়ো—” বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা কর'রেও না পেরে সন্ধ্যা হেসে কেলে বলল : “তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না—”

স্বপন সন্ধ্যাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে সেই সুরেই বলল :

“( আমি ) রাখালী অমতি করি পায়ে নতি যদি না পারিবি তুই

( তবে ) আর কেবা বল পারবে ও রাই

তুই না পারিলে আর কেবা বল—”

এমন সময়ে দোরের আঘাত হয় : “Est-ce que vous avez fini ?”.

সন্ধ্যা স্বপনের বাহুপাশ থেকে ছিটকে গিয়ে দশহাত দূরে দাঁড়াল ও তার লগ্ন কেশপাশ বিকলিত করতে করতে চাপা সুরে বলল : “দেখলে তো ? দেখ তো, ক্রচটাও খুলে গেছে ! কী যে ভূমি—”

স্বপন হাসি চেপে দোরের উদ্দেশে বলে : “Oui, on a fini—entrez donc.” †

## কথা-কাটাকাটি

মসিয়ে বেনার দুহাতে চোখ ঢেকে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন : “ভয় নেই! ষুগলবন্ধু ! পুরো এক মিনিট আরো সময় দিচ্ছি উপসংহারটাকে সেয়ে নিতে ।”

\* তোমাদের পালা সাক্ষ হইছে কি ?

† হী—সাক্ষ হইছে, আসতে পারেন।

ঘরের মধ্যে হাসির বান বায় ডেকে।

হাসি খামলে মসিয়ে বেনার তাঁর সোফাটিতে বসতে বসতে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন : “বাঃ—বা ভেবেছি তাই। একটু নিঃস্নানতার অস্বকূল বাতাস পেতে না পেতে গাল দুটিতে চেরির রাঙা আভা দিয়েছে দেখা, চোখে ফুটেছে আলো, মুখে মেঘ গেছে কেটে।”

স্বপন হাসিমুখে বলল : “কেমন ক’রে জানলেন যে, সেটা নতুন মেঘের সূচনা নয় ?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “যারা মিটিয়েলজিষ্ট তারা জানে।”

স্বপন বলে : “যদি বলি মেয়েদের চোখ মুখ হৃদয়ের বাষ্পতত্ত্ব জানা একটু বেশি শক্ত !”

মসিয়ে বেনারের কটাক্ষে বিজলি খেলে গেল : “ওহে বন্ধু! শক্তকেও আয়ত্ত্ব করা যায়—তার মতিগতির সাধনায়।—কিন্তু এ আসলে শক্ত নয়। কেন না কামিনীর কমল-আনন থেকে যখন মেঘের ছায়া স’রে যায় তখন সত্যিকার কমলবিলাসীর কি তা বুঝতে দেয়ি হয় ? না, মানিনীর স্মৃতিভাষ্য কখন তিরপিত হয়েছে সেটা চিনতে পারার মতন অধর-চর্চাও কখনো করিনি বলতে চাও ?”

সন্ধ্যা ব্রীড়ারক্ত মুখে হেসে বলল : “তা যদি সত্যিই ক’রে থাকতেন তা হ’লে আরও একটা কথা ধরতে পারতেন।”

—“যথা ?”

—“যথা, মানটা আমার ভাঙেনি—অর্থাৎ আপনার ওপর।”

—“সর্জনশ ! অধীনের অপরাধ ?”

—“আপনি পদে পদে আমাদের এড়িয়ে চলতে চাচ্ছেন।”

—“ও ! তারতর্ঘ্যে না গিয়ে আমেরিকা দ্বারের মংলব ক’রে ?”

স্বপন বলল : “হ্যা—কিছু মানিনী বলেন মংলবটা আপনার তিনি ভুল ক’রে দেবেনই দেবেন।”

—“কি ক’রে? মান ক’রে কি জাহাজের গতিও ভুল ক’রে দেবার শক্তিও ধরেন না কি উনি?”

স্বপন বলল : “জাহাজের বাড়া : আপনার ইচ্ছার গতি ভুল করবার শক্তি ধরেন যে। অন্তত ঠুর বিশ্বাস, ঠুর অতুরোধ আপনি এড়াতে পারবেন না—বিশেষতঃ যখন সাক্ষা-কুহকিমার আপনি একজন দীতিমত সনজ্জদার—on your own showing.”

মসিয়ে বেনার চুমকুড়ি দিয়ে সাক্ষেপে বললেন : “মনামি, আমি তোমাকে কি একশোদিন বলিনি যে, নারী যেদিন প্রথম তার কুহকিমা সঙ্ক্ষে সচেতন হয়েছিল সেদিনটাই ছিল আদমের ফল-খাওয়ার দিন। নইলে ফল-খাওয়াটা তো আসলে রূপক মাত্র।”

সাক্ষা বলল : “মানে?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “পুরুষের সব চেয়ে বড় দুর্দিন এল সেই দিনেই, এই আর কি।”

স্বপন বলল : “আপনার ফ্রাঁস কিছু বলেন, মনে রাখবেন, যে নারীর কুহকের বারো আনা পুরুষেরই করুনা—অর্থাৎ পুরুষই তাকে বলে বলে স্বঘোষিত করেছে। বলেছেন :

‘স্বঘোষা! তোর কুহকে ঘেরা কায়া :

তাই তো চায় পরাণ ওই মায়া।

লাবণী! তোর ঘোমটা যদি খুলি

আর কি দিয়া উঠিবে ঢুলি’ ঢুলি’?

প্রাণে কে দেয় সবার আগে হানা?—

‘রহস্য’ তার নাম : চির অজানা।

অবহ হবে জীবন ভবে হায়—

নয়নে যদি কল্পনা মিলায় !” \*

মুসিয়ে বেনার হেসে বললেন : “জানি গো শিল্পিবর, জানি। আর ক্রাস কেন, আমি নিজেও হাজারো বারই বলিনি কি ও-কথা? কিন্তু ঐকান্তেই তো মেয়েরা সদা-সর্বদা চায় তাদের রহস্যভরা মণিকুঠির চাবিকাঠিটি আগলে রাখতে। চাং কথাটাকে ঘুরিয়ে বলে : পুরুষ যেদিন কল্পনা করল যে, নারী স্বভাব-কুহকিনী—সেদিনই সে তার আনন্দের সরল স্বর্গ থেকে অলিত হ’য়ে পড়ল রোমান্সের হেঁয়ালি-মর্ত্যে।”

সন্ধ্যা হেসে বলল : “কিন্তু সন্ধ্যা যদি কথাটাকে আরও একটু ঘুরিয়ে বলে যে, স্বর্গ আনন্দের সরল স্বাদ পুরুষের ধাতে গয় না ব’লেই সে চাইল মর্ত্য-হেঁয়ালির আল?”

মুসিয়ে বেনার হেসে বললেন : “তা হ’লে বৃদ্ধ কথাটাকে আরও ঘোরাতে ঘোরাতে বেমালুম কিরিয়ে নেওয়ার সামিল ক’রে করযোড়ে ক’মা চাইবেন এই ব’লে যে হেঁয়ালির রাগীদের কাছে মায়া-কুণ্ঠিতরা হাত না পেতে পারে? কাজেই এসো কৃতাজলি পরাভূতের কাছে এবার করো তোমার সখীরূপকে জাহির—তার্কিকরূপকে ছেড়ে।”

তিনজনেই হেসে উঠল।

ঘরের দোরে টোকা।

—“Entrez.”

\* “Le charme qui touche le plus les âmes est le charme du mystère. Il n’y a pas de beauté sans voiles, et ce que nous préférons, c’est encore l’inconnu. L’existence serait intolérable si l’on ne rêvait jamais ..” Le Jardin D’epicure—ANATOLE FRANCE

## মসিয়ে বেনারের সঙ্কল্প

আনাকে দেখে স্বপন ও সন্ধ্যা দুজনেই ওঠে চমকে। অশ্রুর ইতিহাস এতই স্পষ্ট!...পাউডার-প্রসাধনে লুকোবার প্রয়াস বুঝা।...

আনা সোজা এসে মসিয়ে বেনারের পাশেই বসল সোফাটিতে। মসিয়ে বেনার একটু উঠে বসলেন। সন্ধ্যা ওর অপর পাশে বসে ওর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিল টেনে। স্বপন একটু ইতস্ততঃ 'ক'রে সোফার সামনেই একটি কোচে বসল।

খানিকক্ষণ কেউই কথা বলে না। মুহূর্তনধো ঘরের হালকা হাওয়া যেন ভারি হ'য়ে ওঠে...সমুদ্রের দীর্ঘচ্ছন্দ নিঃশ্বাস সে-নীরবতার গটভূমিকায় দীপ্ত আকাশের গায়ে ভূষ শৈলমালার তরঙ্গ-রেখার মতন স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। একটা জাহাজের বিষম গম্ভীর বাঁশি অনেকক্ষণ ধ'রে বাজে...সকলেই যেন কান পেতে শোনে! ঘরের হাওয়া যেন আরও থমকে যায়।...কারুর কিছু বলা এমন বিসদৃশ ঠেকে...সন্ধ্যা ও আনার দেখা হ'লেই প্রথমটায় কেন এমন হয়!

সন্ধ্যা জোর ক'রেই তার কণ্ঠের মধ্যে সহজ সুর টেনে এনে বলল : "জানো আনা, তোমার আসবার একটু আগেই মসিয়ে বেনারের সঙ্গে কি কথা হ'চ্ছিল?"

আনা জিজ্ঞাসুভাবে শুধু তার মুখের দিকে তাকাল, কিন্তু কোনো কথাই বলল না।

বাধ্য হ'য়ে সন্ধ্যাই ফের বলল : "মসিয়ে আমাদের সঙ্গে ভারতবর্ষে যেতে নিষ-রাজি। এখন শুধু তোমার হ্যাঁ বলার অপেক্ষা।"...কিন্তু এমন বিসদৃশ শোনার এ-ধরনের লম্বুভঙ্গি কথা!

আনার সঙ্গে চকিতে স্বপনের দৃষ্টি-বিনিময়ে দুজনেই চোখ নেয় ফিরিয়ে। ঘরের মধ্যে অস্বস্তির ভাবটা যেন আরো ঘন হয়ে ওঠে!...

সন্ধ্যা পরপর স্বপন, মসিয়ে বেনার ও আনার মুখের দিকে তাকায়। পরে যেন অনেকটা কি বলবে ভেবে না পেয়েই বলে : “কি বলো আনা? রাজি তো?”

আনা তবু কোনো কথা কয় না।

মসিয়ে বেনার আনার দিকে চকিত কটাক্ষ ক’রেই সন্ধ্যার মুখে পরে দৃষ্টি রেখে বলেন : “তোমার সাদর নিমন্ত্রণের জন্তে তোমাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি না শেরি, কিন্তু এখন তো আর হয় না।”

—“কেন?”

—“এইমাত্র চাঁদের তার পেয়েছি : সে সামনের শুক্রবারেই আমেরিকার জাহাজ ধরবে। তাতে আমাদের জন্তে দুটো ‘সেগুন’ রিজার্ভ করেছে। এই দেখ তার। ক্যাল থেকে জাহাজ ছাড়বে।”

সন্ধ্যা সেটা না পড়েই বলে : “তাতে কি? রিজার্ভি যে আর নাকচ করা যায় না তা তো নয়।”

—“জানি। কিন্তু সত্যিই চাঁদ ও ইসাবেলার পক্ষে পারিস এখন নিরাপদ নয় : ওরা বত শীঘ্র এ-দেশ ছাড়ে ততই ভালো। আর, ওদের সঙ্গেও একজনের থাকা দরকার।” বলে সন্ধ্যার পানে চেয়ে আরও কোমল স্বরে বললেন : “তাই কিছু মনে করো না শেরি, তোমাদের জিজ্ঞাসা না ক’রেই এইমাত্র ওদের তার ক’রে দিয়েছি যে, কাল ভোরের ৯ গাড়ীতেই আমি ও আনা পারিস রওনা হচ্ছি, সেখানে বুধবারের মধ্যে সব গুছিয়ে নিয়ে ওদের সঙ্গে একত্রে ‘ক্যাল’ রওনা হব।”

আনার অশ্রুক্ষীত চোখ দুটির তাৎপর্য্য এতক্ষণে স্বপন ও সন্ধ্যার কাছে ধরা পড়ে।



স্বপনও অস্বস্তিকর নিশ্চিন্ততা ভঙ্গ করার জন্তেই যেন অর্থহীন ভাবে প্রশ্ন ক'রে বসে : “কখন তার ক'রে দিলেন?”

মসিয়ে বেনার ছোর ক'রেই হেসে বলেন : “ঠিক যখন তুমি এই ঘরে ঐ সামনের ঠাণ্ডা মানভঙ্গ করতে ব্যস্ত ছিলে।”

সন্ধ্যা হাসবার চেষ্টা ক'রে বলে : “এ-ঘর থেকে তো আপনি ও আনা মাত্র খানিক আগে গেলেন। এর মধ্যে মন-স্থির করলেনই বা কেমন ক'রে, আর তার করলেনই বা কবে?”

মসিয়ে বেনার মুহূর্ত্ত হেসে বললেন : “মন তো আনাদের প্রায় স্থির করাই ছিল সন্ধ্যা। আর তাব করা তো এক মিনিটের কাজ—বিশেষতঃ এরকম হোটেল থেকে। মানোজ্ঞারকে বলে দিতেই তিনি সটাং টেলিগ্রাফ অফিসে টেলিফোনেই আমার উত্তরটা পাঠিয়ে দিলেন।”

—“কিন্তু আনাকে রাজি করলেন কখন?”

—“এইমাত্র—ওরই ঘরে।”

সন্ধ্যা এবার রাগ করল : “এ আপনার ভারি অকৃত্য কিন্ন মসিয়ে। আনাকে রাজি করবার আগে না-হয় ভদ্রতার খাতিরেও রাজিনামায় আমাদের সইটা চাইতেন একবার?”

মসিয়ে বেনার ব্রিঙ্ক হেসে বললেন : “রাগ কোরো না শেরি—তাতে আসল সমস্যাটার কী-ই বা এমন সুরাহা হ'ত বলা তো? তা ছাড়া একটু শান্তচিত্তে ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে যে, এ-ই সব চেয়ে ভালো হয়েছে সকলের পক্ষেই।”



—“কক্ষনো না। আপনি না-হয় বাত সারতে এখানে থাকতেনই দুদিন। আমেরিকা তো আর পালাছিল না? এত কী তাড়াতাড়ি ছিল শুনি?”

মসিয়ে বেনার আরও প্রশান্ত হুঁরে হেসে বললেন : “তাড়াতাড়ি একটু ছিল বৈ কি সন্ধ্যা—তুমি তো বুদ্ধিমতী মেয়ে। বুঝতে কি পারো না?”

সন্ধ্যা মুখ ঝিচু করে। স্বপন ও আনা দৃষ্টি-বিনিময় করেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। আনা ওর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই জানলার দিকে তাকিয়ে থাকে। বাইরে হাওয়া আরো দীর্ঘশ্বাস ফেলে।...সামনের ঝাউ ও পাইনের সার যেন সে তালে তালে পা ফেলে সমান কদমে চলে—সমুদ্রের বিবর্দ্ধমান অশ্রান্ত কল্লোলের সঙ্গে। সকলে কান পেতে শোনে।

\* \* \*

হঠাৎ আনার একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে সন্ধ্যা মুখ তুলে তার দিকে তাকায়। কিন্তু আনার দৃষ্টি তখন বহুদূরে হুহুর দিগন্তে একটি ধূসরভ মেঘের শিখরে নিবদ্ধ।

স্বপনের বকের মধ্যে কি একটা বেদনা ওঠে ঢলে। সে স্পষ্ট অসুস্থত্ব করে তারই স্পন্দন সবার অস্বাচ্ছন্দ্যে। চোখ পড়ে তার : সন্ধ্যা মসিয়ে বেনারের দিকে তাকাতেই দেখে তিনি তার মুখের দিকেই একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন—অক্লমনস্ক ভাবেই যেন : তাঁর গুণ্ঠপ্রান্তে যেন একটা পথভোলা হাসির রেশ লেগে। সন্ধ্যা মুহূর্তের বলে : “মসিয়ে!”

—“মাদা—সন্ধ্যা?”

—“খানিক আগে খোলাখুলি আলোচনা করবেন কথা দিয়েছিলেন : কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে-কথা মনে রাখবেন কি?”

—“রাখব।”

সন্ধ্যা তাঁর মুখের 'পরে অচঞ্চল দৃষ্টি স্থাপন ক'রে বলল : “আনাকে নিয়ে চ'লে যাচ্ছেন বে আপনি প্রধানতঃ আমার ভালোর জন্তে সেটা করতে পারি। কিন্তু এটা সকলের পক্ষেই ভালো না-ও তো হ'তে পারে?”

মসিয়ে বেনার উত্তর দিতে গিয়ে কি ভেবে খেমে গেলেন। আনা হঠাৎ উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।...সন্ধ্যা তাঁকে উঠে যেতে দেখে তার দিকে একবার চেয়েই মসিয়ে বেনারের দিকে ফিরে বলল : “এর উত্তর দিতে এতই কী সঙ্কোচ?”

মসিয়ে বেনার একটু হেসে মুহূ স্বরে বললেন : “ঠিক সঙ্কোচ নয় শেরি, তবে...এ-সব আলোচনার বিশেষ লাভ আছে কি?”

সন্ধ্যা দৃঢ়স্বরে বলল : “আছে।”

মসিয়ে বেনার উত্তর না দিয়ে তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে রইলেন থাকিয়ে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি কি সন্ধ্যাকে দেখছিল, না দেখছিল আর একটা কিছু—তার মধ্যে দিয়ে? হঠাৎ তাঁর শূন্য-দৃষ্টির মধ্যে একটা কারুণ্য ধীরে ধীরে উঠল ফুটে। তিনি শান্তস্বরে বললেন : “তা হ'লে শোনো সন্ধ্যা। আর হয়তো তুমিই ঠিক—একটা খোলাখুলি আলোচনা হওয়া ভালোই।” ব'লে আনার দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে স্বর মুহূ ক'রে নিয়ে বললেন : “ওর আসলে আমেরিকা বাবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। আমি মত করলে ও আমেরিকা না গিয়ে তোমাদের নিমন্ত্রণই গ্রহণ করত।” ব'লে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন : “কিন্তু...কথা হচ্ছে তোমাদের দুজনের...একত্রে থাকা...অসম্ভব।”

সন্ধ্যা মুখ নিচু ক'রে একটু লাল হ'য়ে ওঠে, কিন্তু প্রাণশূন্য আত্ম-সংবরণ ক'রে নিয়ে মুহূ অথচ দৃঢ়স্বরে জুতোর গোড়ালি দিয়ে কার্পেটের

একটা ফুলের ওপর অবিশ্রান্ত আঘাত করতে করতে বলল : “কিন্তু—  
কেন, যদি জিজ্ঞাসা করি?”

মসিয়ে বেনার ঈষৎ স্নান হেসে বললেন : “আমাদের আধুনিক  
সমাজে এবং তার হাজারো দাবি-দাওয়ার কেন্দ্রে বাস করতে হ’লে—  
বুঝতে কি পারো না শেরি?”

সন্ধ্যা একটু চুপ ক’রে থেকে হঠাৎ মসিয়ে বেনারের মুখের পানে  
চেয়ে বলল : “যদি কিছু মনে না করেন তবে—”

মসিয়ে বেনার সেইভাবেই হেসে বললেন : “মনে কিছু করতে  
পারি কখনো?”

সন্ধ্যা তবু একটু ইতস্ততঃ করে : “আমার জিজ্ঞাস্তা এই...অর্থাৎ  
আমার কাল থেকে একটা প্রশ্ন কেবলই মনে আনাগোনা করছে যে—”

—“বলো।”

সন্ধ্যা ঋণিকবর্ণে কি ভাবে : “কথাটা আমার মুখে একটু কেমন  
কেমন শোনাতে ব’লেই—অপচ মনে হচ্ছে যে, সকলের সাম্মুখে একটা  
খোলাখুলি কথাবার্তা হ’লে—”

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন : “দেখেছ তো সন্ধ্যা, ঋণিক আগে  
যা বলছিলাম ঠিক কি না? খোলাখুলি কথাবার্তা চাও ব’লে তুমি  
এইবার কতই না তর্ক করছিলে, কিন্তু আমি নিশ্চয় ক’রে বলতে পারি  
যে, আমাদের মধ্যে খোলাখুলি কথাবার্তায় সব চেয়ে আপত্তি যদি কারুর  
থাকে তবে সে তোমার মনটির। নইলে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে  
তোমার মনে এত শত দ্বিধা দ্বন্দ্ব আসে? ভেবে বলো ঠিক বলিনি আমি?”

সন্ধ্যা ঈষৎ লজ্জিত হ’য়ে মুখ নিচু ক’রেই ঝঙ্কু হ’য়ে ব’সে বলে :  
“ঠিক তা নয়—তবে—” ব’লে আবার খেমে যায়। সকলেই একযোগে  
তার মুখের দিকে তাকায়।

তাদের সে মিলিত দৃষ্টির সামনে সক্ষ্য যেন হঠাৎ বল পেয়ে যায়, দৃঢ়স্বরে বলে : “আমার জিজ্ঞাস্তা ছিল—আমার ও আনার একত্রে থাকা অসম্ভব কেন?—আমি নিছক কোতূহল বশে এ-প্রশ্ন করছি ভাববেন না আশা করি?”

মসিয়ে বেনার একটু চুপ ক’রে রইলেন, পরে বললেন : “এ যে তোমার নিছক কোতূহলের প্রশ্ন নয় তা বুঝতে খুব বেশী অন্তর্দৃষ্টির দরকার করে না সক্ষ্য।” তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে যে-একটা শান্ত হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল, সে যায় নিলিয়ে...তিনি গভীর মুখে বলেন : “কিন্তু কি জানো শেরি? প্রশ্নটি তোমার সহজ, কিন্তু উত্তরটা নয়। কারণ সমস্তটা তাল-পাকিরে উঠেছে মাহুরের সংস্কার, বুদ্ধি, হৃদয় প্রভৃতি নানা বস্তুর জটলায়। এমন ধাঁধার এক কথার কোনো সমাধান নির্দেশ ক’রে দেওয়া—বুঝলে না?”—বলে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন : “তার চেয়ে এক কাজ করি। আনার জীবনের একটা অনুরূপ ঘটনার কথা বলি। তা থেকে আর কিছু না হোক অন্ততঃ এটা বুঝতে পারবে যে, আনাকে যে আমি সরিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছি সেটা অনেক ভেবে-চিন্তেই। বলব সে-কাহিনী? শুনবে?”

সক্ষ্য সাগ্রহে বলল : “শুনব না? বাঃ।—কেবল একটা কথা। কী ধরনের কাহিনী আপনার, বলবেন আগে?”

মসিয়ে বেনার ঈষৎ স্নান হেসে বললেন : “কাহিনীটা বে খুব অসাধারণ তা নয়। হৃদয়ের সেই চিরন্তন বিয়োগ-নাট্য। একসঙ্গে বিপরীত আকর্ষণের ফলে সমাজ ও হৃদয়ের ঠোকাঠুকি। শুনবে?”

সক্ষ্য মুহূ হেসে বলে : “এ না শুনবে কে মসিয়ে? কেবল, কিছু যদি মনে না করেন তবে গল্পটি ফাদবার আগে এইমাত্র যে-কথাটি বললেন সে-সবকে একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?”

মসিমে বেনার একটু ফেসে বললেন : “কি ? এক সঙ্গে একাধিক ভালোবাসা জীবনে উচিত কি না ?”

সন্ধ্যা দৈবতঃ রাগতঃ স্বরে বলল : “আপনারা মেয়েদের কেবলই ভাবেন নীতিবাণীশ—এইজ্যেট তো রাগ হয় এমন ! আমরা কি কোনো সমস্তার উচিত-অতুচিত ছাড়া অজ্ঞ কোনো দিক অন্যভাবে আলোচনা করতেও পারি না ?”

মসিমে বেনার সমাজে বললেন : “রাগ কোরো না শেরি । আমি টিক অতটা বলতে চাইনি । তবে এটা হয়েতো ইঙ্গিত করতে চেয়েছি যে, মেয়েরা জন্মের সব সমস্তাই অতুত্ব দিয়ে যতটা বুঝতে পারে—বুঝি দিয়ে উতটা পারে না । অথচ আলোচনা জিনিষটার অনেকখানি অতুত বুজির এলাকায় । কিছ-এ শুক আজ থাক । বলা কী প্রশ্ন তুমি করতে যাচ্ছিলে । উচিত-অতুচিত নিয়ে প্রশ্ন যদি নয় তবে না জানি কেমন প্রশ্ন সে ।”

—“আমার জিজ্ঞাস্য ছিল একসঙ্গে একাধিক ভালোবাসা কি নতুনে ছাড়া কোথাও সত্যিই সম্ভব ? অর্থাৎ আমাদের দ্বয়টা যে-উপাদানে গড়া তাতে তার সমস্ত টান এক দায়গার সংহত হ’লেই কি সে দ্বয় সেবে সার্থক হ’য়ে ওঠে না ?”

মসিমে বেনার একটু ফেসে বললেন : “দেখেছ সন্ধ্যা, তোনার প্রশ্ন কুত্বে-কিরে সেই উচিত-অতুচিতেরই গা-ঘেঁষে যাচ্ছে । যেন বলতে চাইছে সব টান এক দায়গার সংহত হ’লে তবেই ভালোবাসার সার্থক ওওয়া উচিত । নয় কি ? ভেবে দেখো ।”

—“এর নাম হ’ল উচিত-অতুচিতের গা-ঘেঁষে যাওয়া ? কখনো না । আপনাবা—লি কুটুমি । আমি তো শুধু জিজ্ঞাসা করেছি—এটা সম্ভব কি না—আমরা এক সঙ্গে একাধিক জনকে ভালোবাসতে পারি কি না ? বানে—বাতবে—জীবনে ।”

—“পারি ব’লে পারি শেরি? না-ভালোবেসেই পারি না যে।  
এতবড় বাস্তব সম্বন্ধেও যে তোমার মনে সংশয় জেগেছে তাইতেই তো  
প্রমাণ হচ্ছে—”

সন্ধ্যা বাধা দিল রাগ ক’রে: “কে—র আপনি ঠাট্টার মূর ধরেছেন।  
আমাকে আপনি চাইছেন না বুঝতে। আমি কি বাস্তবকে চোখ  
চেয়ে দেখছি না? না, এ সামান্য সত্যটাও অস্বীকার করতে চাইছি  
যে, সাধারণ মানুষ নিত্য নানা টানের ফেরে শুধু রাগ রাগ নোনা  
জনই খেয়ে মরে? আমি শুধু জিজ্ঞাসা করতে চাইছি যে, জন্মের  
বিকাশ চ’লে—”

—“ভালোবাসার সম্ভাবনা তো আরও বেড়েই যাবে শেরি। বরং  
দুঃখ যেখানে ঘুমিয়ে থাকে সেখানে নানা ভালোবাসার কিরণ তার নানা  
পাশড়ি চকু মুকেও থাকতে পারে। কিন্তু যেখানে সে যত আগ্রহ সেখানে  
প্রতি ছোট স্পন্দনেও তা’র বুকের তার ততই গুঠে বেজে—তুমি আমি  
কি করব বল?” ব’লেই মূর বদলে নিয়ে বললেন: “রাগ কোরোনা  
সন্ধ্যা—করাসী বুঝোয়াদের মূরের মধ্যে নানা সময় অজান্তে একটু  
ব্যবের মূর ভেসে গুঠে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, বক্তব্যটা ভাবের  
গম্ভীর নয়। সত্যিই এটা আমার কথার কথা নয়—আমার বৈচিত্র্যবহুল  
জীবনের প্রতি পাঠার সাক্ষ্যের কথা।”

বপন বলল: “কী?”

—“যে, সং বা সত্যের একজনের বেশি কাউকে ভালোবাসতে  
না-পারাতা মানবাত্মার কোনো মহান বিরাট মহিমার সত্যতার সূচনা করে  
না। ও হচ্ছে আসলে সত্যীর্ণ, অসম্পূর্ণ; সাধনের পরিচয় দেয় না, দেয়—  
কল্পনার বীনতার, সাদা সেওয়ার অন্ধকারতা। আমাদের জন্মটা একতারা  
নয়—বহুতন্ত্রী—তাই নানা প্রেমাস্রদের আত্মার পরশের সে অপেক্ষা

রাখে। কেননা একজন কখনো তার সব তারগুলির নাগাল পেতেই পারে না—তা সে যতই কেননা আদর্শ প্রেমিক হোক।”

সন্ধ্যা একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে : “ও তো হ’ল উপমার কথা। যদি বলি যে, জনরের নানা তার অনেক সময়ে একজনের ছোঁওয়াতেই নিত্য-নতুন ভাবে রপিয়ে ওঠে? যেমন একই কণ্ঠে ফুটে ওঠে নিত্যনতুন সুর?”

—“আপত্তি করছে কে? আমার আপত্তি : যখন তোমরা বলা যে, একজন ছাড়া আর-একজনের ছোঁয়াতে এ-তার বেজে উঠতে পারেই না, বা উঠলে ‘মহতী বিনষ্টি’।”

—“কিন্তু আপনি আপত্তি করলেই বা শুনব কেন? যার অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য এই-রকম, তাকে বোঝাবেন কী বলে?—যার জনরের তার একজন ছাড়া আর কারুর ছোঁওয়ায়ই বেজে ওঠে না—”

—“রাগ কোরো না শেরি, তার কল্যাণও আমি বলব যে, হয়, তার জনরের তারগুলি সুরে বাধা হয়নি—না-হয়, তার অভিজ্ঞতার বহর ধ্রুব বেশি না। কারণ পরলা নদর : বৈচিত্র্য হ’ল সৃষ্টির একটা গোড়াকার কথা; দোসরা : সৃষ্টির সেবা-বিকাশ—মাহুষ। কাজেই সিদ্ধান্ত : মাহুষের কনয়েই সব চেয়ে বেশি ফুটেবে বৈচিত্র্যের আলোছায়া—অর্থাৎ এক্ষেত্রে গতির মধ্যে দিয়ে সে সার্থক হ’তে পারেই না।”

এবার স্বপন বলল : “এ-কথা আমারও সম্প্রতি বার বারই মনে হয়েছে মসিয়ে। কেবল সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা প্রশ্নও উঠেছে জেগে : মাহুষ যদি প্রকৃতিতে আসলে বহুনিষ্ঠই হয় তবে জগতের প্রতি সভ্য সমাজেই একনিষ্ঠতার এত গুণ-গান ধুম-ধাম কেন?”

হাসিয়ে বেদার বললেন : “তার কারণ একটা নয়—কয়। সভ্যতার প্রভাবিত্তে এক-একটা আইডিয়া যখন বিকাশ-লাভ করার মুখে আসে, তখন তারের দাবি একটু অসহিষ্ণু না হ’লে তার বাজতেই পারে না। সেই

জল্পেই দেখা যায় যে মানব-সমাজে ক্রম-বিকাশের পথে এক-একটা বিশেষ অবস্থায় এক-একটা বিশেষ আইডিয়া আমাদেরকে ভূতের মতন পেয়ে বসে। একনিষ্ঠতার আইডিয়া সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। কিছুদিন ধরে ও আমাদের বিকাশের পথচলায় একটুখানি কণিক আলো ধরেছে মাত্র—প্রেমকে সংহত করতে চেয়ে।”

স্বপন বলল : “তা হ’লে অনেক পণ্ডিতেও বলেন কেন যে একনিষ্ঠতা নইলে শুধু দাম্পত্য-জীবন নয়—সমাজও টিকতেই পারে না !”

—“বলেন তাঁরাও কম বেশি বাল্য-সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে পারেননি বলে। কারণ ইতিহাসের প্রতিপৃষ্ঠাই এ-ধিওরির বিরুদ্ধ সাক্ষ্য তরা।”

সন্ধ্যা সন্নিধ্ব সুরে বলল : “তাই কি ?”

—“তার আর সন্দেহ আছে ? কে না জানে যে মানুষের ক্রম-বিকাশের যুগে প্রতি সমাজেই একটা যুগ ছিল যখন তার গৌরব মাশা হ’ত তার পত্নী বা প্রণয়িনীর সংখ্যা দিয়ে। কিন্তু এ-উচ্ছ্বাসতার প্রতিক্রিয়ারও দরকার হ’ল—যার ফলে সে এমন কথাও বলে বসল যে, ‘মানুষের সব চেয়ে বড় কীর্তি হচ্ছে নারীকে একেবারে বরকট করতে পারা।’” বলে একটু থেমে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন : “তাই আমার এক প্রিয় বন্ধু ভালের বলত সন্ধ্যা, যে, আমাদের সমাজের এক-একটা ব্যবস্থা বা বিধান আমাদের পথের-বাঁকে এক-একটা পাহাশালা মাত্র—চরম গন্তব্যস্থান নয়। একনিষ্ঠতার ক্ষেত্রেও ঐ কথা। এটা সমসাময়িক সমাজের একটা অস্থায়ী বিলি ব্যবস্থা বৈ আর কিছুই নয়।”

সন্ধ্যা বলল : “আপনার একথায় কিন্তু আমার মন কিছুতেই সার দিতে পারছে না মসিয়ে, মাক করবেন। কারণ এই কথাই যদি সত্য হবে তা হ’লে নারীর সতীত্ব বা পুরুষের চরিত্রবলে আমাদের কবর এমন ক’রে মাদা দেয় কেন ?”



মসিয়ে বেনার ঈশ্বর হেসে বললেন : “দেয়, তুমি এমন সমাজের মধ্যে জন্মেছ বলে যে-সমাজ—একনিষ্ঠতার ভিত্তির ওপরই গড়েছে তার গৃহ-জীবনের ইমারৎ। ঐক্যেই তো ভালের প্রায়ই বলত : বর্তমানের দোষই এই যে, সে নিজেকে অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝামাঝি একটা ক্রম-বিকাশ হিসেবে দেখতে চায় না—চিরন্তন মনে ক’রে বসে। ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের আমি এত ভক্তও এইকালে। তাতে ক’রে আমাদের চোখের ঠুলি যায় খসে—কল্পনার চক্রবাল হয় বিস্তৃত—উদার। আমরা দেখতে পাই যে, অনেক কিছুই স্রেফ সাময়িক বাক্যে আমরা শুধু ইতিহাস-না-জানার জন্যেই ভেবে বসি চিরন্তন।”

সন্ধ্যা বলল : “কি রকম?”

—“ঐ নারীর সতীত্ব আর পুরুষের—কি বলছিলে!—চরিত্রবল না? জন্মের দৃষ্টান্তই নেও না কেন। ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের দুটো পাতা উলটোলেই দেখতে পাবে যে, মানুষের সমাজ-ব্যবস্থায় সর্বত্রই এমন একটা যুগ ছিল যে-যুগে ওদেরকে নিয়ে কেউই বড়-একটা মাথা ঘামাত না। স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রী তার দেবরের সঙ্গে থাকলে স্বামীও সেটা স্বাভাবিক না—বা প্রবাসী-কাল বিদেশে নতুন ঘরকরা পাতলে প্রোথিত-ভর্তুক! বুক চাপড়ে আত্মহত্যা করতেন না।—শুধু এই না—এর চেয়ে দোমহর্ষক দৃষ্টান্ত পাবে। অনেক দেশেই অতিথিকে পত্নী পরিবেষণ করতে না বাধত স্ত্রীর সতীত্বের—না, স্বামীর পৌরুষের। এ-সবকে কী বলবে!”

আনা বলল : “কিন্তু এ-সব আলোচনা এখন থাক মসিয়ে। তার চেয়ে আপনার কাহিনীটাই বলুন।”

মসিয়ে বেনার বললেন : “হ্যাঁ তাই বোধ হয় ভালো—বিশেষতঃ যখন এটা অত্যন্ত জানা কথা যে একনিষ্ঠতার আইডিয়া মানুষের প্রাচীন

করেছে, ওতে ক'রে মানুষের জন্মের পরমতম বিকাশ হয় ব'লে নয়—  
সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ঠিক-করার সুবিধে হয় ব'লে।”

স্বপন বলল : “আমার কিন্তু এ-কথাটা সম্পূর্ণ সত্য ব'লে মেনে নিতে  
বাধে মসিয়ে। এ যেন সেই মাদ্রাতার-আমলের কথার গা-থেষে যাচ্ছে  
যে, পুত্রের জন্তেই ভার্য্যা। পুরুষে যে নারীর কাছ থেকে সত্যীত্বের দাবি  
করে সে কি শুধু আত্মজের স্বাজাত্য রক্ষার জন্তে? নরনারীর সম্বন্ধের  
মধ্যে কি অর্থনীতি ছাড়াও অন্য কোনো রকম দাবি-মাওয়া নেই?”

—“আমাকে তুমি একটু ভুল বুঝেছ মনামি! আমি তো হাল-  
আমলের আর্থিকদের মতন বলিনি যে, নারীর সত্যীত্বের একমাত্র সার্থকতা  
অর্থনৈতিক। আমি শুধু বলেছি যে, যৌন-নীতির ইমারতের একটা মস্ত  
ভিত্তি—অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা।”

স্বপন বলল : “কিন্তু যদি বলি যে, শুধু অর্থনৈতিক সুব্যবস্থার জন্তেই  
সভ্যসমাজে একনিষ্ঠতার চল হয়নি? যদি বলি : এর মধ্যে দিয়ে নর-  
নারী আত্মবিকাশের ঋণিকটা সার্থকতাও না পেলে যৌন-নীতির ইমারত  
শুধু ঐ অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপরই এতদিন খাড়া থাকতে পারত না?”

মসিয়ে বেনার চিন্তিত সুরে বললেন : “তোমার এ-কথার মধ্যে যে  
একটুও সার নেই তা বলি না। আর আমি যে অর্থনৈতিকদের ব্যাখ্যায়  
সর্বত্রই সায় দেই তাও না। তবে কি জানো! আমি বলি যে ঠিক ঐ  
আত্মবিকাশের জন্তেই সত্যীত্ব একনিষ্ঠতা প্রভৃতিকে একটু ছোট ক'রে  
দেখার দরকার। এক সময়ে এ-সবের মধ্যে মাদ্রব হয়তো ঋণিকটা  
সার্থকতা পেয়েছে—কিন্তু সে-সুখ একেবারে গত না হ'লেও বাবার দাবিল  
—এ নিশ্চয়। আমাদের বোকবার সময় এসেছে যে এ-ব্যবস্থা চিরন্তন  
তো নয়ই—শুধু দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থাও নয়। আর সত্যীত্বের মূলে অনেকখানি  
হান জুড়ে আছে—ঐ সন্তান।”

খপন সন্নিহিত হয়ে বলল : “কিন্তু তা হ’লে যেখানে সম্ভানের প্রশ্ন ওঠে না সেখানে সতীত্বের দর এত বেশি কেন ?”

মসিয়ে বেনার হাসলেন : “কোথায় বেশি, বন্ধুবর ! আজকের যুরোপের সঙ্গে মধ্যযুগের যুরোপের তুলনা ক’রে দেখ তো একবার। সে-সময়ে সতীত্বের যে-দর ছিল তার সঙ্গে আজকের দরের কি কোনো তুলনা হয় ? না, এ-যুগে সতীত্বের বাজারদর কমার দরুণ চার্জের মড়াকান্না তোমার কানে এখনো পৌঁছয়নি ?”

—“কিন্তু—”

—“এতেও যদি তোমার প্রত্যয় না হয়, তবে আর একটা দৃষ্টান্ত দেখে—যেটা এতকণ দিতে চাচ্ছিলাম না।”

সকলে ঈষৎ উৎসুক হ’য়ে মসিয়ে বেনারের মুখের দিকে তাকাল। তিনি বলতে লাগলেন : “সেটা এমন কিছু শক্ত কথা নয় অবিজ্ঞিত তবে সোজা কথা বটে। সেটা হচ্ছে সম্ভানের জন্মনিরন্তনের ব্যবহার সঙ্গে সতীত্বের সম্বন্ধ। দেখতে পাবে এ-উদ্ভাবনের পর থেকে সভ্যসমাজে সতীত্বের জোয়ারে কি হুহু ক’রে ভাঁটা এসে গেছে। যদি নারীর সতীত্বের সঙ্গে এ অবাস্তব সম্ভানের প্রশ্নের একটা গভীর যোগ না থাকবে তা হ’লে কি এটা সম্ভব হ’তে পারত ! যুরোপের তন্ত্র ঘেঁষের সঙ্গে তো মিথছে সেন। তোমার কি মনে হয় তারা ঠিক ঐ ইতালীর মাদনা বা ভারতের সতীদেবী হাতে ঢালা ?”

আলা আরও জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। খপন মুখ তুলে চাইতেও পারে না। সন্ধ্যার মনেও লাগে ওদের অবস্থির হোঁয়াচ। শেষটার খপন জোর ক’রেই তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটা সহজ স্বর টেনে এনে বলল : “কিন্তু তাই ব’লে কি আপনি বলতে চান যে, একনিষ্ঠতার মূলে যে-সংঘর্ষ ও সহন-জ্ঞান আছে—যে-গভীরতা আছে—যে-সুত্রতা

মাছে—তার কোনোই মূল্য নেই ? না, প্রতি পদে সত্তা আকর্ষণের পায়ে লুটিয়ে পড়ার মধ্যে কোথাও একটুও অগৌরব নেই !”

সন্ধ্যা একবার স্বপনের দিকে চকিত কটাক্ষ ক’রে প্রীতহৃয়ে বলল : “সিসির এ-কথায় আমার মন খুবই সাড়া দেয় মসিয়ে—তা আপনি বতই কেন মাদনা বা সতী-সাধবীদেরকে ঠাট্টা করুন। সত্তা আকর্ষণের পায়ে প্রতি মুহূর্তে লুটোনের মধ্যে আমোদও থাকতে পারে—আবেশও মিলতে পারে—কিন্তু যেটা পারে না সেটার নাম—সংঘের গরিমা ও অমৃতত্বের মাধুর্য্য।”

মসিয়ে বেনার কি-একটা উত্তর দিতে গিয়ে আত্মসংবরণ করলেন।

সন্ধ্যা একটু উৎসাহিত হ’য়ে বলতে লাগল : “আপনি এইমাত্র উপমা দিলেন : হৃদয়ের নানা তার নানা প্রেমিকের সৌধীন আঙুলের পরশে বিহ্বল হ’য়ে বেজে ওঠে। উপমাটি শুনে অবস্থা দৃষ্ট না। কিন্তু যতটা স্তম্ভ্য ঠিক ততটা গভীর কি ? একটু তলিয়ে দেখতে গেলে কি ওকে ছদ্মবেশে বথেকাচারেরই ওকালতি বলা চলে না ? অমৃত শতকরা নিরানব্বই জন লোক যে-ভাবে প্রবৃত্তি-চরিতার্থ করতে ছোটো তাতে আমি তো কিছুতেই ভাবতে পারিনি যে তারা তাদের হৃদয়ের নানা হৃদয় তার কাপাতেই ছুটেছে।”

মসিয়ে বেনার কোমলকণ্ঠে বললেন : “তোমাকে আমি হয়তো অজান্তে একটু আঘাত দিয়েই ফেলেছি শেরি—নইলে তুমি এতবড় ভুলটা ক’রে বলতে পারতে না যে, ছদ্মবেশে আমি উচ্ছ্বলতারই ওকালতি করতে চাচ্ছি। বলেছিই তো : একনিষ্ঠতাকে আমি শুধু অর্ধমৈত্রিক দ্বিক দিয়েই বিচার করিনি। আমি দেখতে চেয়েছি যে, একনিষ্ঠতার সত্ত্বতা—মতিমা—মাধুর্য্য—আর কি ?—সংঘ-সম্মত জ্ঞান না ?—হ্যাঁ এ-সবের মূলে মস্ত একটা অবাস্তব জীবন লুকিয়ে রয়েছে—তার নাম সম্পত্তি-জ্ঞান।”

সন্ধ্যা বলল : “ও-কথা না-হয় মেনেই নিলাম। কিন্তু উচ্ছ্বলতার ও অসংযমের প্রসঙ্গটা আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন যে।”

মসিয়ে বেনার একটু হেসে বললেন : “এড়িয়ে যাইনি সন্ধ্যা। আর কেন যাইনি শুনবে? কারণ আমি বুদ্ধ।”

—“মানে?”

—“মানে, বার্কিকোর দোষ অশেষ হ’লেও তার একটা গুণ আছে এই যে, সে সহজে ভোলে না যে, জীবনের নিরুদ্দেশ-বাতায় দুটো বিপরীত পথের মাঝামাঝি একটা পথ প্রায়ই থাকে। তাই শৃঙ্খলাকে গ্রহণ না-করার অর্থই যে নিছক উচ্ছ্বলতাকে বরণ করা—তা নয়; বা সংযমের অতিনির্দিষ্ট চৌহদ্দিকে অনেক সময়ে অতিক্রম করতে চাওয়ার মানে নয় যে, যাকে দেখে মন একটুও বিচলিত হ’ল—সব ছেড়ে তার পিছু ধাওয়া করতেই হবে।”

সন্ধ্যা কি একটা উত্তর দিতে গিয়ে চূপ ক’রে গেল। মসিয়ে বেনার বলতে লাগলেন : “আমি বলেছি শুধু এই যে, একাধিক জনকে ভালোবাসতে পারাটা কামা। কিন্তু তার মানে কি এই যে আত্মহাসনের মতন প্রতি রায়ে একজন একজন ক’রে নতুন বন্ধু পাকড়ে তাকে প্রেম-নিবেদন না-করলেই সে-ফুলশয্যা নামজুর? আমি চাই বটে মানুষকে অসংযমেরও একটু স্বাধীনতা দিতে। কিন্তু সেটা কি শুধু এই সাধু অভিশ্রোয়ে যে তারা সব রাতারাতি উদ্দাম উচ্ছ্বলতার উপাসক হ’য়ে উঠুক! সংসারে বেন সত্য সুকুমার মানুষ ব’লে কোনো জীব একেবারেই নেই। একটু ফাঁক পেয়েছে কি সব উচ্ছ্বলতার রসাতলে ডোবার জরে বুঝিয়ে ব’সে আছে!—বা রে বা! আমার কিলজফির সব্বকে তোমরা তো দেখি খাসা ধারণা গ’ড়ে ব’সে আছে!”

সন্ধ্যা হেসে বলল : “থাকব না কেন? আপনি বলেননি এইমাত্র

যে, আমার ও আনার দুমিনও একত্রে থাকে অসম্ভব! আমরা কি সভ্য নই, না সুকুমারী নই!”

মসিয়ে বেনার একটু শান্ত হলে বললেন : “তোমাদের ক্ষেত্রে হয়েছে আবার উলটো বিপদ। তোমরা তো শুধু সভ্য নও—অতি-সভ্য; শুধু সুকুমারী নও—চুটিয়ে সুকুমারী। নইলে তোমাদের সঙ্গে—একটু খোলাখুলি কথা বলছি বলে মাক কোরো—সেন একসঙ্গে প্রেম করতেও পারত হয়তো। কারণ সামান্যদের সঙ্গে প্রেমের সেনদেনও হয় সহজ—তাদের দাবি-দাওয়া কম হওয়ার দরুন। ঝড় আসে ঐ অসামান্যদেরই বেলায়—তাদের অমূল্যবস্তু একটু বেশি বিকশিত বলে।”

স্বপন ও সন্ধ্যা মুখ নিচু করে রইল।

হঠাৎ আনা বলল : “কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে সামান্যই বলুন বা অসামান্যই বলুন দুজনেরই দাবি কি এক না? বিহারের ক্ষেত্রে মাছুয়ের রুচিভেদ ঘটা বুঝতে পারি—কিন্তু আহারের বেলায় তো সবাই সমান।”

মসিয়ে বেনারের ঠোঁটের কোণে একটুখানি ব্যঙ্গের রেশ দেখা দিতে দিতে মিলিয়ে গেল, তিনি গম্ভীর স্বরেই বললেন : “এ হ’ল তোমার সদন্যতার কথা আনা, কারণ তুলছ কেন সামান্যদের বেলায় প্রেম শুধু ঐ আহারই—বিহার একেবারেই নয়। প্রেমে বিহারের অঙ্গীকরণ করতে পারেন এক তাঁরাই ধারা খানিকটা অসামান্য।”

আনা সন্ধিদ্ধ স্বরে বলল : “তাই কি?”

—“তাই নয়? বাঃ। তুমি কি মনে করো—জু হুসের সাহিত্যিক-প্রণয়িনী অর্জু ত্রাণ তাঁর কাছে যা চাইতেন, ক্রসোর পরিচারিকা-প্রণয়িনী থেরেসা তাঁর কাছে ঠিক তাই চাইত? না, তুমি মরিসের কাছে ঠিক যে জিনিসটি না-পেয়ে তাকে ত্যাগ করেছিলে, পথে ঘাটের মাঝামেঝা তাঁদের মসিয়ের কাছে ঠিক সেই বস্তুটি না পেলে ঘরকন্ডা দেয় উলটে?” বলতে

বলতে তাঁর কণ্ঠের মধ্যে তাঁর অভ্যস্ত কঙ্গ হালি কের ফুটে উঠল, তিনি বললেন : “আটপোরে মেয়েরা শুধু যে আটপোরে প্রেমই চার শেষি—ও চার ব’লেই তো বাঁচোয়! নইলে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রেম করতে যাবার বেলায়ই যদি প্রেমের নানা নৃস্র সৌরভ নিয়ে মাথা ঘামাতে হ’ত তা হ’লে—উঃ—” ব’লে পর-পর সন্ধ্যা ও আনার দিকে তাকিয়ে বললেন : “তাই তো এ-সংসারে যত ক্যান্সাদ বাধে তার পনের আনা হ’ল তোমাদের মতন মেয়েদের মনটিকে নিয়ে, সামান্যতাদের মন নিয়ে নয়। মানে রোমান্সের এলাকায় অবস্থা—বরকন্নার নয়।”

স্বপন হেসে বলল : “ওদের না হয় আলগোছে খুব একচোট কমপ্লিক্টে দিয়ে নিলেন মসিয়ে—কিন্তু সামান্যতারা যদি তাদের সম্বন্ধে আপনার এই ধারণাটি একবার শুনতে পেত—”

- —“সর্বনাশ! তাঁদের চটাতে পারি? তাঁরা আছেন ব’লেই না সংসার চলেছে! নির্জলা অসামান্যতা হলেন নির্জলা হইলি, ও নিয়ে কি চিরদিন ঘর করা চলে? চললে কি আর কসো মাশাম ওয়ার’র সঙ্গে ‘বব’ ক’রেও পরিচারিকা খেরেসার সঙ্গেই করতেন বরাবর ‘কন্না’

সন্ধ্যা হেসে বলল : “যাক এবার কমপ্লিক্ট-টা বেশ উলটে দিয়েছেন। কিন্তু ভিজ্ঞাসা করি—সামান্যতাদের কাছে তা হ’লে আপনি নিজে কি ছদ্মবেশ প’রে থাকতেন না কি?”

—“তার আর সন্দেহ আছে? তাঁদের সঙ্গে যখন প্রেম করেছি তখন কি তাঁদের খুশাকরে জানতে দিয়েছি মনে করো যে, তাঁরা ক্লিওপেট্রা, হেলেন, শোশিরা, এলিজাবেথের চেয়ে একভিলও কম?”

স্বপন ও সন্ধ্যা হেসে উঠল, কিন্তু আনা সমভাবে বাইরের দিকেই তাকিয়ে রইল। মসিয়ে বেনার সম্মুখস্থরে বলতে লাগলেন : “অসামান্যতাদের করি আমি কবর, কিন্তু সামান্যতাদের করি—আদর।”

কারণ তাঁর জীবনে রস-বৈচিত্র্য না আনুন, শৃঙ্খলা আনেন তো ? শান্তি না আনুন, সৌরাস্তি আনেন তো ? সমৃদ্ধি না আনুন, স্বচ্ছলতা আনেন তো ? আর এ-সব দানকে কোন্ পামর অস্বীকার করবে বলা ?” ব’লেই আনার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। তিনি তৎক্ষণাৎ জ্বর বদলে নিয়ে গম্ভীর স্বরে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন : “কিন্তু সামান্যতাদের এ-সব গুণ স্বীকার ক’রে নিয়েও নিশ্চয়ই বলা যায় যে, তাদের ভালোবাসার ও তোমাদের মতন অসামান্যতাদের ভালোবাসার ছন্দের মধ্যে তফাৎ আকাশ পাতাল। যেহেতু উভয়ের দায়িত্বই হ’ল আলাদা—প্রেম।”

সন্ধ্যা বলল : “কী ধরনের দায়িত্বের কথা বলছেন আপনি ?”

মসিয়ে বেনার একটু চুপ ক’রে থেকে বললেন : “খোলাপুলি বলব ?”

সন্ধ্যা বলল : “নিশ্চয়।”

মসিয়ে বেনার গম্ভীর হ’য়ে বললেন : “এই ধরো, দুজন সামান্যতার সঙ্গে একত্র প্রেম করাও চলে আবার তাঁদেরকে এসেঙ্গ গহনা কাপড় দিয়ে তুতিয়ে-পাতিয়ে ভুলিয়ে রাখাও চলে। কিন্তু তোমার—আনার মতন মেয়ের সঙ্গে সে-রকম বিলি ব্যবস্থা সম্ভব কি ?” ব’লেই একটু থেমে বললেন : “কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো না বেন তাই ব’লে। আমি বলতে চাই না যে, একাধিক অসামান্যতার সঙ্গেও একত্রে প্রেম করা যায় না। খুবই যায়—এবং এই সমাজেও যায়। কেবল পাশাপাশি যায় না—একজনকে একটু গা-ঢাকা হ’য়ে থাকতে হয়ই।” ব’লে স্বপনের দিকে তাকালেন।

স্বপন চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চকিতে আনার দিকে কটাক্ষপাত করল। কিন্তু আনা তখনও সেইভাবেই বাইরের আকাশের দিকে শূণ্যদৃষ্টিতে চেয়ে। --



কথা কইল সন্ধ্যা, একটু যেন জোর ক'রেই : “কারণ—সাদা ভাষায়—ঈর্ষা এই বলতে চাইছেন তো ?”

মসিয়ে বেনার চিন্তিত স্বরে বললেন : “ঠিক তা-ও না। অত মরল নিদান হয় না এ-রকম জটিল ব্যাধির।”

—“কিন্তু ঈর্ষা ছাড়া অন্য কী নিদানই বা হ'তে পারে ?”

মসিয়ে বেনার একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন : “ঈর্ষা হয়তো খানিকটা থাকেই—কিন্তু বিকশিত মনের ক্ষেত্রে এ-ঈর্ষা যে রূপটি নেয় তাকে আবার ঠিক গড়পড়তা ঈর্ষার শ্রেণীতেও ফেলা চলে না ঠিক।”

—“আপনার কথাটা একটু আবছা—”

—“কি জানো সন্ধ্যা ? প্রেমের বিকাশ যেখানে যত হৃদয় তার সমস্ত ও দায়িত্বজ্ঞানও যে ততই বেশি—বুঝলে না ? কাজেই ঈর্ষার উগ্র কীটাতিকৈক মনের কোণ থেকে উপড়ে ফেলে দিতে পারলেও তাতে ক'রে সমস্তার জটিলতাটি এতটুকুও কমে মনে করো—?”

—“কমে না ?”

—“বিশেষ না। ঐ যে বললাম সামান্যতাদের ক্ষেত্রে কমতে পারে হয়তো—যারা আটপোরে ভালোবাসায়ই ভরপুর—খুসি। কিন্তু তোমাদের মতন মেয়ের ভালোবাসা তো আর এ-ধরণের আটপোরে ভালোবাসা নয় শেরি, যে, একটা বিশেষ বিলি ব্যবস্থায় সে আফ্রান্দে আটখানা হ'য়ে পড়বে। প্রতি হৃদয় জিনিষেই-যে তোমাদের পরস্পরের দাবির সংঘর্ষ বাধবে—প্রতি কথায়ই-যে দুজনকে দুজনার মন বুঝে চলতে হবে—প্রতি আচরণেই-যে প্রত্যেকের অত্যন্ত সাবধান হ'তে হবে যেমন এখানে এর মধ্যেই হ'তে হচ্ছে—বুঝতে তো পারছ ? এর উপায় কী বলো ! একদিন মাজব বুকে-হৃদয়ে র'রে-স'রে সামঞ্জস্য ক'রে চলতে পারে—হুদিনও পারে হয়তো, কিন্তু ডিন দিনের দিন সে অসম্ভব হ'য়ে ওঠেই ওঠে শেরি।

আত্মজর্জর হ'য়ে দিনের-পর-দিন চলা—নাটক নভেলেই সম্ভব ও মিষ্টি, বাস্তব জীবনে একটু শান্তির আকাশ নইলে চলে কি?—কিন্তু এটা একটু অবাস্তব কথা এসে গেল। আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, প্রেমের বিকাশ যেখানে যত দূর তার ছোটখাটো তৃষ্ণা-না-মেটার বেদনাও ততই দুঃসহ! এর তো আর চারা নেই!”

সন্ধ্যা চিন্তিতস্বরে বলল : “আশনি যা যা বলছেন মসিয়ে সবই সত্যি কথা, মানি। কেবল একটা কথা আমার মনে হয়—”

মসিয়ে বেনার জিজ্ঞাসু নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সন্ধ্যা স্নেহ-দৃষ্টির সামনে চোখ নিচু ক'রে মুহূর্তেরে বলল : “আমার ভয় হয় যে...এ-সব আসলে দুর্বলতার...ভয়ের যুক্তি নয় তো?” বলে মসিয়ে বেনারের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল : “মাস করেক আগে আনা মরিসকে একবার বলেছিল যে, সাবধান হ'য়ে নারী আগলাতে পারে প্রেমাস্পদকে কিন্তু ভালোবাসাকে না। এ-কথাটা কি জানি কেন আমাকে বড় গভীর ভাবে স্পর্শ করেছিল।”

আনা চকিতে তার দিকে তাকাতেই—সন্ধ্যা ও তার চোখোচোখি হয়। আনা কি-একটা কথা বলতে বাচ্ছিল এমন সময়ে মসিয়ে বেনার কথা কইলেন। সন্ধ্যার একটা হাতের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে দীর্ঘ-স্বরে বললেন : “কথাটা খুবই ঠিক, জানি—কেবল তোমার ক্ষেত্রে তো আর এ-ভয় নেই শেরি! কারণ এক্ষেত্রে তুমি তো আর আনাকে সরিয়ে দিচ্ছ না, আমিই সরিয়ে নিচ্ছি।”

সন্ধ্যা ব্রান হেসে বলল : “এ-ভাবে মনকে চোখ ঠেগে প্রবোধ করতে দেওয়া বার—কিন্তু ভয় কি সাহস হ'য়ে দাঁড়ায় মসিয়ে?”

মসিয়ে বেনার উদ্ভ্রম দিতে গিয়েই কি ভেবে বেমে গেলেন।

হঠাৎ কিরে আনা বলল : “এ-কথাটা কিন্তু তোমার ঠিকভাবে বলা

হয়নি সন্ধ্যা। কারণ এটা ঠিক তো ভয় নয়—এটা যে অনেকটা জীবনে সামঞ্জস্যের কথা। সংসারে ভয় কথাটা শুনতে খারাপ—কিন্তু তাই ব'লে হঠকারিতা মাত্রই তো আর বীরত্ব নয়।”

স্বপন মুহূর্তের বলল : “আমার বোধ হয় আনা, তুমি সন্ধ্যাকে একটু ভুল বুঝেছ। ও ঠিক হঠকারিতার সমর্থন করতে চেয়েছে ব'লে আমার মনে হয় না। সম্ভবতঃ বলতে চেয়েছিল যে জীবনে সংঘর্ষকে ক্রমাগত এড়িয়ে চলতে চাইলে খতিয়ে লাভ হয় না। আর এ-কথাটা তো সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়।”

মসিয়ার বেনার ঈষৎ হেসে বললেন : “তোমার ও সন্ধ্যার কথার মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে বটে, কিন্তু একেত্রে আনার মন্তব্যের সঙ্গেই আমি বেশি সায় দিই। কেন জানো?”

স্বপন বলল : “দূরদর্শিতার ওকালতি?”

মসিয়ার বেনার বললেন : “অনেকটা তাই বটে, যদিও ওকালতি কথাটা ব'লে আমায় খোঁটা না দিলেও চলত। কিন্তু এ-সূত্রে একটা কথা বলি সেন, শোনো। পৃথিবীতে সব দেশেই আজ মাছুষ ঘোবনের প্তবগানে ব্রতী বটে এবং এ জয়ধ্বনির সাহিত্যিক বা সামাজিক মূল্যও আমি অস্বীকার করি না। কারণ ঘোবন জীবনকে অনেক কিছুই দিয়েছে বৈ কি। কিন্তু তাই ব'লে তো আর জীবনে প্রবীণতার, হৈয়োয়, অভিজ্ঞতার এমন কি তোমার ঐ দূরদর্শিতার দানকেও এক কথায় নাকচ ক'রে দেওয়া চলে না মনামি।”

স্বপন একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে বলল : “আমি দূরদর্শিতাকে বেশ দিয়ে কথা বলেছিলাম তাকে ঠিক নাকচ করতে—”

মসিয়ার বেনার বিহ্বল হেসে বললেন : “জানি। তবু কি জানো? তোমাদের মতন বক্তা গরম অবস্থায় হৈর্ঘ্য, দৈর্ঘ্য, প্রশান্তি এ-সবকে একটু

শ্রোতোহীন গোছের অবস্থা ব'লে মনে হয়ই সময়ে সময়ে। তাই তোমাদের হজ্ঞাতসারেই প্রবীণতার প্রতি তোমরা একটু বেশি কঠোর হ'য়ে পড়ো। ভারো যে, সংসারে সব সত্য লাভই বুঝি ঐ এক বিক্রমাদিত্যের পথ বেয়েই উদয় হ'তে বাধ্য। কিন্তু বিশ্বাস কোরো মনামি, যে, জীবনে এমন পরীক্ষাও আসে যেখানে নিজের শক্তিকে গুটিয়ে নেওয়ার বীরত্বের আফালনের চেয়েও বেশি লাভ হয়—মানে, সত্য লাভ।”

সন্ধ্যা বলল : “কী ধরনের লাভ বলতে চাইছেন ?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “যে-শক্তির নিরর্থক সংঘর্ষে হ'ত কেবল অপচয় তাকে জীবনে নানানভাবে সক্রিয় করে সার্থক করার লাভ।” ব'লে স্মরণ নিয়ে নিয়ে বললেন : “তাই আমি আনাকে নিয়ে বাচ্ছি বহুদূরে—ও কি! আনা! আনা!” ব'লে বুদ্ধ দাঁড়িয়ে উঠলেন।

আনা খানিকক্ষণ থেকে দুহাতে মুখ ঢেকে পাশের জানলার কাছে তর দিয়ে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়েছিল, কেউই লক্ষ্য করেনি বাবিতগায়। বুদ্ধ উঠে দাঁড়াতেই স্বপন ও সন্ধ্যাও উঠে দাঁড়াল। রুদ্ধ কান্নার শ্রোত আনার সমস্ত দেহখানিতে থেলে বাজে।

\* \* \*

স্বপন ও সন্ধ্যা আনাকে ধ'রে এনে মসিয়ে বেনারের পাশে বসিয়ে দিল। বুদ্ধ তার মাথাটি টেনে নিলেন বুকে। সন্ধ্যা তার অপর পাশে ব'সে, টেবিলের ওপর থেকে একটা ছোট্ট খবরের কাগজ নিয়ে তাকে চাওয়া করতে লাগল।

মসিয়ে বেনার গভীর মেহে এক হাতে আনার কটিবেষ্টন করে আর এক হাতে তার চুলের ওপর হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন : “আনারই দোষ হয়েছে আনা। তোমার দেহ-মনের বর্তমান অবস্থায় এ-এমন নিয়ে

আমাদের তোমার সামনে এমন শুকভাবে এত দীর্ঘ আলোচনা করাটা ঠিক হয়নি।”

আনা অশ্রুট স্বরে বলল : “না মসিয়ে—আপনাদের কিছু জ্ঞান হয়নি। হঠাৎ আমার বুকের ভেতরটা কেমন ক’রে উঠল। আমি কোনোমতেই সামলাতে পারলাম না, ক্ষমা করবেন। থাক সন্ধ্যা—তার হাওয়া করতে হবে না।”

সন্ধ্যা পাখা-করা থামিয়ে বাইরের আকাশের দিকে চূপ ক’রে চেয়ে থাকে। মসিয়ে বেনার সেই এক ভাবেই আনার গারে ধীরে ধীরে হাত বুলাতে থাকেন। স্বপন মাটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে নিঃশব্দ হয়ে ব’সে।...

হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে সন্ধ্যা তাকায় স্বপনের আনত বিবর্ণ মুখের দিকে। আনাও। স্বপন সচেতন হ’য়ে ওঠে মুহূর্তে—ও আরও আড়ষ্ট হ’য়ে পড়ে। আনা রুমালে তার অক্লিস্ত মুখ মুছে আত্মসংবরণ ক’রে সোজা হ’য়ে উঠে বসে। সকলে তার দিকে তাকাতো সে মুখ নিচু ক’রে বলে : “আমাকে তোমরা সকলে ক্ষমা কোরো—আমি ভারি লজ্জা বোধ করছি...কিন্তু কী করব! কোনোমতেই পারলাম না। মাঝে মাঝে কেন যে এমন হয়—”

সন্ধ্যা অত্যন্ত শাস্ত সিন্ধু স্বরে তার দিকে চেয়ে বলে : “কেন ওজস্তে এত কুণ্ঠিত হচ্ছে আনা। তোমার শরীরও তো ভালো না।”

আনার কণ্ঠস্বরের জড়তা একবার একটু কাটে। “ধনুবাদ সন্ধ্যা”, ক’লেই স্বপনের দিকে চেয়ে রান হেসে বলে : “কাজেই বুঝতে পারছ তো যে, তোমাদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ না ক’রে মসিয়ে বেনার ঠিকই করেছিলেন। আমাকে তিনি চেনেন তো।”

মসিয়ে বেনার সম্বন্ধে তার পিঠে হাত দিয়ে বদলেন : “এর করে

শুধু নিজেকেই দায়ী করছ কেন, শেরি ? বিশেষতঃ যখন জানো এর জন্তে তোমার চেয়ে আমি বা স্বপন একচুলও কম দায়ী নই ।” ব’লে স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন : “কেবল আমি সত্যিই ভাবিনি সেন, যে, ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি এ-রকম পরিণতি নেবে—এই-ই আমার একমাত্র সাফাই ।”

সন্ধ্যা শান্তভাবে একটু হেসে বলে : “বেন জানলেই পারতেন ঠেকাতে এ-পরিণতিকে ।”

মসিয়ে বেনার একটু চুপ করে থেকে একটা সিগারেট ধরালেন, পরে বললেন : “কথাটা তুমি বলেছ ভালো সন্ধ্যা । তবে কি জানো ? আমরা য়ুরোপে ছেলেবেলা থেকে বড় বেশি শুনে মাহুয যে জীবনে যা কিছু ঘটে-না-ঘটে তার নিয়ন্তা একমাত্র আমরা । তাই বোধ হয় আমাদের দায়িত্ব-জ্ঞান তোমাদের চেয়ে এত বেশি ।” ব’লে আবার খানিকক্ষণ ধূমপানে মনোনিবেশ করলেন । পরে স্বপনের দিকে চেয়ে চিন্তিত স্বরে বললেন : “তোমাদের কথা নিয়ে কাল ও আজ এত বেশি ভেবেছি যে, বলতে পারি না । আর ভেবে ভেবে আমার মনে হয়েছে যে, জীবন-সম্বন্ধে তোমাদের কিলসকি প্রভৃতিকে মিস্টিসিস্‌ম্ ব’লে হেসে উড়িয়ে না দিয়ে যদি একটু জিজ্ঞাসুভাবে সেটাকে বুঝতে চাইতাম তা হ’লে হয়তো আমাদের গুব লোকমান হ’ত না ।”

স্বপন মসিয়ে বেনারের দিকে চেয়ে মুহূ হেসে তার স্বভাবসিদ্ধ প্রফুল্ল স্বরে বলতে চেষ্টা পেল : “মসিয়ে ! আপনার মুখ দিয়ে ক্রমাগত এ কী ধরনের কথা বেরুচ্ছে । ব্যাপার কি বলুন তো ? কালও চাত্তের প্রসঙ্গে কত-যে অ-পাশ্চাত্য কথা ব’লে ফেললেন । আবার আজ এ কী অ-বুদ্ধিবাদী কথা ?”

মসিয়ে বেনারও হাসলেন : “কি জানো সেন ! য়ুরোপের

বুদ্ধিবাদীদের যদি একটু তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করো তা হ'লে দেখতে পাবে তাদের যতটা শুদ্ধ দেখায় তারা আসলে ততটা শুদ্ধ নয়। কি হয় শুনবে ?”

—“কী ?”

—“আমরা অনেক সময়ে অনেক জিনিষ মনে মনে সম্ভব ব'লে মেনে নিতে রাজি হ'তে পারি—কিন্তু মুখে স্বীকার করতে বললেই ভয়ে ঘাই নীল হ'য়ে। ঠিক ভয় বললেও আবার একটু ভুল বলা হবে হয়তো। কী ক'রে বোঝাই কথাটা।” ব'লে একটু থেমে একমুখ ধূম্রোদগার ক'রে বলতে লাগলেন : “কি জানো ? সম্প্রতি আমরা মনে মনে জগৎ আরম্ভ করেছি যে, জীবনে অন্ধকার কাটে কেবল যুক্তির মালাভূষণ করলে। তাই স্বসঙ্গতির খাতিরে মতামত-প্রকাশের সময় আমাদের একটু শুদ্ধ ও এমন কি অসহিষ্ণুও হ'য়ে পড়তে হয়। কিন্তু তাই ব'লে কি অন্তরে অদৃশ্য জগতের দানকে একেবারেই কোণঠেসা ক'রে রাখতে পারি সব সময়ে ? না, জীবনের নানা পূত মুহূর্তে এ-জগতের নানা রহস্যভাবে অভিভূত না হ'য়ে পারি ?”

বুদ্ধ বলতে লাগলেন : “জীবনে বুদ্ধিবাদীদের সঙ্গে ক্রমাগত মিশে আমরা বুদ্ধিকেই সব চেয়ে বড় পাথেয় ব'লে মনে করতে চাই বটে। কিন্তু, যেরূপা সেদিন চাঁও বলছিল : তাই ব'লে কি কানের কাছে শুকরায়ে কখনো কোনো স্বর বলেনি যে, কুল পেতে হ'লে আগে কাঁপ দিতে হয় অকুলে ? সংসারে বুদ্ধির নির্দিষ্ট একটানা পথে চ'লে নানা সাফল্য, নানা সুখ, নানা স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয়েছে, সত্য। কিন্তু তাই ব'লে কি কখনো আত্মাষ পাইনি যে, কাটাছাঁটা, মাপাজোপা, বাধাধরার পারে নিরুদ্ধেশ-যাত্রা করার মধ্যে বৈ-সার্থকতা নিহিত সে এ-সবের অনেক ওপরে ? না সেয়ে পারি ?”

সকলে স্বাক্ষর হ'য়ে শোনে। বাইরে একটা মুহূর্ত মর্ষরের সঙ্গে লুপ্ত মিলিয়ে বুকের স্বর এমন অপকৃপ শোনায? তিনি ব'লে উঠলেন : “আজ তোমাদের বলব আমার জীবনের একটি বিচিত্র অধ্যায়ের কথা। বলব বিশেষ ক'রে এইজন্তে যে, তা থেকে তোমরা আমাকে হয়তো একটু ভালো ক'রে চিনতে পারবে। বুঝতে পারবে যে, দৈনন্দিন জীবনে যুক্তি-তর্ককে বড় ক'রে ধরলেও মনটা আমার আসলে রহস্যহৃৎতির প্রতি বিমুগ্ধ নয়।”

ব'লে মসিয়ে বেনার চুপ করলেন। বাইরের আকাশে দিগন্তের কোলে একটা কালো মেঘের অন্তরালে থেকে থেকে বিদ্যুতের ঝিলিকে সমস্ত আকাশটা দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। এদিকে তটের কাছে চাঁদের গলিত স্বর্ণবর্ণ উপছে পড়ে। মাঝে মাঝে উর্ধ্ববালাদের ফেনকিরীটে সে-আলো ভ্রম হাঙ্গো পড়ে ভেঙে, আর কালো মেঘের উপত্যকার কোল অবধি সে-হাসি যায় বিছিয়ে। মাঝে একটা বায়গায় একটা ডিম্বাকৃতি ছায়ায় পুসরিয়া। ছবিটি এমন মায়াময়! মসিয়ে বেনারের মুগ্ধ দৃষ্টি অহুসরণ ক'রে সকলে সেই দিকে তাকায়। স্তিমিত নীরবতার মধ্যে আলোচনার মুখরতা যেন আপনা হ'তেই করে আত্মসমর্পণ।

\* \* \*

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন : “আজ আমি তোমাদের সামনে আমার জীবনের যে-পরিচ্ছেদটির পাতা খুলতে যাচ্ছি, তা আজ পর্যন্ত কাউকে কখনো বলিনি। অথচ আমার আশ্চর্য লাগে এ-কথা ভাবতে : কেননা আমার বন্ধুর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।” ব'লে একটু চুপ ক'রে বলতে লাগলেন : “তোমাদের কাছে যে অতীতের এ-কয়টি পাতা কখনো খুলে ধরব তা-ও কখনো ভাবিনি! অথচ আজ মনে হচ্ছে যে...কিন্তু



বাক সে কথা। কেবল আশা করি তোমরা এ থেকে বৃথাতে পারবে—  
 কেন বুদ্ধি-সারথীর রাশ-কড়া শাসনে আমি সচরাচর মুখ খুলতে পারি  
 না। মাহুঘের আসল রূপটি যে কত গোপন ও কত কম লোকের  
 কাছেই উদ্ঘাটিত ক'রে ধরা যায়...” বলে আবার থেমে সন্ধ্যার দিকে  
 তাকিয়ে বলতে লাগলেন :—“ধর এইমাত্র তুমি ও সেন তর্ক করছিলে না  
 যে জীবনে সংঘর্ষ বেদনা প্রভৃতির দাম কম নয় ? আর আমি উল্টো বুদ্ধি  
 দিচ্ছিলাম যে প্রবীণতা, বিচার প্রভৃতির দামই বেশি ! কিন্তু যদি ঐখানেই  
 থেমে যেতাম তা হ'লে আমার সম্বন্ধে কতটুকুই বা তোমরা জানতে !”

সন্ধ্যা মুহূর্তে হেসে শুধু বলল : “কিন্তু ঐ ক'টি কথা শুনেই যে আমরা  
 আপনাকে বিচার করতাম না এ-ভরসা বোধ হয় আপনাকে দিতে পারি।  
 কারণ কথার মধ্যে দিয়ে আমরা যে নিজের কতরকম ভুল ছবিই কুটিয়ে  
 তুলি সেটা আমরা দুজনেই মর্মে মর্মে জানি।”

মসিয়ে বেনার প্রীত হুঁরে বললেন : “বেশ বলেছ সন্ধ্যা। ভলটেরার  
 বলেছিলেন না যে, চিন্তা গোপন করবার ক্ষেত্রেই কথার ছদ্মবেশের সৃষ্টি ?...  
 কথাটা একটা গভীর কথা। ধরো না কেন আমি মুখে একজন  
 নাস্তিক, অথচ গ্রীসের ও ভারতের পৌরাণিক দেব-দেবী আমাকে যে  
 কী গভীরভাবে স্পর্শ করে !—”

স্বপন বিস্মিত হ'য়ে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি হেসে বললেন :  
 “আশ্চর্য লাগে শুনে, না ? আমার নিজেরই আশ্চর্য লাগে। বিশেষ  
 ক'রে তোমাদের একটি দেবতার কথা শুনে। তাঁর কথা মনে হ'লে  
 আমার সমস্ত অন্তরে যেন আনন্দের দোল লাগে। অথচ কেন—তা কি  
 আমিই জানি ?”

সন্ধ্যা সম্বিত হুঁরে বলল : “কোন দেবতাকে আবার এত ভালো  
 লাগে আপনার ?”

—“অসুমান করো তো দেখি।”

সন্ধ্যা ভেবে বলল : “ব্রহ্মা ? না বিষ্ণু ?” ব’লেই হেসে বলল :  
“ন্যূ হয়েছ : কার্তিক।”

মসিয়ে বেনার বললেন : “ওদের কাউকেই না। আমার ভালো লাগে তোমাদের ঐ পাগলা গৃহহীন শিবকে—যে-মুচ মছনের সময়ে নাহ’ক বিষ খেয়ে নীল হ’য়ে রইল।...একটু আশ্চর্য লাগছে, না ? হয়তো তোমাদের আধুনিক শিক্ষিত রুচি ঐ ক্ষেপাটে, সাপুড়ের কথা ভেবে রসগদগদ হ’য়ে ওঠে না, কিন্তু আমার মন সত্যিই প্রকায় গুরে আসে ঐ আশান-পাগলার কথা ভাবলে। কেন—কে বলবে ?”

ব’লে একটু থেমে বলতে লাগলেন : “বলেছি তো যে, ভগবানে আমি বিশ্বাস করি না। অথচ ভগবানের একক্লিত রিক্ত রূপরূপকে কেন-বে আমার এত ভালো লাগে তার কোনো দিশাই আজ অবধি পাইনি। তোমাদের একজন বিখ্যাত চিত্রকরের আঁকা শিবের বৈরাগী মূর্তি যতবারই দেখি ততবারই প্রায় সেক্টিমেণ্টাল হ’য়ে পড়ি আর কি। ও-দেবতাটি যদি পুরুষ না হ’য়ে নারী হতেন তা হ’লে আমি বোধ হয় তাঁকেই বলভ ব’লে বরণ করতে ছুটতাম।”

ধানিককণ কেউই কথা বলল না। বৃদ্ধের কথার মধ্যে এমন একটা রেশ ফুটে উঠেছিল !.....

বাইরের দিগন্তে মেঘের চূড়ায় একটি স্বর্ণ-সীমন্তের দিকে চেয়ে বৃদ্ধ যেন আপন মনেই বলতে লাগলেন : “এ-সব কথা বলতে কোথায় যেন বেঁধে আঁমার।”

সন্ধ্যা হেসে বলল : “কেন মসিয়ে ? এ-বরণের কথায় বুদ্ধি সার দেয় না ব’লে ?”

বুদ্ধ বললেন : “না, এ-ধরণের কথা বলতে গেলেই কেমন যেন একটা চং মনে হয়—তাই।”

স্বপন কি-একটা কথা বলতে গিয়েই চূপ ক’রে গেল। মসিয়ে বেন্নার সেইভাবেই ব’লে চললেন : “অবশ্য চং মনে হয় যখন বুদ্ধির আলোয় দেখি। কিন্তু যখন অহুতবের আলোয় দেখি তখন মনে হয় যে জীবনে এই রুদ্ররূপের মহিমাই হয়তো একমাত্র সত্য—বাকি সবই চং। মনে হয়, ব্যাথা-মহুনের মাঝে যে-গরল ওঠে বোধ হয় কেবল তাই পান ক’রেই মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায়। বাকি সব ভাব-বিলাসিতা।”

ব’লে স্বপনের দিকে তাকিয়ে বললেন : “হয়তো একটু বেশি উচ্ছ্বাসের কাছ ঘেঁষে যাচ্ছে। আমাদের ভুল বুঝা না যেন। আমি কল্হি না যে, বেন্নার মহুনের মধ্যে আমার নিরাশা কখনো আসেনি—কোন্ড কখনো হয়নি। কিন্তু সে-অবিলতা কেটে যেতে-না-যেতেই যেন আভাষ পেয়েছি যে বাইরে থেকে দেখতে যা অভিশাপের মতন তা হয়তো আসলে বর হ’তেও পারে।”

আনা মুহূর্তের বলল : “কিন্তু বর ও অভিশাপের মধ্যে কি তা হ’লে কোনো প্রভেদই নেই।”

মসিয়ে বেন্নারের মুখে স্নান হাসি দেখা দিল, তিনি বললেন : “জানি না। বুদ্ধি দিয়ে এ-অতলের তল পাইনি কখনো। আলো ও অন্ধকারের আসল ভেদটা কোথায়, বিষ ও অমৃতের মধ্যে মূলগত ব্যবধানটি কি, জীবন ও মৃত্যুর ভেতর আড়ালটি ঠিক কোন্‌খানে, অনন্ত কি-উপারে সান্ত্বের মধ্যে রূপ নেয়, এ-সব সম্বন্ধে ভেবে কোনো দিশা পাইনি ;—করং যতই ভেবেছি ততই দৃষ্টি এসেছে আপ্সা হ’য়ে। কারণ হয়তো এই যে...এ-সব...এ-সব হচ্ছে অহুতবের কথা—ভেবে বোঝবার কথাও নয়

ব'লে যোঝাবার কথাও নয়। তাইতো এ-সব কথা বলতে এত বাধে। দারা অল্পভব দিয়ে এর নাগাল না পায় তাদের কাছে এ পাগলামি বৈ আর কী বলো ?”

ঘরের দোরে আঘাত হ'ল। মসিয়ে বেনার বললেন : “Entrez.” \*

## মসিয়ে বেনারের আত্মকাহিনী

মসিয়ে বেনারের ভ্যালিট একটি ট্রেতে কেক, বিস্কুট, টাট, জাওউইচ প্রভৃতি সাজিয়ে—স-কফি পরিবেষণ ক'রে গ্রহান করল। বুদ্ধ খুসী হ'য়ে আনার দিকে ‘আ-লা গুর্ম’† \* তাকাতেই আনা হেসে বলল : “জানি তো আপনাকে : ফর্মাশ দিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু এ-সময়ে কেউ তো এ-সব খায় না তাই ভুলে গিয়েছিল। নইলে এত দেরী হ'ত না।”

মসিয়ে বেনার হেসে হাত ঘষতে ঘষতে বললেন : “জানো জ্ঞো তোমাদের বাইব্রাই আছে : Better late than never ! তা ছাড়া গল্পালাপের সময়ে হাতের কাছে একটা পেয়ালা বা রঙীন গেলাস না থাকলে গল্প যেন জমেই না, নয় ?” ব'লেই সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন : “তোমার কফি খাওয়া ?”

সন্ধ্যা বলল : “না, ধন্তবাদ মসিয়ে—অভ্যাস নেই তেমন। আমরা হ'লাম চা-বিলাসিনী।” আর বাবে কোথায় ? সন্ধ্যার আপত্তি সবেও ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বুদ্ধ তৎক্ষণাৎ ঘণ্টা টিপে চা আনতে বললেন। তারপর স্বপনের দিকে তাকিয়ে বললেন : “সেন ?”

\* ভেতরে এসো।

† à la gourmand = পটুকের বচন।

—“আমি চা-তে নেই মসিয়ে। মানে, কন্টিনেন্টে না। যেখানকার যা। আপনারা চা তৈরী করতেই পারেন না।”

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন : “চাং-ও তাই বলে। তবে ওদের দেশে, জানো তো, চা হ’ল একটা প্রতিষ্ঠান। আমাদের দেশে যেমন প্রত্যেক যুবককে দু-একবছর যুদ্ধ শিখতে হয়—ওদের শিখতে হয়—কী ভঙ্গিতে চার পেয়ালা ধরা হবে, কি-ভাবে চা পরিবেষণ করা হবে, কি-ভাবে চুমুক দিতে হবে—সে টেকনিক হার্মনি কাউন্টার-পয়েন্টের চেয়েও কঠিন।”

আনা কফি ঢেলে স্বপন ও বুদ্ধকে দিল। সন্ধ্যার প্রেটে শুধু দুটো বিস্কুট ও একটা স্মাণ্ডউইচ।...ইতিমধ্যে চা এসে হাজির। সন্ধ্যা নিজেই ঢেলে নিল।

স্বপন বলল : “আর একটু দুধ আনা, আমার কফিতে—ধন্যবাদ।”

সন্ধ্যা মসিয়ে বেনারের পেয়ালার দিকে তাকিয়ে সত্ৰাসে বলল : “আর আপনি? মা গো মা! হুধের নাম গন্ধ নেই, ঐ আলকাতরার মতন কালো কফি এত রসিয়ে-রসিয়ে চাখ্ছেন কেমন ক’রে?”

বুদ্ধ সর্কোতুকে বললেন : “বরাং জোর থাকলে এখুঁ চেয়েও অসনাতন বস্তুকেও রসিয়ে-রসিয়ে চাখা যায় শেরি। বিশ্বাস না হয়, তোমার পাশের চেয়ারেই ঐ সনাতন হিন্দুকুল-ধুরন্ধরকে জিজ্ঞাসা ক’রে মিলিয়ে নাও না গো।”

সন্ধ্যা ও আনার মুখে ফাগ বিছিয়ে গেল। স্বপন কফির পেয়ালায় দুধ আড়াল করল। কিন্তু বুদ্ধ সমান অনগ্রসিত।

স্বপন একটু পরে তাঁর দিকে তাকাতেই দেখে মসিয়ে বেনার মুহু মুহু হাসছেন। সে-ও অপ্রস্তুত মতন হ’য়ে হাসল।

মসিয়ে বেনার বললেন : “তোমাদের—তরুণ-তরুণীদের নিয়ে ঐ এক বিষম ফ্যাসাদ : হাসবে তো—পড়বে গড়িয়ে, আবার গভীর হবে

তো—একেবারে গদগদ।” স্বপনের ঝাড়ই হাসি তবুও কাটে না, মসিয়ে বেনার তার কাঁধে চাপড় মেরে বললেন : “দুঃ অত অশ্রুতিত হ’তে আছে ? একে বলে আমাদের ফরাসী gauloiserie, \* জানো না ?”

স্বপন হেসে বলে : “জানি মসিয়ে, কেবল বাঙালী ভদ্র-সভানের কাছে এসব খানিকটা tracasserie রই + সামিল মনে হয় যে,—একটু বেশি গুরুপাক, করি কী বলুন ? তাই না হয় এসব রেখে বললেনই আপনার সেই কাহিনীটি ?”

—“বলব হে বলব, অত ব্যস্ত হ’লে চলে ? একটু তৌড়জোড় বাঁধতে দাও—যা বলতে যাচ্ছি তা যে একটা মহাভারত বিশেষ—বাদিও একটা অধ্যায়ের মহাভারত।”

সন্ধ্যা বলল : “না-হয় দুটোই হ’ল।”

বুদ্ধ হেসে বললেন : “দাঁড়াও শেরি, একটার ধাক্কাই সামলাও তো আগে। জানো না তো বুদ্ধের রসনা হ’ল ছদ্মবেশে পক্ষীরাজ ঘোড়া—  
• একবার রাশ-আল্গা পেলে থানতে কি আর চায় ?”

\* \* \*

বুদ্ধের মুখ হঠাৎ গম্ভীর হ’য়ে গেল। কী আশ্চর্য্য ! যেন শরতের আকাশ : এই মেঘ—এই রোদ্র, এই আলো—এই নীল শান্তি।

তিনি ককির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন : “আনি আজ আমার জীবনের সেই পরিচ্ছন্ন থেকেই আরম্ভ করব, যে পরিচ্ছন্নে এ গচ্ছময় জীবনে সব প্রথম পদ্ম—মানে, মিল ও ছন্দ—করেন পরীর্ণ।”

\* স্বপন হেসে বলল : “অর্থাৎ বোবন থেকে—এই তো ?”

\* বুধ-আল্গা অসিকতা + আলান্তন

—“না—কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিলগ্ন থেকে যাকে আমরা বলি adolescence ; মানুষ বিকচোদ্ভূতী কাব্যরাগীর নৃপুত্র স্তনতে আরম্ভ করে প্রথম ঐ বিচিত্র মাহেন্দ্রলগ্নে। ঐ সময়েই সে আকাশে বাতাসে প্রথম দেখা হরু করে—রোমান্স, ফলে ফলে গন্ধ পায়—স্বপ্নের, পথে ঘাটে শোনে বাঁশি—অনাগতের প্রতি প্রীতিস্পর্শে পূর্বাভাস পায়—প্রথম চুষনের। আমার নিজের কাছেও সব চেয়ে ভালো লাগে ঐ কৈশোরের স্মৃতি। ঐ সময়েই আমার জীবনে প্রথম সত্যিকার রোমান্স আসে—যে-রোমান্সে আমার সমস্ত জীবনটারই গতি যায় বদলে। সে এক বিচিত্র ব্যাপার। কিন্তু এবার উপক্রমণিকা ছেড়ে অবতরণিকায় এসে পড়া যাক।”

\* \* \*

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বুদ্ধ বললেন : “তখন আমি সবে এঞ্জিনিয়ারিং পড়া শুরু করেছি—”

আনা বলল : “এঞ্জিনিয়ারিং !”

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন : “তুনে এখন আশ্চর্য লাগে, না ? অথচ আশ্চর্য্য এই যে, সে-সময়ে আমার বিশ্বয়ের অবধি থাকত না যদি কোনো আকাশবাণী হ’ত যে, আমার লাইন এঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া আর কিছু। আমাদের জীবনে যে কী কঠিন এই স্বধর্মের নির্দেশ পাওয়া—কিন্তু সে কথা যাক, কেমন করে-যে আমাকে এঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে চিত্রবিজ্ঞান পেশা করতে হ’ল সেই কাহিনীই বলি আগে।”

ব’লে কফির পেয়ালায় আর একটু কফি ঢেলে নিয়ে বললেন : “উঃ, সে আজ কত বছরের কথা ! চল্লিশ—প্রায় তেত্তালিশ বছর হতে চলল যখন আমার বাবা মা একটা ট্রেনের কলিশনে মারা যান।”

আনা ও সন্ধ্যা প্রায় একসঙ্গে ব'লে উঠল : “কলিশন!”

মসিয়ে বেনারের মুখে একটা স্নান হাসি দেখা দিল : “হাঁ। সেই. আমার প্রথম গভীর শোক পাওয়া। মনে আছে চারদিক যেন অন্ধকার মনে হয়েছিল—যেন দাঁড়াবার মতন মাটি নেই পায়ের নিচে!—

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন : “আমার বয়স তখন আঠার কি উনিশ। ফ্রান্সে আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না বললেই হয়। এক কাকা ছিলেন—বাবার উইলের তিনিই ছিলেন এক্সিকিউটর ও আমার অভিভাবক। তিনি লীড্‌স্-এ একটি বণিক-কল্যাণে বিয়ে ক'রে স্বস্তুরের লোহার কারখানার ম্যানেজার হ'য়ে ইংলণ্ডেই করেছিলেন বসবাস। তাঁর কাছে গিয়ে আমি এঞ্জিনিয়ারিং পড়া শুরু করি; তাঁর জানাশোনাও ছিল, কাজেই পড়াশুনোর সুবিধেও হ'য়ে যায়।

“কিন্তু আমার ভারি একটা মুশ্কিল হ'ল সেখানে এই যে, ইংরেজদের ভাষায় আমি ভারি ভক্ত হ'য়ে ওঠা সত্ত্বেও কোনো-মতেই ওদের জাতটার অমুরাগী হ'তে পারলাম না। কলেজে আমার ইংরাজ বন্ধুবান্ধব একটিও ছিল না, তাদের ধরণধারণ দেখে কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেও ইচ্ছে হ'ত না। তার ওপর আমার ইংরাজী কথাবার্তায় করাসী ঝোককে, আমার করাসী ‘r’-কে ‘r’-একটা ছেলে নকল ক'রে এমন বিকৃপ করত যে, আমার সর্ব্ব অঙ্গ যেন জ'লে যেত।

“সেখানে আমি নিশ্চয়ই অত্যন্ত অসুখী হ'য়ে পড়তাম ও সম্ভবতঃ কয়েক মাসের মধ্যেই ফ্রান্সে ফেরার বায়না নিতাম যদি না ঠিক এই সময়ে কলেজে ডেনিস ম্যাকডুগাল ব'লে একটি আইরিশ ছেলের সহসা আবির্ভাব হ'ত। তার সঙ্গে ভাব হ'য়ে গেল দুদিনে। ইংরেজদের সেও দৃঢ়ত্ব দেখতে পারত না। সে-ও আমি একটা কারণ তার সঙ্গে



সৌহার্দ্যের। ওরা সপরিবারেই এসেছিল। ওদের বাড়ীতে প্রায়ই যেতাম ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতাম।

“অবশ্য শুধু যে ডেনিসের বন্ধুত্বের জন্তেই ওদের ওখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতাম তা বললে তোমরা নিশ্চয়ই অবিখ্যাসের কুটিল হাসি হাসবে। একরূপ ক্ষেত্রে প্রায়ই বন্ধুর একটি বোন থাকে। ডেনিসেরও ছিল : সারা।”

সন্ধ্যা সন্ধ্যাতে বলল : “আর নিশ্চয়ই সারা দেখতে—”

মসিয়ে বেনার বাধা দিয়ে বললেন : “ঐ তুমি আবার একটা ভারি অস্তায় কটাক্ষ করছ সন্ধ্যা। একুনি বললাম না যে, তখন আমি কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে? তখন বন্ধুব বোনের বা অস্ত্র কারুর বোনের কি আমরা হবার দরকার করে? উদাস কল্পনা তা হ’লে বলেছে কেন? সারারও স্নানরী হবার কি গুলবতী হবার এতটুকুও দরকার হয়নি।”

সন্ধ্যা স্মিতহাস্তে বলল : “তবু সে দেখতে তো খারাপ ছিল না?”

—“না তা ছিল না। কিন্তু সে তা-ও ছিল না যা আমার চোখ তার মধ্যে প্রতি মুহূর্তেই আবিষ্কার করত। এবং এইসব আবিষ্কারের ফলে সে দেখতে যেমনই হোক না কেন আমি ভুত্থাম—এট-ই আমার মলবার কথা।” বলে ঈর্ষ হেসে বললেন : “কি রকম জানো? লোহা চুষকের সামনে যেমন বেতুল আচরণ করে, তার সান্নিধ্যে আমি ঠিক সেই রকম করতাম। তাই তার রূপের কথা এখানে উল্লেখ রেখে গেলেও কিছু ক্ষতি নেই।”

সন্ধ্যা বলল : “তা না থাকুক, আপনাকে বলতে হবে সে কি রকম দেখতে স্নানরী ছিল।”

মসিয়ে বেনার স্বপনের দিকে সকৌতুক কটাক্ষ করে বললেন :

“দেখেছ তো ? মেয়েদের কৌতূহলকে যে কবির মেয়েলি বলেছেন, সে কি নাথে ? আমাদের কাছে যা অবাস্তব ওদের কাছে তাই সবচেয়ে গুরুতর !”

—“কিন্তু, ‘ভিনাস ডি মিলো’ বা ‘মনালিসা’-কে নিয়ে হৈ হৈ করে কারা শুনি ?”

—“কিন্তু সেটা করি কি তাদের সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে ?”

—“অবিশ্বাস্তি ।”

বৃদ্ধ হেসে বললেন : “না সন্ধ্যা । ওদের প্রেমে পুরুষরা মুগ্ধ—শিল্পীর চোখের রং ও মনের আবেশ ঐ সব কল্পনামূর্তির মধ্যে দিয়ে অন্ধকার করছে বলে । অর্থাৎ ওরা যদি জ্বলন্ত না হ’য়ে দেখতে কুৎসিত হ’ত তা হ’লেও কিছু আসত-যেতনা—অন্ততঃ শিল্পীর চোখে না ।”

সন্ধ্যা রাগ করে বলল : “তা না থাক । আমার দরকার নেই এমন শিল্পী হ’য়ে । আমার এ-কথা স্বীকার করতে এতটুকুও লজ্জা নেই যে, অজ্ঞানদের চেয়ে জ্ঞানদের আমার রুচি ঢের ঢে—র বেশি । তাই বলতেই হবে : সারা দেখতে কেমন ছিল, ছাড়ছি নে ।”

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন : “ভালোই ছিল গো ভালোই ছিল । অবশ্য তার যে ‘ভিনাস ডি মিলো’র মতন অঙ্গসৌষ্টব ছিল না বা ‘মনালিসা’-র মতন হাসি ছিল না এ-কথা না বললেও চলবে বোঝ হয় ? কিন্তু তার জুড়োল দেহলতার মধ্যে এমন একটা গতিভঙ্গি ছিল—যা পুরুষের কামনাকে উদ্দীপ্ত না ক’রেই পারত না । আর তার মুখশ্রীর মধ্যে চমকপ্রদ সৌন্দর্য্য ফুটে না উঠলেও একটা মিষ্টি জ্বলনা ছিল...অথচ বিশ্লেষণ করতে গেলে এ-লাবণ্যের হামিল পাওয়া যেত না । যাকে লোকে চলুতি কথায় বলে ‘মিষ্টি মেয়ে’—সে ছিল তাই । খুব যে মিষ্টক ছিল তা না, কিন্তু যে দু-চারজনকে তার একবার ভালো সেগে যেত তাদের সঙ্গে সে সখিচ্ছ করতে পারত খুবই ।”

ব'লে একটু থেমে স্মিতহাস্তে বললেন : “কিন্তু সত্যি বলছি : এ-সব বর্ণনা বর্তমান ক্ষেত্রে একেবারেই অবাস্তব। যেটা প্রাসঙ্গিক সেটা হচ্ছে এই যে, সে ছিল আমার প্রথম যৌবনের প্রথম স্বপ্নদেবী। অর্থাৎ কৈশোরের সমস্ত উদ্ভাদনা দিয়ে-যে আমি তাকে রঙীন ক'রে দেখেছিলাম এইটেই হচ্ছে ঝড় কথা।……আর সে রংটি সত্যিই বড় অপূর্ব রং। এমনই অপূর্ব যে ধরতে গেলে তাকে খুঁসি করতে গিয়েই আমি চিত্রী হ'য়ে উঠি বললে বেশি বলা হবে না। কারণ সত্যিই তারই জন্তে আমি লীড্‌সের এঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে লণ্ডনে একটা আর্ট স্কুলে ভর্তি হই।”

স্বপ্ন বলল : “সে কি তাই চেয়েছিল নাকি ?”

মসিয়ে বেনারু বললেন : “ঠিক যে মুখ ফুটে চেয়েছিল তা নয়। তবে প্রথম যৌবনের প্রথম উদ্ভাদনায় প্রেমিক অনেক কিছুই বুঝে নেবার শক্তি ধরে জানো তো? এ সহজবোধ বয়সের, বিজ্ঞতার, অভিজ্ঞতার চাপে আসে ঝাপসা হ'য়ে। তাই প্রেমের ক্ষেত্রে যৌবন হ'ল সব চেয়ে বড় স্রষ্টা—যদিও প্রকাশে নয়—অনুভবে। অর্থাৎ সে বয়সের প্রেমের অনুভবকেও আঁকতে পারে না তরুণে, পারে প্রবীণে। কিন্তু থাক সে কথা, যা বলছিলাম।” ব'লে বুদ্ধ কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলতে লাগলেন : “আমি দেখতাম যে, গাছপালা, মাঠ-আকাশ, গান-ছবি এ-সব সারা অত্যন্ত সহজভাবে সাড়া দিত—আর কলকারখানা, ধূলা-কাদা, সোরগোল এ-সবকে চাইত এড়িয়ে চলতে। সত্যি, তার হৃদয়ের এই সহজ সৌকুমার্য থেকে আমি যে কত লাভ করেছি তা বলতে পারি না। আর বোধ হয় এক প্রথম প্রেমের প্রতীবী এতটা প্রবল হ'তে পারে—হৃদয়ের ওপর রেখে যেতে পারে এতটা গভীর ছাপ।”

আনা বলল : “কিন্তু ছেলেবেলাকার অনেক প্রেম তো আবার মানব সহজে ভুলেও যায় ?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “যার বটে—কিন্তু সে সত্যিকার প্রেম নয়—চোখের মোহ। অবজ্ঞা কৈশোরে নানা আকর্ষণের মধ্যে কোন্টো যে চোখের মোহ ও কোন্টো স্থায়ী ভালোবাসা সেটার ঠাছর পাওয়ার মতন কঠিন কাজ ছনিয়ায় আর নেই—মানি। কিন্তু বোধ হয় তবু বলা চলে যে, সত্যিকার ভালোবাসা এলে তফাৎটা বোঝা যায়। অন্ততঃ সারাকে যে আমি সত্যিই ভালোবেসেছিলাম তার প্রমাণ পরে পাবে। তাই এখন এটা ধরেই নাও।”

বন্ধ বলতে লাগলেন : “ব’লে রাখা ভালো যে, ছেলেবেলা থেকে ছবি-আঁকার দিকে আমার একটা সহজ ঝোঁক ও স্বাভাবিক পটুতা ছিল—যদিও কেন জানি না, চিত্রশিল্পী হবার উচ্চাশা কখনো জাগেনি। ঠাঁঠ তো সারার কাছে আমি এত কৃতজ্ঞ—আজ্ঞাও। কেননা ঠিক এসময়ে তার সংস্পর্শে না এলে যে এঞ্জিনিয়ারিং আমার এত শীঘ্র বৈরাগ্য আসত না এ নিশ্চয়। কিন্তু সে কথা বাক। ছবি আঁকার কথাই বলি।

“বাস্তবিক, বেশ মনে আছে সে-সময়ে আমার ছবি-আঁকার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তার চোখ দুটিতে আলো জালানো, গাল দুটিতে রং জাগানো, ঠোঁঠ দুটিতে হাসি ফোটানো।

“আমার আঁকা কোনো ভালো ছবি দেখলেই তার কপোলে উবার সিঁদুর উঠত দীপ্ত হয়ে, খুসিতে আঁখিতারা উঠত বিকমিকিয়ে। সে বলত : ‘পিয়ের, তুমি কেন ছবি আঁকা ছেড়ে ইটপাটকেলের চর্চায় জীবন দিতে বাচ্ছ বলো তো?’ সঙ্গে সঙ্গে তার প্রবালের মতন রাঙা ঠোঁট দুটি উঠত কুলে—অভিমান। আর আমি চোখে দেখতাম অন্ধকার—বুঝেই পারছ ?”

স্বপন হাসিমুখে বলল : “পারছি।”

মসিয়ে বেনার বললেন : “পারবে বৈ কি তারা। আর সেই সঙ্গে এটাও বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই যে, সে উত্তম ঠোট দুটিকে শাস্ত না ক’রেই আমার উপায় থাকত না। কিন্তু এ-সব অতি পরিচিত কাহিনী থাক—সারার কথাই বলি।”

সন্ধ্যা বলল : “একটা কথা; সারার কথা না আপনার সঙ্গে মেয়েকে এ-ভাবে অবোধে মিশতে দিতেন।”

মসিয়ে বেনার বললেন : “এ তোমাদের হিন্দুস্থান নয় শেরি, যেখানে বালক-বালিকা বাল্যের কোটা পেরিয়ে সরাসর যৌবনে পদার্পণ করে। এখানে কৈশোর বলে একটা ব্যঃসন্ধি আছে; আর সে-বয়সের ভালোবাসা বাসিকে বড় কেউই আমল দেয় না। যোলো বছরের মেয়ে ও উনিশ বছরের ছেলের মেশামেশি কি এখানে কারুর বিশেষ ক’রে চোখে পড়ে? এ ছাড়াও আর একটা কথা ছিল : তাঁরা ভাবতেন আমি কেবল ডেনিসের সঙ্গেই মিশতে এত ঘন ঘন আসতাম,—এটা ভুলো না।”

সন্ধ্যা হেসে বলল : “ভুলছি না—তবু—”

মসিয়ে বেনার বললেন : “তবুও তাঁরা হয়তো একটু সাবধান হতেন সারার সম্বন্ধে—যদি না তার মা হতেন বিমাতা।”

সন্ধ্যা বলল : “আহা! অল্প বয়সেই বুদ্ধি—”

মসিয়ে বেনার বললেন : “না ঠিক তাও নয়। ডেনিস ও সারার মা আর এক জনের সঙ্গে পালিয়ে যায় ও তার পরেই ঘরে—বুঝলে না—বিনাতার আবির্ভাব। ইনি ছিলেন আবার অত্যন্ত গোড়া ক্যাথলিক। কাজেই শুধু পলাতক পাণ্ডিত্য সপত্নীকে নয় সপত্নীর পুত্র কন্যাকেও দেখতেন বিষচক্ষে। ধার্মিক কি না! যাক।

“ডেনিসের অবস্থা এতে তত আসত যেত না—কেন না তার বাবা দান সময় কাটত বাড়ীর বাইরেই। কিন্তু অসুখী হ’ল সারা। শুধু অসুখী

না—অবজ্ঞাত, অনাদৃত এমন কি উৎপীড়িত বললেও বোধ হয় অভ্যক্তি হবে না। ওর পিতার মেহেরও সবটুকু গিয়ে পড়েছিল ওর দুটি বৈমাত্রেয় ছোট বোনের ওপর। ধরতে গেলে বাড়িতে একমাত্র ডেনিস ছাড়া আপনার বলতে তার কেউ ছিল না। আর সারার লীড্‌স্‌ সহরে দরদী বলতে ছিল—এই প্রগলভ বুদ্ধ চিত্রকর।” বলেই সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন : “অবশ্য তখন এ-চিত্রকর না ছিল বুদ্ধ, না প্রগলভ; এবং চেহারাখানাও নেহাৎ ফেলনা ছিল না এটা সবিনয়ে বস্পল রাখি। নইলে কি জানি, হয়তো সন্ধ্যা ভেবে বসবে যে, আমি শুকনো আপেলের মতন এই চেহারা নিয়েই বরাবর প্রেমের আড্ডা সরগরম রেখে এসেছি।” সন্ধ্যা হাসল কিন্তু কিছু বলল না। বুদ্ধ গম্ভীর হ’য়ে বলতে লাগলেন :

“সুতরাং তোমরা কল্পনা ক’রে নিতে পারবে যে, এককন্দর্পকাস্তি বসজ্ঞকে সে কী ভাবে আঁকড়ে ধরেছিল—তার সবগ্র মেহ-বৃত্তুকু ধরয় দিয়ে। আমি ছিলাম তার খেলার সাথী বলতে খেলার সাথী, ব্যথার ব্যথী বলতে ব্যথার ব্যথী—তার একমাত্র দরদী—সারা বিশ্বে। আর প্রথম যৌবনে এ-রকম দরদের বাড়াবাড়ির পরিণতি যে একই রকম ছাড়া ছরকম হয় না সেটা অস্বপ্নে। কলে আমরা গোপনে বাগ্‌দস্ত হই।”

স্বপন বলল : “কিন্তু গোপনে কেন ?”

—“বলিনি সারার বাপ মা ছিলেন বোর ক্যাবলিক, অথচ এদিকে আমার কাকা—বোর প্রটেস্ট্যান্ট। তা ছাড়া আমাদের সারার বাবা ঠিক অপছন্দ না করলেও আমার কাকার প্রতি তিনি, ধর্মের জন্তেও বটে, কারখানার প্রতীবোগিতার জন্তেও বটে, বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। যতটো ভুলে গেছি সারার বাবা ও আমার কাকা একই কারখানার কাজ করতেন ও তাঁদের মধ্যে একটা ভারি রেবারেখা চলত সর্বদাই।...কিন্তু

এ-সব গল্পময় অংশ বাদ দিয়ে আমার আর্টের দিকে চ'লে আমার পক্ষর ক'থাই বলি।

“কী ক’রে আমার আঁকা দু-একটি নক্সা লণ্ডনের একটি প্রদর্শনীতে জোগাড়-যত্ন ক’রে পাঠিয়ে বিক্রি ক’রে সে-টাকার আঁকাকে তাঁর এক জন্মদিনে একটি সাইকেল উপহার দিয়ে, খরচের কাগজের সুখ্যাতি দেখিয়ে তাঁর মনে বিশ্বাস জন্মাই যে, এঞ্জিনিয়ারিং আমার লাইন নয়—সে-সব বর্ণনার দরকার নেই। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কাকা তাঁর দু-একটি বন্ধুর অনুমোদন পেয়ে আমাকে লণ্ডনে রয়াল আকাদেমি অব আর্টস্-এ পেন্টিং শিখতে পাঠান।”

আনা বলল : “পেন্টিং শিখতে ফরাসী ছেলেকে লণ্ডনে পাঠানো—পারিসে না পাঠিয়ে ?”

মসিয়ে বেনার ছেসে বললেন : “তাঁর অবশ্য ইচ্ছে ছিল পারিসেই আমাকে কিরিয়ে পাঠানো—কিন্তু আমি অনেক ক’রে তাঁকে বোঝাই যে আগে লণ্ডনে কিছু শিখে তার পর পারিসে ফেরা ভালো। কাকা এ-সব বিষয় বেশি বুঝতেন না। তাই তিনি বেশি আপত্তি করলেন না। তা ছাড়া কাকীমা ইংরেজের মেয়ে—কাজেই ইংরেজদের জাঁকালো রয়াল আকাদেমির ভক্ত, বুঝেন না ? অবশ্য আমিও তাঁকে বোঝালাম যে, ফরাসীরা বেশি বিজ্ঞাপন-নিপুণ ব’লেই আর্টে তাদের ইংরেজদের চেয়ে বেশি নাম—কিন্তু আসলে ইংরাজরাও বড় কেও-কেটা নয়। অর্থাৎ নানাভাবে অন্তরটিপ্সুনি দিয়ে কাজ হাসিল করা আর কি। তা ছাড়া আমি ছিলাম কাকীমার চক্ষুশূল, তাঁর গৃহত্যাগ করাতে তিনিও খুঁসি। আমি তো হাতে স্বর্গই পেলাম।”

সন্ধ্যা স্মৃতিসূত্রে বলল : “কিন্তু সারাই যখন রইল লীড্‌সে, তখন লণ্ডনে স্বর্গের রংমহল খুলল কে ?”

মসিয়ে বেনার চোখ মিট মিট ক'রে বললেন : “আহা কথাটা শেষ করতেই দাও ।—ঠিক সেই সময়ে যে সারাও হঠাৎ তার বাপমাকে বোঝালো : লগুনের পিসিমার গৃহে থেকে স্কুলে পড়লে বিজ্ঞ-দিগ্‌গজিনী হওয়া অবধারিত—এ-ও বুঝে নিতে পারলে না ?”

সন্ধ্যা হাসিমুখে বলল : “এখন পেরেছি ।—কেবল আর একটা প্রশ্ন : পিসিমার গৃহে আপনাদের দেশান্তরের সুবিধেও বেড়ে গেল নিশ্চয় ?”

—“বাঃ, তা না গেলে লগুনের স্কুলে লীড্‌সের স্কুলের চেয়ে পড়া ভালো হবে কেমন ক'রে ? কবি বলেছেন বটে :

‘প্রেমের পথে বাধাই লয় পিছু :

তাই তো আঁকা-বাকা সে—উঁচু-নিচু ।’”

কিন্তু বাধা সত্ত্বেও অন্ধ দেবতা পথটির প্রথম দিকটা ঢালুও তো করেছেন সেই সঙ্গে । বোগাবোগ হ'য়ে গেল এই যে, সারার পিসিমাকে আমি জানতাম ও আমার ওপর তাঁর একটা অপত্যবাহ প'ড়ে বাওয়ার দরুন তাঁর গৃহে আমার ছিল অবাধ গতিবিধি । তাই যদি না থাকবে তবে লীড্‌সের এঞ্জিনিয়ারিং পড়া কী এমন দোষ করেছিল ?”

সকলের অস্থূল হাসির মুহূর্তেই থেমে গেলে মসিয়ে বেনার পুনরায় গম্ভীর হ'য়ে স্তব্ধ করলেন : “সারা এখন লগুনে আসে তখন সে সবে নতেরায় পা দিয়েছে, আনি—কুড়িতে ।” ব'লে স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন : “লগুনে আমরা অবশ্য নানা অছিলায় লুকিয়ে হাম্পস্টেড হীপে, কিউ'গার্ডেনে, হ্যামডেন কোর্টে, টেম্‌সের নৌকায় আরও নানা বায়গায় দেখা করতাম, লী-অন্-সী-তে ব্রান করতে ছুটতাম ট্রেন ধ'রে—চিড়িয়া-খানায় হৈ চৈ—কখনো বা কলিসিয়মের মাটিনি-শো-তে বিহার—কখনো

• The course of true love never did run smooth.—Shakespeare



বা কাছাকাছি গ্রামের কুঞ্জবনাদিতে পিকনিক—ই'ল বা কখনো নানা পুরোনো রোমান্টিক সরাইয়ের আতিথ্য-গ্রহণ—সে-সব অমনি নানা ছুতোয় সারা যেত, বুঝলে না?—এ-পথ আঁকা-বাঁকা উঁচু-নিচু বটে, কিন্তু অধিসন্ধি জানলে ফন্দিও তো আবার বেরোয়—সেই বন্ধুরতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।” \* ব'লে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে সকৌতুকে বললেন : “অপ্য ব্যাপারটা যে ঠিক নিরামিষ পিকনিক-টিকনিকেই পরিসমাপ্ত হ'ত না তা বেশি বুঝিয়ে বলার দরকার নেই আশা করি !”

সন্ধ্যা মুহূ হেসে বলল : “না।”

মসিয়ে বেনার বললেন : “ও—আমার জিজ্ঞাসা করাটাই ভুল হয়েছিল—তোমাদের বুঝি বাপমায়ে বিয়ে দেয়নি—পূর্বরাগের পরে বিয়ে হয়েছিল—না।”

স্বপন বলল : “তা হয়েছিল বটে—কিন্তু আমাদের দেশের পূর্বরাগের সঙ্গে আপনাদের দেশের পূর্বরাগের মধ্যে তফাৎ আকাশ-পাতাল। মাঠ, গিরিবন, নদীবক্ষ, থিয়েটার তো দূরের কথা ছোঁকলা-নির্জন পার্কেও বেড়াবার অমুমতি ছিল না। যদিও হাল-সামলে এসব সুরু হয়েছে আ লা বিলেত।”

সন্ধ্যা একটু কুষ্ঠার সাথে বলল : “কিন্তু উপস্থিত আমাদের পূর্বরাগের আলোচনা স্থগিত রেখে আপনাদেরটারই চর্চা হোক না।”

মসিয়ে বেনার বললেন : “কেন? ও—বুঝেছি—এ বুঝি বিয়ের পরে পূর্বরাগের পিছু-ডাক, না?—”

ব'লে আক্ষেপের একটা শব্দ ক'রে বললেন : “ঐ হয় সন্ধ্যা—সর্বত্র : পূর্বরাগের স্বাদ পেয়ে লাফিয়ে উঠে সে-স্বাদকে কায়েন করতে গিরে মাহুষ বিয়ে ক'রে একূল ওকূল ছুকূলট হারায়।”

আবার খরটা তাদের মিলিত হাস্যশব্দে শব্দিত হয়ে ওঠে।

হাসি খামলে মসিয়ে বেনার বললেন : “কিন্তু বাক—এসব বাজে কথা রেখে এবার আমার আসল প্রথম রোমান্সের কথাই পাড়ি—যার অবতারণার জন্তে এতখানি বিদগ্ধক।” বলতে বলতে তাঁর লঘু হুয়ের ব্যরণায় একটা সম্পূর্ণ আলাদা স্বর ওঠে বেজে।...একটা ছোট্ট মিড় দান্ন...তা-ও না...একটা মিড়ের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বললেও চলে...কিন্তু তাইতেই ঘরের আবহাওয়াটা যায় খেন বদলে।...সকলে উৎসুক নেত্র তাকায় তাঁর দিকে! কত স্তম্ভ-যে মাহুঘের কণ্ঠতন্নিমা...কত পেলব-যে তাঁর ব্যঞ্জন!—মনে হয় বুঝি প্রতিজ্ঞেনেরই!...

• মসিয়ে বেনার তাঁর কফির পেয়ালায় আর একটু কফি ঢেলে নিয়ে বলতে লাগলেন : “ধরতে গেলে সত্যিকার দুঃখের সঙ্গে সেই আমার প্রথম মুখোমুখি। সে-পরিচয় আজও তাঁর জের টেনে চলেছে। কিন্তু বাক—শোনো।

• “আমাদের ঠিক ছিল যে, ছ’বছর বাদে—সারা সাবালিকা হ’লেই—আমরা বিবাহ করব ও সারাকে নিয়ে গিয়ে পারিসে আনি একটা ষ্টুডিয়ো খুলে বসব। কিন্তু হায়রে, প্রথম যৌবনের উন্মাদনা!” ব’লে একটু চূপ ক’রে থেকে বললেন : “সব জল্পনা-কল্পনাই গেল আমাদের ভেতরে—সারার সম্ভান-সম্ভাবনায়।”

ওরা খেন একযোগে চমকে উঠল।

বুদ্ধ বলতে লাগলেন : “আমাদের মাথায় তো বাজ ভেঙে পড়ল। বুকুতেই পারছ—আমরা তখন দুজনেই ছেলেমাহুঘ—সারা তো সাবালিকাও নয়—কাজেই ইংলণ্ডে বিবাহও অসম্ভব। এক সাপার ডিঙিয়ে পারিসে গিয়ে পড়তে পারলে—কিন্তু সেদিকেও বাধা—কাকা ছিলেন বাবার উইলের একলিকিউটর, আমার পৈতৃক টাকা সবই তাঁর হাতে। তাঁর কাছে সব স্বীকার ক’রে টাকা চাওয়াও সম্ভব নয়,

অথচ অল্প কী অজুহাতেই বা সারাকে নিয়ে পারিস বাবার কথা পাড়তে পারি ?

“এক উপায় ছিল—ক্রূরহত্যা। কিন্তু নানা কারণে তা-ও সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া সারার বাপমাকে না ব’লে এ-কাজ করতে যাওয়া—কিন্তু এ-সব বর্ণনা ফলাতে যাওয়া একরকম বিড়ম্বনা। কারণ বারী অল্পরূপ অবস্থায় না পড়েছে তাদেরকে সে-নিরাশা ও আতঙ্কের ভাষা বোঝানো অসম্ভব। তাই সে-চেষ্ঠা ছেড়ে ঘটনাচক্রে আসি ফিরে।”

বুদ্ধ বলতে লাগলেন : “সব চেয়ে আমার ভয় হ’ল সারার মানসিক অবস্থার জটিলতা। আর দু-এক মাসের মধ্যে অবস্থাটা চেপে রাখা যাবে না— অথচ এ-সময়ের মধ্যে কোনো দৈববাণী শোনা না গেলে অকূলে কূল মেলা—আকাঙ্ক্ষাকৃতম। সারাকে ভরসা দিতাম নানা রকম বাজে কথা ব’লে।

• কিন্তু তাতে না ভুলত সে, না ভরসা পেতাম আমি নিজে।”

স্বপন বলল : “কী রকম ভরসা ?”

—“ভরসা আর কী—মাথামুণ্ডু ! একমাত্র ভরসা : যাক নাথার সন্দেহটা ভুল হয়। আমি শুনেছিলাম এ-রকমও নাকি কোনো কখনো ঘটে।”

ব’লে আবার একটু থেমে বলতে লাগলেন : “কিন্তু আমাদের সন্দেহ আর নাস থানেকের মধ্যেই পূরোপূরি ভঙ্গন হ’ল। ভুল হয়নি। সারা তো আতঙ্কে প্রায় পাগলের মতন হ’য়ে পড়ল। সব চেয়ে বিপদ হ’ল এই যে, ঠিক এই সময়েই তার শিক্ষাগত ক্যাথলিক কুসংস্কার সব উঠল জেগে। সে চারিদিকে পাপের বিভীষিকা দেখতে শুরু করল। আর এ-বিভীষিকা দেখা শেষটায় এমন বেড়ে উঠল যে, তার ফিট আরম্ভ হ’ল।”

সকল্য রুদ্ধস্বরে বলল : “কি করলেন আপনি তখন ?”

—“আমি আমার এ দীর্ঘ জীবনে অনেকবার দেখেছি সন্ধ্যা বে, অন্ধকার যখন সব চেয়ে গাঢ় হ’য়ে ওঠে তখনই আসে আলোর দূতী।— যখন অকূল পাথারে মনে হয় তরী না ডুবেই পারে না, ঠিক তখনই মেলে কুলের দিশা। আমাদের ক্ষেত্রেও হ’ল তাই। ঠিক কি এই সময়েই প্যারিস থেকে আমার বন্ধু ভালের আমার একটি চেক পাঠল পচিশ পাউণ্ডের।”

স্বপন বলল : “খানিক আগে যার উল্লেখ করেছিলেন ?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “হাঁ। সে ছিল আমার ‘লিসে’র ‘বাল্যবন্ধু’। ‘লিসে’\* থেকে বেড়িয়ে আমি যখন লীড্‌সে বাই তখন সে প্যারিসে ষ্টুডিয়ো খোলে। জীবনে তার কাছে আমার বহু জ্ঞান জমা হ’য়ে আছে আর কাকুর কাছে তার সিকির সিকিও না। তাই তার কথা এখানে একটু বলা অবাস্তব হবে না হয়তো। সে-সময়ও এসেছে।”

খ’লে ককির পেয়লাতে চুমুক দিয়ে বলতে লাগলেন :

“ভালের ছিল আমাদের মধ্যে মুক্তিমান প্রতিভা—বৃক-হিসেবেও ‘আদর্শ’ যাকে বলে। ‘লিসে’তে সে প্রতি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করত। শ্রেষ্ঠ ছাত্রাশিপগুলো তো ছিল তার একচেটে সম্পত্তি। অথচ কি আড্ডায়, কি বনভোজনে, কি হৈ হৈ-য়ে কিছুতেই সে পেছপাও ছিল না। আমাদের দলের সে ছিল সর্কীবাদিসম্মত দলপতি।—কিন্তু শুধু আমাদের দলেরই বা বলি কেন?—যেখানেই সে যেত সেখানেই বে তাকে কেন্দ্র ক’রে দল উঠত গ’ড়ে। দলপতি হবার ক্ষেত্রেই এক-একজনের ক্ষয় বে,—আঁতুড় থেকেই তারা দল গড়ে,—ভালের ছিল সেই শ্রেণীর মানুষ।

“আমি যখন প্যারিস ছেড়ে লীড্‌সে আসি তখন সে ভারি কুঁক হয়।

\* Lycée—ফরাসী স্কুল

তার ইচ্ছে ছিল : আমি তার পাশেই একটা ঠুড়িয়ো নিই। কারণ আমাকে, কেন জানি না, সে ভালোবাসত। এত ভালোবাসত যে, আমি লীড্‌সে চলে যাওয়ার দরুণ সে রাগ করে আমাকে চিঠিপত্র লেখা একদম বন্ধ করে দেয়। লীড্‌সে একবছরে পাঁচ-ছয়টি চিঠির উত্তরে একদিন মাত্র তার একটি চিঠি পেয়েছিলাম আমার জন্মদিনে তার স্বাক্ষর একটি সুন্দর ছবির সঙ্গে। তাতে শুধু লেখা ছিল—আমি আমার আশা ছাত্রজীবনের এই ঘটনাটি তোমার মনে আছে।”

স্বপন বলল : “কি ঘটনা?”

—“ঘটনাটি এমন বিশেষ কিছুই নয়। আমি মন্ট্রিয়ালের বিখ্যাত Bourgeois Gentilhomme-এ Monosieur Jourdain-র পার্ট নিয়ে নিজেদের মধ্যে একদিন অভিনয় করি। আমার সাজ-সজ্জা ও অভিনয় ভালোরের ভারি ভালো লাগে, সেটি সেও ত আরম্ভ করে আমি থাকতে থাকতেই।

“আমি এই ছবিটি পাই আমার লগুনে পাড়ি দেবার মুখে। এত চমৎকার সে এঁকেছিল ছবিটি যে—কিন্তু যাক সে-কথা। ভালোরের ছবি —প্রশংসা করাই বিড়ম্বনা।

“আমি ছবিটি পেয়ে তাকে উচ্ছ্বাসিত ধনুবাদ দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে জানাই যে, সে আমার ওপর আর যেন রাগ না রাখে, আমি লগুনে আঁট শিথতে যাচ্ছি ও কিছুদিন বাদেই পারিসে যাব ঠুড়িয়ো খুলতে। সঙ্গে সঙ্গে সারার ও আমার বাগদানের সংবাদও দিই অবশ্য।

“লগুনে আঁট শিথতে যাবার প্রস্তাবে ভালোর মনে-মনে হেসেই খন হয়েছিল কিনা জানি না—কিন্তু চিঠিতে সামান্য একটু ব্যঙ্গ করা ছাড়া আর কিছু করেনি : লিখেছিল যে, এঞ্জিনিয়ারিং পড়ার চেয়ে লগুনের আঁকাডেনিতে আঁট শেখাও ভালো। যাক।

“এই সময় থেকে তার সঙ্গে আমার চিঠি লেখা ফের হয় শুরু। আমি তাকে আমার এক-আধটা ছবি পাঠাতে আরম্ভ করি। ভাবটা : যদি পারিসেও বিক্রির কিছু সুবিধে ক’রে দিতে পারে তো মন কি ?—যেহেতু, লিখেছিলাম, টাকার আমার বড়ই দরকার পড়েছে হঠাৎ।

“সুবিধে হ’লও বড় সময়ে, অর্থাৎ ঠিক যে-সময়ে টাকার দরকার আমার সব চেয়ে বেশি। ভালের লিথল আমার তিন-তিনটি ছবি একজন আমেরিকান কোটীপতির পুত্র আড়াইশো ডলার দিয়ে কিনে নিয়ে গেছেন তার ষ্টুডিও থেকে। তার মধ্যে অর্ধেক—প্রায় পঁচিশ পাউণ্ড আমাকে পাঠায় ও, বাকি অর্ধেক পারিসে আমার নামে ব্যাঙ্কে দেয় জমা। পরে জেনেছিলাম : এ-আমেরিকান কোটীপতিটি ছদ্মবেশে ভালেরই নিজে—আমার অভাব বুঝে সে—কিন্তু সে-সব বখাস্থানে।

“আমি তো হাতে স্বর্ণ পেলাম, বৃকতেই পারছি। বিবাহ করব ব’লে সারাকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ পারিসে দে চম্পট। ভাগ্যে সে-সময়ে পাস-পোর্টের হান্ধামা ছিল না !

ব’লে থেমে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলতে লাগলেন : “অবস্থা পারিসে রওনা দেবার আগে ভালেরকে সারার সম্ভান-সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিলাম। কারণ এ অকূলে ও-ই ছিল আমাদের একমাত্র কাণ্ডারী। ও আমার ওর স্বভাবসিদ্ধ বেপরোয়া চালে ভরসা দিয়ে চিঠি লেখে যে, কোনো ভয় নেই—সারাকে নিয়ে বেন সটাং চ’লে আসি—সব ঠিক হয়ে যাবে ; এমন কি সারার বাপমা যদি পুলিশ ও লাগান তা হ’লেও কুছ পরোয়া নেই। কারণ অন্ততঃ সারার সাবালিকা হওয়া অবধি পারিসের কার্ভিযে লাভ্যা ( Quartier Latin )-তেও তাকে কোনো মতে লুকিয়ে রাখতে পারবেই।”

সক্কা বলল : “কোথায় ?”

মসিমে বেনার তার দিকে চেয়ে বললেন : “ও—তুমি বুঝি কাঠিয়ে লাঠিয়ার খাপখাপ জানো না ?”

—“তুনেছি সেখানে ছাত্রতা থাকে।”

—“নিখা শোনোনি—কেবল তার ওপর আরও একটু শুনতে পারতে—চারদলের অনিবার্যত দয়িত্বাও থাকে অনেক সময়ে তাদের সঙ্গে। আমি সারাকে নিয়ে এইভাবেই ছাত্র সেজে কাঠিয়ে লাঠিয়ার এসে উইল্যাম জ্যাকসনের বাসার কাছেই।”

সন্ধ্যা একটু কুণ্ঠিত চ'য়ে জিজ্ঞাসা করল : “মানে ?—একর—বিয়ে না ক'রে ?”

মসিমে বেনার স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন : “সেন, তুমি সন্ধ্যাকে চিহ্নিত পাগলের ছদ্মনামের এককটার কথাই যদি না লিখতে, তবে এতদিন কী দিয়ে ছাই চিহ্ন ভাঙতে শুনি ?”

\* স্বপন সম্বন্ধে বলল : “আমি লিখেছিলম—তবে খুব বেশি খোলাখুলি লিখিনি—ও সব লেখার কোনো সুযোগ ঘটেনি বলে।”

সন্ধ্যা প্রস্নোৎসুকভাবে একবার মসিমে বেনারের মুখের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই স্বপনের মুখের দিকে তাকাল, পরে জিজ্ঞাসা করল : “এমন কী কথা যে, লিখতে এত ইতস্ততঃ করতে হয়েছিল ?”

মসিমে বেনার বললেন : “কথা এমন কিছু নয় অবিজ্ঞ—যদি নিছক যুক্তি ও সত্যতার দিক দিয়ে সরলভাবে দেখা যায়। তবে সাংঘাতিক হ'য়ে পাড়ায় যদি মর্দ, নীতি বা কুসংস্কারের বেড়াগুলো আটক প'ড়ে তিরচ্ছিন্নভাবে দেখা হয়। অত্যন্ত সহজ জিনিসও যে তখন তেড়াবেঁকা দেখার কি না। যেমন ধরো না কেন, সারার ও আমার প্রেম ও তার সম্ভান-সম্ভাবনা। খোলা মন নিয়ে দেখলে এর মধ্যে এমন কিছুই তো ছিল না যার মধ্যে এতটুকু দোষের কথা ওঠে ? সম্ভান হচ্ছে নরনারীর

সেই আদমের সময় থেকে । অথচ চুটো পুরুতের মত আগুড়ানো হয়নি বলে এ-ধরণের ব্যাপারটা কী মতানই হয়ে পড়েছিল বলা দেখি ! কারিয়ে ল্যাঠায় ফরাসী ছাত্র ও শিল্পীদের দীর্ঘনীতি সহজে ঠিক হইত । আমি নিজে তাদের এ-নীতির খুবই পক্ষপাতী, এবং সব প্রথমিক লোকই পক্ষপাতী হ'তে বাধ্য—”

আনা বলল : “আপনি কিম্বা সন্ধ্যাকে ব্যাপারটা খুলে না বলতে পারেন এ-ভাবে মন্তব্য তাত্ত্বিক থাকেন—”

মসিয়ে বেনার সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন : “ও হোঃ—আমি খুবই গিয়েছিলাম যে, ফ্রান্সের একদল তরুণ বোহেমিয়ানদের একতায় আদিত প্রথাটির কথা জানি জানো না । প্রথাটা এমন কিছুই নয়—ছাত্র ও শিল্পীরা অনেক সময়েই তাদের সঙ্গিনী নিয়ে একসঙ্গে থাকে ও পড়াশুনাও করে—এই ।”

সন্ধ্যা বলল : “কিন্তু তা হ'লে বিবাহ করে না কেন ?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “তার অনেক বাধা । অবশ্য কেউ কেউ কবেও । কিন্তু তারা মনে করে যে, বিবাহের চিরদিনের দায়িত্ব এত তরুণ-বয়সের প্রণয় যুগলের ঘাড়ে না করাই ভালো । উল্টোই জানে যে, যতদিন আকর্ষণ তাজা থাকবে ততদিনই তাদের সম্বন্ধ । পরে যে-যার পথ নেবে খুঁজে । এক কথায় বিবাহিতদের মতন থাকবে, অথচ একে-ও পরে অপরের কোনো দাবি-দায়বাহী রটল না আর কি । বুঝলেন না ?”

সন্ধ্যা বলল : “বুঝলাম । কিন্তু এ-প্রথাটির সহজে আপনি অতটা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন কেন ? এর মধ্যে কত বেদনা লুকিয়ে থাকতে পারে মনে হয় না কি ?”

মসিয়ে বেনার শান্ত স্বরে বললেন : “নরনারীর কোন্ সহজের পিছনে ব্যথা থমকে নেই সন্ধ্যা ?”



মসিয়ে বেনার তার দিকে চেয়ে বললেন : “ও—তুমি বুঝি কার্টির লাঠীয়া বাপার জানো না ?”

—“কুনেছি সেখানে ছাত্ররা থাকে।”

—“মিথ্যা শোনোনি—কেবল তার ওপর আরও একটু শুনতে পারতে—ছাত্রদের অবিবাহিত দয়িতারাও থাকে অনেক সময়ে তাদের সঙ্গে। আমি সারাকে নিয়ে এইভাবেই ছাত্র সঙ্গে কার্টিয়ে লাঠীয়া এসে উঠলাম ভাগেবের বাসার কাছেই।”

সন্ধ্যা একটু কুণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল : “মা—একত্র—বির না ক’রে ?”

মসিয়ে বেনার স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন : “সেন, তুমি সন্ধ্যাকে চিত্রিত পারিসের ছাত্রমহলের এদিকটার কথাই যদি না লিখতে, তবে এতদিন কী দিয়ে ছাই চিত্রি ভরাতে শুনি ?”

সপন সসঙ্কোচে বলল : “আমি লিখেছিলাম—তবে খুব বেশি খোলাখুলি লিখিনি—ও সব লেখার কোনো সুযোগ ঘটেনি বলে।”

সন্ধ্যা প্রশ্নোৎসুকভাবে একবার মসিয়ে বেনারের মুখের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই স্বপনের মুখের দিকে তাকাল, পরে জিজ্ঞাসা করল : “এমন কী কথা যে, লিখতে এত ইতস্ততঃ করতে হয়েছিল ?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “কথা এমন কিছু নয় অবিজ্ঞ—যদি নিছক মুক্তি ও সত্যতার দিক দিয়ে সরলভাবে দেখা যায়। তবে সাংঘাতিক হয়ে লাড়ায় যদি ধর্ম, নীতি বা কুসংস্কারের বেড়াঙ্কালে আটক পড়ে ত্রিচ্ছিন্নভাবে দেখা হয়। অত্যন্ত সহজ জিনিষও যে তখন তেড়াবেকা দেখায় কি না। যেমন ধরো না কেন, সারার ও আমার প্রেম ও তার সম্মান-সম্ভাবনা। খোলা মন নিয়ে দেখলে এর মধ্যে এমন কিছুই তো ছিল না যার মধ্যে এতটুকু দোষের কথা ওঠে ? সম্মান হচ্ছে নরনারীর

সেই আদমের সময় থেকে। অথচ দুটো পুরুতের মত আওড়ানো হয়নি বলে এ-ধরনের ব্যাপারটা কী সতীন্দ্রই হ'য়ে পড়েছিল বলে দেখি। কাঠিয়ে ল্যাটার ফরাসী ছাত্র ও শিল্পীদের রীতিনীতি সঙ্কেও ঠিক তাই। আমি নিজে তাদের এ-রীতির খুবই পক্ষপাতী, এবং সব চরমস্তিক লোকই পক্ষপাতী হ'তে বাধ্য—”

আনা বলল : “আপনি কিন্তু সন্ধ্যাকে ব্যাপারটা খুলে না ব'লেই যদি এ-ভাবে মন্তব্য ঝাড়তে থাকেন—”

মসিয়ে বেনার সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন : “ও হ্যাঁ—আমি খুবই গিয়েছিলাম যে, ফ্রান্সের একদল তরুণ পোহেনিয়ানদের এ-অত্যন্ত মাদৃত প্রথাটির কথা তুমি জানো না। প্রথাটা এমন কিছুই নয়—ছাত্র বা শিল্পীরা অনেক সময়েই তাদের প্রণয়িনী নিয়ে একসঙ্গে থাকে ও পড়াশুনাও করে—এ-ই।”

সন্ধ্যা বলল : “কিন্তু তা হ'লে বিবাহ করে না কেন?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “তার অনেক বাধ্য। অবশ্য কেউ কেউ কবেও। কিন্তু তারা মনে করে যে, বিবাহের চিরদিনের দায়িত্ব এত তরুণ-বয়সের প্রণয়-যুগলের ঘাড়ে না করাই ভালো। দুজনেই জানে যে, ততদিন আকর্ষণ তাজা থাকবে ততদিনই তাদের সখক। পরে যে যার পথ নেবে খুঁজে। এক কথায় বিবাহিতদের মতন থাকবে, অথচ একের ওপর অপরের কোনো দাবি-দায়িত্বই রইল না আর কি। বুঝলে না?”

সন্ধ্যা বলল : “বুঝলাম। কিন্তু এ-প্রথাটির সখকে আপনি অতটী উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন কেন? এর মধ্যে কত বেদনা লুকিয়ে থাকতে পারে মনে হয় না কি?”

মসিয়ে বেনার শান্ত হুয়ে বললেন : “মরনারীর কোন্ সখকের পিছনে ব্যথা থমকে নেই সন্ধ্যা?”

—“মানলাম, কিন্তু—তবু—”

—“তবু বিবাহ-প্রথার চেয়ে এটা ভালো এই আর কি—অর্থাৎ অবশ্য তাদের কাছে যারা শুধু ভাবে সাদা চোখে ব্যাপারটা দেখে থাকে।”

—“কিন্তু সাদা চোখের সামনে বিবাহই বা এমন কী দোষ করল?”

—“করেনি? বাঃ। একটা গোড়াকার অস্থায়ী আবেগের স্বয়ংক্রিয় অজীবন সন্ত করায় কে? মজা আচারের শিকলে আটকিয়ে বীধে কে? অবশ্য সন্ত ও শপথ না করে বিবাহ করলে আমার তত আপত্তি নেই—যেমন আজকাল রাশিয়ায় করছে। কিন্তু তা হ’লে বিবাহরূপ অচল্যনটির আসল *raison d'être*-টিই যায় উবে, এটুকুও জেনে রাখা ভালো।”

সত্যা চিন্তিত্বের বলল: “কিন্তু সন্ত বা শপথ করার কি একেবারে কোনো সার্থকতা নেই তা হ’লে? সত্যানের কথা ভাবাটা কি এতই পাপ?”

—“পাপ বলি না। তবে কি জানো? যদি সন্ত ও শপথ করতেই হয় তা হ’লে জেনেভেনেই করা ভালো যে, সেটা করা হচ্ছে প্রেমের কথা ভেবে না—সত্যানের কথা ভেবে; রোমান্সের কথা ভেবে না—ঘর-গাড়ির কথা ভেবে। এদিক দিয়ে খানিকটা সার্থকতা মেলে ব’লেই বোধ হয় প্রেমের মধ্যে সন্ত এতদিন অবদি ঢিক্কে আছে। ভালেরও একথা বলতে মাঝে মাঝে।”

শপন বলল: “তবে বিবাহের বিরুদ্ধে তিন—খুঁড়ি, আপনাক্ত—এত খড়াহুত ছিলেন কেন?”

—“শুধু আমরা দূরদর্শী ছিলাম না ব’লে—বোহেমিয়ানি চালচলনের জন্ত ছিলাম ব’লে। তাই ভালেরের মতন বিবাহবৈধীদের কথা আমরা

মনে প্রাণে দিতে পারতাম সাড়া। সুরে সুর মিলিয়ে পারতাম বলতে যে প্রেমকে যতটা নিরঙ্কুশ রাখা যায় ততই ভালো—যত না বেঁধে রাখা যায় ততই শ্রেয়ঃ।” ব’লে সন্ধ্যার নিকে চেয়ে বললেন : “আশা করি তুমি মানবে সন্ধ্যা যে, এরকম চালচলনের মধ্যে যতই দোষ ত্রুটি থাকুক না কেন, এর মধ্যে একটা আদর্শবাদ ও সত্যাপরতাও আছে।—বসিও ঠিক ঠিকভাবেই দার্শনিক-মহলে যোগেন্দ্রনাথের এত বদনাম।” বলতে বলতে কান্ড হাতে তাঁর ওষ্ঠপ্রান্ত কুঞ্চিত হয়ে উঠল, তিনি বলতে লাগলেন : “অর্থাৎ যদি আমরা স্বীকে বাড়িতে পুরে বসিতাকে বাগান বাড়িতে মুক্তিতে চলতে পারতাম, সমাজকে মনে না মেনেও মুখে মেনে চলতে পারতাম,—এককথায় লোক-সমক্ষে ভগ্নামির মুখের প’রে নিখার স্বাবে উজ্জ্বলিত হ’তে বাজি থাকতাম—তা হ’লে পাণ্ডা পুরুত সকলেরই সমর্থন পেতাম আর কি।”

সন্ধ্যা কি বলতে গিয়ে থেমে গিয়ে শুধু বলল : “কিছুই এয়ার। আচ্ছা, তারপর বলুন।”

মসিয়ে বেনার চকিতে তার একটা হাত নিয়ে আদর ক’রে বললেন : “কিছু মনে কোরো না শেরি—”

সন্ধ্যা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল : “না না মসিয়ে, মনে করব কেন? আপনি তো আমাকে ব্যথা দেবার জন্তে বলেননি এসব। তবু যে লাগে, সে ঐ সাধারণেরই গুণে। বাক্”—ব’লে সহজ সুরেই বলল : “তারপর?”

—“আমি তো ভাগ্নেদের কণামত বিবাহ-উচ্ছেদ-মন্ত্রী হ’য়ে তার বাসার কাছেই একটা ষ্টুডিয়ে নিলাম—সঙ্গে একটি শোবার ঘর ও রান্না ঘর। সাত্যাকে নিয়ে সেইখানেই পাতলাম নৈশোবে—ঘরকটা।”

সন্ধ্যা বলল : “কিন্তু বিবাহ না ক’রে তার মতন ক্যাথলিক মেয়ে এভাবে থাকতে রাজি হ’ল? কমা করবেন এ-প্রশ্ন করছি ব’লে।

আমি শুধু সারার দিক দিয়েই প্রশ্রুটি করছি মনে রাখবেন। কার আপনার বা ভালের মতে সে সার তো না দিতেও পারত ?”

—“পারতই তো। আর সার কি সহজে দিয়েছিল ? এ-ভাবে যে থাকতে রাজি হয় দুটি কারণে। প্রথম : সে-সময়ে সে নাবানিত—না ক’রে উপায় ছিল না তার। দ্বিতীয় : ভালের তাকে ক্রমে ক্রমে বোঝায় যে, বিবাহ জিনিষটা একটা কুসংস্কার মাত্র।”

স্বপন বলল : “অমনি সারা বুলল ?”

—“ভালের বোঝাবার একটা অদ্ভুত কনভার্সে ছিল। বিশেষতঃ মেয়েদের ওপর তার এমন আশ্চর্য্য প্রভাব ছিল যে—যে, সে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। সারাকে বোঝাতে তার কন বেগ পেতে হয়নি তাই ব’লে—কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, শেষটায় সে পেরেছিল বোঝাতে। অবশ্য কায়েমী শাখার পারিপার্শ্বিক ও আবহাওয়ার একেবারে কেন্দ্রে পড়ে বাওয়ার দরুন সারাকে বোঝানো একটু সুসাধ্যও হয়েছিল। যেটা লগনের আবহাওয়ার মধ্যে হ’ত অসম্ভব। কারণ সারা দেখল চোখে সামনে যে, অনেকেই এ-ভাবে বিবাহ না ক’রে একসঙ্গে ঘর তুলে করছে—এবং যেটা সব চেয়ে বড় কথা : ভালেরও একটি মেয়ের সঙ্গে এইভাবে একত্র রয়েছে। এ-সব দেখে শুনে তার মাথায় স্তম্ভ বুদ্ধিই শেষটা হ’ল—ধর্মের কুসংস্কার হ’ল পরাস্ত।”

স্বপন বলল : “কিন্তু আপনি তো আর ঠিক ভালের বা অল্প ছাত্রদের মতন একটি সাময়িক শয়্যাসক্তিনী হিসেবেই সারাকে দেখতেন না ? কাজেই আপনার ও সারার সম্বন্ধ কি ঠিক অল্প করাসী ছাত্র ও তার প্রিয়নীদের মতন ছিল ?”

মসিয়ার বেনার বললেন : “না তা ছিল না বটে। কারণ সারাকে আমি সত্যি বিবাহ করব ব’লেই পারিসে নিয়ে আসি, ও শুধু ভালের

প্রভাবে প'ড়েই বিবাহ করার সম্ভব চিরদিনের মত ত্যাগ করি। একত্রে সে-সনয়ে যে কখনই মনে মনে অস্বস্তি বোধ করতাম না তা-ও বলতে পারি না। তবে কি জানো? আমিও জানতাম, ভালেরও বলত যে, যদি নেতাংই বিবাহ না ক'রে আর চলে না তখন বিবাহ করা তো প'ড়েই রয়েছে। আগে থাকতে সাত-তাড়াতাড়ি ও নাগরাজের পাশটি পরে রাখার কী-দরকার? অর্থাৎ why meet evil half-way আর কি—বললে না?”

ব'লে ককির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলতে লাগলেন : “সারা বিবাহ নু ক'রে এই বেপরোয়া ফিলসফি মেনে নিয়ে আমার সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে রাজি হয় এটাতে তারও মহত্ব ছিল অবশ্য। কারণ কে না জানে জীবনে কোনো রকম মহৎ দৃষ্টান্তই আমাদের ডাক দিতে পারে না যদি সে শ্রেণীর মহত্বের কোনো বীজই আমাদের মনের গোপন স্তরে উপস্থিত না থাকে! সারার মধ্যে একটা খুব আন্তরিক সত্যপ্রিয়তা ছিল, আর ছিল তার অসামান্য ভালোবাসার ও প্রকার ক্ষমতা। সে আমাদের ভালোবেসেছিল ব'লেই বুদ্ধি দিয়ে না হোক তার নারীত্বলভ সহজবোধ দিয়ে বুঝতে পেরেছিল যে, কান্নাকাটি ক'রে তাকে বিবাহ করতে আমরা বাধ্য করলে আমার নবোদগত এই আদর্শবাদে দা দেওয়া হবে ও তাতে তৃপ্তি ফলবে না। তার ওপর সে জানত যে, মেয়ে-কান্না কেঁদে আমাকে কখনো ফলবে না। তার ওপর সে জানত যে, মেয়ে-কান্না কেঁদে আমাকে বিবাহে বাধ্য করলে ভালেরের চোখে আমরা দুজনেই যাব ছোট হ'য়ে। আর ভালেরের ব্যক্তিত্বের জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে থেকে এসম্ভাবনার কথা করাও ছিল অসম্ভব।”

ব'লে ককিতে চুমুক দিয়ে বলতে লাগলেন : “পারিসে ভালের না থাকলে আমাদের যে কী হ'ত আরও ভাবতে পারি না। অস্বস্তি আমার সমস্ত জীবনটাই যে ব'লে বেত এটা নিশ্চয়। কারণ শুধু এই নয় যে,

সে আমাদের দলপতি ও আদর্শ ছিল; কারণ : সে ছিল আমাদের রক্ষক, সহায় ও আমার প্রায় অদ্বিতীয় অবলম্বন। নীড়-সে গিয়ে কাকাকে বলে ক'রে আমাদের মাসে মাসে আমার পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বরাদ্দ নাসোয়ারা পাঠাতে রাজি করাতেও সে, আমাদের ছবি আঁকতে শেখাতেও সে, নানা শিল্প-মহলে অংশগ্রহণ দিতেও সে, এক কথায় সে ছিল ঐ যে বললাম আমার অকূলের কাণ্ডারী—”

সন্ধ্যা বলল : “একটু বাধা দিচ্ছি ক্ষমা করবেন। আপনার নাসোয়ারার যোগাড় না হয় তিনি করলেন। কিন্তু সারার বাপ না? তাঁদের ক্রোধ থেকে তিনি আপনারদের বাঁচালেন কেমন ক'রে?”

—“সেখানে একটা ভারি সুবিধে হ'য়ে গিয়েছিল। সারা আমায় সঙ্গে পালিয়ে গেছে শুনেই তাঁরা ক্যাথলিক-সম্ভব ধার্মিক ক্রোধে দাঁট দাঁট ক'রে জ'লে উঠে তাকে ত্যাগ করেন। সারার সঙ্গে তাঁদের আর কখনো দেখাই হয়নি। এটা হয়েছিল সব দিক দিয়েই শুভ—তাঁদের দিক দিয়েও—সারার দিক দিয়ে তো বটেই। It is an ill wind that blows no-body any good বলে একটা কথা আছে না ঐংরাজিতে? এ-গোড়ামির বেলায়ও হ'ল তাই—শাপে বর আর কি। নইলে হয়তো তাঁরা পুলিশ লাগিয়ে সারাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা পেতেন—যেমন জুলিয়ার ক্ষেত্রে ঘটেছিল।”

আনা বলল : “জুলিয়া কে?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “ওহো তার কথা বলতেই ভুল হ'য়ে গেছে এতক্ষণ, দেখ দেখি! অথচ কত আশ্চর্য-বাজেই না বকছি—এ-অধ্যায়ের প্রধান নায়িকাকেই বার দিয়ে!—” বলে বুদ্ধ একটু থেমে বললেন : “জুলিয়া ছিল ভালোবাসার প্রথম প্রণয়িনী—বদিও ভালের ছিল তার পরতে গেলে দ্বিতীয় বরষা, অর্থাৎ দেহদানের দিক দিয়ে।”

সন্ধ্যা প্রশোৎসুক নেত্রে তাঁর দিকে তাকাল।

বুদ্ধ বললেন : “ঐ দেখ, ফের ধীরে নিচ্ছি যে, এ-সবই তোমার ভাল মতন। অর্থাৎ ফরাসী বুঝকরা—ভালের বাধ অবস্তা—বখন প্রণয়িনী পছন্দ করে তখন একটু বেপরোয়া হ’য়ে করে অনেক সময়েই, বুঝে না? এমন কি বনলে হয়তো বিশ্বাস করবে না, যাকে ইংরাজিতে বলে a woman with a past—তার স্বামি তাদের বেশি ভালো লাগে বরং—অনাছাত কুমারীর স্বামের চেয়ে।”

সন্ধ্যা বলল : “বেশি ভালো লাগে বোধ করি বেশি নিরাপদ ব’লেই?”

বুদ্ধ হেসে বললেন : “সন্ধ্যা তা হ’লে তুমি কিছু বোঝো দেখছি, হাঁ!” ব’লে তার গালে ঠোঁটা দিলেন।

সন্ধ্যা হেসে বলল : “নাঃ, বাংলা দেশের মেয়েরা খাস গেরে মাঝব—তা-ও সাবুতে ডিকিয়ে। এটুকুও তাই তারা বুঝতে অক্ষম যে, অনাছাত মেয়েরা প্রেমে বেশি বিশ্বাস করে ব’লে বেশি দাবি ক’রে আপনার ভালোবের মতন ডন জুয়ানদের ফেলে ফাংগারে।”

বুদ্ধ গম্ভীর হ’য়ে বললেন : “কথাটা তোমার মিথ্যা নয় সন্ধ্যা, কেবল ভালের ডন জুয়ান ছিল না। যা পেত তার শুধু যে দাম দিত তাই নয়—সে-দামকে রেখে যেত দশগুণ বাড়িয়ে। তার আশে মাজন তৈরসপত্রের মতন ক্ষয়ে যেত না—তস্ত্রী-বহুর মতন গভীরবনই হ’য়ে উঠত। শোনো তার একটি চিঠি, তা হ’লেই বুঝবে—এ-কথা।

## ভালোবের পত্র

বুদ্ধ পকেট থেকে একটি খাম অতি সন্তর্পণে বার করলেন। আঁধার ধীরে ধীরে খুললেন মধ্যকার চিঠিটি—কত-বে ঘরে। বার্তাকো চিঠির কাগজগুলো হলদে হ’য়ে গেছে।



সন্ধ্যা বলল : “ও কী ?”

বুদ্ধ বললেন : “ভালের একটি চিঠি। তোমার দেবার ব’লেই এনেছি—এটি ও আর-একটি। তার কথা বলব না। এটি আগে শোনো। ব’লে রাখি এটি আমি পাই ভালের পরে।”

সন্ধ্যা বলল : “মৃত্যুর পরে! মানে ?”

বুদ্ধ বললেন : “মানে শুনেই বুঝতে পারবে। ওর ইচ্ছে ছিল না, ও বেঁচে থাকতে এ-চিঠি—কিন্তু না, শোনো, চিঠিতেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।”

\* \* \*

বুদ্ধ পড়তে লাগলেন খেমে খেমে :

“তোকে কতদিন ক্ষম করেছি আমি কি জানি। ভাবিস পিরের ? জানি। কিন্তু তবু জুলিয়ার কথা তোকে বলতে পারিনি। এমন কি, তোর ও সারার কথা তুই আমাকে অকপট ব’লে আমাকে যে-তৃপ্তি দিয়েছিলি তার প্রতিদানেও না। কেন ? জানাতেই এ-চিঠি।

“চিঠিতে এ-সব লেখা আমার পক্ষে অনেকটা লোভ। কারণ এ-চিঠি যখন পড়বি তখন আমি তো আর নেই—এ-কথা যখন তাবি তখনই মন খুলে লিখতে ছোর পাই। আমার মনে, জানিসই তো, এক বিদ্ম অশ্বতি ও আশঙ্কা আছে—পাছে বা বলি তা-ই হ’য়ে দাঁড়ায় ঢং। চেষ্টা করি যাতে না হয়—কিন্তু তবু হয়ই বে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার Montaigne-এর কথা যে, আমাদের

‘এ-জীবন এক মহাপ্রহসন—রাজ-প্রদর্শনী,

সম্রাট, শাসক যত—যুগ যুগ ধরি’ তুলে ধরনি’

হাস্তের তরঙ্গলীলা—ঠমক ঠমক ঢঙ কত !

বিশ্ব এ-ব্যঙ্গের চিররঙ্গমঞ্চ—দিগন্তবিস্তৃত ।\* •

“মনে পড়ে তোর ডষ্টরে ভঙ্কির ব্রাদার্স কারামাছোতে সেই মাদাম  
হলাকভের কথা—যিনি সরলভাবে আত্মদোষ কীৰ্ত্তন করতেন প্রাশংসাই  
পেতে ? ওর এইটুকুই নয় । প্রাশংসার লোভে যে নিজের দোষ তিনি  
জাহির করতেন—এ কথাও যখন অকপটে স্বীকার করতেন তখনও  
সে-স্বীকারের পিছনে থাকত ঐ একই—কেবল হৃদয়ের স্তম্ভিলোভ যে :  
‘দেখ আমি কতটা স্বীকার করতে পারি অকপটে !’ কথাটা হয়তো  
পরিষ্কার হ’ল না, কিন্তু সত্যিই কথাটা অত্যন্ত স্বচ্ছ—আসলে । ধন্য  
ভালের পিয়েরের কাছে বলল : ‘পিয়ের, আমি দোষ করেছি এই এই ।’  
পরে দুখল এ-স্বীকারের পিছনে আছে পিয়েরের চোখে ছোট হ’য়েই  
আরও বড় হওয়ার চেষ্টা । রূপে উঠে একপাও সে স্বীকার করল পিয়েরের  
কাছে যে : ‘পিয়ের, তোকে নিজের দোষ বলতাম না যদি মনে মনে না  
জানতাম যে, তার ফলে তোর চোখে ছোট না হ’য়ে বড়ই হবে ।’ কিন্তু  
এ আত্মমানি-কীৰ্ত্তনের পিছনেও যে ঐ একই লোভ রইল তার শূকিয়ে  
—শুধু আরও হৃদয়ভাবে—পিয়েরের চোখে বড় হবার ! নয় কি ?

“হায় রে সরলতা ! এ-যুগে কোনো কাজই কি আমরা করতে পারি  
সরলভাবে—সে কথা অপরের মনে কী সূর গুনগুনিয়ে তুলবে এই *arrière-  
pensee*-কে † কাজিয়ে ? কবিতা লিখি, তখনও মনের একটা অংশ হয়  
থেকা—বিচারক । গান পাই—নিজের কান হয় অপরের : কত

\* “Une noble farce, de laquelle les rois, les choses publiques  
et les empereurs vont jouant leur personnage tant de siècles, et  
à laquelle tout ce grand univers sort de théâtre.”

† সেপথচিন্তা, সেপথচিন্তা ।

সময়েই সে উৎকর্ষা বোধ করে : অপরের ভালো লাগছে তো ? শেষ পর্যন্ত নিজেকে আমরা ভুলতে পারি কই ? একটা বাইরে দুটো আয়নার মধ্যে দাঁড়িয়ে। প্রতি আয়নার পড়ে সামনের আয়নার ছায়া—সে ছায়া পড়ে আবার সামনের আয়নার—সে-ও আবার সে-বিষকে দেয় ফিরিয়ে সামনের মর্পণে—এমনি চলে...চলে...চলে। বাস্তবিক এ-ছায়ার মেলার তো আর শেষ নেই। তেমনিই কি দাঁড়িয়ে নয়—আমাদের প্রতি কাজ, প্রতি লাভ, প্রতি অশ্রু, প্রতি হাসি—লক্ষ মনের আয়নার সামনে ? আমার প্রত্যেক ভঙ্গির বিষ পড়ছে তাদের 'পরে'—তারা ফিরিয়ে দিচ্ছে অল্প অল্প মনের আয়নার—এমনি ক'রে একটা মানুষ গাঁবে তার একটামাত্র ভক্তিতে লক্ষ ব্যক্তির হৃদয় হৃদয়তর হৃদয়তম মালা। আর মজা এই যে, এ-প্রতিটি মালার দোলা সম্বন্ধে সে সচেতন। এই-ই যে হ'ল এখনকার দুগ্ধধর্ম—এই জটিলতার গোলক ধাঁধা। সরল হবি—সাধ্য কি ? লক্ষ মনের আয়না ঠায় চেয়ে...লক্ষ বাচাইয়ের চক্ষু মেলে—সাধ্য কি একলা থাকবে কোনো চেতনা—পাকবে নীরব—আত্মসংহরণ ক'রে ভুলবে অপরকে ? এ-বহিমুখী গা ত্রিকলোমিত প্রাণলীলায় সে কি হবার ঘো আছে রে ?

“অথচ মানুষ চায় একলা হ'তে। চায় সরল হ'তে। চায় ভুলতে যে, সে লক্ষ চোখের সামনে। তাই না এত আশ্রাণ চেঁচা সবাইয়ের পুরাকালে পেছিয়ে একটা সহজতর হৃদয় খোঁজা। তাই তো—কিন্তু না, অগ্রক্ৰমণিকার বহরে হয়তো তুই হাঁপিয়ে উঠবি। কিন্তু কেন এত ভিনিতা করলাম ? ভাবছিল সরল হ'তে চাই ব'লে ? না। চং করতেই চাই ব'লে ?—তা-ও না। তবে কি চং-কে প্রাণপণে এড়াতে চাই ব'লে ? তাও নয় যে নয়। কারণ চং করতে না চাওয়াও—যে একটা নিপুণ ছয় চং পিয়ার, নয় কি ? খিওফিল গতিয়ের জটিল প্রকৃতি বহুলমারের ব্যাখ্যায় ওকালতির হুরে খলেছিলেন মনে পড়ে ?—

আছে এমন মানুষ বাবা স্বভাব-চরিত্র প্রতিচরণপাতে :

সরল হ'লে আরো চরিত্র-বে হবে গো তারা হৃদয়তর হাঁদে ! \*

“তবে ? এ-গোলকধাঁধা থেকে বহির্গমনের পথ কি নেই-ই একবার ? নিজের কবল থেকে মুক্তির ?—বিষজোড়া চোখের নিরীক্ষা থেকে নিষ্পত্তির—নিজেকে চিনে ?—কিছু ছায়া যে, নির্জনলোকে স্থির হ'য়ে ব'সে নিজেকে চিনবি তুই কী ক'রে বল ? বাইরে থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করলেই কি নিটোল আত্মপরিচিতি হয় ? বাইরের যোগ যে আমাদের নীড়িতে সঞ্চলমান—পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হব কেমন ক'রে ? বায়ুহীন মণ্ডলকে ধরে রাখা এই বায়ুময় জগতে ? যেখানে বায়ুর চাপ এতটুকুও কমল—লক্ষ নক্ষত্র এসে ধাওয়া করে যে—বিজ্ঞানে বলে না ? তেমনিই তো মানবচেতনাও । সবার থেকে বহিঃস্বত্র কাটলেই কি সে একলা হয়, না হ'তে পারে ? নিরালায় কেবল হৃদয়তর পেলবতর স্তরে সে বাধে নিজেকে—বাদের ছেড়েছে তাদের সঙ্গে ।

“তবে ? এ-গুটি-কাটার পথ নেই এই-ই কি জ্ঞানের শেষ সাফা ? না, আছে । পূর্ণতার পথ আছে—কিন্তু শুধু একটি সাধনার : ভালোবাসার । একমাত্র প্রেমেই এ অসম্ভব সম্ভব হয়, খোলে এই পাকের-পর-পাক, গ্রন্থির-পর-গ্রন্থি । তখন মুহুর্তে হই আমরা আত্মতোলা ও আত্মপূর্ণ । তখন আর বিশ্বের বাধন বাধে না—খোলে : প্রেমাস্পদের মধ্যে দেখে মানুষ নিজের পূর্ণরূপ—অপও মূর্তি ।

“তাই আমি চাইতাম এ-ভালোবাসা । পেলামও । কিন্তু এ-অগ্রাণ্য আশীর্ভূত বস্তুর পাওয়ার ইতিহাস বলতে বাধ্য—এতই পবিত্র এ-প্রাণি । তাই তো একথা বলতে চাইনি কাউকে । বলতে গেলেই মনে হয়েছে :

\* “Il y a des gens qui sont naturellement maniérés. La simplicité serait chez eux affectation pure et comme une sorte de maniérisme inverse.”

জীবনে প্রতি কাজেই তো ঢং হয়েছে আমার সর্বেসকী, একটা ক্ষেত্র থাক না যেখানে আমি খাটি—পুরো খাটি। সেটা হোক জুলিয়া ও আমার সবক। এই-ই ছিল আমার অভিপ্রায়। তাই তোকে দিয়েছি তুং—কিন্তু না ব'লে। তুই ভাবতিস আমি তোকে বিশ্বাস করিনি পুরো। না রে না। তোর চেয়ে কোনো বন্ধুকে আমি বিশ্বাস করিনি কখনো—এক জুলিয়াকে ছাড়া অবশ্য, কিন্তু সে তো বন্ধু নয়—তোর চেয়ে তের বড়। কেবল—ঐ যে বললাম, কেন বলিনি।

“বুলি কি! না-ও যদি বুঝতে পারিস পুরো পুরি—কমা করিস তাই এই ভেবে যে, তোর ভালের তোকেও যে বলিনি, সে পারেনি ব'লেই। আর সে-অক্ষমতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপই সে এ-চিঠি লিখে গেল—সে যখন থাকবে না তখন তুই পড়বি ব'লে। প'ড়ে তাকে কমা করবি ব'লে। বেঁচে থাকতে থাকে পুরো বুঝতে পারিসনি মরণের পরে তাকে বুঝবি ব'লে। অন্ততঃ বুঝতে চেষ্টা করিস পিয়ার—তোর অভিমানী বন্ধুর অভিমানের কথা ভেবে। লোকে তাকে পুরোপুরি বুঝুক এ ছিল তার যে কত দিনের কামনা—জানিস তো তার দুর্বলতা।

“কিন্তু বেঁচে থাকতে মানুষকে বোঝা যায় না যে পুরো। তাই তো পূর্ণজ্ঞানের অপেক্ষা ক'রে আছি। আমার কিছু বিশ্বাস বেশি অপেক্ষা করতে হবে না। কি জানি কেন, আমার ছেলেবেলা থেকে কেমন যেন মনে হয় আমার আয়ু অল্প। কত কী যেন আমাকে ডাকে : নানা রকম মূর্তি, রং, আলো নানা সময়ে আমি দেখি—যাদের ভাষা আমি বুঝি না, অথচ মনে হয় যেন চেনা। মনে হয় তাদের সঙ্গে চেনা হবে দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গে। একথা আমি প্রমাণ করতে পারি না। কিন্তু প্রমাণ করা যায় কী-ই বা—এ জীবনে ? বা আমার কাছে সব চেয়ে অন্তরঙ্গ, সব চেয়ে জলন্ত, তাই তো দেখি বলতে গেলেই হয় স্মিরমাণ,

হয় নিভৃত, হয় কাপুসা। বহু, আমার কাছে এই যে অহুত্ব, প্রত্যক্ষ  
‘অনিখার মতন দীপ্ত অহুত্ব’ যে, এ-জীবন আমাদের বেন একটা  
পাহালা। প্রমাণ করা যায় একে ? না তো ? অথচ তবু আমার  
অনিশই মনে হয় যে, এখানে একটা বিশেষ পরিণতি লাভ ক’রে উঠাও  
হবে আমরা জনে জনে, হেলির ধূমকেতুর মতন নয়—সেইনব তারার  
মতন ঘাঘের আলো চলে...চলে...চলে...কিন্তু আর করে না। আমি  
নাস্তিক—কিন্তু চেতনা অস্তি—সে অমর—এ আমার কব বিবাস, এ-চেতনার  
পরিণতির শেষ নেই এ-ও। তাই বখন তুই এ-চিঠি পাখি জানিল  
‘আমি অদ্বন্দ্ব অক্লত হ’লেও ‘কিছু-না’ হইনি—আছি, ও চলছি। কি  
ভাবে ও কোথায় জানি না—কিন্তু, অস্তি প্রত্যক্ষভাবেই আছি।  
‘যার তাকে ভুলিনি। কারণ আমার এ-ও মনে হয় যে, ভালোবাসার  
দান মরে না—শুধু স্থিতিতেই না—জীবনেও। তার রূপ বদল হয়—  
পাপড়ি করে, কিন্তু পরাগ থাকে। এক আধার থেকে আর-এক  
আধারে বোনা হ’লে সে-পরাগে নব গন্ধ ওঠে কুটে—নব রং ওঠে জ’লে  
—নব সুবাস ওঠে ভেসে—কিন্তু তার অমরতন নির্যাসের নির্ঝাণ নেই।  
তাই ভাবিস নে তোকে আমি ভুলব এ-দেহের গ্রন্থি পুলবার সঙ্গে সঙ্গে।  
তোকে ও জুলিয়াকে ভুলব না কোনোদিনই। অথচ তবু হ্রোদেয়ও বেতে  
চাই ছেড়ে, আজও মনে পড়ে মালার্মের সেই :

‘ক্লিয় দেহ, ক্লিয় দেহ, হায় !

প্রতিটি অণু মুক্তি চায়—চায় !’\*

কেন ? জানি না। অথচ আমার কোন একটা স্তর বলে : কোথায় ?  
স্বীতি প্রেম থেকে মুক্তি—আত্মার ? তত্বকে ছিন্ন ক’রে মুক্তি—বীণার ?

\* “La chair est triste hélas ! — Fuir ! — Là-bas fuir !”

.....Mallarmé.

“না। জুলিয়াকে ভালোবেসেছি, তোকে আপনার মাহুয় বলে চিনেছি। যেখানেই বাই তোদের মুখ পড়বে মনে বা চাই তা পার কি না জানি না—কী-বে চাই তা-ই কি জানি রে?—তবে চাইলে যদি পাওয়া যেত তবে চিরচলার পথে সাথী চাইতাম তোদের দুজনকে। আঃ বোধ হয় কোনোদিনই ক্লান্ত হতাম না তোদের সাহচর্যে—কেবল এক সপ্তে : আমরা তিনজনে চলতাম চলতাম চলতাম—অশ্রীস্তুগতিতে।

“কেন এতসব বকছি? বোধ হয় মৃত্যুর ছায়া যখন কাছে আসে তখন এমনিই হয়। বোধ হয় যখন জীবনের অনেক দীপ্ত মুখরতা ছায়ামোহন হয়ে আসে, তখন আপ্সা অশ্রুভব আপ্সা কথার মধ্যে দিয়ে আপনাকে ফুটিয়ে তুলতে চায় কারুর কাছে—কোনো দরদীর কাছে—আলো ঝিকমিকিয়ে। জানিস তো, মাইকেল এঞ্জেলো ভাসারিকে লিখেছিলেন :

১. ‘যতই বাঁচি মরণ চিতে মম

অলিয়া রয়ে চিন্তা-তারা সম।’\*

আমার জীবনের নানা দেখার ভঙ্গি তাই এত বদলে গেছে হয়তো—এই নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুছায়ার দরুণ, কে জানে? আমার নানা জিনিষই ছিল চং, কেবল দেখার ভঙ্গি যে সাধারণের চেয়ে বেশ একটু আলাদা ছিল বলে জানতাম ও ফলিয়ে তুলতে চাইতাম সেটা চং ছিল না—এই মরণের ছায়া সারিধোর দরুণ। জীবনে নানা ভাবের রামধন্য রং, নানা ঠমকের ফুলিক, নানা চমকের বেশ এই ছায়ার বায় নিভে। তাই মরণের কথা ভেবে আমি সব চেয়ে সহজে খুলতে পারি নিজের সুখোষ—সব চেয়ে সহজে তুলতে পারি আপনাকে—হ’তে পারি একলা।

\* “Non nasce in me pensier che non vi sia dentro scolpita la Morte.”

“কিন্তু এবার বলি। বলা এখন সহজ হবে জীবনের সুখরতার অন্তরলন  
মসিহে আসছে বলে। ঐ—শুনতে পাই এক নিখরতার জরাজ্বনি  
মেন—রথচক্রের রোলের সঙ্গে উঠছে। এই গভীর কন্ঠের পটভূমিকার  
পরে কুটিয়ে তুলতে পারব হয়তো : কেমন ক’রে জুলিয়াকে ভালো-  
বেসেছিলাম।—যা জীবনের উজ্জল পাদপ্রদীপের আলোর ছিল মুদিত—  
অন্ধকারের কুলার হয়তো মেলবে দল।”



বৃদ্ধ কণ্ঠ একটু পরিষ্কার ক’রে নিরে ফের পড়তে লাগলেন :

“তোমার সঙ্গে আমার দেখা সেই কবে : দশবছর বয়সে, ইস্কুলে।  
প্রথম দেখারই তোকে ভালোবেসেছিলাম। পরে পড়েছিলাম—তোমার  
প্রদানে—মার্গের Hero and Leander নাটকে—যেটা তুমি ইংলণ্ড  
থেকে আমার ও জুলিয়ার বাগ্‌দানের সময় পারিয়েছিলি উপহার :

‘Who ever loved that loved not at first sight ?’  
পড়েই মনে হয়েছিল কত সত্যি। অজান্তে আমার জীবনে। কারণ আমার  
প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রেই একথা বরাবর খেটেছে। যাকে প্রথম  
বর্ণনাই ভালোবাসতে পারিনি তার সঙ্গে পরে হাজার মিশেও কি কখনো  
মনে হয়েছে একটুও বেশি চিনলাম। কিন্তু প্রথম সুখোমুখির সময়ে সেই  
অদ্বিত দেবতার আলো যার নয়নে পড়ে তার জ্বরের তল অবধি স্বচ্ছ  
ক’রে দেয়, তার আধিত্যেরা কি আর কাশসা হয় তাই কোনোদিন ?  
বলিনি, মানুষ ভোলে নিজেকে কেবল তখনই যখন সে ভালোবাসে !  
তোকে যেদিন দেখি : তোমার চোখের মধ্যে দেখি আমারই ছায়া।  
সে ছায়া এত সুন্দর যে, হই আনন্দারা—আপনাকে তুলি সত্যি—‘আমি  
এত সুন্দর !’—ভেবে। সেই না ভালোবাসা—নিজের সুন্দরতম রূপছায়া



প্রেমাস্পদের হৃদয়-বর্ণনে দেখে নিজেকে পূর্ণ করে ফিরে পাওয়া—  
চেনা—ভোগকরা !

“কিন্তু তারও আগে আমার চোখের পর্দা বাতুল মূলে। জুলিয়ার  
সঙ্গে দেখা হয় আমার ন’বছর বয়সে। ওর বয়স তখন আট।

“সে-কথা তুলবার নয় পিয়ের। বাবা নিজেই হয়েছিলেন আমাকে  
নেপল্‌সে। নেপল্‌সের রাস্তা উঁচুনিচু জানিসই তো। চকল চকল  
চলেছি, এমন সময়ে বাতাসের মতন ছুটে গেল এক ছোট মেয়ে পাশ  
দিয়ে। ঠিক আমার সামনে এসেই কী ক’রে আমার খেঁচের পড়ে  
আর কি। টপ্ ক’রে ধরলাম চেপে। সে বেঁচে গেল, কিন্তু টাল  
সামলাতে না-পেরে আমি প’ড়ে গেলাম। চালু রাস্তা নিচে গড়িয়ে।

“মনে আছে জুলিয়া চিংকার ক’রে উঠেছিল। আমার মনে নেই।

“যখন জান হ’ল দেখি শিল্পের—একটি মাতৃমূর্তি, তার পাশে ছবি  
মতন—জুলিয়া : আট বছরের মেয়ে—ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো চুল  
মাথায়—চোখ দুটি অশ্রুস্রবীত, সে ছবি কি তুলবার ? মাতৃবৈষ্ণব মুখ বে,  
এত তুলার হয় কখনো জানিনি এর আগে।

“হ’ল শুভদৃষ্টি বালকের সঙ্গে বালিকার। সে কী যে-সে রোমান্স  
রে!—প্রবীণরা বলে ছেলেমানুষি! যেন প্রবীণরা ভালোবাসার কিছু  
জানে! দুঃ। জানবে কোথেকে বল ? ভালোবাসার চরম ও পরম  
কলই যে হ’ল ছেলেমানুষি। মনে যখন গ্রহির পর গ্রহি উঠেছে ক’রে,  
শক্ত হ’য়ে কুল—তখন কি ভালোবাসা হয় রে পিয়ের ? হয় শুধু চাপরা  
—নিজের অহমিকার খোঁরাক চাপরা। অস্বস্তি : শতকরা নিরানব্বই  
জন প্রবীণ প্রেমিকের ক্ষেত্রেই। ভালোবাসতে হ’লে, সত্যিকার রোমান্স  
করতে হ’লে হাতে হবেই শিশু।

“তার পরের ব্যাপার তুই জানিস—মানে ঘটনাগুলো। জুলিয়ার

নাথ গারিসেই থাকতেন ডাক্তারি করতে। নেপ্লুসে ভিটে তাঁর, বড়তে বেতেন মাঝে মাঝে। তুই ও আমি যেদিন প্রথম তাঁর বাগানে গড়া করি—মনে পড়ে? কেন করি তাও? জুলিয়াকে তুই একটা টু ডালের আপেল আমার আগে পেড়ে দিস। তাকে সাতদিন কমা করতে পারিনি এ-অপরোধের দরুন।

“মনে অসহ বস্তুতা হয়েছিল কিছু একত্রে। এই কি ভালোবাসা? হুগিয়াকে ভালোবাসি বলে তোর ওপর করলান রাগ? আর এই কারণে? বুঝলাম শিশুর মধ্যেও লুকিয়ে থাকে ঐকীণ। তার নাম সন্ধান—প্রতিদানের কামনা। জুলিয়ার সবটাই আমি চাই—এই রাগ। তাকে এতটুকু কৃতজ্ঞতাও সে দিতে পারবে না! হি! চিত্তের মধ্যে এত কৃতজ্ঞতাও আছে। জীবনে যত মানি আছে তার মধ্যে লাব হয় সব চেয়ে মানি পুঞ্জীভূত হ’য়ে আছে হিংসার—উর্বার। অথচ এত তাঁর অশুভৃতি জীবনে কমই আছে। বর্ষরতার চেয়ে প্রবল অশুভৃতি ক’তে পারে আর?”

“আমার মনটা অল্প বয়সেই অত্যন্ত বেশি সজাগ ছিল। (এটা দরজা আমি পরে বুঝতে পারি।) তাই তখন থেকেই পণ করি : এ যেন না। স্পষ্ট ভেবে-চিন্তেই যে এ-পণ করেছিলাম তা নয়—তবে বড় বিস্তী লেগেছিল নিজের এ-স্বভাব। আবছা ভাবে ভেবেছিলামও একটু : একটা ভালোবাসা আর-একটা ভালোবাসার বিরোধী হয় কেন? জুলিয়াকে ভালোবাসার ক্ষেত্রেই যে তোর ওপর অচেতুক ফল পেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে রাগ হয়েছিল, সেক্ষেত্রে আশ্রয়মানি ছিল তাক আমার বহরিন।

“কিন্তু সজাগ থাকার ফলে ও কু-প্রভৃতিটা গেল। মন আমার স্পষ্ট না বুঝলেও বুঝল : এটা বড়ই হয়—বড়ই কুস্তী। নীতির দিক

থেকে ভেবে নয় অবশ্য—হুঃখ পেয়ে। কারণ তোর বিচ্ছেদও আমি সহ্য করতে পারতাম না যে।

“যাক এসব বাজে কথা। জুলিয়ার কথাই বলি।

“তুই চ’লে গেলি তোর কাকার কাছে। এমন রাগ হ’ল!...তাকে চিঠি লিখিনি ক’বছর? তিন, না? হবে না রাগ? সভ্যতার কেন্দ্র করাগীদেশ ছেড়ে তুই গেলি কিনা চাষাদের দেশে, যারা এমন কি ছোট কথা কইতেও জানে না বক্সিমগ্রীব না হ’য়ে!

“রইল জুলিয়া। সেই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিলগ্নে—এক। সে। যখন মাহুব সব চেয়ে সঙ্গপিপাসু—সেই সময়ে। আশ্চর্য্য নয় যে, জুলিয়া হ’ল আমার জীবনের সবচেয়ে-বড়-অভিজ্ঞতা।

“তোর ও সারার খবর পাওয়ার একবছর আগে—যখন আমার বয়স উনিশ, জুলিয়ার আঠারো, আমরা বাগ্‌দান করি জানি ই তো।—কিন্তু বিবাহ করব না এই বন্দোবস্তে। বলিনি—আমি সব যারই একটু বেশ সঙ্গাগ ছিলাম—পাকা ছিলাম—যাকে বলে *prince* \* তাই এই পণ। তার উপর আমি ছিলাম—যে একদল কিশোর বাহেমিয়ানদের দলপতি মতনই। বিবাহ করা আর যারই সাজুক না কেন আমার সাজবে কেমন ক’রে?

“এই সময়ের অনেক ঘটনা বাদ দিয়ে বাই। গল্পের মতন ঘটনা-বিবৃতি করতে আমার একদম ভালো লাগে না জানিসই তো। জীবনের ঘটনাবলিকে দেখি আমি আধার হিসেবে যাদেরকে অবলম্বন ক’রে অন্তর্জগৎ আধের-রূপে ওঠে কলকে, যেমন শাখাকে অবলম্বন ক’রে ফুল, বোটাকে অবলম্বন ক’রে কল। আমি চাই ফুলের গন্ধ, ফলের স্বাদ,—শাখা, কাণ্ড, অঙ্কুর—এসব না। তাই অবাঙুর ঘটনাগুলো বাদ দিয়ে

\* আর বয়সে অধিক বিকশিত চেতনার মাহুব।

বেঙলো আমার অন্তর্জগৎ ও আমাদের ভালোবাসার নিহিত রূপটি  
বসতি করিয়ে তুলবে সেইগুলোই বলব।

“জুলিয়ার সঙ্গে আমার বাগ্‌দান আমরা গোপন রেখেছিলাম, কারণ  
জুলিয়ার বাবা ছিলেন—খাঁটি ইতালিয়ান ক্যাথলিক—এক সময়ে পাত্রী  
হয়েম প্রায় হির করেছিলেন। সেই প্রবণতার কুল তাঁর সারা জীবনকে  
করেছিল প্রভাবিত। আমি খোলাগুলিই বলতাম : আমি নাস্তিক।  
তাঁর ওপর আমার যে-কারণেই হোক, একটা দল-গড়ার ক্ষমতা ছিল  
জানিসই তো! আমাকে কেন্দ্র ক’রে একদল দুবক রোখালো হ’য়ে  
শপথ করেছিল ভগবান্ মানবে না, না বিবাহ, না সমাজের চলতি কোনো  
অনুশাসন—বদি না মনেপ্রাণে এ সবের সাথ পায়। কাজেই নানা দুর্ভাগ্য  
হটেছিল আমার নামে। তাই জুলিয়ার বাবা মিস্ত্রোর জিনোনি আমাকে  
দেখতে পারতেন না।

“কিন্তু নিয়তি মানুষকে পাকে কেলতে ভালোবাসেন কে না জানে!  
মিস্ত্রোর জিনোনি জুলিয়াকেও এত ভালোবাসতেন যে, তাঁর মনে  
পারতপকে কষ্ট দিতেন না—দিলে নিজে খুশতে পারতেন না রাতে,  
দাসতে চলতে-থেতে পারতেন না দিনে। কত চেষ্টাই করতেন যাতে  
মেয়ে তাঁর আমার সঙ্গে বেশা ছেড়ে দেয়। কিন্তু সেই এতটুকু বয়েস  
থেকেই ও যে-একগুঁয়ে! তা ছাড়া আত্মরে মেয়ে! জানত : একেকের  
বাপ খানিকটা বেহাশ তো বটেই। তাই আমাদের মেলামেলা চলত  
মিস্ত্রোর জিনোনির নাকের সামনে বাকে বলে।

“এদিকে কিন্তু জুলিয়াও আমার অন্তর ভালোবাসত তাঁর বাপকে।  
কাজেই বিবাহ না ক’রে আমার সঙ্গে ঘর করবে এ-প্রস্তাব ওর বাপের  
কাছে করতে পারত না। জীবন আপোষ-পঙ্কী—পথে পথে। দুতরফ  
থেকেই হ’ল রুকা। জুলিয়া তাঁকে বলল না খোলাগুলি যে, আমাকেই

করেছে সে চিরবরণ। তাই বাগ্‌দান হ'ল গোপনে। ঠিক হ'ল কিছুদিন পরে ধীরে ধীরে ভাঙা হবে ব্যাপারটা—যখন জুলিয়া অক করেকজন পাণিপ্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান ক'রে প্রমাণ করবে যে ও অননুমদ—তখন। তখন কস্তুর মতে পিতা সায় না দিয়ে করবেন কী ?

“আমি গোপনতার পক্ষপাতী ছিলাম না কোনোদিনই। তবু প্রেমের জন্তে তা-ও মানলাম। ফের রফা—আদর্শের সঙ্গে। তোরা বলতিস আমি আদর্শ থেকে একচুল সরি না। কথাটা সত্যি নয়। প্রতিমি প্রতি মুহূর্ত আদর্শ আমাদের ডাকে, আমরা ছুটি পিছনে—সে-ও বাক্য স'রে। রফা না ক'রে উপায় আছে ? তবু ছুটি কেন আদর্শ পিছনে ?—কোথাও না কোথাও মিলব ব'লে—যেমন ছোট্ট দুটো সমান্তরাল রেখা—চরম অস্তিমে মিলবে ব'লে। নইলে কি তারা পারত ছুটতে সমান ব্যবধান বজায় রেখে ? আশা—আশা—জীবন চলে আশার তরঙ্গে। তাই ছোটটা চাই। সেইটেই আসল।

“কেবল এইটুকু সাফাই আমার আছে যে, রফাকে আমি খোলা চোখে রফা ব'লেই মেনে নিতাম—বলতাম—না : এটা ভুল বা উচিত। আর প্রাণপণে চেষ্টা করতাম—যাতে ক্রমেই রফাকে বিসর্জন দিয়ে অসহিষ্ণুতাকে করতে পারি বরণ—যে-অসহিষ্ণুতা নিজেকে মারে চাবুক যদি আদর্শের দিকে ধাওয়ার গতি হয় তার স্রব। আমি গতি-বিলম্বী স্থিতিবিরোধী মানুষ-যে মনে-প্রাণে। এখানে আমার মধ্যে কোনো ভেজাল ছিল না।

“তাই আমি চাইতাম নিয়তই যে, জুলিয়া জোর পায় তার বাবাকে সব খুলে বলতে। কিন্তু জোর করতাম না। সময়ে সময়ে মুকিল হ'ত ঠিক করতে : কোন্ আদর্শ বড় ? প্রেমের ? না সত্যের ? সত্যপথে চলব ব'লে প্রেমাস্পদকে নিজের প্রভাবের পাকে কেলে ছঃখ দিয়ে তার

পিতার স্নেহনীড় থেকে ছিনিয়ে নেব—এই-ই কি সত্য কাজ হবে! না, ওর জন্মের অমূল্যত্বের দাবি-দাওয়াকে নির্মূল হ'য়ে নির্মূল ক'রে সহবাসের সত্য আশ্বাসের জীবন সার্থক, দীপ্ত, সফল হ'য়ে উঠবে? ভাবতাম, কিন্তু কুল-কিনারা পেতাম কই? এ-জীবনের একটা প্রকাণ্ড দোহাতা চোখ প্রকাশ হয় অনেকেরই জীবনে এই প্রেম ও সত্যের সুখোন্মুখি হওয়ার দুর্ভাগ্যে। কত-যে দুঃখ কত-যে স্বন্দ আশ্বাসের গেছে—কোন মোড়ে বৈক নেব ভাবতে!—কিন্তু না, দুঃখের জন্তে গর্গর করাও একটা ঢং—সার্থক হীন বাহাদুরি। তবু এ গহিত কাজ নিতাই ক'রে ফেলি—বন্ধুর কাছে। অল্প দুঃখে এ-সমবেদনা পাওয়ার অগোরব তত বাজে না, কিন্তু প্রেমকে বরণ করার পথে বাজে, কেননা প্রেমকে মর্যাদা দেওয়া হয় না যদি প্রেমের উদ্দেশ্য-পথে কাঁটার কত নিয়ে করি দুঃখ-বিলাস, কাব্যিহান। ও-কাজ তাই করব না আমি—যদিও তাই ব'লে বলি না—প্রমবরণের পথের দুঃখ দুঃখই নয়। বলতে কি, জীবনের তীব্রতম বেদনা এই পথেই—কেননা সব বড় উপলক্ষ্যই পথ উগ্র চেতনার পথ। আর উগ্র চেতনার আলোর স্বপ্ন বাধা-বেদনাও দেখা দেয় নত হ'য়ে।

“কুলিয়া ছিল আমার প্রভাবে মুগ্ধ—আচ্ছন্ন। কিন্তু তবু ওর মনটা অল্প প্রভাবও খুঁজত। তাই ও ওর বাবার প্রভাবও কাটাতে পারেনি। তাই ও ওর অল্প প্রণয়ীসেরও—( কারণ ওর প্রণয়ী ছিল দিলের দিলে—সাক্ষাৎ অঙ্গরা-যে জানিস তো! )—ঠেলতে পারেনি।

“ওর মধ্যে কোথায় ছিল একটা ভয়ও। ও সব মনোভাব আমাকে বলতে পারত না। যদি ওর অল্প কোনো প্রণয়ীকে ওর ভালো লাগত, গোপন করতে চেষ্টা করত। ওর আনাচে-কানাচে সর্বদা ঘুরত ওর আলমুজো ব'লে এক স্প্যানিশ প্রণয়ী—এর কথা বলছি পরে—সে ওর

চেয়ে বয়সে ছিল চার বৎসরের ছোট। কী চমৎকার যে তার কণা স্পানিশ villancico, madrigal, serenade প্রভৃতি সুন্দর গাইত। কিন্তু জুলিয়া কখনো মন খুলে তার গানের একটু সুখ্যাতিও করতে পারেনা আমার সামনে। ওর অমৃতবও ছিল-যে অতি সুন্দর। পাছে আমি এতটুকু দুঃখ পাই তেবে ও একদিনও আমার কাছে বলেনি আমার কী সুন্দর গায়! এ মাত্র একটা দৃষ্টান্ত। কিন্তু এ থেকে বুঝতে পারি আমাদের কৈশোর প্রণয়েই কত রকম সাবধানতার দুঃখ বাপা উভয়কে বাজত পদে পদে। বাদ্যের অমৃতব-জগৎ পেলব তাদের সুখ বেশি দুঃখ, পিয়ের? দুঃখ? হয়তো সংখ্যায় বেশি। কিন্তু অপরিবর্তনীয় নিলনের যে-তীব্র শিহরণ, সার্থকতার যে-দীপ্ত উদ্ভাস, নানা অমৃতব যে-মিষ্ণু পলাতক হিল্লোল, একটু স্পর্শ, একটি কটাক্ষও ইন্দ্রধনুর রং-আহরণ, হাসিতে যে-বসন্তোৎসব, অশ্রুতেও গ্রীষ্মের পাত্রে বর্ষা যে-মিষ্ণুতা—সর্বোপরি প্রতি পদক্ষেপে প্রেমাস্পদের হৃদয় বুকুরে নিয়ে নানা অবর্ণ্য রূপ স্বপ্নমার আলোছায়ায় যে-উপভোগ—পারবে? এসবের জ্ঞান হয়তো দুঃখের ফুল ভারের সঙ্গে ওজনে প্রতিযোগিতা করতে পারেনা। কিন্তু স্বপ্নমায়? মিষ্ণুতায়? ফুলের বৃকে জগদল পাখি চাপে বাজে দুঃখ—সত্য। হৃদয়ের শিশিরে তার পাশড়ি হয় অধোমুখী-সত্য। কিন্তু এক অমৃতপলেও সে-যে সমস্ত আকাশকে টেনে নেয় বৃক—একাজ পারে পাথরে? এক কণা ফুলের দোল পাখীর কণ্ঠে জাগি গান, প্রেমিকের বৃকে জাগায় প্রেমের অরুণোদয়। পারে অনন্ত মর পাছাড়া? আর ফুলের এই মুহূর্তের উদ্বেগ যে বৃগান্তের নিকটস্থ করে পরাজিত। পারে দিগন্তবিস্তৃত বাণুচর? এই সময়েই লিখেছিলাম সেই গানটা—যা তাদের এত ভালো লাগত আমার মুখে শুনে জুলিয়া মৃত্যু-সঙ্কটের সঙ্গে :

কুলের স্বপন :                      ডাকিবে তপন  
 চক্রে তারা,  
 দেয় না সাড়া  
 ধূলি সরা কেন ? হায়  
 সে আজও জানে না ;—                      তবু সে মানে না  
 সীমার মহীতে  
 শুধু ঝরিতে  
 জনন তার—ধরায় !  
 শিশিরও বিধুর                      বকে নিঠুর  
 হানে যে বাণী,  
 তবু সে কথা  
 কয় না, কেন ?—নে গায় :  
 আলোর বিরহে                      অশ্রুতে দহে :  
 তবু যা মিলে—  
 তাহে নিখিলে  
 বিলাই তো স্রব্দায় ।

এগানটি জুলিয়ার বড় প্রিয় ছিল। কারণ ওর মনের ছবিটি ছিল  
 সেই যে। কত রাতে কত সন্ধ্যায় ও একলা কেঁদেছে—আনাকে ওর  
 যাব বিধচক্ষে দেখতেন বলে, কিন্তু সেজঙ্গে না পারত ও তাঁকে ধ্বংস,  
 না আনাকে ছাড়তে। হৃদয়কেই বিলোতো ওর কোমল নারীহৃদয়ের  
 স্রব্দটুকু। চাইত ও মিলনের আলো, পোত বিরহের শিশির। চাইত  
 সখী, পোত বিরোধ। কত আশার দলই-যে ওর স্বপ্নে যেত প্রতি  
 মীত—কিন্তু তবু এতটুকু সূর্য্যরাগে ওর রোমে রোমে আগত কুলের



মাড়া—আর সে শিহরণ চারিধে যেত যে ওর সংস্পর্শে আসত তাকে দেহে নেন। আমি দেখেছি পিরের, এক-একজন মানুষ থাকে তার নেয় শুষে—বানি যেমন, মাকড়সার জাল যেমন, আঁবন্তের টান যেমন। আর একদল মানুষ থাকে বাঁবা বা পায় দুহাতে বিলোয়—তারার চাইত যেমন, স্বর্গের মোনা যেমন, আঁশের স্বচ্ছতা যেমন। ছুলিয়া ছিট এট প্রকৃতির মেয়ে। ও প্রতি মুহূর্তে দুঃখের আবর্জনাকেও গলিত আনন্দবাসে দিত পরিণতি। সিজোর জিনোনি, আমি ও ওর দিকে দুই প্রণয়ী ওকে কম দুঃখ দিইনি—কিন্তু ও কাউকেই পরিবর্তে কখনো দুঃখ দেয়নি ফিরিয়ে। গানে ও নাচে ওর কী অসামান্য কমতা জানিবার তো। ও বিলোতো এ-হিমোল কত যে আনন্দে!—আর যে চাইত তাকেই, কখনো—গভীর দুঃখের মুহূর্তেও—ওকে কেউ গান গাইতে বাঁবা 'না' শোনেনি ওর মুখে। এমন কি ওর গভীর দুঃখ তারা টেরও পায় নি যুগ্মকরে যখন ও গান গেয়েছে, নেচেছে। পবে জেনে অচ্যুতস্থ হয়ে তারা কমা চেয়েছে। ও হেসে বলেছে : তাতে কি ? বলেছে : ওর দুঃখ ওর নিজের, সুখই সবাকার। এই যে আনন্দদান এর কি দান আছে রে পিরের এ-দীন পূলিমলিন জীবনে—বেখানে চাইবার লোক অটেল, দেবার—এত কম ? সাথে কি ঐ গানটি গাইতে আমার আগে শত স্ত্রী সবেও আমি আমার কর্তকে সংঘত করতে পারিনি কোনোদিন—যে জন্তে তোরা ঠাট্টা করতস ? কিন্তু যাক এসব। একেবারে শেষ আছে আসি। কারণ ওর-আমার একত্র-বাসের অধ্যায়ে পরেকার গল্পাংশটুকু তুই জানিস। আমি বলব যেটা তোরা অজানা—যে বছরে ওর জীবনের সব চেয়ে গভীর দুঃখ আসে, ও আমি—কিন্তু শোন। একথা ওর বাবা ও আলন্জো ছাড়া কেউ জানে না। বেদরদীকে নীতিবাদীকে বলিস নে কখনো এ-কথা। তারা বিচারই করবে—বুঝবে না।

“তুই যে বছর চ’লে গেলি শীড়সে, তার একবছর পরেই ওর সঙ্গে আমার হয় বাগ্দান। কিন্তু বাগ্দানের পরেই ওর বাবার কানে পৌঁছায় কথাটা।

“হয়েছিল কি, এ-বাগদানের কথা ও ব’লে কেলেছিল একমাত্র আলম্‌জোকে। কেন? সে অনেক কথা। সে সব বলবার প্রবৃত্তিও নেই, সময়ও না। এইটুকু জেনে রাখ, তুমি যে, আলম্‌জো কথা টেনে বের করতে জানত। তা ছাড়া আলম্‌জোকে ও বিশ্বাস করত, তাগোও বাসত বৈ কি। তাই আমার কারণ সবেও ব’লে কেলে। উষায় জ্বর আলম্‌জো ব’লে দেয় সিন্ধোর জিনোনিকে গোপনে। একথা আমিও তখন জানতাম না—পরে জানতে পারি।

“সিন্ধোর জিনোনি ওকে নিয়ে যখন সে-বছর নেপল্‌সে যান তখন আমরা দুজনেই জানতাম : যেমন বছর বছর তু-একমাসের জুড়ে যান। কিন্তু একমাস হুমাস ছেড়ে পাঁচ ছয় সাত আট মাস যখন হ’তে চলল তখন মনটার মধ্যে একটা আব’ছা আঁতর উঠল আমার বনিয়ে।

“প্রথম প্রথম জুলিয়া চিঠি লিখত বড় বড়। ক্রমে সে চিঠির বছর এল ছোট হ’য়ে। শেষে একবারে বন্ধ—মাস চারেকের মধ্যেই।

“আমি ব্যস্ত হ’য়ে উঠলাম। কিন্তু আমার তখন পরীক্ষা কাছের, নেপল্‌সে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। কাজেই আমি বড় বড় চিঠি লিখে উত্তর না পেয়ে উদ্বেগে আকুল হ’য়ে করলাম তার। উত্তর এলো টেলিগ্রামেই : জুলিয়া এখানে নেই, তাকে বিরক্ত কোরো না আর।

“আমার মনের অবস্থা করানাই করে নে। পরীক্ষাটা ছেড়ে ছুটলাম নেপল্‌সে। সেখানে সিন্ধোর জিনোনি গভীর মুখে আমার দিলেন অর্ধচন্দ্র। ও ছিল না নেপল্‌সে। গেছে কোথায়—তা কোনোমতেই বার করতে পারলাম না—আশ্রাণ অহুসঙ্কান ক’রেও না।

“বলেছি : আমার বরাবরই ধারণা ছিল আমার হঠাৎ মৃত্যু হবে, ও তরুণ বয়সে। কত সময়ে কত স্বর বে ডাকত আমায়। আমি প্রায় স্থির ক’রে বসলাম—এই সেই সময়। কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ একটা খবর পেলাম—তাতে রোখ উঠল চেপে। মৃত্যুর হাতছানি গেল কোথায় ভেসে। দাঁতে দাঁত ঘষে বললাম : নিজেকে শেষ করবার আগে এর শোধ তুলতেই হবে।

খবরটা এই যে, এক ইংরাজ বন্ধু লণ্ডন থেকে এই সময়ে আমাকে লেখেন যে, তিনি আলনুজো ও জুলিয়াকে দেখেছেন কি এক থিয়েটারে। তাঁকে দেখেই আলনুজো জুলিয়াকে নিয়ে বার উঠে ও একটা ট্যাকসি ক’রে হয় উঠাও। বন্ধুর সন্দেহ হয়—তার ভাবগতিক দেখে। কারণ তার সঙ্গে চোখোচোখি হবার পরই সে যে-ভাবে গাঢ়াকা দিল তাতে তাঁর সন্দেহ রইল না যে, তাঁকে এড়াতেই তার অস্থকান এ-ভাবে। কিন্তু কেন? বন্ধু আমায় অত্যন্ত সম্বরণেই একথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন— কেননা তিনি জানতেন জুলিয়ার প্রতি আমার মনোভাব কি-রকম— যদিও আমাদের বাগ্‌দানের সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানতেন না।

“আমি পরীক্ষা ছেড়ে গেলাম লণ্ডনে। কিন্তু বহু চেষ্টা ক’রেও খুঁজে পেলাম না। আমার আরও খুন চেপে গেল। কারণ বৃকতে আমার বাকি রইল না যে, এর তলে যড়বহু আছেই আছে আলনুজোর। কিন্তু পাষাণের গায়ে ছোবল মারে যে-সাপ তারই মতন ব্যর্থ আলায় জলতে লাগলাম—নিভেরই বিষে। কেননা নিকুপায়, সব দিক দিয়েই। পৌকুষ যাদের আছে তাদেরই বাজে সব চেয়ে বেশি এই ধরনের একান্ত অসহায়তায়। মানুষ এ-সব মেনে নেয় নিয়তি বলে—অদৃষ্ট বলে—যে-সব ব্যাখ্যা অবশ্য ব্যাখ্যা হিসেবে নামজুব—কেননা এতে কিছুই পরিহার হয় না—অভিধানে হু-একটা কথা বাড়ে মাত্র।

“এই সময়ে আমার চোখে পড়ে : আমাদের মধ্যে কত অন্ধকার বর্সরতা থাকে লুকিয়ে। কারণ আমি অস্বস্তিতে বলতে পারি এ সময়ে আলনজোর সঙ্গে দেখা হ’লে ডুয়েলে তার আলনজো-লীলা সাজ হ’তই হ’ত। ডুয়েলে রাজি না হ’লে গুলব মতন হত্যা। অথচ আমি স্বভাবে একটি পিপড়েও মারতে পারি না। আমাদের কোমলতার গিছনেই কী রৌদ্রপই না আমাদের থাকে লুকিয়ে! নয় কিয়ের? আর সে-নিহিত-মুষ্টি প্রকাশ পায় সব চেয়ে বেশি এই প্রেমেরই, নয়? প্রেম হ’ল যুগপৎ শিপক-গহ্বরচারী। দীরে দীরে তো সে চলে না—দায় উড়াবেগে। দেবতা মুহূর্তে দানব হয় এক এই প্রেমেরই ক্ষেত্রে। কেন—আমি ভেবে আজ পর্যন্ত কোনো কিনারা করতে পারিনি। আমাদের মনের মধ্যে যত ওজস্ব শক্তি পুঞ্জিত অথচ ছড়িয়ে থাকে সব যেমন নরনারীর মিলনের মুহূর্তে বিদ্যুৎ সংঘত হ’য়ে বিভ্রান্ত উদ্ভারনায় তাদের কাছে কণ্ঠে হোলে দৈহানন্দের তীব্রতম পরিণতি—তেমনি আমাদের যত বীর্য যত আগ্রহ যত তপস্কার বেগ আমাদের মনে প্রাণে চাপিয়ে থাকে, প্রেমের পথে বাধা পড়লেই ঈর্ষার বিদ্যুৎ হয় সংঘত। একেই বুঝি কবি বলেছেন—এক অজ্ঞ ভাইমেন্শনে বাঁচা। সাধারণ জীবনে আমরা বাঁচি না তো, বাঁচার ছদ্মবেশে শুধু জীবনধারণ করি মাত্র। এক এই ধরনের ঈর্ষার দুঃস্বভাব্য বাধার-পর্যন্তে হোকের পেয়েই বাঁচার সমস্ত শক্তি কেগে গুঠে প্রাবল্য-চ্ছাদনের গর্জনে। সে-বাঁচার কল পরিণামে শুভই হোক বা অশুভই হোক, অমৃতোন্মাদারই হোক বা বিষমালারই হোক—বাঁচার এ-ভঙ্গি যে উচ্চতর শ্রেণীর বাঁচা তাতে সন্দেহ নেই।

“কিন্তু নিয়তি আমাদের অনেক সময়ে যেমন ধ্বংসের গহ্বরে ঠেলে দেন—অনেক সময়ে আবার তেমনি নিশ্চিন্ত নতক থেকে বাঁচানও। কারণ আলনজোর সঙ্গে এ সময়ে যদি দেখা হ’ত তা হ’লে আমার জীবন

হ'ত বার্থ—কারণ স্বপ্ন হ'ত সাক্ষ। ভগবানে আমি বিশ্বাস করি না—  
তবে সব চেয়ে বিশ্বাস করার কাছে এসেছি এই কথা ভেবেই যে, ভাগ্যে  
দেখা হয়নি আমার ও আলমজোর। কথাটা হয়তো খাপসা রইল।  
রইল কি? আমি বলতে চাইছি শুধু এই কথাটি যে, যখন একটা গল্পের  
আঁপ দেবার বিপর্যয় কুধা জাগে—আর কার না জাগে—তখন সেখানেই  
আঁপ দিতে?—তখনও শিখরের আলো হাসির টান পুণ্ড হয় না  
এইখানেই বিধাতার করুণা সিদ্ধ—অর্থাৎ যদি জীবনের কেউও সিদ্ধ হয়  
তবে এইখানেই সিদ্ধ। একটু আলো একটু হাওয়া একটু হাসি একটু  
মিলন এতে যারা বিধাতার কাছে কৃতজ্ঞ হ'য়ে কেঁদে বয়ে দেয়  
তাদের বলি আমি—স্বপ্নাচ্ছাসী, ভাববিলাসী। না—আমি দানব  
সাক্ষ্য করুণা অসিদ্ধ। তবে আজও আমি এই পশুদের মায়ে-খলন  
থেকে বাঁচার জন্মে ভুলে গিয়ে হাতঘোড় ক'রে মাথা হুইয়ে পাল সময়ে  
সময়ে যে, ভাগ্যে আমি পশু হইনি! দৈব দুর্ভটনায় মানুষ বৈ কি!  
কিন্তু আবার বাঁচেও তো। আর এখন বাঁচাটা হয় প্রায় আশ্বস্ত তখনই  
মনে হয় এই করুণার কথা। কিন্তু যাক এসব বাজে কথা।

“মনের এই দানবীক যন্ত্রণার মুহুর্তে—যখন নিজের উদগ্র চিত্তে প্রতি  
রক্তকণায় জ্বলে উঠেছে খোলুপ জন্মদের খজা—ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ  
নেপল্‌স থেকে এলো সিক্কোর জিনোনির তার: এসো যদি জুলিয়াকে  
বাঁচাতে চাও—এক মুহুর্তও না বিলম্ব ক'রে।”

“গেলাম টাটে—দানব নিষাদ আশা নিরাশার এক অবর্ণনীয় ইচ্ছাবৃত্ত  
মনের আকাশে ফলিয়ে। নিরাশার অন্ধকার যখন নীরাক্তম হয় তখনই  
বেজে ওঠে অকণোদয়ের মাহেজুলয়—কথাটা সত্য। অক্ষরে অক্ষরে  
সত্য। যদি ভগবান্ ব'লে কোনো কর্ণধার থাকেন তবে একটুকে তাঁর  
কর্ণালীলা প্রকাশ?—হ'তেও পারে। কারণ এতে আর বাই থাক

বরতা নেই, আছে নিবিড়তা—সংহত জীবনরসের এক অপরূপ আবাদ।

“সব ঘটনা বলব না—বলতে ইচ্ছাও নেই প্রবৃত্তিও না। সে-সব লিখতে গেলেও-যে আমার ভিতরকার সুপ্ত (সুপ্ত তো নয়) দানবতা ওঠে—আমার রক্তের প্রতি বিদ্রোহ: কখনো আমি হ’য়ে উঠি বক্তৃতাশূন্য উচ্চ ও ঘাতক। যুগ-যুগের হিংস বর্ধিততা যে আমাদের অন্ধিতে মজ্জায় উপ সেকথা আমি ভুলতে চাই। এ-ও একটা কারণ যেক্ষে আমি তোকে বলিনি জুলিয়ার কাহিনী কোনোদিন। প্রেমের উৎসবে বকে জাগে স্বপ্ন-দেবতার অক্ষয়নি। প্রতিহিংসার দামানায়—মোকের সিংহনাদ। স্বপ্নের জয় হোক—গঙ্গাবের হিংসরোল বাক ঢেকে। এ আশটার পরে তাই আমি যবনিকা দেই টেনে।

“শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে—আলমুজো আমার নাম জাল ক’রে আমাকে অসচ্চরিত্র প্রমাণ করেছিল—ফটোগ্রাফের চাকুসো—যেমন নারী-হুতুড়ে নীতিরানরা করে—আমার একটা ফটোগ্রাফের সঙ্গে আর-একটা মেয়ের স-কটাক্ষ ফটোগ্রাফ জুড়ে ওকে দেখিয়েছিল।

আমার চিঠিপত্র জুলিয়ার হাতে পৌছত না ওরই নিপুণ চাকুসো! ও সিন্ধোর জিনোনিকে কথা দেয়—জুলিয়াকে বিবাহ করবে—ওকে নানাভাবে ভজিয়ে শেষটায় লওনে নিয়ে যায়। ও ছিল ধনিপুত্র—পেট্রোল-ব্যবসারী কোটিপতির একমাত্র পুত্র—তার ওপর ‘আ লা কামখলিক’ বকধাঙ্গিক। সিন্ধোর জিনোনি তো হাতে স্বর্ণ পান—ওর হাতে মেয়েকে ছেড়ে দিতে। মেয়ের মতন পিতারও লোভ ছিল মাত্রকে বিশ্বাস করার—আর ধাঙ্গিক হ’লে তো কথাই নেই। পোপের হাতে বর্গের চাবি—একথা যে বিশ্বাস করে—তার দ্বারা মন্ডাচরণ? অসম্ভব!

“জুলিয়াকে নিয়ে ও লওনে যায়—এইসব ক’রে যখন ওর মন জাঙে

তখন ওর বাসনা মিটতে-না-মিটতে ওর চোখে পড়ে আমেরিকার ফ্রান্সিস ডনি ইংলেণ্ড এসেছিল Dame aux Camelias-র হিরোইন হয়ে। তৎক্ষণাৎ তাকে বিয়ে করে—জুলিয়াকে ফেলে। সে ছিল আলমজোর চেয়ে দশ বৎসরের বড়। কিন্তু প্রেম যে! হায় প্রেম! এই আলমজোর তোহার নাম করে ব্রাউনিংকে করত উদ্ধৃত :

For the loving worm with its clod  
Were diviner than a loveless God !

“কেবল ভুলত সে এই কথাটি যে, সন্ন্যাসের প্রণয় হয় অন্ধ বিবাহের সঙ্গে। তবু ভক্তদের সুরে সুর মিলিয়ে হয়তো বলতে হবে এ প্রণয় ঈশ্বরেরই দান।” ভাগ্যে আমি ঈশ্বর মানি নে। যাক।

“এ দিকে জুলিয়ার সম্ভান-সম্ভাবনা হয়।”

\* \* \*

বৃদ্ধ কষ্ট পরিষ্কার করে নিয়ে পড়তে লাগলেন :

“জুলিয়ার বাবাকে বলি ওকে আমি বিবাহ করব—ক্যাথলিক আচায়েই। আচ্ছা বুকের সে উদ্ধাসিত কৃতজ্ঞ অশ্রুচ্ছাস ভুলবার নয়। মনে হ’ল প্রিন্সিপে কী যায় আসে যদি নাচুষকে এ আনন্দ দেওয়া যায়—প্রোম্যান্সকে যার বাঁচানো ?

“তার পরে সে এক কাহিনী পিয়ের। সে সব যাক। সে বড় পবিত্র। বর্ণনা হয় না তার। করা যায়ও না। জুলিয়ার সে কী কান্না! আমার জীবন আমার আদর্শ এ-ভাবে ও ছাড়তে দেবে না। ও আমার সঙ্গে থাকতে রাজি—কিন্তু বিবাহ না করে। ওর আসর শিশু ? ও কোনো মতেই রাজি হ’ল না যে আমি তার ভার নেব। বলল : ওর মানিফেস্ট জীবন আমার হাতে দিচ্ছে, না দিলে বাঁচবে না

ব'লে, কিন্তু তাই ব'লে যে অপরের সম্বন্ধের ভারও আমাকে নিতে হবে  
এ—ও মানবেই না, কোনো মতেই না, না না।

“অগত্যা নেপল্‌সে লিলিকে সিজোর জিনোনির হাতে দিয়ে ওকে নিয়ে  
এলাম আমার সঙ্গে পারিসে কাঁড়িয়ে লাঠীয়ায়—বেখানে আমাদের সঙ্গে  
তোর ও সারার নব পরিচয়। বছরখানেক বাদে লিলি আসে আমাদের  
কাছে। কারণ তখন লিলিকে আমি লিলির জুড়েই ধারণা করেছিলাম।

“এ-চিঠি আমার ব্যাকে রেখে গেলাম পিয়ের, সীল ক'রে। জুলিয়াকে  
দেখাস এ-চিঠি। ও সেই থেকে আমার কাজে এত কতক হয়ে আছে  
যে, সে-ভার হ'য়ে আছে আমার দুসেত। প্রেমের প্রতিদান প্রেমে—  
প্রত্যক্ষতায় নয়। ওকে আমি বাঁচিয়েছি এত কথাটাও ওর কাছে বড়  
হ'ল? ওর জীবনে যে আমার জীবনও ফলে ফলে ভ'রে উঠেছে পিয়ের,  
তার কি? কিন্তু ছায়ের, একথা ও বিশ্বাসই করে না। নিজের কী-এক  
কল্পিত অবোধ্যতার ভারে ও সদাই থাকে হয়ে। মগ প্রেমেই এমনি  
একটা বাধা বাজে, নয়?—যন্ত্রণা আড়াল হ'য়ে? এটাই আমার ভূষণ।  
কিন্তু ওকে বোঝাতে পারিনি এ-কথা আজও—এ-চিঠি দেবলে যদি বোঝে  
আমার আকস্মিক মৃত্যুর পরে অন্ততঃ। যদি বোঝে যে ও ছিল আমার:

পরানের রূপদোল, ছিল মোর ইন্দ্রলতের স্বর,  
ফুল-বিকাশের মজিমা, মোর বাঁশির মারানুপুর,  
ধূলি-জীবনের অমৃত-উৎস, শিল্পের রাঙা বেগা,  
আধা-লাঞ্ছিত আড়নে অনাথ—গগনে ইন্দ্রলত।

“কি জানি কেন আমার মনে হয় পিয়ের যে, প্রেমের সখকে এই  
উজ্জ্বলের রাঙা আভাকে রাঙা রাখতেই তার নিভরার আগেই আমার  
জীবন-স্বর্ষাকে বেতে হবে অন্ত। ‘প্রেম ক'রে যায় দুদিনে—ফলের মতনই’  
—এ-কথার মধ্যে সত্য নেই ব'লেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু ভরও হয় যে,



হয়তো হ'তেও পারে সত্য। যদি হয়, তবে প্রেমের মূল করবার আগেই দেহ-চেতনার রবি যাক অন্ত—বিধাতা যদি থাকেন তবে তাঁর কাছে আমার এ-ই একমাত্র প্রার্থনা! কেন জানি না মনে হয় তিনি থাকুন না না থাকুন, এ প্রার্থনা আমার পূর্ণ হবে।

“তালের।”

## কার্ত্তিরে লাঠী

সন্ধ্যা গাঢ় হবে বলল : “আমাকে ক্ষমা করবেন মসিয়ে।”

মসিয়ে বেনার তার একটি হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে দ্বিধ্ব কণ্ঠে বললেন : “তোমার দোষ কি শেরি? আমরা যে সাধারণ জাতিপোরে নাহুবই দেখি অষ্টপ্রহর। এ-বাস্তবতার যুগে চকির দটার সে-সাক্ষ্যকে অস্বীকার ক'রে কি হঠাৎ বিশ্বাস হয় যে, এ-জগতে সৈদ্ধ ব্যাপক ব'লেই মহিমা অবাস্তব নয়?”

ব'লেই যেন ঊষং কুণ্ঠিত হবে হেসে : “ভাবছ, বুড়োর এ-কী ছেলেমানুষি, না?”

সন্ধ্যা বলল : “না মসিয়ে। আমি শুধু ভাবছি, এ-বয়সেও যে আপনার মনের রঙীনতার রসদ ফুটোরনি—এটা কোন্ আবেগের উৎস-বলে সম্ভব হ'ল?”

রক্তের মুখ খুসিতে হ'য়ে উঠল উজ্জ্বল। তিনি ওর বন্দী হাতটায় 'পরে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন : “সে যে ভালের, শেরি—ভাল'র দৃষ্টান্ত। ভুলছ কেন যে, অল্পবয়সে—যে-বয়সে জীবনের মূলে রাগ রূপ রস রঙে বিশ্বাস জন্মায় সব চেয়ে দৃঢ় হ'য়ে—সে-বয়সেই ও দেখিয়ে দিয়ে গেছে—কী ভাবে এ-জীবন বাশন করা যায়—ওর ভাবায় এ 'ধূলি-জাতি' মজো।”

সন্ধ্যা মুহূ হুয়ে বলল : “সত্যি এতখানি সম্পদ—অক্লান্ত !”

তুচ্ছ বললেন : “কিন্তু ওর চিঠির মধ্যে ওর অমূল্য সম্পদের কতটুকুই বা প্রকাশ পেয়েছে সন্ধ্যা ?—মনে পড়ে জুলিয়ার প্রতি ওর ভালোবাসা !”  
হাসে থেমে যেন আপন মনেই ব’লে চললেন : “সত্যি, সে না দেখলে যেন বিশ্বাসই হয় না। কল্পনার প্রেমকে রক্ত-মাংসের কাঠামোর দৃষ্টিয়ে তোলা !—অসাধ্যসাধন নয় ?—সত্যিই অসাধ্যসাধন।”

তুচ্ছ ‘অসাধ্যসাধন’ কথাটি যেন চেখে চেখে ভোগ করেন।

পানিকরণ নিঃস্রব্য। কেবল বাইরের সমুদ্র-গমকের সঙ্গে মুহূ পবন-মন্দী বাগিণীর সঙ্গত শোনা যায়।—তুচ্ছের কণ্ঠে হুহু কোটে যেন আপনাই :

“ববে এ-জীবনে অসাধ্যকে অসাধ্য করার ভয়েই কচিং যারা আসে তাদের যে তাদেরই একজন। তাই ওর কাছে এ অসাধ্য ছিল না তো। থেমে যে কৃতজ্ঞতাও সত্যিই পীড়া দেয় এ এক ওর মুখেই সাক্ষ্য—অজের মুখে মনে হ’ত ঢং। ...

ব’লে আপন মনেই যেন স্মৃতিচারণ করে বললেন : “সত্যি সে কেটা দেশবার জিনিষ ছিল : জুলিয়ার প্রতি ওর ভালোবাসা। ... হঠাৎ জাহির করা নেই, নেই আশ্রয়দাতার গর্ভ, নেই অহুকম্পা, এমন কি এতটুকু দাবিও না। শুধু আপনাকে বেওয়া বিলিয়ে। ...”

বলতে বলতে তাঁর স্বরের মধ্যে কোটে উদ্দীপ্তি : “আর কী বস্তু বিলিয়ে দেওয়া—বে-সে বস্তু তো নয়—সাক্ষ্য ভালোবাসার ধন্য-সম্পদ—আপনো তো !—”

হঠাৎ যেন একটু আত্মসচেতন হ’য়ে ওঠেন তুচ্ছ। সন্ধ্যার সঙ্গে দৃষ্টি-সংঘর্ষ হয়। পাণ্ডুর গুঠপ্রান্তে আবছা একটুকরো হাসি ওঠে তিকমিক করে। পরে বলতে লাগলেন ফের—টোঁটের কোণে হাসিটা যেন আপন-আপনাই যায় ঝিলিয়ে :

“ভাবছ এ-ও উচ্ছ্বাসের গা-ঘেঁষা? সত্যিই না। সারার জন্মে আমার ভালোবাসার সঙ্গে জুলিয়ার প্রতি ওর ভালোবাসার মনো-তুলনা করতাম তখনই মনে হ’ত অন্যাদের চেয়ে ও কত বড় ছিল। মনে পড়ত কবির উপমা—ওর চন্দরের বদান্ততা সম্বন্ধে—

যে-খতুচক্ষে আসে না শিশির কখনো তুলে

ডির বসন্ত দানসম্ভার ফলে ও ফলে

ঢালেক সে লক্ষ ভূজা সম, তার

সম্পদ যে দিগন্ত বিখ্যার

ঐক্যজালিক সম অনিবার

যত দেয়—তত চেউ যে তুলে

নব নব সুশাবক্য তারি সে-দানের কূলে।” \*

\* কেউই কথা কইল না। বৃদ্ধ ব’লে চললেন : “এ-কথা সত্যি যে সারার জন্মে আমাকে কিছু কতি ও ভাগ্যবশীকার করতে হয়েছিল, কিন্তু শত চেটায়ও সে-কথা যে আমি তুলতে পারিনি এজন্মে বড় হিঁকার বোধ হ’ত সময়ে সময়ে। মনকে তখন সাহসনা দিতাম শুধু এই বলে যে মনের নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তো প্রায় একটা জন্ম থেকে-পাণ্ডা জিনিষ—শরীরের গঠনের মতন, তার ওপর তো আর হাত নেই, উপায় কি? মুখে একথা কখনো বলিনি অবশ্য। কিন্তু তার নাম কতটুকু বলো—যদি না-বলার ধরুণও জাগে গরু—জাগে আশ্বরাধা? সত্যি ছন্দে না হোক, কত হৃদয় বেশেই যে আক্ষেপ উঠত বেজে যে, সারার জন্মে

\* For his bounty,

There was no winter in it, an autumn.

That grew the more by reaping.—( Antony and Cleopatra

—Shakespeare

তত রকমের স্বাধীনতাই না খুইয়ে বসেছি! কিন্তু ভালের—যে কুলিয়ায়  
হল অন্ধের ঔরসজাত সন্তানকেও গ্রহণ করল অকুণ্ঠে; তার মুখে বা  
মন এমনব্বের কথা উদয়ই হ'ত না—”

চ্যাং বুদ্ধের বেশ গেল থেমে। তিনি বললেন: “এ-সম্পর্কে  
মন খুঁড়ে গেল একদিনের কথা, বলি শোনো। আমরা সে-  
সময়ে কতিয়ে লাঠায় ভালেরের অধ্যাপনার প্রতি রবিবারে  
চমৎচম জাম্বান-চর্চার আসর, যেমন শনিবারে—গান ও নাচের।  
নাচ ও কুলিয়াকে ও-ই জাম্বান শিখিয়েছিল এক রকম জোর  
ক'রে—”

সুদার্মা বলল: “কেন?”

বুদ্ধ বললেন: “ও বলতো নীটশে ও গেটে না পড়লে মাড়ম সভ্যই  
হো না।”

সুপন বলল: “চ্যাংও বলতো এ কথা।”

বুদ্ধ বললেন: “স্বয়ংপ্রভ ধ্যানচিন্তাকে দ্বারা কাবা মনে করে তারা  
এমনই যে। তবে দ্বারা শুধু সাহিত্য সাহিত্য ক'রে বন্ধশূন্য পেলব  
স্বাধীনতাকেই মনে করে চরম অটী তাদের কথা জালাল। ভালের  
তাদের ঠাট্টা ক'রে প্রায়ই উদ্ধত করত নেপোলিয়নের সেই বিখ্যাত  
চৈতন্য উপদেশ তাঁর ভাই জোসেফকে দাকে তিনি নেপলসের রাজা  
করেছিলেন:

পণ্ডিত ও সাহিত্যিক? ভাট্টের, সাধবান!

ওদের সাথে গলাগলিতে ফাসাদ অকুরান!

কেমন ওরা জানিস?—যেন রাজকী বিলোলা—

চাহনি হাসি চটুল কলা চালানি হরবোলা।

শুধু, ওদেরে ভুলেও বেন করিস না বরগে

মহী মিতা—কিছা তোর পত্নী এ-জীবনে।”\*

সকলে ওঠে হেসে।

\* \*

আনা বলল : “কিছু কি বলছিলেন ?”

বৃদ্ধ বললেন : “ঐ দেখ, জরুর দোষ কি একটা—বেমানুষ হ’লে ব’সে আছি। বলছিলাম না আমাদের জার্মান পড়ার কথা ?” ব’লে একটু খেনে বলতে লাগলেন :

“আমাদের মধ্যে এই রীতি ভালের বেধে দিয়েছিল যে, প্রতি কবিতাকে যে-সব জার্মান কবিতা পড়া হবে সেমবারে তাদের মধ্যে যে-কবিতাটি বা কবিতার অংশবিশেষ যার সব চেয়ে মনে ধরবে শোনাতে হবে অতঃপর—কুতোককেই। ও বলত : শুধু পড়া হ’ল পাঠবিলাস—চাই পরিপাক। তাই এই ফতোয়া জারি। ওর প্রিয় লেখক বিখ্যাত লিপিশিষ্টা লাককাভিয়ো হার্নের একটি কথা ও প্রায়ই উদ্ধৃত করত পড়ার প্রসঙ্গ উঠলে : ‘Very few people know how to read. Reading merely for amusement is a narcotic paralysing the mind.’—যাক, যা বলছিলাম :

“একদিনের কথা মনে আছে পরিষ্কার। এক-একদিনের তুচ্ছ স্মৃতি ও স্মৃতির ফলকে এমন কেটে কেটে ব’সে যায়—নয় ?” ব’লে লজ্জার দিকে তাকাপেন—এমনিই।

\* “Vous vivez trop avec des lettrés et des savants. Ce sont des coquettes avec lesquelles il faut entretenir un commerce de galanterie, et dont il ne faut jamais songer à faire ni sa femme ni son ministre.”

সন্ধ্যা মুহু সুরে বলল : “বার।”

—“সেদিনের সন্ধ্যার পড়াটাও ছিল তেমনি একটা দিন। তার  
প্রতি কবিতা আজও মনে আছে আমার। আমি করেছিলাম অহুহাদ :

বন্ধু : তার প্রেমের দ্বারা জীবনে সুখসার,

মলিন হয় সে-দান—তার ঘাটিলে উপহার। \*

“স্মৃতি করেছিল হাইনের চারটি লাইন :

গোলাপ তুমি যবে চয়ন করি’

শিশুর অঙ্গে বরাও তার দল :

শুনিতে নাহি পাও কি মন্মরি’

বেদনা মোর শ্রুতিতে অকোমল ?” †

সন্ধ্যা মুহু সুরে বলল : “কী সুন্দর!”

বর্ণন বলল : “আর জুলিয়া ?”

বুদ্ধ বললেন : “জুলিয়া করেছিল :

প্রেমের তরে যে জীবনে মজিতে নাহে

রাঙা চুম্বন চায় সে কী আদিকারে ?” ‡

সন্ধ্যা মুহু সুরে বলল : “কী সুন্দর!”

\* Rühmlich ist es Freunde haben  
Schlimm : bedürften ihrer Gaben

† Wenn du eine Rose pflückest,  
Und mit kindischem Belagen  
Sie entblätterst und zerstückest  
Horst du nicht auch leise klagen ?—Heine

‡ Wer für sein Lieb nicht sterben kann,  
Ist keines kusses wert

বুদ্ধ তার দিকে ঋনিকক্ষণ সরেই নয়নে চেয়ে থেকে হঠাৎ ছুটুনি  
সুরে বলে বললেন : “অনন্দ ?”

সন্ধ্যা তাঁর চোখের পানে চেয়ে বলল : “নয় ?”

বুদ্ধ পূব গম্ভীর হ’য়ে বললেন : “অবশ্য।”

সন্ধ্যা ঈষৎ অপ্রতিভ সুরে বলল : “ঠাট্টা ?”

বুদ্ধ চোখ মিটমিট ক’রে বললেন : “মোটাই না শেরি—জাস—  
প্রাণের ভয়।”

সন্ধ্যা বিস্মিত সুরে বলল : “মানে ?”

বুদ্ধ তার পানে চটুল চাহনি ফেপণ ক’রে বললেন : “মানে, ভেবে  
দেখেছ কি হৈ, এ-মাপকাটিতে মাপলে ক’জন তপ্ত প্রেমিকের অধরে  
সিকিখানি শীতল চুষনেরও দাগ পড়তে পায় ?”

সকলে হেসে ওঠে।

\* আনা বলল : “আর ভালের ?”

বুদ্ধ মুহূর্তে গম্ভীর হ’য়ে বললেন : “মনে আছে : সে প্রথমে  
দেখাতে চায়নি। কিছু সারা তাকে নিয়মভঙ্গকারী ব’লে ভাবতে  
অগত্যা দেখায়।—মাত্র চারটি লাইন—গেটের। কিছু যেন কথান্তরি  
ওরই জবানিতে লিখে গিয়েছিলেন সেই বরেন্দ্র মহাকবি :

অক্ষর হ’তে উপলব্ধ হবে প্রেমের ধারা :

আপনারে নিতি বিলায়ে হয় যে আশ্বহারা :

যবে সে আপন ভাগের কাহিনী বর্ণি’ সারা :

নহে সে সত্য প্রেম—তুচ্ছানেও যে অবতারা ।” \*

\* Liebe, die von Herzen liebt,  
Ist am reichsten, wenn sie gibt ;  
Liebe, die von Opfern spricht,  
Ist schon rechte Liebe nicht.....Goethe



বৃদ্ধের স্তর আন্তে আন্তে যেন আপনিই যায় মিলিয়ে।... ঘরের মধ্যে শোনা যায় কেবল বাইরের সাগরের নিয়মিত নিঃশ্বাস।.....



বৃদ্ধ পর পর ওদের তিনজনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন...  
“অকুশল হামি। পরে বললেন : “উচ্ছ্বাস এসে গেল তবু, দেখলে ?”

কেউ কথা কর না। বৃদ্ধ বললেন : “কিছু মুখিল কি জানো ?  
মুখিল এই যে, ভালেরকে যে একবার জেনেছে—শুধু জানা নয়—তার  
মেহ সৌহার্দ্য সহায়তার পরিমণ্ডলে দিনে দিনে নিজের জীবনের আলো  
সঞ্চার করেছে—তার পক্ষে উচ্ছ্বাসকে সংযত করা—কিছু বাক, তবু  
করব।”



বৃদ্ধের স্বর গাঢ় হ’য়ে আসে : “শুধু যে আমার চেতন মনেই সম্পদ  
তার জমা হয়েছে তা তো নয়। তার সত্যের পতীরতন রসটুকু উর্ধ্বের  
ক’রে রেখে গেছে যে আমার মনের ছায়াঙ্কিত রসকুহি—যা আমাদের  
বন্ধুপের ভিত্তি।”

ব’লেই হঠাৎ যেন তাঁর চরক ভাঙল, বৃদ্ধ লজ্জার দিকে চেয়ে বৃদ্ধ  
হেসে বললেন : “ভাবছ হয়তো—বুড়ো কেলে গেছে আজ, না ? সত্যি  
কেনো তো ?”

লজ্জা হেসে বলল : “সত্যি বলছি : না, মসিরে। বিবাহ কখন



আপনার একথাগুলিই বরং আমাদের কাছে প্রতিপন্ন করছে আমার খিওরি যে, বরস হ'লেও উচ্ছ্বাসের হুহতা থাকতে পারে। সিসি একথা স্বীকার করতে না কিচ্ছ।”

বুকের মুখ খুলিতে উচ্ছল হ'য়ে উঠল, তিনি সন্ধ্যার গালে আঁদর ক'রে চোঁনা ঘেরে বললেন : “শেরি, কম্প্লিমেন্ট দিতে জানে বুঝি শুধু করাসী জাহ ?”

সন্ধ্যা হাসে শুধু।

• •

বুঝ বলতে লাগলেন : “কিন্তু তবুও, উচ্ছ্বাস হাকার হুহ হ'লেও বরস বাড়লে হেঁথতে পাৰে কোথায় বাধে যেন তাকে বুকের তাহার রূপ  
• দিতে গেলেই।”

কখন হঠাৎ বিজ্ঞাসা করল : “কিন্তু কেন বাধে মসিরে ? জানি ভেবে পাইনি। চাং বলত সে-ও এটা বার বার অসুভব ক'রে, কিন্তু কেন যে গভীর অসুভবকে বুকের তাহার প্রকাশ করতে অসুভবের বাধ বাধ থেকে—”

বুঝ বাধা দিয়ে বললেন : “জানি সেন। বিশেষ জ-জাতের মোকের। পীপতার রাবি ওরের ক্ষিতে পাখর হ'য়ে চেপে বসে যেন, নয় ?”

জানা বাধা দিয়ে বলল : “কিন্তু বাধে কেন—এ-প্রশ্নের উত্তর যে এড়িয়ে যাচ্ছেন।”

বুঝ বুঝ মেলেই গভীর বুকের বললেন : “এড়িয়ে যাইনি শেরি, তবে এ-প্রশ্নের উত্তর যে-ওরা বড় লজ্জা কিনা, বুঝলে না ?” ব'লে চিন্তাটি হুঁরে আনার বুকের দিকে চেয়ে বললেন : “কি জানো শেরি ? এমন বড় আঁছে না বাকি নীল জলের রূপ থেকে টেনে তুলতে বা তুলতে তার

চোখ-খাঁধানো দীপ্তি হয় জান—নিশ্চয় ? আমাদের গভীর অন্তরতব বেন ভেমনি মণি।” ব’লে সন্ধ্যার পানে কিংব বললেন : “এমন কুর আছে না-বা একান্ত নির্জনেই ঘেরোর পেলব কঠে ? বায় পেলবতা মুল মতন শোনার ছইং কমে, জ্যোতাধের সত্যার ?—এ বেন—বড় দরদের বায়গা—ভর হয় পাছে কুটিয়ে তুললে জ্যোতা না শোনে ? তাই আসে আকৃষ্টতা—আসে আক্সসচেতনতা। আর, কে না জানে সব কুষ্ঠার মূলই হ’ল এই আক্সসচেতনতা ? কিন্তু থাক এ-সব কুষ্ঠাত্বের পেলবিয়া।” ব’লে থেমে হঠাৎ বেন জোর ক’রেই সহজ হুরে বললেন :

“বলা বাহুল্য আলমগ্রাসবা সারাকে নিয়ে আমার খণ্ড ক্রমশই ছেড়ে চলেছিল। ওর ওপর একটি শিশুর অত্যাগম হ’তে তিনজনের খরচের সংস্থান করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হ’ত যদি তাদের না থাকত। আমার মনে পড়ে একদিন তাদেরকে বলি যে দরতে সেলে আমরা যে ক্রমে ক্রমে তার গলগ্রহই হ’য়ে পড়ছি। তাতে তার সে কী রাগ ! বলল : কেন ও-রকম কথা বললে আর আমার মূল ধর্মান করবে না। আমি তবু মরীয়া হ’রে বললাম যে শেঠিং রেখে আপাততঃ একটা চাকরির চেষ্টা দেখলে হয় না ? তাতে সে রাগ ক’রে তিনদিন আনাধের বাড়ি আসেনি—শেষটা সারা গিয়ে কমা চেয়ে তাকে রেস্তার ক’রে আনে। সে এল বটে, কিন্তু এই সন্তে যে, আমাদের সংসার যে খানিকটা ভারও—এটা এখন থেকে আমাদের মনে রাখতে হবে।…… যৌবনের আকৃষ্টতা এমনিই হয়। পরিণত বয়সে মাত্তরের দিতেও বড় কুষ্ঠা দিতেও ভিত্ত।”

• স্বপন বলল : “তাদেরের সন্ততি ছিল কি-রকম ?”

—“কিছু সম্পত্তি ছিল—কিন্তু সে-সম্পত্তির আর ছিল আমার চেয়েও কম। সে রোকবার কতট ছবি এঁকে, ও খাঁকা দিখিয়ে। কিন্তু তাতে

ক'রে কোনোরূপে তাদের তিনটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন সঙ্কলান হ'ত যাত্রা।”

সন্ধ্যা বলল : “তা হ'লে কোন্ ভরসায় সে আপনাদের সংসারকেও এমনভাবে তার নিজের সংসার ব'লে ছাড়ে তুলে নিতে পারল ?”

মসিরে বেনার হেসে বললেন : “যৌবন যখন দ্বিতে চায়—তখন এ-সব কি সে ভাবে সন্ধ্যা ? না, সঙ্গতি ভেবে যে দেওয়ার হিসেব করে সে দিতে পারে ?” ব'লে আবার একটু থেমে বেন আপন মনেই ব'লে চললেন : “সে একটা রোমান্সের সময় ছিল খটে। কী দিনই গিয়েছে ! এমন অকস্মিক দিন কেটেছে যখন দেনার দারে তৈয়্যসপত্রও বিক্রি করতে হয়েছে আমাদের। অথচ আবার সেই সময়েই হাতে দুটো টাকা আসতে না আসতেই সে কী অতিথি-সংস্কারের বদান্ততা—হুঃহুঃ সহশিল্পীকে সাহায্য করার ব্যগ্রতা—পিকনিক, হৈ-চৈ, হরদা—উঃ সে এক অবিখ্যাত ব্যাপার সত্যি !”

অপন বলল : “হাতে তা হ'লে মাঝে মাঝে উদ্ভূত কিছু থাকত ?”

—“ঐ যে বললাম—আমার ছবি মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিতভাবেই বিক্রি হ'রে যেত। বেশির ভাগ সময়েই অবিভিৎ খারাপ দাম পেতাম—কখনো বা একটু ভালো। তবে ভালোয়ের একটু নাম হয়েছিল ইতিমধ্যেই—অনেক সাল'তেই তার ছবি নিত, ও সময়ে সময়ে এক-আধজন রসজ্ঞ বেশ মোটা দাম দিয়েই কিনতেন বিশেষ ক'রে তার ফুলের ছবি। আর ভালোর আমাদের সংসার-খরচের তার জোর ক'রে গ্রহণ করার পর আরও বেশি ক'রে ছবি-আকার মন দিয়েছিল। তাই এক এক সময়ে হরভো তার দু-তিনখানা ছবি একসঙ্গেই বিক্রি করত—দু-তিনটে সাল'র প্রেক্ষণীতে। আর সময়ে সময়ে—আমাদের অধীকার বেশি হ'লে—তার উৎসাহ উর্জিত বেন আরও বেড়ে। এক এক সময় এমনও গেছে যখন সে

বার চোখ ঘন্টা ক'রে খাটত দিনের পর দিন—বতদিন না আমাদের শাওনাদারের ঋণ শোধ হ'ত ।”

আনা বলল : “আর আপনি ?”

—“আমি ভালেবের মতন অত খাটতে পারতাম না । আমার শরীরটাও বরাবরই একটু দুর্বল ছিল কি না । তাই আমার উপরি পাটুনিটুকু যেন সে-ই দিত খেটে । আমি ও সারা এতে অবশ্য কুষ্ঠাবোধ করতাম পূর্বই—কিন্তু কিছু বলার কি উপায় ছিল ? না কোঁ ছিল আপত্তি করার, না—কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ?”

স্বপন বলল : “কেন ? বন্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেও সে চটত বুঝি ?”

—“চটার বাড়ি । তার ক্ষুধার ব্যর্থ ও কৃপাতীক্ষ দৃষ্টির সামনে টগবগে কৃতজ্ঞতাও হিম হ'য়ে যেত যে । বলিনি—সে সব সইতে পারত, পারত না কেবল মুখে উচ্ছ্বাস ? মনে আছে এক এক সময়ে সারা তাকে ঠাট্টা ক'রে বলত : সে কি জুলিয়ার সঙ্গে প্রেম করেও তপু এই ব্যক্তির মূলধনে ?”

সন্ধ্যা খুলি হ'য়ে বলল : “তাতে সে কী বলত ?”

—“বলত হেসে : মেয়েদের প্রেম পেতে হয় উচ্ছ্বাসের বাগনা দিয়ে কিন্তু বজার রাধবার একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মূলধন, যেহেতু মেয়েদের অস্ত্রের উত্তরে পুরুষের অস্ত্রসব অস্ত্র মেকি টাকার মতই অচল ।”

ব'লে একটু হেসেই গভীর হ'য়ে বলতে লাগলেন : “কিন্তু তার ক্ষুধার রেবও অনেক সময়ে আমাকে নিরস্ত করতে পারত না—আমি ঠিক তার উপাধানে তৈরি ছিলাম না তো—চিরদিনই ছিলাম একটু উচ্ছ্বাসপ্রবণ । তাই সময়ে সময়ে তার কাছে আমার অপেক্ষা অধিক কথা না ব'লেও থাকতে পারতাম না । সে তখন হেসে বলত—করাসীতে

একেই বলে blague—‘সংসারে খার নেওয়ার চেয়ে সুবিধের ব্যাবসা আর কি আছেরে পিয়ের ? কে না জানে বড়মাসুখ হবার একটা শ্রেষ্ঠ উপায় টাকা ইন্ডেস্ট করা। আর সব চেয়ে বড় ইন্ডেস্টমেন্ট হচ্ছে বন্ধুকে বাধ্য-বাধ্যকতার করে ফেলা—তাকে জানতে না দিয়ে—কুন্সি না ? তুই যখন পরে বড় চিত্রকর হবি, তখন বুঝবি এর তাৎপর্য, এখন ও-কথা থাক।’ এই রকম হরেক রকম আঁজ-বাজে কথা ব’লে, ঠাট্টা ক’রে, নিজেকে উত্তমর্ষ ব’লে জাহির ক’রে—সে অমনর্ষ কোচরীর খণের বোকাটা ক’রে দিত হাসকা।’ ব’লে হঠাৎ আবার একটু হেসে স্বপনের দিকে চেয়ে বড় বললেন : “অথচ এমনিই মানুষের অহমিকা সেন বে, সময়ে সময়ে আমিও সত্যিই ভাবতাম : হবেও বা, হয়তো আমার মধ্যে বড় শিল্পী হবার শক্তি দেখেছে ব’লেই বুঝি তাঁর এত গরজ। অবশ্য এ-রকমটা মনে হ’ত আমার পরীক্ষাকার জুর্জল মুহূর্তে—তবু এ-রকমও মানুষের মনে হয়—ভালোদের মতন মানুষের সম্বন্ধে !—মানুষের মন কত ছোটই যে হ’তে পারে।”

স্বপন বলল : “এ-সময়ে সাত্রার মনোভাব কি রকম ছিল ভালো ও তাঁর—এ-সব সাহায্য সম্বন্ধে ?”

—“সে-বিষয়ে একটা সুবিধে হ’রে গিয়েছিল এই যে সাত্রাও প্রথম থেকেই ভালোদের প্রজ্ঞায়ে প’ড়ে গিয়েছিল। কলে ক্রমে ক্রমে সে তাকে এমন গভীর প্রজ্ঞা করতে আরম্ভ করল যে, সময়ে সময়ে আবারও হিন্দু হয়ে বুঝি, প্রায়। কারণ বিপর্যাস সবটুকু সাত্রার ভালোদের পরামর্শ মাইলে তার মনের বুৎবুতে তার বেশ কাটতেই চাইত না।

“তার অপরাধও ছিল না। কোনো বিশৃঙ্খলেই ভালোদের মুখ জো কেউ কখনো বেখাছুর দেখেনি। ভালোদের প্রসঙ্গমুখি বেমন মুহূর্তে প্রবেশও সেস বস, সাত্রার আশা—তার হাসিকার মুখ ও সৌন্দর্য্য করত আশ্রয়ের এক প্রাণে বিহ্বলে দিত ভেমনিই জগলা। নতীর মিরাপাত

সকলেও তার বেশরোয়া টং দিচ্ছিল বাক, প্রশান্ত চাউনি ছিল যেন আশ্বাসের সব চেয়ে বড় মঞ্চ। নেহাৎ বখন তার আশ্বাসেও কুলোতো না, তখন সে রেগে উঠে, আর সে-রোগের দমকা কড়ে সব হতাশার কাঁপো বেধ ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যেত উড়ে, আবার ফুটত আলো। এক কথায়, বিপদ, হতাশা, সেটিমেন্টালিটি, কৃতজ্ঞতা—এ সবই তাকে যেন ভর ক'রে চলত।”

সন্ধ্যা বলল : “সব বুঝলাম বলিয়ে, কিন্তু সারার মতন মেরেকে তাঁর বেশরোয়া মস্তামত সঙ্ক করতে কি বেগ পেতে হয়নি ? জানতে ইচ্ছে হয়।”

—“প্রথম প্রথম হয়েছিল বৈ কি। কিন্তু এমনি ছিল তার ব্যক্তিত্বের মজা যে অত্যন্ত দুঃসহ কথাও তার মুখ থেকে ছুটিন শোনার পরে তিন দিনের দিন মনে হ'ত—যেন কতকাল থেকে শুনে আসছি। কিন্তু শেষে কুয়াশা যেমন ক'রে আপনারই অজান্তে দায় কেটে—ভাগ্যেরের মুখে তার ডনজুয়ানি মস্তামতের হাওয়ায় ধর্মাক্রান্তাও তেমনি অলকোই যেত উড়ে—অথচ ধর্মাক্রান্ত মানুষ ঠাঙ্গর করতেও পাকত না যে তার কত বড় কুসংস্কারের মূলসিকড় আসছে নিখিল হ'য়ে। নইলে কি ধরে, সারার কাঁধ থেকে ধর্মের ফুত এক লীজ নামত ?”

অশ্বন হেসে বলল : “ধর্মের ওপর আপনার যে কী ভাতক্রোশ—”

—“তোমরা যে গৌড়া-সন্তানদের আসল মনটির পরে কখনো পড়নি—নইলে কতত ! উঃ ! সে-মনের চেহারা যে কী ভয়ঙ্কর, দুর্ভিত, মিষ্টর ও দরকচা-পড়া মনামি ! ছেলেবেলা থেকে ধনকানি, ভয়, চুপ, চুপ ও উৎসীড়নের চাপে পার্থক্য মন এমনি দুমড়ে যায়—উঃ—যে সে বিধক ! বিজ্ঞানের কুপার মানুষকে নির্দোষ করার উপায় গেরিয়েছে জানো তো ?”

সন্ধ্যা বলল : “না—তুমি নি তো।”

—“শোনোনি ? বাঃ, বৈজ্ঞানিকরা এক রকম শুদ্ধ বের করেছেন

যা ইঞ্জেক্ট ক'রে দিলে আর সম্ভাবন জন্মাতে পারে না। ধর্মসম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা। অর্থাৎ ছেলেবেলার এমন ভয় ও কুসংস্কার মনের মধ্যে ইঞ্জেক্ট ক'রে দেওয়া আর কি যাতে ক'রে সংস্কারকে সুস্থভাবে দেখার প্রবৃত্তি বা জীবন সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে ভাবার ইচ্ছে আর কখনো না ছোর পেতে পারে। এটা আমি বাড়িয়ে বলছি মনে কোনো না। সারার মনে ছেলেবেলার সেই যে পাপের-ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল—মৃত্যু অব্দি সে-ভয় আর তার মন থেকে যোচেনি। আর এ-ভয়ের যে কী যন্ত্রণা জানো না।”

আনা বলল : “তবে যে বললেন সারার ঘাড় থেকে ভালের ধর্মের ভূত নিয়েছিল নামিয়ে।”

—“ঠিক ঐ ভুলেই তো বলছি যে, ধর্মের ভূত হচ্ছে মরিয়া-না-মবেরাম-এ-কেমন বৈরী—ভাব। ভালের যতদিন বেঁচেছিল ততদিন তার ওঝামির কুকুটিতে এ ভূত বেন মনমরা হয়েছিল খানিকটা। তা ছাড়া তার চারপাশে যে নিষ্ঠুর বেপরোয়া মলটি সে গ'ড়ে তুলেছিল তাদের অসংখ্য সখা ও সাহচর্যের আলোমণ্ডলে থেকে থেকে সারা ধর্মের করুণা-মণ্ডলের প্রভাব একটু কাটিয়ে উঠেছিলও বটে। কিন্তু বলছিলাম না যে ছেলেবেলার ধর্মরূপ কুসংস্কারের মাইক্রোব একবার মনের মূলে ঢুকলে সে সিদ্ধবাদের কাঁধে-বুকের মতনই নাছোড়বন্ধ অতিথি হ'য়ে দাঁড়ায়! যক্ষারোগের মাইক্রোবের মতন সেয়েও সারে না—‘সাসেপ-টি-বিলিটি’ থাকেই—একটু অসাবধান হয়েছ কি রক্তবীজের ঝাড় উঠেছে জেগে।” ব'লে একটু হেসে বললেন : “কিন্তু কবুল করছি, এসব আমার ভালেরের কাছ থেকে শেখা কথা।”

আনা হেসে বলল : “ভালেরের ধর্ম-সম্বন্ধে বিরাগও আপনাকে দিল কতজন্মের কল।”

—“সত্যিই যে তাই আনা। আর এখন তো কোনো কণের চেয়েই কম নয়। কেননা প্রথম ঘোবনেই ধর্ম-সম্বন্ধে তার সত্য-দর্শনের প্রভাবে পড়ে না গেলে—কে জানে—হয়তো মানুষি প্রথায় ঈশ্বকে সাক্ষী করে সারাকে বিবাহই ক’রে বসতাম।”

দ্বন্দ্বন হেসে বলল : “আর কী ভয়াবহ ব্যাপারই না হ’ত সেটা !  
উঃ ! ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়।”

মসিয়ে বেনার সহাস্তে বললেন : “সত্যিই দেয় যে মনামি !”

সফা অহুযোগের সুরে বলল : “আপনি কিছু সারার সম্বন্ধে কিছু না বলে কেবল ভালোদের কথাই শোনাচ্ছেন মসিয়ে। যে-সারা আপনার কাছে তার আবালা ধর্মের সংস্কারও ছাড়ল তার কাছেও না হয় ‘পানিকটা ঋণ স্বীকার করলেন। বিবাহ করার মতন না করাটাও তো একতরফা নয়।”

মসিয়ে বেনার একটু অপ্রতিভ সুরে বললেন : “বটে বটে। সারার কথাও আমার কিছু বলা উচিত, নয় ? কিছু কি জানো সফা ? ঐ যে বলছিলাম ভালোদের সম্বন্ধে কথা উঠলে এখনো আমার প্রায়ই মাত্রাজান থাকে না—করি কি বলা ?—কিন্তু” বলে বৃদ্ধ সুর খাদে নামিয়ে নিয়ে বলতে লাগলেন : “এতক্ষণ কেবল ভালোদের ভালোবাসার কথাই বলছিলাম বলে মনে কোরো না যে, এ-সময়ে আমার কাছে সারার ভালোবাসার দাম এতটুকুও কম ছিল। কারণ এ কথা বলাই বেশি যে, সারার কাছে আমি বা শেতাম ভালোদের কাছে তা পাওয়া সম্ভব ছিল না। আমার জীবনে যে ছ-চারজন বহু-বাড়ী চিরদিনের জন্যে আলো ছড়িয়ে গেছে, সারা তাদের মধ্যে কারুর চেয়েই কম নয়।” বৃদ্ধ আরও কোমল করে বলতে লাগলেন :

“তা ছাড়া সে শুধু প্রথম ঘোবনের ভালোবাসাই তো নয়—তার ওপর



এক ছেলে-বন্ধু-পড়ে-ওঠা ভালোবাসা। তার কি তুলনা হয়? একমাত্র  
খাচ্চা, নানা ছোটখাট দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে দিয়ে পরস্পরকে কাঁই  
পাওয়া—নানা তুলবোঝাবুঝি মনান্তর বসন্তের মতো দিয়েও প্রেমে  
নিত্য নতুন করে পাওয়া—কিন্তু এ-সব বলে কী হবে বলো সন্ধ্যা? এ-সব  
কি তোমরা জানো না?”

সন্ধ্যা বলল : “তবু শুনেই ইচ্ছে হয় যে। এ-সব বিষয়ে অপরো  
অভিজ্ঞতা কি কম ভালো লাগে? তা ছাড়া মিলিয়ে দেখারও একটা  
আনন্দ নেই কি?”

মসিয়ে বেনার স্থিতত্বের বললেন : “বেশ বলেছ। তবে শোনো  
সারার মধ্যে একটু বেশি করেই বলি। কেবল ফের যদি উজ্জ্বল  
হয়ে পড়ে—”

আনা বলল : “ফে—র—!”

বুদ্ধ হেসে বললেন : “আচ্ছা আচ্ছা, বলছি গো বল। তোমরা  
সকলে মিলে প্রতি পদে আমাকে শাসন করতে থাকলে আমার গতি কী  
হবে বলো দেখি?”

সকলের মুখে কণিক হাসির রেখা দেখা দিল। মসিয়ে বেনার  
পাইপটা ধরিয়ে বলতে লাগলেন : “এই সময়ে সারার মধ্যে অনেকগুলো  
দোকান-কিউ অবস্থা আমার চোখে পড়ে—যা কেবল একদিকে থাকলেই  
পড়তে পারে। সে-সবের উল্লেখ করা নিম্নরোজন। তা ছাড়া সে-সব  
দোকান-কিউতে সারার জীবনব্যাপি আমি অনেক সময়ে অসহিষ্ণু হয়ে  
উঠলেও তার দৃষ্টির পরে কালের স্তব্ধ স্পর্শে বুঝতে পারি ওদের  
তুলনার তার দোকান-কিউ ছিল কত নগণ্য! অথচ তবু কত সময়ে কত  
বার—কত নিতুইই না হয়েছি,—তুলে গেছি—সে তার কত কত বড়  
ছিল। আজ আমার সত্যি সত্যি সত্যি তা-কত আশ্চর্য লাগে সন্ধ্যা, যে,

বেবানে মায়ের পতীরভাবে ভালোবাসে সেখানেও সে প্রেমাল্পনকে এসব অবান্তর সৌখিন দিয়ে বিচার করতে পারে কেমন করে? আজ বিষয় লাগে : কেমন করে সে-সময়ে আমি অনেক মনকেই ফুলে যেতাম সারার কাছে আমার কল কতখানি? কেননা ভালোবাসার সম্বন্ধে তো কই কখনো এককম সন্দেহ জাগত না—কখনো তো তার দোষ-ত্রুটির সমীপা তার মহত্বকে এতটুকুও কাপসা করে দেয়নি।”

আনা বলল : “কিন্তু এর মূল কারণ কি এই নয় মসিরে, যে—যে-কারণেই হোক—দাম্পত্য-প্রেমের মধ্যে আমরা এমনসব দাবি-মাগরা করে থাকি যা বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে করি না।”

মসিরে বেনার একটু ভাবলেন, পরে বললেন : “কথাটা হয়তো তোমার মিলে নয়। কারণ দাম্পত্য-প্রেমের বন্ধন মেয়েদের কাছে খুব তুসেই হয়তো না-ও হতে পারে, কিন্তু ছেলেদের যে-প্রকৃতি তাতে তার পক্ষে দাম্পত্য বন্ধুত্বও বোধ হয় বেশি সোজা—আদর্শ প্রণয়ী হওয়ার চেয়ে।”

বগুন একটু হেসে বলল : “এইজন্তেই কি মেটো বলতেন না কি যে, পুরুষ-পুরুষে ভালোবাসা মেয়ে-পুরুষে ভালোবাসার চেয়ে বেশি উচ্চাত্মক?”

মসিরে বেনার বললেন : “তুমি ঠাট্টা করে একথা উদ্ধৃত করলেও মেটো কিন্তু মোটেই ঠাট্টা করে করেননি এ-তুলনা। কারণ মেয়ে-পুরুষে ভালোবাসার মধ্যে যে দাবি-মাগরার রাজিমাতি সমাজের চাপে চাপে আসছে তার বহু সই-ই যে বাজে একথা না জানে কে? এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল : ভালোবাসার বিবাহ-বিচ্ছেদের একটা প্রধান কারণই ছিল এই। সে প্রায়ই বলত : যে-দুহুণ্ডেই নয়নাঙ্গী মন পড়ে শপথ করে ছিলকে কীকার করতে যার সে-দুহুণ্ডেই তার একটা মিথ্যাকে দেয় প্রায়ই।”

সন্ধ্যা বলল : “মিথ্যাটা কী ?

—“যে, বিবাহে প্রেম যদি সত্য হয় তবে শপথ ক’রে তাকে বন্ধ রাখার বিড়ম্বনার তাকে খাটো করা হয়ই হয়। ফলে হয় এই যে, বিবাহের পরে লোকে ভুলে যায় যে, শপথটা গোপন, যেটা সত্য সেটা হচ্ছে এমন কিছু যাকে অস্বীকার দিয়ে বাঁধা যায় না। মনে আছে এ-কথা ভালের সারাকে প্রায়ই বলত প্রথম প্রথম।”

সন্ধ্যা বলল : “তাতে সারা কি বলত ?”

—“কি বলবে বলে-? কুণ্ঠে তর্ক করা ঠিক তার প্রকৃতিতে খাপ খেত না। তবু মাঝে মাঝে উত্ফ্রাস হ’য়ে সে প্রতিবাদ করত বৈ কি। বলত : ভালের, তুমি কি মনে করো না যে দুজনের ব্লেচ-সান্নিধ্যের মধ্যে এমন কিছু মতিমা থাকতে পারে যার অঙ্কে শপথ ক’রে বিবাহ করাও সার্থক হ’তে পারে ?”

• অনা বলল : “তাতে ভালের কি উত্তর দিত ?” তার কণ্ঠস্বর আশ্রয়ের স্পন্দন ওঠে ফুটে।

—“সারার সঙ্গে সচরাচর সে তর্ক করত না। কারণ অন্তত তাকে তর্কে হারানোর তার গৌরব নেই। সে তা চাইতও না। তবে মাঝে মাঝে আমি কখনো এ-ধরনের কথা বলে একটু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করত গেলে—তার জিতে ছুটত ফুলিখ। কী স্নেহ সে! আর শুধু নিজের ব্যক্তিই সে কান্ড থাকত না এ-সব সময়ে—প্রায়ই নীটশের নানা অগ্নিময় স্নেহ উদ্ভূত করত দাম্পত্য-প্রেমের উচ্ছ্বাস স্তন্যদে-না-স্তন্যদে। নীটশেকে ভালোবাসতে শিখি আমি তারি উৎসাহে। বলছিলাম না—সে বলত জাম্বাণ ভায়াটা শেখা সার্থক কেবল পেটে ও নীটশে পড়ার ক্ষেত্রে ?”

স্বপন ইহং আপত্তির ঘুরে বলল : “পেটে বুকি—কিন্তু নীটশেকে এত ভালো লাগত তার ঠিক কী হতে ?”

—“সে ভালো-লাগা নয় শুধু : নীটশের ংসারাত্ত্বা প্রায় তার বাইবেলের মতন ছিল। ও বাইবানির নানা অধ্যায় প্রায় তার কণ্ঠস্থ ছিল বললেই হয়। ংসারাত্ত্বার নানা বাবের টাকা সে তুলত তার ভালেরী টিপ্পনিতে কলিয়ে।”

হুগন বলল : “কী পরলের টীকাটিপ্পনি?”

বুদ্ধ বললেন : “সে কি একটা যে বলব? ধরো যেমন সে প্রায়ই উদ্ধৃত করত দাম্পত্য-বন্ধন সম্বন্ধে নীটশের আলামার শ্লোক : “Ach ! diese Armuth der Seele zu Zweien ! Ach, dieser Schmutz der Seele zu Zweien ! Ach, dies erbärmliche Behagen zu Zweien ! Ehe nennen sie dies Alles, und sie sagen ihre Ehen seien im Himmel geschlossen !”

সন্ধ্যা বলল : “এর মানেটা?”

মসিবে বেনারের গুঁঠপ্রান্তে ফুটে উঠল তাঁর নিকরূপ স্নেহের আভা : “মানে আর কি? যে দুগলদের কোনো প্রেমটার মধ্যে সুখার চেয়ে স্নেহই কম্বলিত—অথচ উচ্ছ্বাসীরা এই সঙ্গীণ ভুক্তিতে তাদেরকে জুড়ে দেওয়ার নাম দেন : ‘স্বর্গের ঘটকালি’!” ব’লেই সেন তাঁর চমক ভাঙল সন্ধ্যার মুখের পানে চেয়ে। সন্ধ্যা চোখ নামিয়ে নিল। বুদ্ধ একটু অপ্রতিভ হ’য়ে বললেন জোর ক’রে হেসে : “ঐ দেখ—কের ভালেরের কথা এসে গেছে সারাকে ছাপিয়ে! স্বভাব না বার ম’লে, করি কী বলা? থাক।” ব’লে সুহকে শান্ত ক’রে নিয়ে বলতে লাগলেন কেব : “সারাকে আজ বধন কালের এ স্বচ্ছ সুদূরতার পশ্চাৎপটে ধীপ্ত ক’রে দেখি তখনই তাকে সন্তি ক’রে বেধি ও চিনি। অথচ এ-চেনাকে অপরের পরিচিত ক’রে দেওয়া এতই কঠিন—এক দমর দিয়ে অস্ত্রতন ক’রেই চেনা যায় একে।”

বপন বলল : “কিন্তু যে কোনো-কিছুকে সত্যি চিনেছে সে হতে চেনাতে পারবে না-ই বা কেন ?”

মসিমে বেয়ার চিন্তিত হুঁরে বলতে লাগলেন : “কি রকম জানে! এক শ্রেণীর মহাশয় আছে বা মহাশয় বটে, কিন্তু তার মধ্যে চমক আছে বিশ্বয় আছে—দীপ্তিও—বেশন, ভালোয়ের। এ-মহাশয়ের মধ্যে সবারই না হলেও অনেকখানিই থাকে কীর্তির মহাশয়। কাজেই এ-মহাশয় মহাশয়ের মধ্যে যুক পতীরতাটুকুকে লোকের সামনে ধরা না গেলেও কীর্তিটুকুকে আঙুল দিয়ে দেখানো যায়। কিন্তু আর-এক শ্রেণীর মহাশয় আছে—বা মোম, বা কীর্তি-বুধের নয়—অথচ সে তার স্মরণে প্রতি মহাশয় আমাদের হৃদয়ের অন্তরে নানান স্থিতিশক্তিকে ক’রে তোলে সক্রিয়, দীপ্তিকে ক’রে তোলে উজ্জ্বল।

“সারার মহাশয়—এই শ্রেণীর। শুধু সারার কেন! নারীমাত্রেই প্রেম বশন সত্য হয়—তখন তার মধ্যে এই শ্রেণীর বসই বোধ হয় সব চেয়ে উপচিত হ’য়ে ওঠে। সে কিছু আড়ম্বর করে না—শেখার না কিছু—কোনো কীর্তির তত্ত্ব বার না রেখে—শুধু যৌন স্মরণে আকাঙ্ক্ষা চিরদিনের জন্য বড় ক’রে রেখে যায়।”

ব’লে একটু থেমে বলতে লাগলেন : “সারার সৌরভ ছিল এই শ্রেণীর বর্বার নারীদের সৌরভ। নইলে সে জুলিয়ার বতন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তীও ছিল না, ভালোয়ের মতন দৃঢ়তাও অসাধারণও না। বরং বাইরে থেকে দেখতে গেলে তাকে অত্যন্ত সামান্য—এমন কি নগণ্যই মনে হ’ত অনেকের। অথচ তা সবেও আমি বলব যে সে বক্তব্য সামান্য ছিল না। কারণ তার মধ্যে ছিল দুটি অসামান্য শক্তি : ভালোবাসবার ও প্রকা করবার। সে আমাকে বড় ক’রে রেখে গেছে তার নারী-কন্যের উদ্ভব সব চালা ভালোবাসা দিয়ে, ভালোয়কে বড় করেছিল তার কিশোরী-কন্যার

উজাড় করা জ্ঞান দিয়ে । অর্থাৎ এ-কথা বলি না যে, তার জ্ঞান ভালোবাসার মধ্যে খাদ ছিল না । যে ছিল মাহুদ—তাই তার ভালোবাসার দাবি ছিল বৈ কি, ছিল অসহিষ্ণুতা, ছিল ঈর্ষা—যেমন তার শ্রদ্ধার মধ্যেও ছিল ভয়, ছিল প্রিয় হবার চেষ্টা, এমন কি কখনো কখনো নিজেকে জাহির করার প্রয়াসও । কিন্তু তবু তার জ্ঞান ভালোবাসার মধ্যে খাদটুকুকেই তো বড় করে দেখা চলে না । কারণ এর মধ্যে ছিল আত্মদান, ছিল অনাধীন প্রীতির ধারা, ছিল সাক্ষাৎ দেবার অসামান্য ক্ষমতা ।”

ব’লে একটু থেমে কঠোর স্বর উদ্ভাস স্বরের যেন টেনে এসে বলতে লাগলেন : “আমি এ-কথা বলি না যে তাকে ছাড়া আর কাউকে আমি পরে আর ভালোবাসিনি, বা এ-কথাও বলব না যে সে-ই ছিল আমার নারীত্বের আদর্শ । আমার মনে হয় কোনো একজন নারীই কোনো নানাবূধী সন্নাগ পুরুষের কাছে জীবনে নারীত্বের আদর্শ-রূপিনী হ’তে পারে না—সে সম্ভব কেবল কাব্যে, যেমন পের্সার্কীর কাছে লভা বা দাস্তুর কাছে বিরাজিত । কিন্তু তবু এ-কথা আমি বোধ হয় অকুণ্ঠে বলতে পারি যে, তার রহস্যের সংস্পর্শে না এসে আমি অনেক কিছু হারালাম । তার সংস্পর্শে এসেছিলাম ব’লেই আমি অস্বস্তি করতে পেরেছিলাম নারী কি তাবে পুরুষকে চিরদিনের মতন বড় করে রেখে যায় । তার সঙ্গে পরিচয় না হ’লে হয়তো আমি আত্মকালকার পুরুষ-পত্নী নারীত্বের জুড়ে জুড়ে মিলিয়ে বলতাম যে, যেসবের পুরুষ হ’তে সন্মোহন না মিলে মুক্তি জৈব নৈব চ । আর যেটা সব চেয়ে বড় কথা সেটা এই যে, তার একান্ত অকুণ্ঠ আত্মনিবেদনের অপূর্ণ খাদ না পেলে হয়তো নারীর নারীত্ব সম্বন্ধে কোনো সত্য অজস্রুট্টই আমার লাভ হ’ত না ।—কিন্তু ঐ যেখ—কেন উজ্জ্বল হ’তে পড়ার বোগাড়—ভাগ্যে থাকলে না জানি কী ব্যঙ্গকর চাউনিই চাইত !”

সজ্জা বলল : “আজ্ঞা মসিয়ে, সে-সময়কার স্থিতি এখন কী মূরে বাজে আপনার মনে, বলবেন ? মানে সব-জড়িয়ে ?”

বৃদ্ধ একটু চেয়ে রইলেন ওর দিকে, পরে বললেন : “ও, বুঝছি। কিন্তু তুমি বা ভাবছ তানয়। কোনো কাঁটাই আর নেই আজ আর। আজ সে সময়ের কথা মনে হয় যেন একটা মধু-মুগ্ধের মতন। কারণ সে-সময়কার দুঃখ কষ্ট উদ্বেগ উৎকর্ষার স্থিতি এ দুঃখের ব্যবধানে ঐ-তারাদের মতনই ছোট্ট সঙ্কুচিত হ’য়ে গেছে—আছে শুধু তাদের তৃপ্তির বাদের বেশ ঐ চাদেরই মতন মিষ্টি বড় হ’য়ে।”

বলতে বলতে তাঁর অধরগ্রাস্তে একটা ছোট্ট হাসির টুকরো উঠল মুখে : “উঃ, সে কী কাণ্ড ! কত সময়ে রাজভোর তরুঁ হাসি আজ্ঞা হয়না—আবার পরদিনই ছবি-আঁকার বিপর্যয় শ্রম। কত সময়ে কত দুঃখ, অথচ সে-দুঃখের মধ্যেও তালেয়ের সাহায্য, যৌন সমবেদনা, জুলিয়ার নৃত্যগান, সারার অক্লান্ত সেবা, আমাদের ছুটি শিশুর খেলা-ধাড়া ও—আব আব কথা নিয়ে আমাদের মধ্যে নানা হাসি গল্প, মজা, ঝগড়া-কল্লনা—ওরা পরে কী রকম দাঁড়ায়ে, আমার ও তালেয়ের সতীর্থদের কত-কত সাহচর্যের স্থিতি, কত থিয়েটার দেখা, নিজেদের ঘরেই কোনো মতে টেজ বানিয়ে থিয়েটার করা, হল বেঁধে সীন নদীতে স্নান, আচম্কা এ-বন্ধ সে-বন্ধর ওখানে চড়াও হ’য়ে প’ড়ে তাদের ও তাদের প্রণয়িনীদের ওপর জুলুম ক’রে ঘটাখানেকের মধ্যে প্রায় তোজ দিতে বাধ্য করা, কলবেঁধে ফিটেনরো, ভার্সেল্‌ প্রভৃতিতে গিয়ে ঘন-তোজন করা—কত কী—সে কি একটা ? সে এক দিন গিয়েছে জানা, সত্যি। মাঝে মাঝে এখন মনে হয় মাহুদ কত কস মূলধনে কত বড় আনন্দের হাট্টই না বসাতে পারে ঐ যৌধন-বেবতার হায়ার—বখন উপকরণের অভাবও

হ'য়ে ওঠে ঐখ্য—প্রাপশক্তির স্পর্শমণিতে। সত্যি আজ এসব মায়ার মতনই মনে হয়।”

ব'লেই সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন : “কেমন, সামলাও এবার কুছের দরদীন স্ত্রী উচ্ছ্বাস ! বলেছিলে না ‘সংক্ষেপ করতে পারবেন না কি?’”

সন্ধ্যা বলল : “আমি কি অধৈর্য্য হ'য়ে পড়াছি নাকি ? কেবল আমার ভব হয় পাছে আপনি গল্পটুকু শেষ করবার সময় না পান। তাইতো গল্পটা আগে শুনে নিতে চাই। বিশেষ ক'রে সারার কথা।”

মসিয়ে বেনার আবার দিকে চেয়ে বললেন : “আর তোমার ?”

আনা বলল : “আমার—ভালোবের কথা।”

—“আর তোমার, সেন ? জুলিয়ার কথা, না ? সত্যি বলা তো ব'কে হাত দিয়ে ?”

স্বপন হেসে বলল : “গিল্টি প্রীড করছি। কেবল ও বেচারীকে এইতিহাসে এতটা উপেক্ষিতা ক'রে রাখছেন যে, আমার খানিকটা সাফাইও আছে।”

মসিয়ে বেনার বললেন : “মানি সেন। তা ছাড়া জুলিয়ার কথা বলার সময়ও এসেছে বৈ কি। কারণ দরতে গেলে প্রাক্ জুলিয়া অঙ্কটুকু হ'ল আমার এ-জীবন-নাট্যের বিদ্যুৎক মাত্র। আসল নাট্যরস এল ওর প্রবেশের পরে। কাজেই ও উপেক্ষিতা থাকবে না, মাইল্ডঃ—ব'লেই বেন কথটা শুধরে বেনার জন্তে বললেন : “অবশ্য, এতকণ জুলিয়া এ-জীবন-নাট্যে ঠিকমতন প্রবেশ করেনি, কারণ ভালোবের জীবনটার তার সঙ্গ ও সাহচর্য্য আনাদের বগেট আনক দিলেও, তার পাশে জুলিয়া ঠিক তেমনিই পাতুর হ'য়ে থাকত বেনন পাতুর—চাঁদের পাশে ঐ তারাটি।” ব'লে একটু খেমে বললেন : “সে আমার জীবনে সত্যিকার প্রভাব বিস্তার করে : ভালোবের জলে-দুখে মজার পরে।”



আনা ও সন্ধ্যা প্রায় একসঙ্গে অশ্রুট চিৎকার করে উঠল :  
“জলে ডুবে ! !”

মসিবে বেনার বললেন : “হ্যাঁ, একটি পনের বছরের মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে। সীন নদীতে সে কুড়ি মাইল সাঁতার কেটে উঠতে যাবে এমন সময়ে মেয়েটি কি কারণে ডুবে যায় নাকো উলটে। ভালের ক্রান্ত মুহুর্তে তাকে উদ্ধার করতে ফের আপ দেয় ও সে তর পেয়ে তাকে এমনভাবে জাপটে ধরে যে দুজনেই মায় ডুবে।”

খানিকক্ষণ ঘরের মধ্যে একটা আঁর্জ নীরবতা এসে ছায়া বিস্তার করল যেন।

মসিবে বেনার উদ্বাস-কর্ষে বলতে লাগলেন : “ভালেরের এ আকস্মিক মৃত্যুতে আমাদের মনের অবস্থা যে কী রকম তল তা বর্ণনা করতে বাব না—তোমরা কল্পনাই করে নিয়ো। কেবল এর মধ্যে একটা ভূষ্টির কথা না বলে থাকতে পারছি না। সেটা এই যে আমি কেমন যেন আগে থেকেই জানতাম যে, রোগে ভুগে বিছানায় শুয়ে জ্বলেরের মৃত্যু হবে না,—তার অসাধারণ জীবনের মধ্যঅবধেই কোলাহল এমনি করে হঠাৎ যবনিকা পড়বে। আর আশ্চর্য্য এই যে, তার মৃত্যুর দু-তিন দিন আগে দুপুরবেলা আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে তার মৃতদেহ সীন নদী থেকে টোলে তোলা হচ্ছে। স্ব্ন থেকে উঠেই আমি তার বাসায় গিয়ে যখন তাকে পরদিন কুড়ি মাইল সাঁতারের প্রতিযোগিতার যেতে মানা করি তখন সে হেসে আমার পিঠে চড় মেয়ে বলেছিল : Et tu Brute ? তুইও শেখটার হুক করলি নাকে-কান্না ? আমি অপ্রতিভ হয়ে বললাম যে, আমি শুনেছি যে এ-রকম স্বপ্ন নাকি কখনও কখনও সত্যিও হয়। তাতে সে হেসে শুধু বলে : যদি হয় তো বন্ধ কি রে ? ধারে ধারে মৃত্যুর নাকি বাসের কব্জি অপেক্ষা না করে একটু এগিয়ে গিয়ে

তার হাত ধরে ডেকে আনাই কি ভালো নয় ? বা এখন, আজ সারা  
রাতভোর ওখানে আড্ডার হুঁরা মনে আছে ত ? অকুরন্ত কফি ও  
বোর্দোর \* বোঁগাড় রাখিস । অনেককে আসতে বলেছি । জুলিয়া  
তিনটে নতুন নাচ নাচবে—আমার তিনটে নতুন গানের সঙ্গে । কাজেই  
ঘোর ষ্টুডিয়ার মাঝখানে একটু উঁচু প্রাটিকশ্বের বন্ধোবস্ত রাখিস ।”

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর এমন যুহু হ’য়ে আসে : বেন আপনা-আপনি—“মনে  
আছে শেব গানটি তার—যার সঙ্গে জুলিয়া নেচেছিল—সে উন-অস্থির  
দিনে—সন্ধ্যায়...আর ভালের গেয়েছিল :

সুঝালো কি উদা-আলো অবেলায় ?

ঘনালো কি মাদা-কালো—সন্ধ্যায় ?

হেমন্ত এলো বন ছেয়ে কি ?

তাই তুখে উছসি’

লো সরোজ-সরসি,

রবে বসন্ত-পথ চেয়ে কি ?

অতল অঙ্কুরের শতকল আলো না...

বিরল মর্ষ-মুখা অকুরান ঢালো না...

অক্ষ-মৌন কেন আজি লো ?—

জীবন যে কারা-আলী,—ছায়া সখি, ভালো না ।

অন্ত-অচলে রবি চুরে যায় ?—

তার-মণিমালা গাণো সন্ধ্যায় ।

তোমারো নয়নে ছি ছি যেব ছায় ?

যৌবনও আতুর কি হবে হায় ?

\* একরকম করাসী মন ।

‘যদি পাছে জয়ী হয় নিয়তি’—

এ-তরাসে উছসি’

প্রাণ হঃসাহসী

তারি পায়ে করিবে কি মিনতি ?

যা দেবার—দিয়ে যাও বিলায়ে লো তূর্ণ...

দুরাশা হিয়ার খেন নাহি হয় ক্ষুধ...

দুঃ দুঃ কেন করে বুক লো ?

মানের প্রাধনে বাধা-বাধ হোক চূর্ণ ।

কৌমুদী কক্ষায় নিতে যায় ?—

চাহনি-চাঁদিমা আলো সক্ষায় ।”

\* \*

নিশ্চয়তা ভাঙল সক্ষা—অতি মুহূর্তেরে : “তারপর ?”

বুকের চমক ভাঙল না তবু। ব’লে চললেন যেন আপন মনেই :  
“কত কথাই মনে পড়ে ।...কী যেন একটা ছায়া পড়েছিল সেই সবারই  
মনে । ভালেরকে এত প্রফুল্ল কখনো কেউ দেখেনি বোধ হয় । অথচ  
...তবু...কী ক’রে যোঝাবো সে-কথা বলো...তার হাসির পিছনে কি-  
একটা নতুন প্রজ্জ্বল করণ হ’ল যেন বেজে উঠছিল থেকে থেকে ।...কেন না  
তবু যে আমারই মনে হয়েছিল একথা তা নয়—পরে শুনলাম অনেকেই  
যেন আবছা প্রত্যায় কি-একটা অড়ের আভাব পেয়েছিল তার নিটোল  
প্রকৃততা ও অটল প্রশান্তির মধ্যে । মনে আছে হঠাৎ সে-রাতে—আমার  
তাতে রাত দুটোর—সারা আমার কণ্ঠবেইন ক’রে বলে ভালেরকে যেন  
পরদিন সঁতারে যেতে না দেই ।...শেষ রাতে হঠাৎ উঠে দেখি, সারা  
আনন্দের কাছে একটা ছোট্ট টেবিলে বাহতে মাথা রেখে কান্দছে ।

“বললাম : ‘কী সারা ?’

“ও বলল : ‘কিছু না—এমনিই।’...আমি খানিক চুপ করে বইলাম। ভালোরের গানের শেষ দুটো চরণ কানে বাজছিল যেন তখনও :

কৌমুদী কৃষ্ণার নিভে যায় ?—

— চাহনি-চাঁদিয়া জালো সন্ধ্যায়।”



এবার নিশ্চকতা ভাঙল আন।

বুদ্ধ বললেন : “তারপর বাদ দিয়ে যাঠ অনেকখানি। সে তো বলা যায় না।”

স্বপন বলল : “জুলিয়াও কি বুকে পেয়েছিল আসন্ন কোনো দুর্ঘট্যের কথা ?”

বুদ্ধ বললেন : “না। কেবল সে-ই পারেনি। পারলে হয়তো সেদিন সে-নাচ নাচতে পারত না। আরে পারেনি বলেই এক রকম আমাদের বাঁচিয়ে দিল সে।”

আনা বলল : “কি রকম ?”

বুদ্ধ বললেন : “ওর কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল ব’লে ভালোরের মৃত্যুর পরে ও যেন কেমন বিহবল মতন হ’য়ে রইল দুদিন। তিন দিনের দিন হঠাৎ বেহ’শ। তখন ওকে দেখতেই আমাদের এত ব্যস্ত হ’য়ে পড়তে হ’ল যে, ভালোর যেন তখনকার মতন একটু স’রে গেল চেতন মন থেকে।”

সন্ধ্যা বলল : “অনুঘটা কী ?”

বুদ্ধ বললেন : “কোনো ডাক্তারেই বলতে পারল না। অরও নেই, কুল-বকাও নেই, পাগলও না—অগত্যা কেমন যেন সন্নিহারা তাই। আর

সেই হ'ল সব চেয়ে মুক্তি। কারণ ও কখন কি ক'রে বলে ভেবে সদাসর্বদা ওকে চোখে-চোখে রাখতে হ'ত আমাদের। কেমন বেন শিশু হ'য়ে পড়ল ও। এক রকম জোর ক'রেই হ'ত ওকে খাওয়াতে, রাতে কারুর না কারুর শুতে হ'ত পাশে—নইলে যদি ভয় পায় হঠাৎ, আরও সে কত রকম বিপদ। শেষটার বিপদ চরমে উঠল যখন একদিন কান্নাতে তার মাথার রক্তকোষের একটা বায়ু গেল ছিঁড়ে। তারপর তিন-তিনটে মাস তার এখন-যায়-তখন-যায় অবস্থা।”

আনা রুদ্ধ স্বরে বলল : “তারপর ?”

—“তারপর আর কি ? তার সমস্ত ভার পড়ল আমার ও সারাব-ওপর। আমরা পালা ক'রে ওকে শুক্রনা করতে লাগলাম। একেই আমাদের অবস্থা ভালো না—তার ওপর জুলিয়ার দরুণ ছবি-আঁকাও এক রকম বন্ধ। ফল—বা হবার, অর্থকষ্ট। তার ওপর ডাক্তারের ও অস্ত্রান্ত আত্মবলিক খরচ—জুলিয়ার শিশু-কন্ডাটির দেখাওনা।” ব'লে ঈষৎ দ্বান হেসে বললেন : “সে যেন ‘আপনি খেতে পায় না আমার লক্ষ্যকে ডাক’ গোছের অবস্থা। অথচ আশ্চর্য্য এই যে যে-আমি ভালোরের জীবনশায় আমাদের নিজেরদেরই জীবিকার সংস্থান করতে পারতাম না—সেই-আমিই ভালোরের মৃত্যুর পরে শুধু নিজেরদের নয় আরও দুটি প্রাণীর খরচ কোনোটতে চালিয়ে তো এলাম—হোক না ঘটিবাটি বাঁধা দিয়ে—কিন্তু আটকে ত রইল না ?—সেইটেই যে সব চেয়ে আশ্চর্য্য কথা ! কেমন ক'রে এ অঘটন ঘটল !”

অনন বলল : “কেমন ক'রে ঘটল ?”

—“আমাদের মধ্যে যে দীনহীন দুর্বল মানুষটা প্রায়ই সম্পদের সমরে উপরে ভেসে ওঠে তাকে দিয়ে আমাদের অতল তলের বিশাা মেলে না ব'লেই ঘটল, নইলে এ-অসম্ভব সম্ভব হ'ল কেমন ক'রে হলো ? আর

সারারই বা কী এক নতুন রূপ সে-সময়ে ফুটে উঠল ! বাকি আমি ধর্মভীরু, ভরকাতুরে, দুর্বল ব'লে মনে মনে একটু অবজ্ঞার চোখে না দেখেই পারতাম না—তার অটল প্রেমের নির্ভর সম্বন্ধে—সেই সারার এক অচেনা মহিমা যেন ফেটে পড়ল। তারতে এখনো মনটা ভরে ওঠে ! শুধু অক্লান্ত স্বেচার ক্ষমতাই নয় ! কী সাহস, নির্ভর, ধৈর্য ও হাসিমুখে সব কষ্ট সওয়া !...আর তা আবার কার অঙ্কে ! এমন একজনকে অঙ্কে বার সম্বন্ধে তার সম্বন্ধের ভাব পোষণ করা তো দূরের কথা, ভালো ধারণাও কোনো দিনই ছিল না।”

সন্ধ্যা বলল : “কেন ?”

—“ভালেকে সে যে-পরিমাণে শ্রদ্ধা করত—জুলিয়াস করত ঠিক সেই পরিমাণেই অনাদর। না, ঠিক অশ্রদ্ধা বললেও ভুল হবে...একটা যেন বিবৃথ ভাব—এমন কি অবজ্ঞারও।”—ব'লে একটু থেমে : “না, ঠিক অবজ্ঞা নয় হয়তো—কারণ জুলিয়ার নানা নৈপুণ্যের ও লাভলোর সম্বন্ধে ঠিক অশ্রদ্ধা পোষণ করাও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।— কি জানো ? ব'লে বোঝানো বড় শক্ত। জুলিয়ার প্রতি তার মনোভাব ছিল যেন অনেকটা শ্রেণীগত অবজ্ঞা...বংশগত...অর্থাৎ ওর বৃত্ত গুলই থাক না কেন ও সতীয়ে ছোট—এই ভাব আর কি। ওর সেই—” একটু থেমে বললেন : “আলমজোর সঙ্গে অগ্নি সম্বন্ধে কানায়ুধো—বুলে না ?—বহিও মুখে একলা স্বীকার করত না।”

স্বপন বলল : “এটা আপনার অনুমান নয় তো ?”

—“না। কারণ এই নিয়ে ভালের বেঁচে থাকতে অনেক সময়ই সারার সঙ্গে আমার তর্ক হ'ত। ও আমাকে মাঝে মাঝেই বলত যে, জুলিয়ার বৃত্ত গুলনাই থাকুক না কেন ভালেরের পাঠের ক'ড়ে আঙুলেরও সে বোধ্য নয়। আমার যে জুলিয়াকে খুবই ভালো লাগত এ-ও ছিল

তার মনকোত্তর কারণ—যে-ধরণের আবছা মনকোভ এক মেয়েদেরই মনে জন্মানো সম্ভব। আমরা—পুরুষেরাও—অবশ্য কারুর কারুর প্রতি বিমুগ্ধ হই, কিন্তু আমাদের বন্ধুদের মধ্যে যদি কাউকে তার প্রতি বিমুগ্ধ না দেখি তা হ'লে তার প্রতি ঠিক ও রকম কোভ পোষণ করি না। কিন্তু সারার মনের গোশন কোণে যেন স্বপ্ন কাঁটার মতন কি-একটা সর্বস্বই বিঁধে থাকত এজ্ঞে। ভাবটা : জুলিয়ার মতন মেয়েকে ভালের বা আমার মতন মানুষ কেনন ক'রে সুনন্দ্রে দেখতে পারে? আমি তার এ-অহেতুক বিমুগ্ধতার বিরুদ্ধে শাস্ত্রভাবে তর্ক করেছি কত সময়ে—কিন্তু কখনো সফল ফলেনি—বরং উল্টো উৎপত্তিই হয়েছে।”

আনা ছটুমির সুরে বলল : “অত সন্মতিস্বপ্ন চুলচেরা বিশ্লেষণ ছেড়ে না হয় সোকাহুজিই বলুন না—ঈর্ষা ?

—“না, তা বললে সারার প্রতি ঠিক সুবিচার করা হবে না যে। ঈর্ষা যখন তার এসেছিল তখন তাকে ঈর্ষা বলতে আমার বাধেনি। কিন্তু ভালের বেঁচে থাকতে তার এ-ঈর্ষা আসেনি। অন্তত : ঈর্ষা বহুতে আমরা সাধারণত যা বুঝি তা নয়। কারণ ভালেরের জীবনশক্তি আমার সঙ্গে যে জুলিয়ার কোনো-কিছু বটা অসম্ভব ছিল সেটা সারা বিলম্ব জানত। সে-সময়ে যে জুলিয়া ভালেরের মধ্যে একেবারে ডুবেছিল সেটা তার প্রতি চাহনি প্রতি ভঙ্গি প্রতি আচরণে বোঝা যেত যে—”

আনা বাঁকা হেসে বলল : “কিন্তু ঠিক সেইজন্মেই যে সারার ঈর্ষা আসতে পারত। তার ঈর্ষার একমাত্র নিশানা যে আপনি এইটাই বা ভাবছেন কেন ?”

মলিরে বেনার ঈর্ষা অপ্রতিভ সুরে বললেন : “ভোমরা আক লকসেই দেখছি উঠে পড়ে লেগেছ।” ব'লেই হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে : “কিন্তু কথাটা যখন কুলগে তখন উত্তরও আমাকে দিতেই হয়। জুলিয়ার

প্রতি সারার অকারণ বিমুখতার অস্ত্রে যে এ-সম্বোধের কথাও কখনো আমার মনে উন্নয় হয়নি তা নয়—বিশ্বাস করতে পারো। কারণ আমি বইটী অহকারী হই না কেন ভালোবের প্রতি যে সারা ভেতরে ভেতরে আসক্ত হ'তে পারে এ সত্যটির প্রতি আমি পূর্ণভাবে সচেতন ছিলাম।”

অপন বলল : “আপনা থেকেই সচেতন ছিলেন, না সচেতন হ'য়ে পড়তে হয়েছিল ?”

—“সচেতন হ'য়ে পড়তে হয়েছিল। কারণ ভালোবের সঙ্গে মিশলে আমার কিছু না হোক একটা জিনিষ অসম্ভব হ'য়ে উঠতই উঠত। সেটার নাম : মনকে চোখ-ঠারা—বা খানিকদূর ভেবে বাঁকিতকুকে ভয়ে ঢাপা-দেওয়া। তার নিরঙ্কুশ জিতের তাড়নার মূর্খুর অভ্যন্তরেও যে বইত বিদ্যৎ। কাজেই তার জীবন, দৃষ্টান্ত ও আলোচনার তোড়ের সামনে মানুষের স্বস্তির প্রতিষ্ঠা টলমল ক'রে না উঠেই পারত না। তা ছাড়া ভালোবের শুধু কথাই তো নয়। আমাদের সে-সমাজটা মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের সমাজ ছিল না—এটা ভুলো না। সে-সমাজের নিত্য অভাববীর গোপাবোধের মাঝে এক-কুসংস্কার বজায় রাখা সম্ভব ছিল না যে, একজন ছেলে বা মেয়ে একসঙ্গে একাধিক মেয়ে বা ছেলেকে ভালোবাসতে পারে না। ও-রকম দাবী বজায় রাখা যার কেবল নিরালা অনভিজ্ঞ গৃহভীষনের প্রতিষ্ঠা কোণে।”

সজ্জা বলল : “কেন ভালোবের বন্ধি—”

—“উঃ, সে আর বলে কাজ কি ? তোমাদের বলিনি যে সব রকম উচ্ছ্বাস ও সেক্টিমেন্টালিটির ছিল সে বয়-বিশেষ ? আর সে-বায় কী ভীষই না হ'য়ে উঠত যখন প্রেমের সম্বন্ধে কোনো উচ্ছ্বাস আমাদের কাকুর মুখ কসকে বেজিরে যেত। একনিষ্ঠতার কথা উঠলে তো আর



কথাই ছিল না। কখনো-বা সে হো হো করে হেসেই উড়িয়ে দিত।  
কখনো-বা বলত : প্রেম—বুঝি,—কিন্তু তার আগে একনিষ্ঠ কথাটুকু  
জুড়ে অমন বৎসহারা গাভীর মতন পদগদ হ'য়ে উঠিস কেন বল্লে?  
ব'লে বাঁকা হাসি চেপে সময়ে সময়ে গভীর হ'য়ে বলত : মাসের  
ছন্দরটাকে সদাসর্বদা আঁকড়ে ধ'রে থেকে আমরা ওকে এমনই  
ছোট করে নিয়েছি যে এখন একটু এমিক ওদিক চাইলেও দিতেঃ  
কৈফিয়ৎ।”

সন্ধ্যা বলল : “সারা বলত না কিছু—উত্তরে?”

—“সময়ে সময়ে বৃহ্ প্রতিবাদ না করে থাকতে পারত না ও তাকে  
সমর্থন করার জন্তে আমাকেও আসরে নামতে হ'ত। কিন্তু ঘুরে ফিরে  
বলতে হ'ত সেই মামুলি কথাটাই—যে, একজনের মধ্যেই প্রেমিক নানারূপে  
নিজের প্রেমকে উপলব্ধি করতেও পারে। বুঝলে না?”

সন্ধ্যা স্তব্ধ হ'য়ে বলল : “বুঝলাম, কিন্তু উত্তরে আপনার বন্ধু কী  
বলতেন?”

—“বলত : দেখ্ পিয়ের, যখনি কাউকে এমনভাবে কথা বলতে  
শুনবি তখনি বুঝবি—হয় বেচারীর ‘দ্রাক্ষাকল-বিবাদ’-গোছের অংক।  
না হয় প্রেমে বৈচিত্র্যরূপ দ্রাক্ষাকল যে কী বস্তু তাই সে কখনো জানেনি।  
নইলে স্বাধীনতা পেলে ও নিরীচনের ক্ষেত্র অপ্রশস্ত হ'লে যে-কোনো  
স্বয়ংবরা স্বৈচ্ছায় একবরা থাকেন এ অত্যন্ত গাঁজাপুরি কথা।”

সন্ধ্যা উৎসাহীভাবের ব'লে বলল : “কিন্তু জন্মা করবেন এটা কি  
একটু গায়ের জোরের কথা'র মতনই শোনাল না?”

তার কণ্ঠে উৎসাহীভাবের আভাস পেয়ে মসিহে কেনার তার দিকে  
তাকালেন। হাসনও। কেবল আনা রইল মুখ নিচু করে। সন্ধ্যা  
অপ্রতিভ হ'য়ে চোখ নামিয়ে নিতেই মসিহে কেনার দিকে ঘুরে বললেন :

“প্রথম প্রথম আমারও তাই মনে হ’ত—কিন্তু হ’লে হবে কি, পরে তখন আমার অভিজ্ঞতার পরিসর বিস্তৃত হ’ল তখন দেখতে পেলাম যে, কথাটা শোনকামাত্র যতটা গায়ের জোরের কথা মনে হয় সত্যি সত্যি ততটা গায়ের জোরের কথা নয়। কারণ তখন দেখলাম যে, মানুষ একজনকে ভাব্যোবেসে পূর্ণ সার্থকতা কখনো পেতে পারে না। বৈচিত্র্য যদি জীবনকে সমৃদ্ধ করে প্রেমকে কেন করবে না বলো? অগতঃ প্রেম সম্বন্ধে আমরা সাময়িক প্রথা ও সংস্কারের নির্দেশকেই একান্ত ক’রে দেখি। কুলে নাই যে একনিষ্ঠতার আইডিয়া মানব সমাজের ক্রমবিকাশের একটা বিশেষ অবস্থা মাত্র—একটা সাময়িক ক্রমপরিণতি মাত্র—তার বেশি কিছু নয়।”

সন্ধ্যা খোঁচা দিল : “কিন্তু তা হ’লে সারাই বা ভালোবের প্রতি আসক্ত হ’ল না কেন—রূপে শুণে, ব্যক্তিত্বে—সব তাতে অত বড় বৈষম্যকে এত কাছে পেয়েও?”

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন : “কিন্তু এ কি তোমার অজ্ঞার আবদার নয় সন্ধ্যা? নারী একদিকে একাধিক পুরুষকে ভালোবাসতে পারে বলার সমর্থ কি এই যে, যে-কোনো সুযোগ্য পুরুষকে দেখবামাত্রই সে আসক্ত হ’তে বাধ্য? না, রূপ শুণের তাগিদে বা ফর্শাসে প্রেমের গতি নিয়ন্ত্রিত করা যায়? একটা ক্ষমতা যে কি-কি যোগাযোগে কেন্দ্রবিশেষে আকৃষ্ট হয় আর কেন্দ্রবিশেষে হয় না কেউ কি জানে? সারা ভালেরকে প্রত্যাভক্তি ক’রেও তার প্রতি আসক্ত হয়নি, মানি। কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয় যে প্রেমের গতি একমুখী? না, বলা চলে যে, বিপুল ব্রহ্মণ্ডে একমাত্র বেনার নামধারী অদ্বিতীয় পুরুষের মধ্যেই সে-সব অতুল যোগাযোগ ছিল যার মরুপ সারা নারী একটি নারী বৃকতে পারত?”

সন্ধ্যা একটু বিপন্ন মুখে বলল : “কিন্তু—তবু—”

স্বপন বলল : “সন্ধ্যা, এবার গল্পের যাবতীয় তর্কের অবসারণ্য জন্মে দায়ী কিন্তু তুমি—মনে রেখো।”

মসিয়ে বেনার ঘরের ঘড়ি দেখে নিয়ে বললেন : “বাস্তবিক—আর তর্ক নয়—গল্পটাকে এবার শেষ করতেই হবে। তবে কুঃ হ’লে না সন্ধ্যা—যেহেতু, অন্তত জুলিয়ার ক্ষেত্রে তোমার প্রেমের একটা উত্তর মিলল ব’লে।”

আনা বলল : “আর কফি আনতে বলব ?”

—“না আনা, ধন্যবাদ। প্রায় ন-দশ পেয়ালা কফি খেয়েছি। হিসেব আছে? বরং ঐ তামাকের থলোটা সরিয়ে দাও—পাইপট ধরাই।” ব’লে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন : “Vous permettez ?”

সন্ধ্যা ফিক ক’রে হেসে বলল : “Mais certainement.” †

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন : “Mais vous parlez comme une dame de salon, vraiment !” ‡ সকলে হেসে উঠল।

## জুলিয়া

পাইপটি ধরিয়ে মসিয়ে বেনার খানিকক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন : “ভালোয়ের মুহূর্ত পরে পাঁচ বছর চ’লে গেছে। তার পরে আরম্ভ—আমাদের জীবন-নাট্যের সেই অন্ধ বা কাহিনীতে চিরপুণাতন অথচ অসুভবে চিরন্তন—অর্থাৎ যেখানে নারিকা দুই-ও নায়ক এক।”

\* তুমি অসুস্থ হলে কিছু ভো ধূমপান করতে ?

† বিলম্বন।

‡ কিন্তু বাস্তবিক তুমি সাল’র মহিলার মতনই কথা বলছ যে !

ব'লে পাইপে একটি দীর্ঘ টান দিয়ে বলতে লাগলেন : “এ পাঁচ বছরের মধ্যে আমার, সারার ও জুলিয়ার জীবন-কিন্তু গল্পে অবাধুর হ'লেও বাস্তবে গুরুতর ঘটনা অনেক ঘটেছিল। যথা, আমার ছবি-আঁকার উন্নতি করা ও নানা প্রদর্শনীতে ছবি পাঠাতে পারা, একটু একটু ক'রে খ্যাতিলাভ করা ও অর্থাগম হওয়া, “ওটাই” (Autueil) পল্লীতে আমাদের একটি ছোট বাড়ি নেওয়া, নানা নতুন বন্ধুলাভ ইত্যাদি ইত্যাদি। যেটা ‘বাস্তব’ সেটা হচ্ছে : এক, আমাদের সম্ভাবনের মৃত্যু ও সারার মনঃকষ্ট ; দুই, জুলিয়ার রোম, ভিয়েনা ও বার্লিন যুগে পারিসে ক্রিরে একটি কাবারে-র (cabaret) প্রধানা নর্তকী হওয়া।”

স্বপন ব'লে উঠল : “জুলিয়া ! শেষে কাবারের নর্তকী !”

সন্ধ্যা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল : “কেন ?”

—“সে অনেক কাহিনী। যেচারি এ-পাঁচবছরে অনেক দুঃখই পেরেছিল—কিন্তু কোথাও কোনো চাকরিতে টিংকে থাকতে পারেনি। যেখানেই গেছে শেষটার তার রূপই হয়েছে তার কাল। অবশ্য কয়েকটি ধনিপুত্র তাকে বিবাহ করতেও চেয়েছিল ; কিন্তু বলা বাহুল্য, ভালোবাসার পরে মামুলি ধনিপুত্রের স্বাদ তার ঠিক দুখরোচক লাগেনি। ফলে তারা ওকে নানা স্বল্প উপায়ে উৎপীড়ন করতে শুরু করে—সে এক দীর্ঘ কাহিনী। কাজেই চিন্তাকর্ষক হওয়া সত্ত্বেও তার বর্ণনা আপাততঃ হালিগত রাখতেই হ'ল। এ-মূত্রে এইটুকু কেবল জেনে রেখো যে, এ পাঁচ বছরে তার জীবনের অতিক্রান্ততা ও মনের গভীরতা দুইই এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তাকে আর সে-জুলিয়া ব'লে চেনবারই উপায় ছিল না।”

• সন্ধ্যা সন্নিদ্রহাসে বলল : “স্বভাব কি বদলার মসিয়ে ?”

হৃদয় বললেন : “বদলার না ! কে বলে ? নিজের প্রতি অতিক্রান্ততাই : তা পরিবর্তনের সঙ্গে কণ্ঠিবদল।”

সন্ধ্যা কি-একটা উত্তর দিতে গিয়ে চুপ ক'রে গেল।

মসিবে বেনার বললেন : “জানি শেরি, তুমি কি বলতে যাচ্ছিলে। কিন্তু, শোনো আগে। তা হ'লেই বুঝবে যে, জুলিয়ার পরিবর্তন হয়েছিল সত্যিই স্বভাবের, মাত্র উপরের ধরণ-ধারণ রঙ-চঙের ভোল-বদলানো না।” ব'লে একটু থেমে বলতে লাগলেন : “কিন্তু অনেক বদলালেও আমাদের সে ভোলেনি। তাই বিপর্য হ'য়ে শেষটায় আমার এখানেই ওঠে। বলে : কোনো হারী নাচের চাকরি চায়। কিন্তু ভালো যায়গার।

“আমি ওকে খুব একটি ভাল কাবারের ম্যানেজারের কাছে বাই নিয়ে। যে-কারণেই হোক আমাদের তিনি একটু খাতির করতেন। তাই শুধু আমার সুপারিশে ওকে ভালো মাইনে দিয়েই রাখেন। সেই থেকে জুলিয়ার কৃতজ্ঞতার সুর।” ব'লেই তাড়াতাড়ি বললেন : “কিন্তু কৃতজ্ঞতার কারণ ছিল না, কেননা দুদিনেই ওর নাচগানের খ্যাতি এত ছড়িয়ে পড়ল যে ম্যানেজারই হ'য়ে উঠলেন ওর কাছে কৃতজ্ঞ—ব'লে, দেখতে।

“কিন্তু হ'লে হবে কি—এক মহামুড়িল হ'ল : কাবারেতে রিহার্সাল প্রকৃতিও যখন তখন, লিলিকে দেখে কে ? সাত-আট বছরের মেয়ে, একটু না দেখলেও চলে না অথচ ওর না ছিল দেখানোর সময়, না গভর্নেন্স রাখার সম্মতি। এক কোনো বোজিঙে রাখতে পারত, কিন্তু তা হ'লে আবার ইচ্ছামত মেয়েটিকে দেখতে পার না। আপনার বলতে তো তার শুধু ঐ মেয়েটি। নীড়ও ঐ মেয়ে, আকাশও ঐ মেয়ে। বাধাও পড়তে ঐখানেই, ছাড়া পেতেও ঐখানেই।

“কলহি, আমাদের শিশু কন্ডাটি জুলিয়া আসার কিছুদিন আগেই মারা যায়। সাজা পাগলের মতন হ'য়ে বায় ও শব্দ অজুবেও পড়ে।

অনেক কষ্টে তাকে সারিয়ে তোলা গেলেও তার হৃদয়টা কেমন যেন বৈরাগী হ'য়েই থাকত। ঠিক এই সময়ে জুলিয়া ও লিলি পারিসে আসে—যখন সারার বৈরাগ্য গভীর হ'য়ে উঠেছে।

“লিলিকে দেখেই তাই তার মৃত্যু মাতৃস্নেহ ওঠে ভেগে—এক মুহূর্তে। জুলিয়ার লিলিকে কোথাও রাখার অসুবিধে দেখে সে তো হাতে স্বর্ণ পেল ও প্রস্তাব করল ওকে সে-ই দেখবে শুনবে।

জুলিয়ারও দুর্ভাবনা দূর হ'ল। কৃতজ্ঞতার সে কী কার্যাই যে কীরল! “আহা!” ব'লে বৃদ্ধ ঋনিককণ চূপ ক'রে থেকে বললেন : “তার কৃতজ্ঞতার সত্যি কারণও ছিল—সারার প্রতি। কেননা জুলিয়া জানত সারার মতন মার কাছে লিলির অধর হওয়া অসম্ভব।” ব'লে বৃদ্ধ আবার একটু অন্তরমনক মতন হ'য়ে পড়লেন। পরে যেন হঠাৎ ভেগে উঠে বলতে লাগলেন : “লিলির দরুণ আমাদের গৃহস্থার বইল জুলিয়ার কষ্টে সর্বস্বাই খোলা। সে ইচ্ছামত লিলিকে দেখতে আমাদের ওখানে যখন তখন আসত বেত ও যখনই ছুটি পেত সব ছেড়ে অনেক রাত অর্ধি আমাদের সঙ্গেই গল্পালাপে কাটাত, তার নানা gallant chevalier-দের লিকে কিরকি না তাকিরে, যে কারণেই হোক।”

সন্ধ্যা বৃহৎ হেসেই চোখ নিচু করল। বৃদ্ধ বললেন : “সন্ধ্যাটী একটু তাড়াতাড়ি ক'রে কসেছ সন্ধ্যা, কারণ ঠিক এ-সময়ে আমার প্রতি তার সত্যিই নজর পড়েনি। যাক, শোনো।”

এক মুখ ধূস্রাঙ্গীরাণ ক'রে বললেন : “এই বকম ক'রে কয়েক মাসের মধ্যেই তার সঙ্গে আমাদের হ'ল আবার যেন একটা নতুন ক'রে ঘনিষ্ঠতা। এ-ঘনিষ্ঠতাটা গ'ড়ে উঠলও আবার বিচিত্রভাবে। আমার সঙ্গে তার বেশির ভাগ কথাইত, হয় নাচ গান আট সখকে, না হয় ভালোবাসার সখকে। আর সারার সঙ্গে তার কথাবার্তা হ'ত, হয় গৃহস্থালী সখকে, না হয় লিলির

সম্বন্ধে। ফলে আমি ও সারা দুজনেই জুলিয়াকে এমন একটা মুহুর্তে পেলার ভালের বেঁচে থাকতে যে-মুহুর্তে পাওয়া সম্ভব ছিল না।”

সন্ধ্যা বলল : “কেন ?”

—“বলিনি যে, জুলিয়ার রূপ ওণ বুদ্ধি যতই থাকুক না কেন, ভালেরে অসামান্যতা তাকে একটু ম্লান ক’রে রাখতই ? হয়তো সেইজন্যেই সে ভালেরের ভীষণদশায় নিজেকে ঠিক খুঁজে পায়নি। অসামান্য প্রতিভাকে ভালোবাসার একটু অসুবিধেও আছে তো।”

আনা জিজ্ঞাসা করল : “ঠিক কী অসুবিধে বলতে পারছেন ?”

—“আওতা। জুলিয়া ভালেরের দিকে চেয়ে থাকত যেমন হৃৎস্রবী থাকে হৃৎস্রের দিকে চেয়ে। ভালের তাকে অনেক সময়ে বলত অবশ্য একটু কম অচুগত হ’তে—কিন্তু তার পাশে আত্মগত্যা যে আমাদেরই স্বাভাবিক মনে হ’ত—প্রেমবুদ্ধি জুলিয়া তো জুলিয়া। তা ছাড়া ভালেরের ছায়ার মধ্যে তার নারীত্বের নানা পাপড়ি, নানা রঙ, নানা স্তবক রিনয় হ’য়ে থাকতেই যেন ভালোবাসত, বাইরের আলোর স্বাধীনতার টুটার উচ্চাশা দেখা দেবে কেমন ক’রে বলো ?” বলে সন্ধ্যা মনে চেয়ে বললেন : “আর তাকে দোষই বা দেব কি—নারীর ভালোবাসার প্রকৃতিই যে এই, তুমি রাগ ক’রে ঠোট কোলালে করব কি বলো পেরি ? খোলা আকাশ বাঁতাসে না জমে তাদের অন্তরঙ্গতার সুর, না সার্থক হয় তাদের মেলাকাজের নিবিড়তা।”

সন্ধ্যা বলল : “আমার তর্ক পেয়েছিল আবার; কিন্তু—কাজ নেই আপনাই বলে যান। তর্কাতর্কি ক’রে রসভঙ্গ ক’রে দিতে চাই না। কেবল একটা জিজ্ঞাস্ত।”

—“কী ?”

—“আশনার কথা যদি সত্যি হয় তা হ’লে কি হাড়ার না দে,

ভালের সংস্পর্শ এসে জুলিয়ার মোটের ওপর কতি বৈ লাভ হয়নি ? কারণ ভালের বত বড়ই হোক না কেন তার আওতার যদি কোনো নারীর নারীক বা স্বাভাব্যত্বকূই যায় শুকিয়ে—”

—“আহা—হা—শুকিয়ে গিয়েছিল কে বলছে ? শেষ পর্যন্ত শোনোই আগে । তা হ’লে বুঝবে জুলিয়ার মধ্যে নারীত্বের যে-বিকাশ, যে-পূর্ণতা হয়েছিল—সে-পূর্ণতা লাভ করা তার পক্ষে অসম্ভব হ’ত যদি না ভালের তার জীবন-পথে উদয় হ’ত । প্রেমের আত্মদানের মুহূর্তগুলি বাইরে থেকেই দেখতে শুদ্ধ । আসলে তো তা নয় । আসলে যে ঐ মুহূর্তে লয়েই নারীর হৃদয় নারীত্বের জড়িমা কেটে ভেতরে ভেতরে সে হলধর-পর-দল মেলতে থাকে । ভালেরের কারণে তার নারীত্বের বা স্বাভাব্যতার এ-রকম অনেকগুলি কুঁড়িই ভেতরে ভেতরে অঙ্কুরিত হয়েছিল । কিংবা এ-ভাবেও বলতে পারো যে, ভালেরের জীবনদশার তার দলগুলিতে তারের ছেঁয়াচ লাগছিল, তার মৃত্যুর পরে ফল ফল । এ-রকম ভাবে বললে হয়তো তুমি ভুট্ট হবে সজ্জা, কি বলা ?”

সজ্জা হেসে বলল : “গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দিলে কি শিকড় ভোলে মসিয়ে, যে আমার প্রবেশে ভোলাচ্ছেন ? তবু আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনি মেয়েদের মেরেপনা সম্বন্ধে কয়েকটা মোলারের কথাও বললেন—to be thankful for small mercies আর কি ।”

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন : “তুমি যে দেখছি মেয়েদের মেয়ে বললে সাত্ত্বিকদের চেয়েও রেগে ওঠো শেরি ?”—ব’লে কৃত্রিম গান্ধীক্যের স্বরে বললেন : “তবে বোধ হয় পক্ষানন্দীনা যখন হঠাৎ বেপক্ষানন্দীনা হন তখন এ-রকম ভাবে বেশি একটু কখে না উঠলেই চলে না । তাই তোমার হয়তো সাধুবাদই দিতে হয় এজ্ঞে—কি বলা ?”

সজ্জা হাসিমুখে বলল : “সাধুবাদের পালা-গাওয়া এখন না-হয়



মুলতুবিই রইল—তার চেয়ে গল্পটাই বলুন। পৃষ্ঠপোষকী চাল তো আছেই—বিশেষত পুরুষের মুখে।”

মসিয়ে বেনার খুব একগাল হেসে বললেন : “খুব যে এক হাত নিলে! বাক—নেও—তোমাদের সঙ্গে রসনা চালনে আমরা কবেই পেরেছি বলা? তাই কথা-কাটাকাটি রেখে গল্পটাই বলি—তো পারি।”

বাঁলে পাইপটা একটু ভালো ক’রে ধরিয়ে বলতে লাগলেন : “তুমি ভিতরের স্বভাবেই নয়, বাইরে থেকে দেখতে গেলেও ভালোবাসার মূর্ত্য পরে জুলিয়ার পরিবর্তন দৃষ্টি-আকর্ষণ না ক’রেই পারত না। ভালোবাসার পাশে সে ছিল—চন্দ্রা—চন্দ্রা—মুগ্ধা অথচ নির্ভরশীল। এ পাঁচ বছরে সে দুঃখও পেয়েছিল অশেষ আর তার ওপর তাকে নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেও হয়েছিল। ফলে তার হাসির মধ্যে কটু উঠেছিল—একটা শুদ্ধতা, কথার মধ্যে—প্রশান্তি, গতিভঙ্গির মধ্যে—সমাহিত দীপ্তি। ভালোবাসার পাশে তাকে মনে হ’ত একটা বড়লোক কাকলি, স্রোতধিনীর নৃত্য, অথচ লতার মতন কাউকে আশ্রয়ন ক’রেই সার্থক হ’তে চায় বেন। এ পাঁচ বছরে তার মধ্যে মূর্ত্ত হ’য়ে উঠেছিল যেন একটা হৃদয়ক্ষের মৌনতা, সন্ধ্যাকাশের উজ্জলতা, বন্যপ্রাণীর আশ্রয়নির্ভর। পাঁচ বছর আগে যে ছিল চটুলা, চপলা, নৃত্যদক্ষা কিশোরী মাত্র, এক কয় বৎসর পরে সে হ’য়ে উঠেছিল—রূপসী, ধীর, নৃত্যশিল্পী পূর্ণ-বৃথতী। ভালোবাসার বেঁচে থাকতে তার কথাবার্তার মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি মিলত কিন্তু আত্মপ্রত্যয় না, মতামত প্রকাশ করার ইচ্ছা দেখা যেত কিন্তু তর্ক ক’রে সে মতকে বজায় রাখতে পারার ক্ষমতা না। এ পাঁচ বছরে তুমি যে বুদ্ধির বৈদ্য ও চিন্তার শক্তি এসে তার এ-সব খুঁটিনাটি অপূর্ণতাকে পূর্ণ ক’রে দিয়েছিল তাই নয়—নিটোল বিকাশে সে হ’য়ে উঠেছিল বাণীর

কোমল, জিজ্ঞাসায় সহিষ্ণু ও সবার উপর জীবনের নানা অসুখতি সহ্যে পূর্ণ সচেতন।—তাই বলছিলাম : সে শুধু বাইরের ক্রমেই বদলায়নি তার ভিতরের প্রকৃতির মধ্যেও ঘটে গিয়েছিল একটা সত্যি বিপ্লব।”

বুদ্ধ বলতে লাগলেন : “কিন্তু সব চেয়ে মনোহর ক’রে তুলেছিল তাকে ভালোরের বিরহ। সর্কাদাই যে সে ভালোরের স্বাতি-চারণ নয় থাকত তা বলি না—কোনো প্রেমই অনন্তকাল ধ’রে শোক করতে পারে না—তবে ভালোরের স্বাতি যে তার নিভৃত সময়কে একটা মিষ্টতার ভ’রে রাখত এ-কথা বললে আশা করি তুমি খুসি হবে সন্ধ্যা।”

সন্ধ্যা হেসে বলল : “হতান, যদি নিঃসন্দেহ হ’তে পারতাম যে, কথটা আমাকে খুসি করবার জন্যেই বলেননি।”

বুদ্ধ হেসে বললেন : “না গো না—অত ভয় কোনো না। আমরা কম্মিস্ট-বিলাসী হ’লেও তাই ব’লে অতটা কপট নই জেনো।”

স্বপন-হেসে বলল : “জানা আছে মসিয়ে, কাজ কি ? তার চেয়ে গল্পটাই বলুন।”

বুদ্ধ তার দিকে চেয়ে উত্তর দিতে গিয়ে বললেন : “এও উত্তর বলতুরি রইল, দেব পরে। এখন যে আমি স্নীগ ভাবী—ওদের সাধনে।”

জানা বলল : “সর্ক রকে। যাক বলুন কাব্যে-জীবন জ্বলবার কেমন লাগছিল।”

বুদ্ধ বললেন : “মন্ব না। তাকে দেখলে অবশ্য মনে হ’ত কিসের একটা আবছা বুদ্ধিকে যেন সে লালন করছে, কিন্তু তা সবেও তার নষ্ট-জীবনের পরিণতলের সঙ্গে সে নিজেকে যেন অনেকটা খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। তার একটা মন্ত কারণ ছিল এই যে, তার নাচ গানে সে ছিল সত্যিই অট্টা ও কাব্যের নানা উদ্ভাবন পরিকল্পনার সে অনেকটা

সার্থকতা খুঁজে পেত। তার ওপর লিলি ছিল, আমরা ছিলাম ও আমাদের গৃহ ছিল তার জন্যে সর্বদাই খোলা। ভালেরের অভাব এ-সবে না মিটলেও একটা নীড় মতন সে পেয়েছিল বৈ কি লিলিকে উপলক্ষ্য ক'রে।”

সন্ধ্যা বলল : “লিলিকে উপলক্ষ্য ক'রে—মানে ?”

বুদ্ধ বললেন : “তার জন্তেই তো ওর সুর হ'য় বখন-তখন আমাদের বাড়ি আসার। বলতে গেলে লিলির কল্যাণেই তো সেও আমাদের ঘরকন্নার একজন হ'য়ে গিয়েছিল। তাই তো অসময়েও এসে প'ড়ে করত উপদ্রব, না ব'লে-ক'য়েই ব'সে যেত আমাদের সঙ্গে বোহেমিয়ান নীড় মতন খেতে, করত লিলির সঙ্গে কত খেলা—কখনো বা রাতেও থেকে যেত লিলির ছোট্ট ঘরে। কিন্তু যাক সে-সব খুঁটিনাটির অধ্যায়। মোটের ওপর জেনে রাখো যে একটা গৃহ গ'ড়ে উঠেছিল আমাদের তিনজন বয়স্ক, একটি শিশু ও একটি প্রকাণ্ড টেরিয়ার কুকুরকে নিয়ে। গৃহ বাকে বলে ;—সে বোহেমিয়ান ক্লাবের নামগন্ধও আর ছিল না। শিল্পীর ডেরার সে ‘ভালেরীয়’ অগোছালো ভাবও গিয়েছিল উৎসাহ, খ্যাতি, অর্থাগম, অভিজ্ঞতা, নানা প্রবীণ শুভাখী ও রাশভারি বন্ধুবান্ধব সব জড়িয়ে একটা সম্মতিপন্ন মধ্যবিত্তের—বুজোরার—মুশুখল ঘরকন্না। তার মধ্যে আগেকার সে নিত্যানুতন হুঁরা, আড্ডা, তর্কাতর্কির রস ছিল না, কিন্তু একটা একটানা মিছতার অভাব ছিল না। ঠিক এই সময়েরই আমাদের ড্রামার হুঁরপাত।” ব'লে একটু ধেম্বে বললেন : “কিন্তু মুকিল হচ্ছে এড্রামাকে কথার সুটিয়ে তোলা—বিশেষ ক'রে সুখের কথায়।”

আনা বলল : “মুকিল কেন ?”

মসিরে বেনার বললেন : “কি জানো আনা ? জীবনে বা অসংখ্য

ছোটবড় ঘটনা ও নিতানুতন আকস্মিকতার মধ্যে দিয়ে তিলে তিলে গলে গলে গ'ড়ে ওঠে—ঘণ্টাবাদ্যের কণাচিরে তাকে ফুড়িরে তোলা বড় কঠিন। আর আমি তো কথাশিল্পীও নই যে—”

স্বপন বলল : “ভগিনী রেখে গল্পটাই বসুন। আপনি যে বাক্যাত্মকো কবী নান্নের কলঙ্ক নন তা আপনি বেশ জানেন।”

মসিয়ে বেনার একটু হেসে বললেন : “তোমরা ভাবছ আমি নিম্নতা করছি? সত্যি না। জীবনে এমন ঘটনা কি দেখনি যা দটে অতি সহজে, অথচ কেমন ক'রে ঘটল ব'লে বোঝানো যায়? কিন্তু তবু বলি : যেমন পারি, উপায় কি?”

ব'লে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ধূমপানে মনোনিবেশ করলেন। পরে বললেন : “তোমাদের বলেছি মনে আছে বোধ হয় যে ভালেবের মৃত্যুর পর থেকে জুলিয়ার প্রতি সারার সে-আগেকার বিমূখতা প্রায় উইঁ গিয়েছিল। এই ‘প্রায়’ কথাটা এখানে বিশেষ ক'রে মনে রাখা সহকারী। কারণ এ-ধরনের বিমূখতা ‘সম্পূর্ণ’ উবে কখনই যায় না—কেবল অবস্থা বিশেষে কমে বাড়ে মাত্র।”

সন্ধ্যা বলল : “কেন?”

—“কারণ, ঐ যে বলছিলাম না, সব রকম বিমূখতাকে জয় করা যায়, যায় না কেবল বর্ণগত বাঙ্গগত বিমূখতাকে থাকে বলে জাতপনা বা ‘কাস্ট’।”

—“কিন্তু যুগোশে তো ঠিক এ-ধরনের ‘জাতপনা’ নেই, তনি?”

মসিয়ে বেনার ব্যঙ্গ হেসে বললেন : “ও-কথা তোমাদের বুঝিয়েছে কে? তোমাদের শুধু ইংরেজ ত!”

—“হানে এখানেও জাত-টাত আছে বলতে চাচ্ছেন?”

—“না থেকে পারে? ভেদজ্ঞান যে মানুষের মনের পরতে পরতে

পাখা সন্ধ্যা ! তোমাদের জাতিভেদের সঙ্গে আমাদের সত্যিকার তফাৎ যদি কিছু থাকে সেটা বাহ্য নিয়ে, ভেতরটা নিয়ে না। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে এ-ভেদটা প্রকাশ করার রীতি পাওয়া-ছোয়ার মধ্যে দিয়ে নিজেকে ফলাও করে ধরে না—একটু স্বল্পভাবে অবস্থান করে এইমাত্র। তাই ব'লে আমাদের মধ্যে জাতিভেদই নেই ? বাপ রে ! কোনদিন কখন আমাদের দেশে গতাহুগতিকতাও নেই !”

স্বপন বলল : “এ-জাতিভেদের ফল কী ধরণের হ'ল বলছিলেন ?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “বলতে যাচ্ছিলাম যে, জুলিয়া নাচে গায় তার এ-অপরাধও হয়তো সারা ক্ষমা করতে পারত যদি তার জন্মটা ঠিক মতন হ'ত।”

আনা বলল : “মানে ?”

বুদ্ধ বললেন : “অর্থাৎ জুলিয়ার বাবা ছিলেন petit bourgeois—বাদের স্থান মধ্যবিত্তের একটু নিচে এ-কথা সারা তার জীবনের শেষ দিন অবধিও বোধ হয় ভুলতে পারেনি। সে বুঝত অবশ্য যে এ-লিঙ্গ-ভেদটা তার কুশী, কাজেই সাধ্যমত একে খুব ডেকেচুকেই চলত। কিন্তু তার তার নানান ছোটখাট কথায় আকারে-ইচ্ছিতে অতর্কিতে বেরিয়ে পড়ত যে, জুলিয়া যে কাব্যের নর্তকী হ'তে পারল তাও মূলতঃ ঐ বংশকোলীভেদই জন্মাবে।”

স্বপন সন্নিহিত সুরে বলল : “সত্যিই কি বংশকোলীভেদ বলতে সারা কুলগোরব বুঝত বলতে চান ?”

বুদ্ধ বললেন : “ভাবতে প্রথমে যে আমারও একটু বাধেনি, বলি না। কিন্তু তার কারণ সে সময়ে সংসারটাকে তত কাছ থেকে দেখিনি। পরে দেখেছি যে মানুষের প্রতি-মানুষের বিমুখতার মূল কত সময়েই লুকিয়ে থাকে এই জাতিগত অতিমানের অবচেতন-রাজ্যেই।”

আনা বলল : “অবচেতন কেন ?”

বুদ্ধ বললেন : “চেতন মনে এ-স্বীকৃতি সহজে টাই পায় না বলে।  
যে না কেন, জুলিয়া যে আলম্জোকে তার দেহ দান করেছিল একজ্ঞেও  
সারা দায়ী করত প্রধানত তার ঐ বাশকোলীস্তের অভাবকে, যদিও  
একথা সে মুখে স্বীকার করত না।”

সন্ধ্যা বলে বলল : “তবে এটা আপনার সিদ্ধান্ত ক’রে নিতেন  
কি আপনারা ঐ অজ্ঞাত বিরোধমূলক অস্বীকৃতি দিয়ে ? বাবা বাবা :—  
ওয়র্ডসওয়ার্থ ব্যঙ্গ করেছিলেন বৈজ্ঞানিকদের—তারা মাংস কবরের ওপরে  
botanize করে বলে। আপনারা তাদেরও হার মানাতে চান বেশি—  
হরম মাতৃবের মনটাকে তন্ন তন্ন ক’রে বিশ্লেষণ করতে মনস্তাত্ত্বিক  
বাবজেন্সগারে পাঠিয়ে।”

বুদ্ধ মুহূর্তে বলে বললেন : “কথাটা ঠেল দিয়ে বলেছি ভালো বটে শেরি,  
কিন্তু যেখানে মাতৃবের আচরণ সরল চেতনার কোঠারই আশ্রয় সেখানে  
এ-ধরণের অস্বীকৃতি দূরবীক্ষণ বিশ্লেষণ বাবজেন্সের আলোর কাছে হার না  
গেতে মাতৃব করে কি বলে।” বলে পছন্দীর চ’য়ে বললেন : “কিন্তু এটা  
আমার নিছক অনুমানই নয় : সারা প্রথম প্রথম যখন খুব বিরক্ত হ’ত  
তখন জুলিয়ার আলন সহজে কটাক্ষ ক’রে বসতই—কেননা একে ভালের  
আলন মনে না করলেও সে না ক’রেই পারত না। আর এ কটাক্ষ ছিল  
মূলতঃ জুলিয়ার বাণেশের পরেই। অর্থাৎ জুলিয়া অতি ভয় ঘরে জন্মালে  
সাক্ষাৎ ভালেরকে পাওয়ার পরে আলম্জোর ছায়া মাড়তেও পারত না  
—এই ইঙ্গিত আর কি।”

বশম বলল : “এ-ধরণের অনুমান কটাক্ষ করত সারা ? তা হ’লে  
ভালেরের ভাব তার মনের ওপর কতটুকু কাজ করেছিল বলুন ?”

বুদ্ধ বললেন : “বলেছিলাম না, এ হ’ল ধানিকটা অবচেতনের

রাজ্য ? ভালেবের কিরণ চুইয়ে চুইয়ে সে-রাজ্যে পৌছবার যথেষ্ট সময়ই যে পায়নি। তা ছাড়া যুরোপীয় বূর্জোয়াদের মনটির সবিশেষ পরিচয় তো জানানো মনামি। অপরকে তারা অগ্নানবদনে বিচার করে যে কতরকম হুম্ম জাতিভেদের কলঙ্ক চাপিয়ে !” বলে ঈষৎ ব্যঙ্গের সুর ধরলেন : “আর মজা এই যে, জাতিভেদের প্রতিষ্ঠা এই সভ্যতার অভিমানের ‘পরে’ হ’লেও বেচারা আমরা বুঝি না যে নিজেদের এই যে রেসপেক্টাবিলিটি প্রসাদলোভ, এই যে ঠাট বজায় রাখার হুর্দম চেষ্টা, এই যে সুশীলতার কাঠামোর ‘পরে’ এতটুকু আঘাত পড়লেও ক্ষেপে-ওঠা—এ বিষয়ে আমরা এখনো ভেতরে ভেতরে সেই আদিম বর্করই আছি। তফাৎ এই যে, আদিম বর্কর মনোয়া হ’য়ে ওঠে সুখ-স্বাক্ষক্যের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কাঠামোকে অক্ষত রাখবার জঙ্কে, আর আমরা ক্ষেপি—তার চেয়ে একটু হুম্ম কাঠামোকে আইন অমুশাসন বিধিনিষেধ দণ্ড প্রভৃতি নিয়ে ‘অটুট রাখতে।’” বলে একটু খেমে স্বপনের পানে তাকিয়ে বললেন : “এ আমার একটুও বাড়িয়ে বলা নয় মেন। এটা আরও বেশি রোকা-মায় ঐ ‘উপজাতি’-বাদের মনস্তত্ত্বের কোঠায় এলে—যদিও এ-কথায় সন্দ্বিগ্ন হয়তো ফের আপত্তি করবে আমি বিশ্লেষণ ব্যবচ্ছেদের অতীবীক্ষণ লাগাচ্ছি বলে।”

সন্দ্বিগ্ন বলল : “না-হয় তা করব না উপস্থিত। কিন্তু উপজাতিবাদের মনস্তত্ত্ব বলতে কী বুঝছেন আপনি—একটু খুলে বলবেন ?”

বুদ্ধ চিন্তিতস্বরে বললেন : “কি জানো ? জাতিভেদের কল্যাণে লর্ডের মেয়ে দিনমজুরের মেয়েকে হতভাক্তা করতে পারে প্রকান্তেই ; কিন্তু উপজাতির ওততা জোর নেই, তাই ডিউকের মেয়ে লর্ডের মেয়ের সঙ্গে বনিবনাও ক’রে চলতে বাধ্য অথচ পারেও না—বুঝলে কি ?”

সন্দ্বিগ্ন বলল : “আপনি বলতে চাইছেন বোধ হয় এই কথাটা যে

জাতে জাতে তকাং যেখানে বেশি ছুল দৃষ্টমান—সেখানে গা-বেঁধাবেনি করতে বাধলেও সমাজে দোষ দেয় না, কিন্তু ডিউক ও লর্ডের মধ্যে যে-তকাং সেটা হৃদয়তর হওয়ার দরুণ উপরওয়াল দূরে-দূরে থাকতে চাইলে শোকে দোষ দেয়—অথচ তবু সে কিছুতেই নিজেকে খাটো করতে পারে না নিম্নতর শ্রেণীর সঙ্গে মিশে।”

বুদ্ধ খুসি হ’য়ে বললেন : “তোমার সঙ্গে কথা ক’য়ে খুব আছে শেরি—এ আমি নতুনমুখে মেনে নেব।”

সন্ধ্যা প্রীতহৃদে হেসে বলল : “ধন্যবাদ মসিয়ে। দেখেও খুব হয় যে, সময়ে সময়ে পুরুষরাও মেয়েদের কথায় খুব পায়।” সবাই শুতে হেসে।

হাসি থামলে স্বপন বলে : “এ বে আমাদের মধ্যেও আছে মসিয়ে, তাই খানিকটা বুঝি বৈ কি। স্বাক্ষর কাগজ হ’ল মোটা বিভাগ—তাদের মধ্যে রেবারেখি তো আছেই—কিন্তু ওদেরও প্রত্যেকের নিজের মতো আছে। যে আবার কত রকম ভাগ পংক্তি চুলচেরা সীমাবদ্ধ—উঃ! অথচ সে-সব রেখা অতি হৃদয় হওয়া সত্ত্বেও অতি প্রবল—কেমনা তারই ত্রুটিতে বিবাহ তো বিবাহ, অনেককালে জলাচারও নেই—এইসব বিচ্ছিন্ন উপজাতিকদের মধ্যে। কিন্তু এটা হয়তো আপনারা বুঝবেন না হাড়ে হাড়ে যেমন আমরা বুঝি—যেহেতু এত কড়াকড়ি আপনাদের অংশায়নেও নেই।”

বুদ্ধ হেসে বললেন : “তুল মনামি, তুল। সবই আছে, নেই যেটা সেটা বলছিলাম না, বাহ—একবারে বাহ। অর্থাৎ এই বাটীরে ছুআর্গ। কিন্তু অন্তরে আছে কারেম হ’য়ে ঠিক অম্মনি-ধারাই স্মৃ-অস্মৃ-বিচার। তাই বখন বেশি তোমাদের জাতিভেদের জন্তে তোমাদের কেউ দোষ দিয়ে সাব্যস্ত করতে চায় যে, যুরোপীয়েরা এ-বিষয়ে কত উদার



—তখন আমি মনে মনে হো হো ক'রেই হাসি। কারণ এ জলাচাৰ বা হোওয়া-হোওয়িতে কতটুকু যায় আসে বলা দেখি যদি ভেতরে থাকে উচুর অবজা নিচুর প্রতি ও নিচুর সমীহ উচুর প্রতি ?”

আনা বলল : “জুলিয়াও বুঝি সারাকে এমনি ধরণের সমীহ করত—?”

বুদ্ধ বললেন : “হাঁ। আর সেটা সংসারের হালচাল যখন বুঝতাম না তখন, প্রথম প্রথম আমার সত্যিই আশ্চর্য লাগত। কেননা সাধারণ চেয়ে সে নানাদিকেই ছিল শ্রেষ্ঠ; রূপে, গুণে, আচরণের চটকে, বুদ্ধি লাভাণ্যে—এক কথায় তার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণী শক্তিতে। কিন্তু তবু মনে মনে তার ছিল একটা অনপন্থে ঈর্ষাত্ত সন্দেহের ভাব সারাক্ষণ প্রতি—যাকে ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স বলতে পারছি না শুধু সন্দ্বিগ্ন ভয়ে, পাছে ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বাবছেদের পারিভাষিকেও রেগে আঙন হ'য়ে ওঠে।”

সন্ধ্যা নরম হ'য়ে বলল : “রাগ করতাম না যদি না আপনার এ বাবছেদের বিশ্লেষণ নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করতেন, যদি সাধারণের সব সন্দ্বিগ্নকেই এই নিষ্করণ বিচারের তীব্র আলোয় তেড়াবৈকা ক'রে না দেখতেন।”

বুদ্ধ তার একটি হাতের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বললেন : “একেই আমরা বলি সেক্টিয়েন্টালিটি শেরি, রাগ কোরো না। কেননা এ আসলে নিষ্করণতা-বিরাগ নয়, এ হ'ল ভয়।”

সন্ধ্যা বলল : “ভয় ?”

বুদ্ধ বললেন : “সারার মধ্যে এ-ভয় ছিল বুঝি বেশি বলেই আমি জানি এর স্বরূপ। নইলে এত জোর ক'রে বলতাম না একথা।”

সন্ধ্যা ক্রভদে বলল : “আপনারা জোর ক’রে বললেই বুঝি মেয়ে নিতে হবে অবলাদের ?”

বুদ্ধ কোমল কর্তে বললেন : “রাগ করো কেন শেরি ?”

সন্ধ্যা তেমনি উষ্ণ সুরেই বলল : “করব না কেন তাই বলুন আপনি আগে। যা অসুভবের বস্তু তাকে বলেন আপনারা সেটিমেটালিটি, কেননা নিরাবেগ তৌল-বাটখায় তাদের ওজন করা যায় না। শুণু হাই না, আপনারা সব পবিত্র স্মৃতির স্মৃৎকেই দাড় করাবেন আপনারদের বৈজ্ঞানিক কাঠগড়ায় আসামীর মতন ক’রে। কী ? না, তর তর ক’রে বে-আক্ৰ ক’রে তাদের দেখতে হবে—যেন তারা সাপপেট। বিচারের আলোর কোকাস—”

বুদ্ধ তার হাতের পরে হাত বুলাতে বুলাতে সুর নরম ক’রে বললেন : “আমি মানি শেরি, যে বিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি করছে—বা বৈজ্ঞানিক সন্ধানপদ্ধতির অধিগমাই নয় তাকেও ঠা এক মাপজোলের পদ্ধতি দিয়ে ওজন করতে গিয়ে—খাচ বলছ বে-আক্ৰ করতে চেয়ে। আক্ৰ জিনিষটার মধ্যে যে একটা ঈশ্বরতা আছে এও আমি মানি—কোন শিরী না মানবে বলা ? কিন্তু তবু একটু দীর্ঘ চিন্তে ভেবে দেখলে কি নতন হয় না যে, যদি কোনো সম্বন্ধ সত্যিই পবিত্র বা স্মৃতির হয় তবে তা এ-ধরণের সমা-সকট ভীত আক্ৰর অপেক্ষা রাখতেই পারে না ?”

সন্ধ্যা উন্মার সুরে বলল : “ভয়ের প্রশ্ন এখানে আসেই না।”

বুদ্ধ আরও নরম সুরে বললেন : “দীর্ঘ শেরি, দীর্ঘে। আবেগ শিল্পহস্তিতে অনবদ্য, কিন্তু সত্য-নির্ধারণে আলোর নামে পরিবেষণ করে উন্মাপই। শাস্ত্রভাবে ভেবে বলা তো এ স্তর ছাড়া আর কী ? বা স্মৃতির বা পবিত্র বা সাঁজা তা কেন এমন শিরূপা তুলবে—বিচারের আলোর কোকাসে আসতে ?—তা ছাড়া এ আলো-অসংজ্ঞিতা কি এক

দিকে দেখতে গেলে অশ্রুকাই হুচনা করে না তোমারই ঐ হৃদয়ে.  
পবিত্রের প্রতি ?”

সন্ধ্যা ঈষৎ বিম্বিত হুঁরে বলল : “কেমন ক’রে ?”

মলিহা বেনার প্রায় নবনীৰ মতন নরম হুঁরে বললেন : “কেমন  
ক’রে নয়—তাই বলা তো। একটু নিশ্চুপ দৃষ্টিতে দেখলে চোখে পড়ে  
না কি যে, এ-আলো বিরাগের মূলে আছে একটা নিহিত আশঙ্কা পাছে  
আলো সব কাশ ক’রে দেয়—চোখে আকুল দিয়ে দেখিয়ে দে, যাকে হৃদয়  
বলি পবিত্র বলি তারও গায়ে লিপ্ত হ’য়ে আছে মানি ও অন্তর্নিহিত ? যে  
হৃদয়কে পবিত্রকে সত্যিই শ্রদ্ধা করবে তার মনোভাব কি হবে এমনি  
ধারা কুণ্ঠিত, না হবে নিঃশব্দ—বেপরোয়া।”

সন্ধ্যা চুপ ক’রে ভাবতে লাগল।

বুদ্ধ বলে চললেন : “তা ছাড়া শেরি, হৃদয়কে পবিত্রকে হুঁই ও  
পাণের অগ্নিপত্রীকায় উত্তীর্ণ হ’য়েই না মজ্জা, পুণ্য, শুভ্রের চিহ্ন  
করতে হবে। যে সত্যি ঘরেই বদ্ধ রইল আজীবন তার  
কতটুকু বলা তো ?” বলে বুদ্ধ সন্ধ্যার মুখের দিকে একটু চুপ ক’রে  
উদ্ভয়ের প্রতীক্ষায় রইলেন। কিন্তু তাকে তেমনি চিন্তামগ্ন দেখে কে  
বললেন : “এ-ও আমার প্রধান যুক্তি নয় আলোর স্বপক্ষে, বিচারের  
স্বপক্ষে। আমার প্রধান যুক্তি হ’ল এই যে, এটা একটা স্বতঃসিদ্ধেরই  
কাছাকাছি যে সত্যের সন্ধান স্বয়ংসিদ্ধ—সব স্থলেই, সব ক্ষেত্রেই।”

সন্ধ্যা বলল : “মানে ?”

বুদ্ধ বললেন : “মানে, শাস্তি সৌন্দর্য্য সুখ সুবিধা কোনো কিছুকেই  
বজ্রায় রাখতে চেয়ে সভ্যসমাজীকে অর্জুচক্র দেওয়া চলবে না—অর্থাৎ  
যদি সত্যিকার সভ্যতা কাম্য হয়। কারণ অন্তত এ-যুগের সব চেয়ে বড়  
বাহীই বোধ হয় এই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি জিনিষকেই দেখবার বোধবার

জানবার অধিকার—সত্য মানুষের অধিকার : তা দূরবীক্ষণ দিয়েই হোক বা অত্মবীক্ষণ দিয়েই হোক, এক্স-রে দিয়েই হোক বা তুলারঙ দিয়েই হোক, সহজ বোধ দিয়েই হোক বা স্ট্যাটিসটিকসই দিয়ে হোক। হুম্মর পথিকের মল যদি এ-আলো সইতে না পারে তবে তাদের সিংহাসনকে কোনো উচ্ছ্বাসী বংশদণ্ডেই খাড়া রাখতে পারবে না—কাব্যের সুভ্রুক্কনেও না, গোড়ার বহুগজ্জনেও না। কেননা, ঐ যে বললাম, সব রকম আলোই তার নিজের এলাকায় স্বয়ংসিদ্ধ—তাকে নাকচ করার না আছে মানুষের ‘অধিকার, না শক্তি।’ বলতে বলতে তাঁর কোমল হৃদয়ের ফুলে ফুটে ওঠে কের তাঁর অভ্যন্তর ধারালো হাসি। “এ যে দুগধর্ম শেরি, করবে কি ? এ-দুগে আড়ালের আওতায় থেকে বড়র দাবি করা চলবে না আর।”

আনা বলল : “এ-কথাটা আপনার খুবই সত্যি মসিয়ে। সর্কবিকল্পী কুরশার আনাতোল ক্রাঁস বোধ হয় এইভাবেই এত ব্যস্ত করতেন ঘোমটাকে, বলতেন যে মানুষ হুম্মরীকে চার ঘোমটা পরাতে—ঘোমটা গুললেই তার খ্যাতির খতম হবে বলে।”

মসিয়ে বেনার উৎসাহিত হ’য়ে বললেন : “এই—এই, এই কথাই তো আমিও বলি আনা, আত্মের বিপক্ষে। এ যে দুগধর্ম, উপায় কি ? এ-দুগের মানুষ যে চাইবেই না এমন অপল্কা হুম্মরীকে বার সৌন্দর্য্য রূপধন হয় অবগুণ্ঠনেরই প্রসাদে। সে মালা দেবে কেবল তাকেই যে ঘোমটা গুললেও থাকবে মোহিনী।”

বপন বলল : “কিন্তু সব সৌন্দর্য্যই কি অমিশ্র আলোয় ফোটে মসিয়ে ? আনিকটা ছায়ারও অপেক্ষা রাখে না কি ? আনাতোল ক্রাঁস নিছক ব্যঙ্গই করেন কি ঘোমটাকে, তার স্বপক্ষেও বলেছেন যে, সৌন্দর্য্য জিনিষটার অনেকখানিই নষ্ট করে কল্পনা। আর কল্পনা মানুষের লজ্জা নয়—গৌরবই।”

সন্ধ্যা উৎসাহিত হ'য়ে বলল : “ধনুবার সিসি, আমিও এই কথাটাই বলতে এতক্ষণ বৃষ্টি হাতড়াচ্ছিলাম যেন।” ব'লে মসিৎ বেনারের দিকে চাইল বিজয়িনীর মতন।

মসিৎ বেনার চিন্তাবিষ্ট স্বরে বললেন : “তোমাদের কল্পনা-বিলাসকে আমি নামজ্বর করতে চাইনি। সৌন্দর্যের রাজ্যে তার একটা স্থান আছে এ-ও মানি। কিন্তু কি জানো? সৌন্দর্য মাছুষের হাতে এসেছে আটের রাজ্যে—যে-রাজ্যে, সবাই জানে, মিথ্যারও স্থান আছে। তাই অসুন্দরকে কুৎসিতকেও খানিকটা শ্রী দেওয়া যায় বৈ কি করুণায় যাওয়াতে। লোলচন্দ্রা কুজাকে দেখতে সুন্দর লাগে না, কিন্তু আকর্ষণে সুন্দর লাগে বৈ কি খানিকটা—যদিও তাই ব'লে সব বিষয়কে সমান সুন্দর করা যায় না একে—বিষয়-বস্তুর গুণে সৌন্দর্যেরও তারতম্য হবেই হবে। কিন্তু সে তর্ক থাক। আমি এক্ষেত্রে ঠিক আটের প্রসঙ্গ টেনে আনতে চাইনি—এ-কথা বলেছিলাম আমি জীবনের প্রসঙ্গে—কি হচ্ছে ঘটছে তারই বিচার বিবেচনা করতে। আমি চেয়েছিলাম বলাতে যে, বাস্তব জীবনে আলো-সম্পাতের ফলে সুন্দর অসুন্দরতার লাজ কৈ লোকসান নেই। আমার বক্তব্য ছিল : গত্য-অসুন্দরতার রাজ্যে আলো বিবেচনা ব্যবচ্ছেদ এরা খতিয়ে বন্ধুই হ'য়ে পাড়ায়, শত্রু না, যদি না জোশো উজ্জ্বল ও কাঁচা আবেগ পথ না আগলায়।”

সন্ধ্যা বলল : “ঠিক কী বলতে চাইছেন আপনি?”

মসিৎ বেনার পাইপ টানতে টানতে খানিকক্ষণ ভাবলেন, পরে বললেন : “কি বকম জানো? একটা দৃষ্টান্ত দিলে হয়তো কথাটা পরিষ্কার হবে একটু। ধরো, জুলিয়া যে ভালের ও আলনুজো দুজনকেই একসাথে ভালোবাসত এ-কথা সে নিজেই স্বীকার করত। আমরাও বৃষ্টি দেখাটাম কেমন ক'রে এটা খুবই স্বাভাবিক হ'তে পারে। কিন্তু

যখন এটা হয়েছিল কি না বা হ'তে পারে কি না বিচার করছি তখন  
আবেগ বা ধারণার সংস্কার হ'ল অবাস্তব, বটে তো? কিন্তু সারা একথা  
বুঝত না। সে সত্যসন্ধার ক্ষেত্রে যুক্তির সঙ্গে তার মেয়েলি আবেগ  
ও উচিতবোধকে এমন জড়িয়ে ফেলত যে আমাদের হ'তেই হ'ত নিরুত্তর।”

সন্ধ্যা বলল : “নিরুত্তর কেন?”

বুদ্ধ বললেন : “যুক্তির ক্ষেত্রে বিচারের ক্ষেত্রেও যে সে উচ্ছ্বাসিত  
হ'য়ে উঠে বলত যে এ-সব বিচারই হ'ল ভালগার, যেহেতু নারীত্ব  
ভালোবাসা হেন, তার অল্পকৃতি তেন, তার দেবতা আলোর পায়, তার  
অকৃত্যামী অহুবীক্ষণ বিচার বিশ্লেষণের নাগালের দার—আরও এমন-  
ধাণ কত ভয়কাতুরে কথা—ডগুর শূন্যর তেজস্বী-চটে বলা আর কি।”

সন্ধ্যা তীব্র স্বরে বলল : “কক্ষনো—”

মসিয়ে বেনার স্বর একটু ধাদে নানিয়ে হেসে বললেন : “কষ্ট না  
হ'লে ফের একটু শাস্তভাবে ভেবে বলা তো সন্ধ্যা, যে সোনা যখন নিখাধ  
হয় তখন কি সে অ্যাসিডকে ভয় করে?—না, বলে যে, আলো  
তীব্র হ'লেই সে ভালগার হ'য়ে ওঠে—পরীক্ষার শিকার তখন হ'লেই  
সে নিকলীয় হ'য়ে ওঠে? বলা তো, এ-সব যুক্তি যে দেখ সে কি  
সোনার স্বর্ণাংশটুকু, না তার ভীতু ধানের ভাগটুকুই? আসলে এরাও  
বাচতে চায় ব'লেই কি নানান উচ্ছ্বাসী যুক্তির অঙ্গরালে নিজেকে লুকিয়ে  
অ্যাসিডকে ছুটে দুর্জয় ব'লে প্রচার করে না? দেখানে বাইরে আকাশলন  
বেশি সেখানেই কেনো ভেতরে ভয় আছে বাসা বেঁধে। আর যেহেতু  
সব দেশেই মেয়েদের মধ্যে এই ভয়টা বড় বেশি সেহেতু, তারাই সব আগে  
কথা ওঠে—যেমন সারা উঠত—তাদের প্রেমের প্রকৃতি সম্বন্ধে এতটুকুও  
আলোচনা করতে গেলে। যুক্তিয়ে-ফিরিয়ে তারা বলেই বলে যে, পবিত্রকে  
বুঝতে গেলেই সে হ'য়ে ওঠে অপবিত্র। হালির কথা নয় এটা?”

সন্ধ্যা উদীপ্ত হুঁরে বলল : “মোটাই না। বিচার অহুসন্ধান এ সঙ্কে আমরা, মেয়েরাও, অস্বীকার করি না। আমরাও জানি সভ্যতার এদের দাম কত। কিন্তু তাই বলে যে বা ইচ্ছে বলবে আমাদের প্রেম অহুভূতি সঙ্কে আর আমরা মুখ বুজে স’রে থাকব? বা রে বুদ্ধি! মেনে নিতেই হবে যে, বিচারের অ্যাসিডকে ভয় করার দরুণই যেসকল আক্রমণ সৃষ্টি? মাকু করবেন মসিয়ে, পুরুষরা এসব ব্যাপারকে যে চোখে দেখে তাই যে চরম দেখা এটা এখনই প্রমাণ হয়নি। মেয়েদের কথা হ’ল এই যে, যা স্কলর বা শোভন, বা পেলব বা সুকুমার তা দরদের স্বীকৃতির আনুকূল্যের অপেক্ষা রাখে। অতীত শুধু বিচারের দৃষ্টিতে তাদের বোকা যায় না কখনই। তা ছাড়া—” বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর আরও দীপ্ত হ’য়ে ওঠে। বলে : “তা ছাড়া অহুভব যেখানেই বিকাশ পেয়েছে সেখানেই যে সে হৃদয়ের কোঠায় পড়ে, আর হৃদয়ের এক্টিয়ার আছেই আছে—তুল ব্যবচ্ছেদের আলোতে আপত্তি করার।”

মসিয়ে বেনার তার হাতের ‘পরে হাত বুলোতে বুলোতে হুঁর আরও এক পর্দা নামিয়ে বললেন : “অত উত্তেজিত হোয়ো না শেফি। আমি এ কথা কখনই বলি না যে নির্জলা বেদরদী বিচারের আলোর কোমল অহুভবের অগত্যা ঠিক মতন পরিপ্রেক্ষিতে দেখা সম্ভব। আমি এও মানি যে, হৃদয় অহুভবের একটা আভিজাত্য আছেই বা আর যাকেই বরদাশ্ত করতে পারুক না কেন, ভালগারিতিকে সইতেই পারে না। এমন কি, এও আমি স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি যে, বিচারের শাবল নিয়ে খুঁড়তে খুঁড়তে সভ্য স্কলর বা মেহ প্রীতি ভালোবাসার পরম মর্শ্বহলে পৌছন যায় না। কিন্তু অসত্য ভালোবাসা—বা প্রতি ভালোবাসার মধ্যে মেকিটুকুকে তো সে বিধতে পারে। বাঁটি প্রেম বাঁটি অহুভবের এত ভয়ের কারণ তো নেইই বরং আনন্দেরই কারণ আছে—নিষ্করণ আলো

নামের ঝুটো থেকে সাঁজার তরফে কোন্‌খানে স্পষ্ট ধরা পড়বে বলে।  
আর এ প্রভেদটুকু স্পষ্ট দেখতে পাওয়ার প্রয়োজন আছেই আছে।  
জন্মের জন্মের বলেই যে সে চায় না—অহংকারের পাশাপাশি থাকতে।  
কাজেই বিচারের আলো তার অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে না—  
পূর্ণোৎসাহেই স্বীকার করে। তা ছাড়া জন্মকে যে সত্যি চায় সে কি  
দাঁসি না হ'য়ে পারে শেরি—যখন আপসা আলোর মিথ্যা পরিশ্রেক্ষিত্তে  
নাকে দেখায় মোলায়েম, তীর আলো এসে দেখিয়ে দেয় যে আসলে  
কত কুস্মী, কত বজুর? কি জানো? বিচারের দৃষ্টিকে তার যথাযথ  
দুলা দিলেই সব গোল চুকে যায়। সারা এটো বুদ্ধি না—শুধু সাদা  
কেন—প্রায়ই মেয়েবা বোকে না এই সাদা কথাটা। তাই চায় না সে  
তাদের প্রেমকে কেউ বিশ্লেষণ করুক। কিন্তু একে সন্তুষ্টিমতি বলে না,  
বলে obscurantism—আপসা-বিলাস।”

অগ্নি বলল : “কিন্তু বিশ্লেষণ যদি স্বভাব বৈদগ্ধ্য হয়—যেমন অনেক  
কেন্দ্রেই হ'য়ে থাকে—তবে তারা চাইবেই বা কেন নিষ্করণ আলো-  
বিলাস?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “চাওয়া কঠিন মনানি, জানি। কিন্তু  
সত্য যদি কামা হয়, মেকি জাল ভেলকে বাদ দেওয়া যদি সভ্যতার একটা  
বাধি হয় তবে চাওয়া উচিত নয় কি?”

আনা বলল : “তবে যে বললেন অভিজ্ঞতা—”

মসিয়ে বেনার বললেন : “সত্যিকার অভিজ্ঞতা কাকে বলে আনা?  
অনভিজ্ঞতার সঙ্গে ঘর করতে চায় তাকে, না যে বলে আমার খাতি  
থাকার ক্ষেত্রেই চাই আমার পূর্ব আত্মপরিচয়—চাই নয় সত্য—তাকে?  
অভিজ্ঞতার স্বপ্ন ভয় নয়—তেজস্বিতা। বটে তো? তা হ'লে বলে  
বেদি, তেজস্বী কে? যে বলে যে মহৎ কিছু কোনো তেজস্বীকেই



অমল্য হয় না সে? না যে বলে, আমার মহত্বের বাজার-দরকে যাচাই করে কমিয়ে দিয়ো না—সে?”

ব'লে একটু ঝঁকা হেসে বললেন : “আনা, যেখানে অভিজ্ঞতা হয় নকল—যেমন হঠাৎ নবাবদের ক্ষেত্রে—parvenu-দের ক্ষেত্রে—সেখানেই তার সর্বদাই ভয় করে পাছে ধরা পড়ে ব'লে। যে সত্যি অভিজ্ঞতা সে স্বভাব-বেশেরায়া।”

আনা বলল : “কণ্ঠাটা এখনো ঠিক পরিষ্কার হ'ল না কিছু—”

বুদ্ধ ঈশ্বর অসহিবু সুরে বললেন : “আনা, সংসারে কুটো ওঁ মা'জী এতই গায়ে গায়ে জড়িয়ে রয়েছে যে এসব কথা খুব স্পষ্ট করে বোঝানো মুকিল, যদিও অশুদ্ধ দিয়ে বুঝতে কষ্ট হয় না। তবু উদাহরণ দিয়ে বলি।—অনেকে বলেন না যে ব্রাহ্মকেমি, ধর্মকে নিয়ে হাসি, এসব দারুণ খারাপ বস্তু। ইহুদীদের দেবতারা এতে নাকি বিষম চটতেন ও হাসিওয়ালাদের অনন্ত নরকে কুটন্ত তেলে অষ্টপ্রহর ভাজতেন—শাস্তি দিতে চেয়ে। কিন্তু ভগবানেরও ক্রমবিকাশ হয় মাহুকেরই মতন। আর হয় বাক্যেই সত্যি ধার্মিক ক্রমে ধর্মকে নিয়ে প্রাণ খুলে হাসতেও শিখল। একথা মানে কি না?”

স্বপ্নন বলল : “মানি। যদিও ধার্মিক আমি নিজেকে নই।”

বুদ্ধ বললেন : “নাই বা হ'লে। সত্যি ধার্মিক অস্বস্ত তোমাদের দেশে এখনো তো দেখা যায় ছু-চারজন? তাঁরা ভগবানকে নিয়েও হাসতে ভয় পান না এ আমি পড়েছি। সত্য নয় কি?”

স্বপ্নন বলল : “সত্য।”

বুদ্ধ বললেন : “তা হ'লেই দেখ—সত্যি ধর্ম ব'লে যদি কিছু থাকে, তবে সে ব্যক্তকে ভয় পাবে না—বা ভগবান যদি ধরো থাকেনই তা হ'লে 'ঐ গো তাঁর অবখ্যাক হ'ল' ব'লে ব্রাহ্মসঙ্ঘকে দামাদা বাজিয়ে দিক

করতে বা পুড়িয়ে মারতে ছুটেবে না। সে জানে সব হাসি বা ব্যঙ্গের নিশানা হ'ল মিথ্যা, আর সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত—সত্যের অটল ভিত্তিতে। ষিক ভেমনি, যেখানে নারীর প্রেম হয় সত্য সেখানে সে একটুও ভরাবে না কোনো ভীষণ আলো তার ওপরে সংহত করে ধরলে। কেননা সত্য তার সঙ্গেই মিতালি করুক না কেন ভয়ের সঙ্গে তার কণ্ঠবদল যে হ'তেই পারে না—এ-সমক্ষে, পাদ্রীদের মত বাই হোক না কেন, আশা করি আমাদের মধ্যে ছ' মত নেই ?”

সকল স্বর একটু নামিয়ে বলল : “না নেই। কিন্তু সারা যে জগিয়ার দুখুখী ভালোবাসার আলোচনায় ভয় পেত এটাই বা হ'তে নিচ্ছেন কেন ? তার এটা ভালো লাগতো না এ-ও তো হ'তে পারে।”

মসিয়ে বেনার বললেন : “কিন্তু যা আমার ভালো লাগে না তাই যে আমার বা অস্বস্তির এ-ও তো যুক্তি নয় শেরি। নানি, সত্য বা স্নহেরর আপকৃষ্টি নিক্কারণ করার মতন কঠিন কাজ সংসারে কমই আছে। কিন্তু এটা কঠিন ব'লেই তো চাই এ-বিষয়ে প্রতি সত্য-অসত্যকানীকে সম্মান করা, নয় কি ? না, বলবে : এ-সব ক্ষেত্রে গোপনতা বা ভয়ট হ'ল মজুই লজ্জা, কাজেই পদে পদে আতঙ্ক—না না একথা বোলে না, অমুক ব্যবচ্ছেদ বড় ভীষণ, অমুক বিশ্লেষণে আমার সংস্কারে বাধা লাগবে, এ ভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ করে উঠলে তাকেই সৌকুমার্য্য ব'লে সমীহ করতে হবে ?” বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠধরের মধ্যে লেখা দিল স্নিক্ততার আমেজ, তিনি বললেন হেসে : “কিন্তু মনে কোরো না সন্ধ্যা, যদি বয়সের প্রগল্ভতায় একটু বেশি ব'লে থাকি—”

সন্ধ্যা তাঁর একটি হাত নিজের দুহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে মস্তকুরে বলল : “না না সে কি কথা মসিয়ে, বরং আমিই তো করেছি বাচালতা—”

হঠাৎ ঘরের টেলিফোনটা উঠল বেজে।

## টেলিকোন

স্বপন তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরল।

—“কে ?”

—“মসিয়ে বেনার আছেন ?”

—“আছেন। আপনি কে ?”

—“তাকে বলবেন তাঁর চীন বন্ধু—”

—“চাং ?”

—“কে ? স্বপন ?”

—“পরেছ।”

—“ভালোই হয়েছে। আমি ইসাবেলা।”

—“মনে হচ্ছিল বটে স্বপ্ন শুনে। এত মিষ্ট কর্তৃক নইলে—”

—“তামাশা রাখো।”

—“তামাশা ?—”

—“শোনো ছুট্‌ মি রেখে। দয়া ক’রে মসিয়ে বেনারকে] এক্ষণি  
বলো—”

—“তাকে ডেকে দেব ?—এই ঘরেই আছেন।”

মসিয়ে বেনার উঠে গেলেন।

—“ইসা ?”

“কবে ?”

“রিজার্ভ হ’য়ে গেছে ?”

“কখন ছাড়বে ?”

“তবশ ?”

“চাং পারবে তো ?”

“ডাক্তারকে ধন্তবাদ । আনন্দের সংবাদ বৈকি ।”

“কাল ভোরেই রওনা হব তা হ’লে । কি বলা ?”

“হ্যাঁ দুটো প্রথম শ্রেণীর বার্থ—আমার ও আমার এক ঘরেষ্ট । কিছু একটি ছোট শিশুও ।”

“থরচের জন্তে আটকাবে না । সরকার হ’লে একটা নার্সও নিয়ে যেতে পারব ।”

“বহু ধন্তবাদ শেরি ।”

“নিশ্চয় । আমারই নামে । আমাদের কেবিনটা হোমারের কাছে হ’লেই ভালো হয় ।”

“হ’য়ে গেছে ? খস্টি মেয়ে ভূমি শেরি। এর মধ্যে এমন ষড়িৎকর্ম হ’লে কী ক’রে ?”

\*

“হা হা হা হা। চাং তা হ’লে সেরে সতিাই উঠেছে বলতে হবে—নইলে তোমাকে ও সেনকে জড়িয়ে এমন অশ্লীলতা করে ? সে না গিয়ে তোমার সঙ্গে এক ক্যাবিনে সেন—বেচারি সেন—ওঃ হোঃ হোঃ হোঃ—”

স্বপন লাল হ’য়ে ওঠে। বুদ্ধ বে কী ! একে অশ্লীলতা—হা ? ওপর টেলিফোনে ! রসিকতা সম্বন্ধে কি ছাই এতটুকু শুচিবাই আছে ? সন্ধ্যার সামনে—আনার সামনে—ভুলেই গেছেন বুদ্ধ ! *Gauloiserie* বটে।

## জুলিয়া ও সারা

স্বপন জোর ক’রে হেসে জিজ্ঞাসা করল : “কী ? আবার কী ?”

বুদ্ধ বললেন : “হা। ওরা চারটে বার্থ রিজার্ভ করেছে।”

\* \*

\*

সন্ধ্যা ক্ষুব্ধ হয়ে বলল : “কালই রওনা হ’তে কিছুতেই দেব না।”

বুদ্ধ কোমলকণ্ঠে বললেন : “করি কী শেরি ? সন্মলে তো তরুণী আহাজ ছাড়ছে। তাই কাল সন্ধ্যা অবধিও তরুণী সইবে না, তোদের ষড়িৎকর্মেই দিতে হবে শাড়ি।”

আনা শুকসুখে জিজ্ঞাসা করল : “কোথেকে ছাড়ছে আহাজ ?

বুদ্ধ অনমনস্ক ছিলেন, একখাটা কানেই ধারনি। একটু পরে

সন্ধ্যার দিকে ফিরে বললেন : “কাজেই গরুটা শেষ ক’রে নিতেই হ’ল আরও ভাড়াভাড়ি।”

সন্ধ্যা রাগ ক’রে বলল : “সে হবে না। কেন এত ভাড়াভাড়ি উধাও হওয়া? না হয় দুটো দিন মেরিই হ’ত।”

মসিয়ে বেনার তার হাতের প’রে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন : “বোঝো তো সবই সন্ধ্যা।”

সন্ধ্যা তাঁর চোখের পানে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিল। স্বপ্ন দুখ নিচু কঁধের থাকা সবেও অতকিতে চোখ তুলতেই আনার কাছে দূরীত্ব মিলমিল হ’ল। সন্ধ্যার চোখে সেটা প’ড়ে যায় ত্রিক সেই মুহূর্তেই! ..

\* \*

রুক কণ্ঠে প্রকল্ল স্বর টেনে এনে বললেন : “কি বলছিলেন যেন? -- ঐ বেশ সব গেছি ভুলে!”

সন্ধ্যা বলল : “সারা ও জুলিয়ার মধ্যে অকথিত বিমুখতা।”

রুক বললেন : “বিমুখতা বললে একটু তুল বলা হবে কিন্তু। দরমের অভাব বলাই বেশি সঙ্গত। আর তার মূল কারণ ছিল ঐ সাংঘর্ষিক কুণ্ডলগোরব ও তারই প্রতিক্রিয়ায় জুলিয়ার নিকট ক্ষোভ। এই ক্ষোভ-বলেই সে যেন আরও জোর ক’রেই আনার কাছে বলত যে, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মেয়েদের জন্তে নয়। বলত : শিল্পীর সার্থকতা নীড়-বাঁধায় নয়, কণ্ঠকারের বৈকুণ্ঠ হ’ল মাজুদের আনন্দলোক—এই রকম আরও কত কথাই যে!—আর এ-সব যে তার কাছে কথার কথা ছিল না, এ-সবের শিহনে যে তার উপলব্ধি, প্রভাবের সার ছিল তা-ও উঠত প্রত্যক্ষ হ’য়ে। অথচ তার মনের কোণে সারার সম্বন্ধে ঐ কী যে একটা কাঁটা তাকে

অল্পকণই বি'ধত—ঐ যাকে বলছিলাম শ্রেষ্ঠের প্রতি হীনের আক্রোশ—  
সে-আক্রোশের জন্মেই হ'ত তার নিজের 'পরে বিকার ও ফলে এ-আক্রোশও  
উঠত আরও ছরপনেয় হ'য়ে। যেখানে কারো প্রতি কোনো শ্রীটন  
বিতৃষ্ণা জাগে, সেখানে সে বিতৃষ্ণার কুশ্রীতার জন্মেই আবার বিতৃষ্ণা  
ওঠে বেড়ে, আর দায়ী করে মানুষ নিজেকে না—উপলক্ষ্যকে।”

স্বপন বলল : “কিন্তু এটা কি ঠিক ঐ ধরনেরই বিতৃষ্ণা? এ-ও  
তো হ'তে পারে যে, এর মূলে ছিল সোজামুজি ঈর্ষা—নারীর প্রতি নারীর  
প্রতিদ্বন্দ্বিতা?”

বুদ্ধ বললেন : “কিন্তু তা নয়, এই কথাটা বোকাবার জন্মেই তো  
আমার এতলত তনিতা হে। অবশ্য এ-রেশ্যারের মূল যে একমাত্র  
খোলাখুলি বংশগত বিমূখতা তা বলছি না। ব্যাপারটা তার চেয়ে বড়।  
কেমন জানো?—আঃ কী ক'রেই বা বোকাই ছাই।” ব'লে একটু ভেবে  
বললেন : “হয়েছে : মনে পড়ে স্পেনের সেই কুলোদ্বারা অযোবান  
সালঙ্কার প্রোটা রাজ-জালিকার কথা?”

স্বপন হেসে বলল : “দাঁর ছবি আঁকছিলেন আপনি কয়েকমাস  
আগে বেশ মোটা দক্ষিণার লোভে?”

বুদ্ধ হেসে বললেন : “আঃ—হাটে সে-ধনাঢ্য হাঁড়িটা ভেঙে না  
দিলেই কি চলছিল না হে?” সবাই ওঠে হেসে।

হাসি থামলে সন্ধ্যা বলল : “তার সম্বন্ধে কী বলতে যাচ্ছিলেন  
আপনি?”

বুদ্ধ বললেন : “যাচ্ছিলাম বলতে যে, বেশ জানি তো—সেই অতর্কী  
পঙ্কময়ীর চেয়ে সব বিষয়েই আমি শ্রেষ্ঠ? অথচ মজা দেখ : একজন  
দরিদ্র সমাজদার আমার কোনো ছবি দেখে আমাকে কোনো উপহাস  
পাঠালে আমি খতটা ফুটাই—ঐ অ-তর্কময়ী শুধু রাজ-জালিকা হওয়ার

দরুন তাঁর পাশে বসিয়ে খাওয়ালে তাঁর চেয়ে বেশি আপ্যায়িত বোধ করি নিজেই। আর এটা শুধু যে আমার কেন্দ্রেই খাটে তা নয়। এমন কোনো শিল্পীই নেই যিনি একজন সুন্দরী ফুলওয়ালিকে ছেড়ে কুংসিত রাণীর ছবি আঁকতে বেশী আগ্রহ বোধ না করেন।—Men may come and men may go, but snobs go on for ever—আর কি, বুঝলে না?”

সবাই নিশ্চুপ। স্বপন প্রথম শাহ্‌রুখ করল : “কি জানি কেন, ঈশ্বরপের জাতিভেদে সবচেয়ে কড়াটাকে এদিক দিলে এমন ক’রে ভেবে দেখিনি কখনো, ধনুবাদ মসিয়ে।”

সফা বলল : “সত্যি, বিশেষ ক’রে এতে আমাদের জাতিভেদের কলঙ্কের বোকাও একটু লাগবে হ’ল ব’লে।”

মসিয়ে বেনার প্রীত স্বরে বললেন : “মাঝা ও জুজিয়ার মধ্যে একটা অসুস্থ দ্বাধের একটা মস্ত প্রতিষ্ঠা যে এই জাতিভেদের ওপরে ছিল—একথাটা এত বেশি ক’রে বললাম : শুধু তোমাদের দুজনেরই কণ্ঠ। যদি শুধু আনাকে বলতে হ’ত তবে এত টীকাটিপনির প্রয়োজন হ’ত না—কেননা এর মূলে আছে বে-স্বাধারি তাঁর সঙ্গে ওর দাঁক-ব’ন্দা আছে।”

ব’লে একটু থেমে স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন : “তাই তো আমি অসহিষ্ণু সাম্যবাদী একাকার-পন্থীদের কথাই না হোসে থাকতে পারি না হে। আরে—এ কি মুখের কথা নাকি যে, সব ভেতেরদুয়ে দাও সমতল ক’রে বলবামাত্র বাইবলের পোখা আলোর মতন যেখানে আলো নেই সেখানেও আলো দেবে দেখা? বৈবন্দের যে একটা মস্ত সভ্যতাসিকি রয়েছে তুমি-আমি সেটাকে নেই বললেই সে শুনবে? বা রে বা! ধীনকে মাথা নিচু করতে বাধ্য করার দিকে যে স্বয়ং প্রতিষ্ঠাবীরাই ইদার।



রয়েছে তে। নইলে মাথা বার স্বভাবতঃই সোজা তাকে নিচু করতে পারে। কেউ ? কিন্তু ঐ দেখ, ফের গবেষণা মারছে উকি-ঝুঁকি।”

সন্ধ্যা বলল : “একটা কথা : সারার সঙ্গে জুলিয়ার এজেন্সি মন-কষাকষি হ’ত নাকি প্রায়ই ?”

—“বাইরে না। মুখে তাদের মধ্যে একটা সখিষ্ ছিল, পরস্পরের প্রতি একটা মুহু সর্হাসচূড়িতও ;—এমন কি প্রত্যেকে অপরকে তার করেকটা বিশেষ বিশেষ গুণের জন্যে প্রশংসা করত—সত্যিই। কিন্তু তবু ঐ যে বলছিলাম : একটা অতি হৃদয় আক্রোশও ছিল সেই সঙ্গে—আবছা-আলোর-সঙ্গী ছায়ার মতন। তাইটা : কেন ওরা বাধ্য হয়ে পরস্পরকে প্রশংসা করত, বুঝলে না ?”

সন্ধ্যা বলল : “বুঝেছি। কেবল—নাফ করবেন মিসরে—সত্যিই কি এ-ধরনের রেঘারেসি ঘটত ?”

বুদ্ধ হৃদয় বললেন : “নইলে কি আমি বলছি এ-সব বানিয়ে ?”

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরিয়ে নিল : “আমার বিশ্বাস হল—অর্থাৎ ওদের বাইরের ব্যবহার থেকে কি এটা ধরা পড়ত ? না, এর মধ্যে আপনার মনস্তাত্ত্বিক অনুমানও আছে মিশে ?”

বুদ্ধ বললেন : “না। প্রমাণের অভাব নেই আমার এ কথা—যদিও ঠিক এ-সময়ে ওদের বাইরের ব্যবহারের মধ্যে মেঘলা ছায়া নামেনি। কারণ এ-সময়ে ওদের পনের আনা কথাবার্তা হ’ত প্রধানত লিলিকে নিয়ে : অর্থাৎ কী ক’রে ওর শিক্ষা ভালো হবে, স্বাস্থ্য অটুট থাকবে, নাচ-গান দেখার সুবিধে হবে—এইসব আর কি—যদিও এখানেও একটা সজা ছিল।”

সন্ধ্যা বলল : “কি ?”

বুদ্ধ বললেন : “লিলিকে নিয়ে আলোচনার উৎসাহ কারুর কম না

হ'লেও একথাবার্তার সারা যতটা তুমি পেত জুলিয়া ততটা পেত না—  
লিলি তার নিজের মেয়ে হওয়া সঙ্গেও।”

সন্ধ্যা বলল : “তবে যে বললেন লিলিকে সে ভালোবাসত ?”

—“ভালো তো বাসতই। খুবই ভালোবাসত। কিন্তু কি জানো ?  
জাতিভেদের ফলে ঘটে যে-প্রকৃতিভেদ তারই কথা এসে পড়ে যে আমার।  
জুলিয়ার সঙ্গে সারার প্রকৃতির একটা মন্ত শ্রবের ছিল। সারা ছিল  
মনে প্রাণে সেই প্রকৃতির নারী যারা প্রধানত গৃহকে কেন্দ্র করেই গড়ে  
উঠে, সেই প্রকৃতির মেয়ে যে বাইরে হ'য়ে পড়েই খানিকটা পথভ্রান্ত  
হতেন। জুলিয়া ঠিক উলটো। সে ছিল সেই শ্রেণীর নারী যারা গৃহের  
নথো কখনো পূর্ণ সার্থকতা পেতে পারে না, সমাজের উদারতর প্রাক্কণেই  
চায় ঘর বাঁধতে। ঘরকে তারা ভালোবাসে না, এমন কথা বলি না—কিন্তু  
বাইরেকেও ভালোবাসে—বাইরেকেও তাদের নারী-সাবল্যার প্রবাস  
খানিকটা-বিলোতে চায়, নইলে ব্যর্থতা বোধ করে। মনে আছে ভালোও  
বলত যে, সারাকে দেখে তার মনে হ'ত ইতালীর ‘মাসনা’র কথা,  
জুলিয়াকে দেখে—গ্রীকদের ‘হেটা-এরা’র \* কথা।”

দ'লে একটু থেমে পুনরায় বলতে লাগলেন : “তাকেই তাদের মে-  
বন্ধনটা প্রথম দিকে যতটা দৃঢ় ছিল ক্রমে ততটা দৃঢ় রইল না—হ'য়ে এল  
আলগা। কল হ'ল—বা হবার তাই : সবার সঙ্গে জুলিয়ার অন্তরঙ্গতা  
যে-পরিমাণে কিকে হ'য়ে এল আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে এল ঠিক সেই  
কতৃপাতের গাঢ়। জুলিয়ার সখিত্বকারী তবু সারার হৃদয় অকণ্ঠিত  
বিষনাভ্যবের বাঁধে আছড়ে প'ড়ে মোড় নিত যেন আমারই দিকে।”

\* Hetaera—গ্রীসের ধারীনা বিষয়্য রমণীকল—গ্রীসিকা, শিষ্টোৎসাহিনী, রমজা  
—ঐতিকতার শিখিল কিন্তু।

স্বপ্ন পরিহাসের সুরে বলল : “না নিয়ে পারে মসিয়ে—বখন সে-  
উর্নিমাণা জানত স্রোতের এ-মোড়ের শেষে কোনো বাঁধের বিন্দুবিসর্গও  
নেই ?”

সন্ধ্যা বলল : “তুমি তাই ? তারা যে এ-ও জানত মনে মনে বেশ  
ভালো করেই যে, জাতিভেদের চেয়েও বেশি প্রবল শক্তি ধরে তরুণ  
মনের ঢেউ—যখন সে কাঁপিয়ে পড়ে তরুণের আহ্বানী মনের তটপানে।”

বৃদ্ধ হেসে বললেন : “কথাটা তোমরা বলেছ ভালো মানছি।  
কেবল তোমরা এ-স্রোত-কেরা তরুর আর-একটা দিক দেখনি।”

উভয়েই প্রায় যুগপৎ জিজ্ঞাসা করল : “কী ?”

বৃদ্ধ বললেন : “যে, দাম্পতীর মাঝে যখন এ-ধরণের তৃতীয়া আসেন  
তখন তিনি প্রায়ই বুঝে আসেন যে আসা চলে। বোঝেন যে একেত্রে  
তিনি অ-দাম্পত্য এমন অনেক প্রবাহ চূর্ণ-তরঙ্গ প্রভৃতি ভুলতে পারবেন  
যা দাম্পত্যের একটানু শাস্ত্রায়মান স্রোতের বৃক বেশিই চমকে ওঠে।  
বাইরের গভময় ভাষার বলতে গেলে একে বলা যায় : এ বছর বছরে  
সারা ও আমার দাম্পত্য-সংস্কার মদ্যে ও অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল  
—যার ফল—”

সন্ধ্যা বাধা দিয়ে ঠাট্টার সুরে বলল : “অত ঘটা ক’রে গভমকেও  
বাখ্যা করতে হবে না মসিয়ে, গচ্ছিনী আমরা একে অস্বস্ত বুদ্ধি। কেবল  
এর মশ্বটুকুকে আরও প্রাঞ্জল গঞ্জে বললে দাঁড়াবে : পাঁচ বছরে সারা  
আপনার কাছে পুরোনো হ’য়ে গিয়েছিল—প্রমে আপনার না ছিল  
রোমান্স, না ইন্দ্রধনুর সে রং-কুরি।”

মসিয়ে বেনার একটু হাসলেন, তাঁর হাসির মধ্যে একটা হানিমার  
ছায়া ছিল : “ঠাট্টাটা তোমার লাগটেল হয়েছে সন্ধ্যা, মানছি।  
কেবল তুমি একটা মারাত্মক ভুল করলে : এ-সব সংস্কার পড়ের মধ্যেও

অনেক সময় কিছু-না-কিছু থাকেই পড়ের আমেজ—অর্থাৎ যদি দাম্পতীর মধ্যে মেহটা একেবারেই কথার-কথা না হয়। আর সারার গোমাল আমার কাছে পুরোনো হ'লেও তার মেহের মধ্যে তখনও রস পেতান বলেই একথা বোধ হয় বলতে পারি যে, তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধে রা-বিলাস না থাকলেও রিদ্ধতাটুকু একেবারে উবে যায়নি।”

সন্ধ্যা এসূরে ঈবং অন্ততম মতন হ'য়ে বলল : “মাক করবেন মসিয়ে—আনি প্রগল্ভতাবেশে এমনিই—”

বুদ্ধ মিত্র হেসে তার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে বলতে লাগলেন : “মনে করিনি কিছু সন্ধ্যা, বিধাস কোরো। তবে কি জানো? নবদাম্পতীরা প্রায়ই ভুল করে পরিণত দাম্পত্যকে বিচার করতে গিয়ে। কিছু এসম্বন্ধটা মোটেই অত সহজে বোঝা যায় না—অভিজ্ঞতা বিদ্যা।” বলে একটু থেমে বলতে লাগলেন : “অবশ্য একথা বলি না যে, আমাদের দাম্পত্য প্রেমে সে উদ্ভাসতা, সে অত্যাগতা, সে সঙ্গ-ভারাই-ভারাই-ভাব এ কয় বছরে সমানই নবীন ছিল। নৃতনতের রা-মশালে রোমান্সের মধ্যে যে চমক জাগে তা নিশ্চয়ই পূসর হ'য়ে গিয়েছিল—না গিয়েই পারে না।” বলে আবার একটু থেমে বলতে লাগলেন : “কিছু দাম্পত্য প্রেম তো ঠিক এই রোমান্টিক ভাব-বিলাসিতা মাত্র নয়—যদিও প্রথমটায় তাই মনে হয় বটে। দাম্পত্য প্রেমের পরিণতি হবার সঙ্গে সঙ্গে তার নানা রকম রূপান্তর ঘটে। একদিকে যেমন ভাব-বিলাসিতা ছাড়াও অল্প অনেক রকম রসই সঞ্চিত হ'তে থাকে—অপেক্ষিক তেমনি আবার অনেক রস নিশ্চিহ্ন হ'য়ে শুকিয়েও যায়।

“কিন্তু তাই বলে একথা বললে খুবই ভুল কথা হবে যে, সাতার প্রতি আমার প্রেমের বন্ধন একসময়ের একেবারে শিথিল হ'য়ে গিয়েছিল। বরং একজন নানানিক দিয়ে আরও বিচিরই হ'য়ে উঠেছিল। একসঙ্গে

অনেক সুখ দুঃখের মধ্যে দিয়ে তরী বেয়ে চলা, নানা মেলামেল, হাসিকান্না, আপদ-বিপদ, ঝড়-ঝাপটের মধ্যে দিয়ে হাত-ধরাধরি করে যাওয়া, নিত্য নূতন রূপে পরস্পরের পরিচয় পাওয়া, একের জন্তে অপরকে ছোট-বড় অনেক প্রাত্যহিক স্বার্থ ছাড়তে বাধ্য হয়ে পরিশুদ্ধি লাভ করা—এক কথায়, প্রতি পদক্ষেপে নিজের চারধারে অহমিকার বেড়া-জালকে ছিন্ন করতে থেথা—এর ফলে উভয়ের মধ্যে যে-নিকট-পরিচয়টি গড়ে ওঠে তাতে উন্মাদনা অজস্র না থাকলেও তার মূল্য কমে না। বরং দ্বন্দ্বের বেশি সার্থকতা পায়—সত্যিই পায়।”

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন :

“অবশ্য সারার প্রতি প্রেম আমার মন্দা হ’য়ে যেতে পারত—যদি সে হ’ত হীন-চরিত্র বা স্বার্থপর, কিংবা যদি সে আগেকার মতন আমাকে আকড়ে ধরে থাকত। কিন্তু তালেবের সংস্পর্শে আসার ফলে যে-কোনো মেয়ের মধ্যেই নারীত্বকে ছাপিয়ে মল্লভূত খানিকটা কুটে উঠতে বাধ্য—বিশেষ করে সারার মতন গ্রহণশীল মেয়ের মধ্যে—যে স্বভাবতই প্রকৃতিতে গ্রহণ করতে নেহে প্রকায় সেবার। শুধু তাই নয়,—নাহুজের, গৃহকর্ম-নৈপুণ্য, সংসারে নানা ছোটখাট বিষয়ে পরের জন্তে নিজের সুবিধা ছাড়, সংযম, নিষ্ঠা,—এসবে জুলিয়া তার কাছে দাঁড়াতেই পারত না। রোমান্সের ঝিকমিকি একটু নিস্ত্রভ হ’য়ে এলেও তার প্রতি প্রকৃত আশার দিন দিন বেড়েই চলেছিল। কাজেই তার প্রতি আমার অন্তরের ভালোবাসা শিথিল হয়নি মোটেই”—ব’লে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন :

“কিন্তু তবু এমনিই আমাদের প্রকৃতি সজ্জা, বিশেষ করে আমাদের মতন অসংযমী শিল্পী-প্রকৃতির মানুষের, যে, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই চায় সে অস্তিনবস্ত, খোঁজে বৈচিত্র্য—নিত্য নতুন রসে মেতে উঠতে। তাই

বোধ হয় এ-ধরণের মানুষকে নিয়ে সমাজের এত বিপদে পড়তে হয়। একদিকে শিল্পিনী নারী চায় একাধিক পুরুষের প্রেমে শ্রদ্ধার সাহচর্যে মগ্ন হ'তে—তা এতে তুমি যতই কেননা রাগ করো—অপর দিকে শিল্পী পুরুষ চায় একাধিক নারীর প্রেরণায়, রূপে, লাগো বড় হ'তে। ফলে যা হবার তাই ঘটল :

“আমি দীর্ঘে দীর্ঘে খানিকটা অজান্তে, খানিকটা জেনেশুনে জুলিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হ'তে লাগলাম—জুলিয়াও আমার সঙ্গে রক্তে একটু একটু করে বেশ স্পষ্ট ঔৎসুক্য দেখাতে আরম্ভ করল।

“কল যে কী হ'ল তা হয়তো তোমরা খানিকটা কল্পনা করে নিতে পারবে : সারার বেদনা সম্বন্ধে আমি জুলিয়ার সাহচর্যে বেশি বেশি সময় কাটাতে বাধ্য ছলাম। এর দরুণ সময়ে সময়ে যে একটু-আদটু উদ্ভাপের বা শূলিকের স্রষ্টি হ'ত না তা বলতে পারি না—কিছু ঐ শূলিকের বেশি না। শূলিক শিখায় পরিণত হ'ত হয়তো—যদি সারা দিক সেই আগেকার ক্যাথলিক সারাট থাকত। কিছু বলোছি : কালপাতে তারও পরিবর্তন তো কম হয়নি। ভালোবের একটা কথা তার মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল : বে, মানুষের মনুষ্যত্বের সব চেয়ে গভীর বটে তখন—যখন সে রাখতে না পেরেও দায় আগলানো। একথা ভেবে সে প্রতি অন্তর্দ্বিষ্টের ক্ষেত্রেই নিজেকে রাখত ঠেকিয়ে—বিসদৃশ কিছুই ঘটতে দিত না।

“কিন্তু বাইরে বেশি কিছু না ঘটলেই তো আর অন্তর্বিষ্টকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। বরং বাইরে বায়ে গেলে যার উদ্ভাপটা যেত ক'মে, সেটাকে অন্তর্মুখী ক'রে নিলে সে হ'য়ে ওঠে দুঃসহ। সারার ক্ষেত্রেও হ'ল তাই। জুলিয়াকে বা আমাকে মুখে কিছু বলতে-না-পারার অতি-সংঘর্ষে ওর ভেতরে জ্বক হ'ল বাহ। অর্থাৎ বাকে তোমরা ঊর্বা

বলো তার কালো মেঘ ঘনিষে এল ওর মনের সমস্ত আকাংক্ষা ছেয়ে ।”

অপন বলল : “আর জুলিয়া ?”

—“জুলিয়া একেবারে চুপ ক’রে রইল—যেন এ-সব তার মনে উন্নত হয়নি। অর্থাৎ সারার প্রবর্তমান বিমুখতার বন্ধ আঁচ তার গায়ে লাগলেও সে যেন সঙ্কল্প করেছিল—অস্বীকার ক’রেই তাকে দেবে না আমল।”

সন্ধ্যা বলল : “কিন্তু আমল দেব না সঙ্কল্প করলেই কি তাতে সঙ্কল্প হওয়া যায় মসিয়ে ?”

মসিয়ে বেনার তার দিকে স্থির নেত্রে চেয়ে রইলেন। সন্ধ্যা মুখ নিচু করল।

বন্ধ ওর একটি চূর্ণালক সরিয়ে দিয়ে চিন্তাবিষ্ট স্বরে বললেন : “যা না—একথা কে না জানে শেরি ? কিন্তু তবু নাহব চেষ্টা করে তো। আমরাও করতাম—বিশেষ ক’রে যা কুশী তাকে দূরে রাখতে।”

সন্ধ্যা চুপ ক’রে রইল।

অপন জিজ্ঞাসা করল : “দূরে রাখতেন কী উপায়ে একটু বলবেন ?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “অভাবনীয় কোনো উপায়ে নয় অবিশিষ্ট। তেবেচিন্তে চ’লে, তেকে শিখে, যেটুকু পাচ্ছি তার ক্ষুদ্র দত্তটা পারা যায় আত্মসম্মতিকে এড়িয়ে। তাই সারার প্রসঙ্গকে আমরা দুজনেই চাইতাম খানিকটা এড়িয়ে বেতে।”

অপন বলল : “চাইতেন শুধু—না, পারতেনও ?—”

বন্ধ বললেন : “সব সময়েই কি আর পারতাম ?”

আনা বলল : “যখন পারতেন না তখন করতেন কি ?”

—“তখন দুজনে মিলেই বন্ধ করতাম সারার গুণগান।”

সন্ধ্যা টপ ক'রে ঈষৎ উদ্যার সঙ্গেই বলে বলল : “আর এ উদ্যারপটী  
প্রতিযোগিতায় জুলিয়া নিশ্চয়ই দিত্ত আপনাকে হারিয়ে ?”

মসিয়ে বেনার ওর দিকে খানিকক্ষণ কোমল দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে  
বললেন : “একটু তলিয়ে বুঝতে ও চেষ্টা করো শেরি—তবু বিচার ক'রে  
কি বুঝবে কিছু ?”

সন্ধ্যা কিন্তু তবু তেমনি বিরস সুরেই বলল : “এতে তলিয়ে বুঝবার  
কি খুব বেশি আছে মসিয়ে ? ব্যাপারটা এমন কি জটিল ? না দেখতে  
গেলে থেকে অবজ্ঞা ?”

বুঝ একটু ভাবলেন, পরে বললেন : “কিন্তু বাইরে থেকে যতটা  
বুঝ দেখায় ঠিক ততটা স্বচ্ছ ও তো নয় সন্ধ্যা ।”

সন্ধ্যা বলল : “ঠিক কী বলতে চাইছেন আপনি ?”

বুঝ ধূম্রোদাসীরণ ক'রে চিন্তাবিষ্ট সুরে বললেন : “তুটি মেয়ে  
পরস্পরকে রাখন ভালোও বাসে তখন তারা পরস্পরের চারদ্বারে এ রকম  
ক্ষেত্রে কত রকম জটিল তত্ত্ব যে বোনে শেরি!—কী ক'বে বোঝাব লে ?—  
দর কি আনিই বুঝতাম—তখন ?”

আনা কোকুলী সুরে বলল : “তবু ?”

বুঝ খানিক আনার দিকে চেয়ে রইলেন যেন অসুমনস্কভাবে । পরে  
বললেন : “শোনো তা হ'লে বলি একটু গুলেই । ‘এ রকম ক্ষেত্রে’ কথাটা  
বলতে আমি কি বুঝছি তা তোমরা নিশ্চয়ই করনা ক'রে নিতে পারবে ।  
তাই সে-সম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য করব না । এখন বলি শুধু দু-চারটে ঘটনা  
না থেকে বুঝবে কী রকম জটিল হ'য়ে লাড়ায় ব্যাপারটা—এ-বলেন  
সম্বন্ধে ।

“একটা জিনিষ প্রায়ই ঘটে । আমি নানা সময়ে নানা রকম ভাবে  
উচ্চরের প্রতি টান অনুভব করতাম । কখনো এর প্রতি, কখনো বা ওর



প্রতি। ধরো, হয়তো জুলিয়াকে সারা সপ্তকে কোনো কথা বললাম : সে-সময়ে মনে হ'ল জুলিয়ারই আমি বেশি কাছে—তখন তাকে বলতাম, নিজেও বিশ্বাস ক'রে, যে সারার চেয়ে সে-ই আমার বেশি অন্তরঙ্গ—মেহেতু, যে-কথা সারাকে বলতে পারি না সে-কথা তাকে বলতে পারলাম। জুলিয়াও তাতে সাড়া দিত। সারার প্রশংসাই করত সে, তবু সে-প্রশংসার মধ্যে আন্তরিকতা থাকা সহ্যও আভাষ পেতাম যখন একটা ঝাঁঝেরও। আর এক ঝাঁঝটা ফুটত বিশেষ ক'রে সেইসব অন্তরঙ্গ মুহূর্তে যখন সে আমাকে নানা কথা বলত বা সারাকে বলতে মানা। মেয়েটা এই নিষেধপন্থিনী হ'য়ে যে কতরকম আত্মপ্রসাদই পায়—কতরকম গল্প-প্রতিতিংসার স্বাদ!—বলে একটু হাসলেন সামান্ত—পরে ফের গম্ভীর হ'য়ে বলতে লাগলেন : “কিন্তু আবার এমনসব সময় আসত যখন উজ্জ্বাল আমার বেক নিত সারার দিকেই : হয়তো জুলিয়াকে নিয়ে সামান্ত কোনো তকরারের ফলে। তার পরিণাম হ'ত এই যে, মনে হ'ত সারাকে এমনসব কথা বলা যায় যা জুলিয়াকে বলা অসম্ভব। কেসমতে মনে হ'ত : বুঝি আমি সারারই বেশি কাছে।”

আনা বলল : “বলতে চাইছেন শুধু চলন্ত-ফিরন্ত ‘মুডের’ ব্যাপার—এই কি ?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “সাধারণ লোকে একে ‘মুড’-ই বলে বৈ কি। কিন্তু আমি এধরনের মনোভাবকে বা মনের সাময়িক প্রকৃতিকে ঠিক মুড বলি না। বলি পাস'নাটিটি বা মুষ্টি।”

অপন বলল : “মানে ?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “যারাই একটু বেশি বিকশিত তাদের মধ্যে একাধিক মানুষ থাকে—এই অকাটা তত্ত্বখাটি আর কি। কখনো কোনো বিশেষ আবেষ্টনীতে বা ঘটনাত্তকে আমার দে-মুষ্টি

আত্মপ্রকাশ করত, অল্প এক আবেশীতে সেই প'ড়ে যেত চাপা, আর তখন মনে হ'ত—আগের যে-মুষ্টি সেই হ'ল আমার পশুরকী স্বরূপ—এখনকার মুষ্টিটিই হ'ল আমার আসল পারমানসিটি। বুঝতে পারছ কি ?” ব'লে স্বপনের দিকে তাকালেন।

স্বপন বলল : “পারছি।” ব'লেই চোখ নিচু করল—আনা ও সন্ধ্যা যুগপৎ তার দিকে তাকাল। তার গণ্ড বেয়ে রক্ত উঠছে শির শির ক'রে মাথায়।”

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন : “অত অপ্রতিভ হওয়ার দরকার নেই ভায়া। এর জন্মে আমরা দায়ী নই ব'লেই নয়—যে-মানুষের মধ্যে একাধিক মানুষ বানা বেঁধে থাকে তার কেন্দ্রীয় সত্তাটির—নিউক্লিয়াসের—শক্তি সমুদ্রতরু ব'লেই। সমাজে এ-রকম মানুষ প্রায়ই তুফান আনে, আনে আঁধি, আনে গণ্ডগোল—এমন কি আশান-বাগাও—অনেক সময়। কিন্তু তবু দ্বারা এ-ধরনের বিস্ফোরণের আমদানি করে তারা বহু-নিষ্পিত ও অতি-উৎপীড়িত হ'লেও মানুষকে উদারতার হামনির আভার তাগাই বহন ক'রে এনে দেয়—তথাকথিত অনবদ্য নিষ্কাশ দেলের-দলের-একজনরা না।”

স্বপন মুগ্ধ ভুলে কি একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়।

রক্ত হেসে বললেন : “তোমাকে খুঁসি করবার জন্মে বা সমর্থন করার জন্মে বলছি না মনামি—এ আমার বহু-পরীক্ষিত সত্য। আমি দেখেছি যে, স্ট্রীজাতীয় মানুষরা এ-ধরনের সংঘর্ষ ও উত্তাপে বহু ছুঃখ পেলেও খতিয়ে লাভ করেই এ-থেকে। কারণ এ-থেকে সে নিজের সম্বন্ধে এমন-সব অভিনব আত্মপরিচয় লাভ করে—যে-পরিচয় এ-ধরনের দোলায় না।”

ব'লে একটু থেবে লাভ করে বলতে লাগলেন : “একটা জিনিষ

কিন্তু আমি এ-স্বরে প্রায়ই লক্ষ্য করতাম ও সেটা আমাকে নিছক যেন ও আত্মগোপনই বহন ক'রে এনে দিত। সেটা হচ্ছে এই যে, সারার কাছ আমি নিজের যে-মূর্ত্তি প্রকট করতাম তা ছাড়া যে আমার অল্প ভেদা মূর্ত্তিও আছে সেটা স্বীকার করতাম না। এক কথায়, কবীর মিথ্যাচরণ। ঠিক হেমনিই জুলিয়ার কাছে আমার যে-মূর্ত্তি মেলে ধরবার তাকে প্রকারান্ত্রে বোঝাতাম যে, সেই মূর্ত্তিই আমার সত্যতম মূর্ত্তি।”

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করল : “আর ছ’জনেই বুঝত ?

মসিমে বেনার বললেন : “সে-ও এক বিচিত্র যোগাযোগ। আমার মনের এক অবস্থায় সারা হয়তো বিশ্বাস করত ও ক’রে ভাবত জুলিয়ার ওপর সে হ’ল জয়ী—কিন্তু অল্প এক অবস্থায়—যখন আমার মন অল্প স্বরে বাধা থাকত তখন—সে মুহূমান হ’য়ে পড়ত, কেননা সংসারে যে-সম্বন্ধের মধ্যে কামনা সব চেয়ে উগ্র অথচ সব চেয়ে অশুট—অর্থাৎ এই নরনারীর চুখের সম্বন্ধ—সেখানেই আশাত্ত্ব সব চেয়ে বেশি যেখানে অভিমানের ইচ্ছা। এ-হেন আদান-প্রদানে যা চাই তা পেলো দাঁড় বলায় মতন বিড়ম্বনা আর কী আছে বলা ?”

স্বপন বলল : “আর জুলিয়া ?”

বুদ্ধ বললেন : “জুলিয়া অল্প মুহূমান হ’ত না—যদিও জরুরোপস্থে গর্ভাঙ্কটা তার মুখকে রাঙিয়ে তুলত—যখন জুলিয়ার মূর্ত্তি মুখে আমাকে সে সারার চেয়ে বেশি কাছে পেত।”

সন্ধ্যা বলল : “মুহূমান সে হ’ত না কেন ?”

বুদ্ধ বললেন : “তার সমাজ-স্বীকৃত কোনো দাবিই ছিল না যে কাজেই না পেলো কোভ সব্বও সারার মতন ব্যাধার হয়ে পড়বে সে কী ক’রে ? কিন্তু অপর পক্ষে সারার কাছ থেকে আমাকে নানা-বিভিন্ন নিজের বেশি কাছে টেনে আনতে পারলে তার মধ্যেও খানিকটা দেন—

কি বলব ?—শোধবোধের ভাব উঠত ফুটে। কেমন জানো ?” বলে  
 হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন : “এ-টানাইচড়ার একটা জিনিষ  
 আমি প্রায়ই লক্ষ্য করতাম : ছুঁজনার প্রত্যেকেই চাইত বেন এমন একটা  
 অস্বস্ততার আশ্রয় পেতে—যেখানে অপরের ছায়াও না আসে। তাই  
 প্রত্যেকে অনেক সময়ে খুব সামান্য কথাও আমাকে বলে শই-পই করে  
 বলত প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে সেটা বলা চলবেই না। সে কত দিবার ঘটা !—  
 কিন্তু পুরুষে যে এ-ধরনের অকারণ সামান্য কথাকে গোপন রাখার মানে  
 বুঝে পায় না কোনোদিনই। ফলে অনেক সময়েই এ-সব অতি-  
 গোপনীয় অতি-গোপনকথা হয়তো বা ভুলে বলে ফেলতাম প্রতিজ্ঞা  
 সহিত। ফলে বাধত যে কী সাংবাদিক গড়গোলা !” বলে সন্ধ্যার  
 দুখের দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে বললেন : “প্রথম প্রথম সত্যিই মনে  
 হ’ত এ-সবকে—যাকে ‘চায়ের পেয়ালার ঝড়’ বলে ঈগরীজিতে। কিন্তু  
 পরে বুঝলাম—ঝড় ওঠে—যে কথাটা ভাল করে দেওয়ার দরকার তা নয়—  
 ওঠে—ঐ একজনের অস্বস্ততার পেয়ালার অপরাধ অধঃস্পর্শ হয় বলে।  
 প্রত্যেকেই ভাবে : এ বুঝি এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা—তার গাফিলত  
 কথার মূল্য sacredness—না-মান। অতঃপরে হ’লে অবশ্য এ-  
 ধরনের শিশুসুলভ অহেতুক-গোপনীয়তার মূল্য দেওয়া-না-দেওয়ার বিশেষ  
 আস্ত-বেত না, কিন্তু ঐ সোষা-বেতের ভাব ছিল বলে, একের মনে  
 আমার বিশ্বাস-রাখার ওপরে একটা প্রায় বেন জন্মের থাকার দরকার  
 হৃদয়ের মনে জলে উঠত আশ্রয়—বা বিচ্ছিন্ন বেত দুয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব।—  
 নইলে গোপন কথাটা ছিল অবাস্তব, তাকে গোপন রাখার মতো দিলে  
 প্রত্যেকেই পেত যে সম্পত্তিজ্ঞানব-চরিতার্থতঃ সেইটাই ছিল আসল।—  
 কিন্তু কথাটা বোঝাতে পারছি কি ? না আপনাদের থেকে বাজে ?”

বলে বৃদ্ধ পর পর তিনজনের মুখের পানেই তাকালেন। সন্ধ্যা ও

স্বপন কথা কইল না, কেবল হঠাৎ আনা মুখ নিচু ক'রে বলল : “না, বেশ বিশদ হয়েছে।” ব'লেই তার মুখ উঠল আবীর-রাঙা হ'য়ে।

বুদ্ধ তার কণ্ঠবেষ্টন ক'রে তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন :

“অত লজ্জার কারণ নেই শেরি। এইসব ক্ষেত্রেই মানুষ সব চেয়ে চেষ্টা করে দোসর পেতে। কিন্তু—” ব'লেই হঠাৎ আনার মুখের দিকে তাকালেন। আনা জোর ক'রে হাসে। কিন্তু সে-হাসির মধ্যে কোথায় আলো ?

স্বপন বলল : “আপনি যে খানিক আগে বলছেন কয়েকটা ঘটনা বলবেন শুনের সম্বন্ধে ?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “ঐ তো মুকিল সেন। এ তো কল্লনার নভেল নয়, এ যে বাস্তবের ড্রামা। এখানে ঘটনাগুলো এতই তুচ্ছ যে, বলার ভার সয় না, অথচ অমুভাবে ওঠে বিপর্যয় রকম ফেঁপে। তবু একটা দৃষ্টান্ত দিই। ‘মনে পড়ে একদিন সারাকে বললাম—‘সারামুখী’ মুডে—‘চলো গিয়েটারে।’ লগুন থেকে বিরভম টা এ বদল নিয়ে পারিসে এসেছেন, হামলেট অভিনয় হবে। সারার মুখ হাসতে উঠল উজ্জ্বল হ'য়ে। কিন্তু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল : ‘ক'টা টিকিট কিনেছ ?’ আমি কিনেছিলাম তিনটে টিকিট ও জুলিয়াকে ব'লেও ছিলাম। কিন্তু সারার উজ্জ্বল মুখখানিকে হান করতে অক্ষম হ'য়ে বললাম : ‘মুখানা মাত্র’। সারা আমার গলা জড়িয়ে ধরল ও কী আদরই যে করল অনেকদিন বাদে !”

বলে বুদ্ধ একটু থেমে বলতে লাগলেন : “কিন্তু এদিকে ওর আদরের উজ্জ্বাসের মধ্যেও আমি হ'য়ে উঠছিলাম বিমনা। মনে মনে মতলব আটছিলাম—জুলিয়াকে গিয়ে এ-যাত্রা কী নতুন মিথ্যা কথা ব'লে কুল-মান বজায় রাখব।”

সন্ধ্যা হেসে বলল : “মিথ্যা-কথার বৃষ্টি এসময়ে পোক্ত হ’য়ে উঠেছিলেন ?”

বৃদ্ধ বললেন : “উঃ, সে আর বলো কেন ?” বলে তার মিকে হিরনেত্রে চেয়ে বললেন : “আশা করি এটা তোমার অভিজ্ঞতার এলাকার মধ্যে আসেনি সন্ধ্যা—এসে কাজও নেই—কিন্তু বার এসেছে সে-ভুক্তভোগী জানে যে, জীবনে সত্যকথার বাধের ঠিক ওপায়েই পদকে থাকে যেন একটা পুঞ্জপ্রাবন—মিথ্যাকথার। একবার এ-বাধের কোথাও এতটুকু চিড় খেয়েছে কি, দেখতে দেখতে বাধ হয় লুপ্ত—আর অশ্রান্ত উদ্ভিভঙ্গে ধেরে আসে মিথ্যার বন্যা অফুরন্ত তালে—একের পর এক।—কিন্তু এ-ও গা-সওয়া হ’য়ে যায়—জানো ?”

বৃন্দ বলল : “জানি মসিয়ে।”

বৃদ্ধ হেসে বললেন : “জানবে বৈ কি। কিন্তু আর-একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছে কি এ-মত্রে ?”

বৃন্দ বলল : “কী ?”

বৃদ্ধ বললেন : “যে, মিথ্যাকথা বলার কালে কতিংগেই হ’লেও একটু লাভও হয় ঐ সঙ্গে ?”

আনা বলল : “লাভ !”

বৃদ্ধ বললেন : “লাভ ছাড়া কী বলবে বলো ; বৃন্দন এর পরিণামে আমরা হাড়ে-হাড়ে বুঝি যে, সত্যকথনের মাঝে সত্যানিষ্টার ইচ্ছাবেশ প্রায়ই পেখম ধ’রে থাকে মানুষের সত্যপ্রীতি নয়—সত্য-বলার-একটা-দম্ভ ?”

“আনা কি-একটা উত্তর দিতে গিয়ে চূপ ক’রে গেল।

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন : “এ-দম্ভটা হ’ল আসলে বর্জ্যতারই অবস্থা। কিন্তু এটা বোঝে মানুষ কেবল মিথ্যার অমৃততাপে যে আলো আসে—

ভারই বরে। তখন সে বোঝে যে, সত্যকে সত্যি সত্যি ভালোবাসা, কত কঠিন। বোঝে, কেননা সত্য-বলার দস্তকে বান্নে মিলে সে প্রথমটার দেখে বেন সত্যনিষ্ঠার অঙ্গ কোনো সার্থকতাই নেই। তার পরেই সে বুঝতে শেখে যে, এ-ধরণের মনোভাব আসলে সত্য-প্রীতি নয়, বুলেন না ? ব'লে থেমে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : “ইংরিজীতে বলে না : ‘No cloud but has a silver lining ?’ এ-ও ঠিক তাই। মিথ্যাকপার আসে অশেষ আশ্রয়গানি, নিজের চোখে মাছ-ছোট হ'য়ে যায়—আরও পড়ে কত কী পাকে—কত কী ছুঁলতার করে। কিন্তু তবু সেই সঙ্গে মাছ একটু নম্রও তো হয়, ঐ যে বললাম প্রথম বুঝতেও তো শেখে সত্যকে ভালোবাসার মানে কী।—কিন্তু কি বলছিলাম যেন ?—ঐ দেখ তুলেই গেছি।” ব'লেই তৎক্ষণাৎ বললেন : “ও—মনে পড়েছে। সারার খুসি দেখে মনে মনে উদ্ভাবন করছি কী ধরণের নিজলা মিথ্যা বললে দু'কূলই বজায় থাকে—মনে পড়ে এখনও পরিষ্কার—সেদিনকার কথা। আমার অজ্ঞানদস্তা গ্রাহ্যের ব্যাপ্ত না এনে সারা খুসি হ'য়ে অনর্গল ব'কে যাচ্ছে—যেমন মেয়ের বকেই খুসি হ'লে—এমন সময়ে হঠাৎ টেলিফোন উঠল বেজে। সারা উঠে ধরল। টেলিফোন করছিল জুলিয়া। সারা হাঁ হ' করে সেরে আমার পাশে ব'সেই কর-কর ক'রে কেঁদে ফেলল। আমি তাকে কী ব্যাপার জিজ্ঞাসা করতেই বলল : ‘আমি খিয়েটারে যাব না—যাও তুমি জুলিয়াকে নিয়ে—মিথ্যাবাদী !’ ব'লেই নিজের ঘরে ছুটে গিয়ে দোর দিল।

“আমি ছুটলাম জুলিয়ার কাছে। সে এত দুঃখিত হ'ল শুনে। বলল : ‘আমি কী ক'রে জানব পিয়ার যে, তুমি আমার কাছে তিনখানা টিকিট কিনেছ ব'লে ওয় কাছে গিয়ে বলবে দু'খানা ? তাই আকিসারাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলাম আমার এখানে সাক্ষ্য-তোজন সমাধা

ক'রে খিয়েটায়ে বাব—মানে আমরা তিনজনে।—তুনি যদি আগে বলতে মনামি !”

• •

নিস্তরুতা ভাঙল স্বপন : “একটি সারা কমা করেছিল কি পরে ?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “না, অনেকদিন পর্যন্ত করেনি।—কিন্তু মেয়েদের ভালোবাসা এমনিই মনামি, যে, তাদের মন কমা না করলেও দরজা কমা করেই। না ক'রেই পারে না।”

ব'লে একটু থেমে শুরু করলেন : “কিন্তু কুমার বলে জ্ঞাত শুধুতোও নাগ তো আর শুকোয় না। এমন কি, সর্বস্বঃকরণে কমা করলেও বেজিনিষটা ছিল তা আর ফেরে না। দার্শনিক হেগেলিটাস বলেছেন না, যে, এক নদীতে মানুষ ঢ়'বার স্নান করতে পারে না—মদী প্রতি দুইভেঁই স্রোতের গুণে বদলে যায় ব'লে ? জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি তব্বদের বেলায়ও তাই। যা যায় তা চিরদিনের জন্মেই যায়। আর এরকম ছোট-খাটো ঘটনা বা ঘটনা-বিপর্যয় কি ছিল একটা ? নিত্যই নতুন বিপত্তি দেখা দিত তিল পরিমাণ বেদ হ'য়ে ও হেঁয় মনের সমস্তা ছাওয়ায় কলে হ'য়ে উঠত ঘনঘটা—ইতালির আধির মতন।”

স্বপন বলল : “কিন্তু এত অস্বস্তি সইতেন তবু ?”

মসিয়ে বেনার স্নান হেসে বললেন : “বন্ধুর, একটা গ্রন্থি যখন পাকে তখন তার মধ্যে খাসরোর ধবার উপক্রম হ'লেও তা থেকে ছাড়া পেতেও বে প্রাণ চায় না। আজকের-মাতুল সরল স্বপ্তি বা অনাবিল শান্তি তো চায় না—চায় সংঘর্ষের ওঠাপড়া—বেধনার তুকান—নিত্য নতুন চমকের দোলা। তা ছাড়া গ্রন্থি যখন ক'রে বাধেও তখনও তার পাশকে নাগপাশ তো মনে হয়ই না—বরং তারই চাপে মনের নানান কড়াবনী



শক্তি সৃষ্টির হাওয়া ওঠে জেগে। মানুষ, বিশেষ করে শিল্পী-প্রকৃতির মানুষ তাই গ্রহি যে মনে-প্রাণে খুলতেই চায় না—বুঝলে না?”

ব’লে একটু থেমে বললেন : “তাই তো জীবনে আসে ড্রামা—আসে ভূমিকম্প। মিথ্যারও একটা প্রবর্তমান নেশা আছে। মানাম ঢাউ বলেছিলেন না—*c’est le premier pas qui coûte* ?\* প্রথম পাক তার দুঃখ দেয় কিন্তু পরে পাকের পর পাক যখন বাঁধে তখন বাইরে থেকে দেখলে তাকে নিছক দুঃখময় মনে হ’লেও অন্তর তা থেকে সংগ্রহ করে এক বিচিত্র রসের খোরাক; আর করে ব’লেই ড্রামাকে মানুষ সর্ষ্পে সাহিত্য—অন্তত সব চেয়ে ইনটেন্স রসসাহিত্যে ব’লে মেনে নিয়েছে সব দেশেই।”

সন্ধ্যা বলল : “সে কি ? লিরিক ?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “হ্যাঁ সহজ সরলপন্থী মানুষের কাছে ভাণ্ডা লাগে, মানি। আমাদের মতন অ-সরলের কাছেও লাগে। কিন্তু ড্রামায় মনের প্রাণের শিরায় শিরায় যে-শিহরণ বয় তার লিরিকের স্নিগ্ধতা পারে কখনো পাল্লা দিয়ে ? লিরিকে অনুভব খুব প্রবল হ’তে পারে না এমন কথা বলি না। কিন্তু ড্রামার সে অনুভব হয় দশগুণ তেজী—তার চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতে। অর্থাৎ বৈষম্য বা বৈরূপ্য আর কি। ছবির পারিভাষিক : *Chiaroscuro*—যা ছিল সামান্য চাক্ষুশ-স্পন্দন—নানা ঘটনা ও চরিত্রের ঠোকাঠুকিতে হ’য়ে দাঁড়াল ভূমিকম্পর কলোচ্ছ্বাস—*cataclysm*। কিন্তু যাক এসব ড্রামা বনাম লিরিক সমগ্র। গল্পটাই বলি।”

পাইপ টানতে টানতে বুদ্ধ বলতে লাগলেন :

\* শুধু প্রথম পাকেই বাজে—তারপরে সব আসে সহজ হ’য়ে।

“এ-গ্রন্থির কত পাক যে নিস্তার হ’ত তার বর্ণনার সময়ও নেই, কুমতাপ না। কেবল এইটুকু বলি যে এ-গ্রন্থির পাক ঘন হ’তে হ’তে শেষটায় দশচক্রে এম্নিই হ’য়ে দাঁড়াল যে, তা থেকে নিজস্ব হ’য়ে উঠল অসম্ভব। এমন কি এ-কথা বললেও বেশি বলা হবে না যে, এ-সময়ে খুব একটা বড় গোছের ভূমিকম্প না এলে এ-গ্রন্থী-সমস্তার সমাধান হ’ত অসম্ভব।—আর জীবনে ভূমিকম্প আসেও তো সেইজন্মেই। কিন্তু সে-কথা যথাস্থানে।” বলতে বলতে তাঁর স্মৃতির মধ্যে একটা আকস্মিক বিস্ময়ের ছায়া এল ঘনিষে। একটু চুপ ক’রে থেকে পরে ফের সহজ স্মৃতি কালে লাগলেন : “সময়ে সময়ে অবশ্য অহুতাপ হ’ত এই ভেবে যে, সারা জুখ পাচ্ছে সব চেয়ে বেশি, অথচ মুখে কিছু বলতেও পাচ্ছে না এই কষ্ট গ্রন্থিদের চাপে। এক এক সময়ে এ-অহুশোচনা এতই তীব্র হ’ত যে এমনও মনে হয়েছে যে, সারা যদি জুলিয়ার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে একটা কলহ ক’রে বসে—একটা ‘সীন’ ক’রে বসে—তা হ’লেও বুঝি এ প্রবুদ্ধমান আড়ষ্টতার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। আর সেই সাথে আমার হৃদয় বলত : জুলিয়ার নিজে থেকেই বোঝা উচিত। অথচ জুলিয়া যদি নিজে থেকে বুঝে ম’রে যেতই চাইত তা হ’লেও আমাকে চক্ষে অঙ্গকার দেখতে হ’ত, কেননা এ-ধরনের শাস্তির কল্পনাতেই কাগত সব চেয়ে অশান্তি আমার মনের মধ্যে। ব’লে সন্ধ্যার পানে চেয়ে একটু চান হেসে বললেন : “এম্নিই বিচিত্র বিরক্ত উপাধানে আমরা তৈরি—করব কি বোলা ? কিন্তু যাক এ-সব খুঁটিনাটির বিচার—”

সন্ধ্যা ব্যস্ত হ’য়ে বলল : “না বাবে না। বলুন। কেবলই সংক্ষেপ কল্পবেন আপনি কেন্ অধিকারে শুনি—আমাদের কোতুলকে চাপিয়ে দিয়ে ?”

মসিয়ে বেনার স্বপনের দিকে চকিত কটাক্ষ করে বললেন : “দেখেছ

সেন, কী উৎসাহ মেয়েদের এসব খুঁটিনাটি শোনবার ? অথচ খানিক আগেই বলছিল গল্পটাই বলতে ।”

সন্ধ্যা রাগন্ত সুরে বলল : “এ বুঝি গল্প নয় ? বা রে ! তবে সত্যি গল্প বুঝি—এক যে ছিল রাজা—তার যে ছিল রাণী ?—শুধু ভক্তি ? কী বলছি যায় আসে না,—শুধু কেমন ক’রে বলছি—এই-ই ? Merci মসিয়ে । আমি চাই না অমন শিল্পিলাসিনী হ’তে ।”

ঘরের মধ্যে সবাই হাসল, কিন্তু মুহু হাসি । রেশ না ফুটতেই থেমে গেল ।

## উদ্দীপন

যখন বৃদ্ধ ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন তখন তাঁর মুখের আলোটুকু ছায়ায় গেছে তেকে : “আর বলবার বড় বেশি নেই সন্ধ্যা । আমার কথাটি ফুরিয়ে এসেছে । এবার শেষ অঙ্কটুকু ব’লেই পাড়ি টানব ।”

আনা সজোরে ঘাড় নেড়ে বলল : “পাড়ি টানবেন বৈ কি । জুলিয়ার কথা কতটুকু হ’ল বলুন-তো ? সে হচ্ছে না । আগে বলুন তার কথা । স—ব ।”

মসিয়ে বেনার ঈষৎ রান হেসে বললেন : “সবই কি গল্পে বলতে হয় আনা ? তা হ’লে করনা বেচারি বায় কোথায় ?”

আনা বলল : “সে গল্পের রাজ্যে । মাতৃবৈর চিত্তরঞ্জনর রাজ্যে । জীবনের রাজ্যে তার মনের পরশই আমার চাই—তার সবটুকু মনের পরশ । আপানী চিত্তীর মস্তন দ্বিগুণে একটুখানি রক্তের ছোঁয়াচ দিয়ে সুর্য্যোদয়—সে নয় । আমি চাই সোনার সোনার আকাশের বৃক কেমন ক’রে

রাষ্ট্রে ওঠে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি—রঙের ইতিহাসের এলাকার।  
জীবন থেকে যে-আট বিচ্ছিন্ন তাকে আমি চাই না। সে-আট থাকুক  
আপনাদের মতন শিরোংসাহীদের একচেটে সম্পত্তি, কোনোরূপে  
হিংসে করব না আমি তাকে। কল্পনার অস্বরূপ-চারপাশে পরের বেলায়  
আমার সম্মতি থাকলেও নিজের বেলায় আগ্রহ নেই।”

মসিয়ে বেনার সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন : “কী গো কল্পনামতিকা !  
তোমার ? করো লড়াই করাসিনী-বাস্তবিনীর সঙ্গে।”

সন্ধ্যা একটু হাসল শুধু।

মসিয়ে বেনার আনাকে বললেন : “কিন্তু জুলিয়ার কথা বাস্তবিনীর  
ভালো লাগলেও কল্পনাবিলাসিনীর ভালো লাগবে কি না ভেবে নেবে  
কি ? উনি যে চান শুধু পতিরতা সারার কথাই শুনতে।”

সন্ধ্যা বলল : “না মসিয়ে, উচ্ছৃঙ্খল জুলিয়ার কথাও আমি শুনতে  
পারি—যদি—” বলে একটু দমে ওঠাৎ যেন জোর করেই বলে বলল :  
“যদি—সবটুকু বলেন সে-অসম্ভ্যতার সম্বন্ধে—অবশ্য আত্মসমীক্ষার সম্বন্ধে  
ঘুচিয়ে। নইলে থাক ও কুহেলিকার আবছা গবেষণা।”

সবাই তার দিকে একটু আশ্চর্য হয়ে তাকাল। মসিয়ে বেনার  
বললেন : “বুঝেছি শেরি। কিন্তু—” বলে একটু থমকে গাছীর হয়ে  
কি ভাবলেন, পরে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে বললেন : “কিন্তু এসময়ে  
জুলিয়া সম্বন্ধে ঠিক কী জানতে চাইছ তুমি একটু বলবে আগে ?”

সন্ধ্যা একটু ইতস্ততঃ করে বলল : “সারা সম্বন্ধে সে ঠিক কী  
ভাবত।”

আনা ও স্বপনের দৃষ্টি পড়ল সন্ধ্যার ওর মুখের উপরে। মুখ ওর হয়ে  
উঠল টকটকে রাঙা। বুক ওর একটি হাত নিজের হুঠোর মধ্যে টেনে  
নিয়ে ওর দিকে তাকালেন।

সন্ধ্যা নতমুখে কুণ্ঠিত সুরে বলল : “অবশ্য যদি বলতে আপত্তি না থাকে—”

মসিয়ে বেনার তৎক্ষণাৎ একটু হেসে কথাটাকে ঘেন খুব সহজ ক’রে নিয়ে বললেন : “আপত্তি কিছুই নেই শেরি। কেবল—” ব’লে তার হাতের পুরে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন : “কেবল কি জানো ? ঠিক এই প্রশ্নটির সহজ উত্তর দেওয়াই আমার পক্ষে সব চেয়ে কঠিন। এক্ষেত্রে সরলপন্থাই যে থেকে সব চেয়ে জটিল। কারণ আমার কোনো কুণ্ঠা নয়, কারণ এই যে, এ-সময়ে জুলিয়ার সঙ্গে সারা সম্বন্ধে কথা প্রায় হ’ত না বললেই হয়।”

সন্ধ্যা তাঁর দিকে চেয়ে ঈষৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল : “কিন্তু এ-রকম এক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় যে-জানাজানি তা কি ঘটে মুখের কথা’র মধ্যে দিয়েই মসিয়ে ?”

বুদ্ধ উজ্জলনেয়ে তার চোখের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। পরে বললেন : “না শেরি। তোমার সঙ্গে এঁটে ওঠা ভার মানছি। যদি শোনো তবে। কেননা—” ব’লে একটু থেমে : “বুঝছি—তুমি বুঝবে।”

সন্ধ্যা ঈষৎ বাস্তবের সুরে বলল : “ভয় হচ্ছিল বুঝি ?”

বুদ্ধ এবার যে হাসলেন তার মধ্যে মানিয়ার আভাষ ছিল স্পষ্ট। বললেন : “রাগ কোনো না শেরি, হচ্ছিল।—কিন্তু হওয়া স্বাভাবিক ভেবে হয়তো আমার সঙ্কোচকে ক্ষমা করতে পারবে।—তবে কি রকম সঙ্কোচ জানো ? মানুষ যেখানে খুব গভীরভাবে অজুতব করে—সেখানকার ছবিগুলির আলোছায়াটি ঠিক যে-ভাবে সে দেখে সেই-ভাবেই চার অপরের চোখে ফলাও ক’রে তুলতে। ঠিক সে-রঙটি সে-পরিপ্রেক্ষিকিটি তার কাছে—বোঝা হয়তো। কিংবা—” ব’লেই থেমে গেলেন।

সন্ধ্যা একটু চুপ ক'রে থেকে নরম স্বরে বলল : “বলুন মসিয়ে, আমি ভুল বুঝব না।”

মসিয়ে বেনার তার চোখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে। পরে বললেন : “শোনো তবে।”

ব'লে আবার একটু চুপ ক'রে কি ভাবলেন, পরে হুত করলেন : “জুলিয়ার সঙ্গে এ সময়ে আমার সারা সন্ধ্যা খোলাখুলি কথা প্রায় হ'তই না একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু তার আকারে ইচ্ছিতে একথা বৃহতে একটুও বেগ পেতে হ'ত না আমাকে যে, হৃদয় তার মনে কারুর চেয়ে কম ছিল না। হয়তো আমাদের মধ্যে এক দিক দিয়ে ভিতরকার সংঘর্ষ ছিল তারই সব চেয়ে বেশি।”

সন্ধ্যা বলল : “সে আপনাদের পরিবারে সব চেয়ে বেশি অ-ঘরোয়া ছিল ব'লে?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “কতকটা। তবে পুরো নয়। হয়েছিল কি, তার মনের মধ্যে সন্দোহ ছিল এক দিক দিয়ে যেমন সব চেয়ে কম— সে ঐ যা বললে অ-ঘরোয়া ছিল ব'লে—আর এক দিক দিয়ে এইভাবেই তার মনের মধ্যে তুফান জেগে উঠত প্রতি পদে।”

সন্ধ্যা বলল : “গৃহহীনার অন্তর্দাহ—গৃহী ও গৃহহীনার বিচ্ছেদ?”

মসিয়ে বেনার চিন্তিত স্বরে বললেন : “দ্রিক অন্তর্দাহ না। তবে গৃহহীনা বখন কারুর কাছে আশ্রয় পায় তখন এক দিকে তার যেমন কৃতজ্ঞতা ওঠে তুলে অন্তর্দাহ দিকে এই কৃতজ্ঞতাই সব চেয়ে বাজে তার বুকে। কখনো কি বুকে? না, একটু কাপসা লাগছে।”

সন্ধ্যা মুখ নিচু করেছিল, তাকিয়ে বলল : “কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ হ'বে ব'লে, না একটা ভার ব'লে?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “হুই-ই সন্ধ্যা। খুব কম মানুষই সংসারে

কৃতজ্ঞতার অগ্নিকে বা ভারকে কৃতজ্ঞচিত্তে বহন করতে পারে। মহাশয়, ঔদার্যের একটা মন্ত নিদর্শনই বোধ হয় এই যে কৃতজ্ঞতার অগ্নি তার বৃকে জগদল পাথর হ'য়ে চাপে না, দৌলে আনন্দের মালা হ'য়েই। কিন্তু মন যেখানে মুক্তির আশ্বাদ পায়নি, সেখানে এই কৃতজ্ঞতা হ'য়ে ওঠে শৃঙ্খল, মালা নয়। মাতুল্য তা থেকে মুক্তি পেতে চায়—কিন্তু এক খুব ছোট মন ছাড়া মুক্তি পেতেও পারে না অগ্নিকে উড়িয়ে দিয়ে। ফলে প্রথমটা ক্ষোভ জাগে কৃতজ্ঞতারই 'পরে,—তারপর—যার প্রতি কৃতজ্ঞ হচ্ছে তারই 'পরে।”

সবাই চুপ ক'রে রইল। বুক বলতে লাগলেন : “তাই নানা রকম উলটোপালটা ভাব তার মনে বাসা বাঁধত নিতাই। এক দিকে আশ্রয় পেয়ে আনন্দ, অপর দিকে ঠিক সেইজন্যই আক্ষেপ। এক দিকে লিঙ্গিত ভক্তে নিশ্চিন্ততা, অপর দিকে তাকে অপরের হাতে খানিকটা সঁপে দিতে বাধ্য হওয়ার বেদনা। এক দিকে আমার আসক্তির ফলে সারার কথা ভেবে দুঃখ বোধ করা—অপর দিকে বলেছি, একটা বেন শোধ, বাকীর আনন্দ। যদিও এ-ধরনের হৃদয় জিয়াংসাকে সে অনেক সময়ে দমন করত, কিন্তু সব সময়ে পারত না। কারণ এক দিকে তার প্রতি আমার প্রবর্তমান আসক্তির দৃষ্টে যেমন সে খুসি না হ'য়েই পারত না—তেমনি অপর দিকে নিজের আমার প্রতি আসক্ত হ'য়ে উঠছে দেখেও আবার সে হ'য়ে উঠত ব্যস্ত। মনে হ'ত, বেন সারার প্রতি তার সত্য কৃতজ্ঞতার কোথার বাধা পড়ছে ভেবেই তার এত বাধছে।”

সন্ধ্যা সকৌতুহলে বলল : “সারার ও তার মৌখিক আচরণে কখনও কোনো বিসদৃশ কিছু ঘটত না?”

মসিয়ার বেনার চিত্তিত হুঁরে বললেন : “ঠিক বিসদৃশ হাকে বলে—তা বড় একটা ঘটত না এ সময়ে—কিন্তু অবস্থাটা ক্রমেই যে ঘোরালো হ'য়ে

আসছিল এ নিশ্চয়। আর এই গুমটের ফলেই সারা হচ্ছে না ক'রেও— এমন কি অনেক সময় আত্মসংবরণ করতে চেষ্টা ক'রেও—নানা ছদ্মবেশে তার সঙ্গে একটু-আধটু অশোভন আচরণ ক'রে এসত। তারপরেই অবজ্ঞা বেশি ক'রেই আপ্যায়নে ব্রতী হ'ত—কিন্তু—ব'লে মৃত হেসে বললেন : “জানো তো, এরূপ ক্ষেত্রে পরেকার সম্ভাষণে কখনো আগেকার রূঢ়তার কতিপূরণ হয় না। অনেকদিনের প্রীতি (মিত্রতা) তোলা সহজ, কিন্তু হৃদয় রূঢ়তার কাটাকে মন থেকে উপড়ে ফেলতে পারে ক'জন ?”

ব'লে একটু থেমে বললেন : “কিন্তু এরকম চাপাচাপি দিয়ে কি মৌখিক শীলতা ও সৌচবোধ চাটে নিহিত মনোভাবকে বেশিদিন গোপন রাখা যায় ? তাই সারার ও জুলিয়ার শত চেষ্টা সত্ত্বেও শেষে একদিন একটা ‘সীন’ হ'য়ে গেল।”

সকলে উৎকর্ণ হ'য়ে উঠল। বৃদ্ধ বলতে লাগলেন : “সেদিন জুলিয়া একটা নূতন নাচ দেখাচ্ছিল আনাদের ড্রিংকমে এক সান্ডা-আসরে। হঠাৎ মাকপথে সারা উঠে চ'লে গেল। ঘটনাটা অবজ্ঞা অতি সামান্য। কিন্তু সে সময়ের কণ্টকটে সব জড়িয়ে ব্যাপারটা এমনই বিশিষ্ট দেখাল যে বলা যায় না। বিশেষ ক'রে এইভাবে যে, সারাই গৃহকর্ত্রী—হোস্টেস। জুলিয়া নানা সময়ে সারাকে অবজ্ঞাই ক'রে চলত ইচ্ছে ক'রে—কিন্তু সেদিন সে-ও তার এ-আচরণের কুশীলতার নিকটায় প্রতি অঙ্গ থাকতে পারল না। তার মুখ ক্রোধে, কোভে বাঁটা ক'রে উঠেই ছাইয়ের মতন সাদা হ'য়ে গেল। সে নাচ থামিয়ে সোজা দোর গুলে বাইরের আলনা থেকে টুপি নিয়ে বলল : ‘সিরের, আমি চললাম। আর আসব না।’ আমি তাকে কি বোকাব ভেবেই পেলাম না। তবু দু-চারটে বাজে ‘না-না’ করলাম—যেমন এ-রকম ক্ষেত্রে মানুষ করার ভুলেই ক'রে থাকে। কিন্তু



সে রইল না। ক্রোধে তার ক্রক্ষে জল উপচে পড়েছে। বলল : ‘না গিরের, সারাই ঠিক। আমার মতন অজ্ঞাতকুললীলা নর্তকীর সঙ্গে ভোমাদের মতন সম্ভ্রান্ত পরিবারের না-মেশাই ভালো। লিলিকে নিজে কাল লোক পাঠিয়ে দেব। এতটা স্থূলতা ওর বরদাস্ত হবার কথা নয়।’ ব’লে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন : ‘বুঝ ত কোথায় বিধত?’

সন্ধ্যা উৎসুক কণ্ঠে বলল : ‘তারপর?’

মসিয়ে বেনার বললেন : ‘তার পর আর কি? আমি সারাকে নিয়ে জুলিয়ার ওখানে ছুটলাম। জুলিয়া লিলিকে নিয়ে যাবে শুনে হো-সারা কৈদেই আকুল। তার গলা জড়িয়ে ধ’রে বলল সে ইচ্ছে ক’রে জেনে শুনে তাকে অপমান করেনি—তার শরীর ও মেজাজ সেদিন নানা কারণে—ইত্যাদি। মিটমাট হ’য়ে গেল—বিশেষতঃ লিলির কথায় সারার কারণ জুলিয়ার রাগ জল হ’য়ে গেল। দুই মা-র একটি শিশুকে সে যে কী অপরূপ ভালোবাসে—’ ব’লে বৃদ্ধ একটু শ্বেনে বললেন : ‘আহা!’—অজ্ঞমনস্ক সুরে। সকলেই তাঁর দিকে উৎসুক নেত্রে চেয়ে!

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন তেমনি স্থিতিচাপী সুরেই : ‘সত্যিই সে দুঃখ এত মধুর!’ ব’লে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে বললেন : ‘জানো আমার কি মনে হয় সন্ধ্যা?—আমার মনে হয় যে, এই একটা ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে এমন একটা সত্য সখিত্বের বন্ধন ছিল যে-বন্ধন কেবল এক মেয়েদের মধ্যেই গড়ে উঠতে পারে।’

সন্ধ্যা খুসি হ’য়ে বলল : ‘মানে, পুরুষদের মধ্যে পারে না?’

মসিয়ে বেনার বললেন : ‘না। তাদের বন্ধন এই ধরণের নীড়-বাঁধার ক্ষেত্রে হ’তে পারে না—বহিঃ নীড়-বাঁধার ক্ষেত্রে—যেমন দূর-অভিবান, বিপ্লব, সম্রাস, সদারিত এ-সব—পারে।’ বলে একটু শ্বেনে বললেন :

“আর আমার বিশ্বাস : সারা ও জুলিয়ার মধ্যে যে এ সময়ে পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটেছে পারেনি সে এই লিলির জন্তেই। নৈলে সারা সম্ভবত জুলিয়াকে তার গৃহস্থালীর ছায়া মাড়াতোও দিত না।”

আনা বলল : “তাদের মধ্যে সত্যি একটা মেহ গড়ে উঠেছিল লিলিকে কেন্দ্র করে—তুখু এইজন্তেই কি সারা তাকে কাছে আসতে দিত বলতে চাইছেন?”

মসিয়ে বেনার বললেন : “পানিকটা, বমিও সম্পূর্ণ নয়। কারণ—  
বলেছি : ওরা পরস্পরের বিশিষ্ট গুণের সংকে সচেতনও ছিল যে।  
জুলিয়াও সারার শান্ত নিপুণ ব্যবহারের আবহাওয়ায় জড়াত অনেকটা,  
সারাও তার নাচগানে অসামান্য সুষ্ট-প্রতিভা দেখে নারীহের একটা  
অভিনব মহিমার আভাষে হ’ত মুগ্ধ। পরস্পরের কাছ থেকে ওরা এই  
‘হৃদয় কাঁটা সবেও তাই কিছু পেত বৈ কি। কিছু তবু আমি বলব যে,  
মেয়েদের কাছে এ-ধরনের নৈব্যক্তিক রস পানিকটা বেশ—অন্তত সারা  
নতন মেয়ের কাছে তো বটেই—তাঁই ওদের সত্যতম বন্ধন ছিল ছোট  
লিলি। ছুটি নারী জন্মের নদী মিশেছিল এসে বিশাল কোনো সমুদ্রে  
নয়—ছোট্ট একটি তড়াগে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, এ-পরিণতিতে  
ওদের মেহ-স্রোতধিনী এমন অপূর্ণ ভাবেই সার্থক হয়ে উঠত যে শত  
বাধা সবেও ওরা পরস্পরকে ভালোবাসতে দিবেছিল এই একমুখী  
ধারার পথে।”

ব’লে একটু থেমে বললেন : “কিন্তু এ-কথা বলার মানে নয় যে, বাধা-  
ওদের জন্তে মানি জমত না ওদের গুজনার মনে। সত্যি বলতে কি,  
ওদের মধ্যে সখিত্ব-বন্ধন সবেও ওরা পরস্পরের নানা বিশদূষণ ব্যবহার  
কুলতে পারেনি কোনোদিনই। বিশেষ করে এই লীনটার জন্তে জুলিয়া  
কোনোদিনই সারাকে মন থেকে দূর ক করতে পারেনি। এবং আর আর

ক'রে এর দক্ষ চাপা মনোমালিন্কেট ওদের সখিদের মধ্যে চিড় ধরল।”

স্বপন বলল : “তার মানে ?”

—“মানে সে নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠল আর কি। এতদিন যে-অন্যতম বিস্মৃতাটুকুকে ঢাকাঢুকি দিয়ে চলছিল সেটাকে ক'রে দিল বে-আক।”

—“কি উপায়ে ?”

—“নানা উপায়ে। এতদিন সারার সামনে সে আমার সঙ্গে একটু কন্ম অন্তরঙ্গতা দেখাত। এখন থেকে শুরু করল অত্যন্ত সহজ আচরণ। ভাবটা অবশ্য—আমি তার বন্ধুমান্ন আর কি, বন্ধুনে না? কাজেই সঙ্কোচের স্বল্প পরদায়ে ছিন্নভিন্ন করা ছাড়া উপায় কি বলো? সে আমাদের ওখানে আরও বেশি ক'রে হাসতে, নাচতে, গাইতে শুরু ক'রে দিল। যখন-তখন আমাকে তার কাবারেতে তার নতুন-নতুন নাচ দেখাতে টেনে নিয়ে যেতে লাগল—সারার প্রতি নিষ্ঠুর হবার পদ্ধতি ছিল ‘কি’ তার একটা? বেচারি সারা মৌন হ'য়ে থাকত। কখনো কখনো ‘অসহ্য হ'লে জলভরা চোখে মাথা-ধরার ওজরে হান ত্যাগ করত। তার চোখের জল জুলিয়া দেখেও দেখত না—আমিও স্বীকার করতাম না যে সে ব্যথা পাচ্ছে।”

সন্ধ্যা ধরা গলায় বলল : “তারপর ?”

মসিয়ে বেনার স্নান হাসি টেনে বললেন : “তারপর আর কি? এ-সবের মধ্যে বোঝা বিষয় সারা আমার চোখের ওপর শুকিয়ে যেতে লাগল—অথচ আমি একটা কথাও বলতে পারতাম না।”

সন্ধ্যা বলল : “কেন পারতেন না?” অজ্ঞাতসারে তার কণ্ঠে তীক্ষ্ণতা ফুটে ওঠে।...

বুঝ বললেন : “সেটা আমার অবস্থার না পড়লে হয়তো ঠিক বুঝতে

পারবে না। সময়ে সময়ে মানি আসত না বলি না। কিন্তু দিন দিন নানান হুস্ম মিথ্যাচারে বেন অসহায়—নির্ভীক হ'য়ে পড়ছিলাম। মিথ্যার ফলে অসুভবের দার ফ'য়ে যায়—কে না জানে বলে? তা ছাড়া ব্যাপারটা নানারকম বোঁগাযোগে এমনট জটিল হ'য়ে পড়ছিল যে বর্ণনা ক'রে বোঝানোও শক্ত। এক দিকে জুলিয়ার রূপের মোহ, অপর দিকে সারার প্রতি ভালোবাসার কর্তব্য; এক দিকে লিলিকেও ছাড়া যায় না, অপর দিকে জুলিয়াকে সংবত হ'তেও বলা যায় না—যেহেতু সে বিসম্মত অসংযমও কিছু করতে না; এক দিকে আমাদের গৃহে জুলিয়ার নাচ গান হাসি-গল্পের দেয়ালিকে নিভিয়ে দিতে মন চায় না, অপর দিকে গৃহের শান্তি ও মনের স্বস্তিরও যায়-যায় অবস্থা। আর সব চেয়ে মুঞ্চিল সেই উদ্বেজনারকে নিয়ে যা ভূপ্তিহীন—অপচ তাকে ছাড়তে গেলেও মন পড়ে দুঃমান হ'য়ে। জীবন দেবতা আর কিছু ভাঙন না ভাঙন মাথারকে আলোরার পিছনে দাওয়া করতে জানেন এ নিশ্চয়।

স্বপন ও সন্ধ্যা প্রায় একত্রেই ব'লে উঠল : “তারপর?”

মসিয়ে বেনার দম নিয়ে শান্তভাবে বলতে লাগলেন : “এই সময়ে হঠাৎ লিলির সাংঘাতিক অসুখ হ'ল—টাইফয়েড। সারার ও জুলিয়ার দুখ শুকিয়ে গেল। ডাক্তারের মুখ মেঘাচ্ছন্ন। বললেন : খুব ভাল উদ্ভাব দরকার, নইলে ইত্যাদি।

“আমি-য়ে-আনি,—আমারই বুক উঠল কেঁপে। অমন ফুলের মতন মেয়ে! আর কথায় সুধা করা থাকে বলে। যে তাকে কেবত মুখ হ'য়ে বেঁচে। ঐ ন-দশ বছর বরসেই কী সুন্দরট যে নাচত!—ওহু জুলিয়ার নাচ দেখে দেখে। জুলিয়া সগর্ভে হেসে বলত : এ-মেয়ে পুরুষের বুক বুক জাগাবে হাছাকাড়। গর্ভের ভারও ছিল বৈ কি!

“সারা জুলিয়াকে আমাদের ওখানেই থাকতে বলল। জুলিয়া হু

নাসের ছুটি নিল কাবারে থেকে। আমরা তিনজন পালা ক'রে লিনিয়  
শুক্রমা আরম্ভ করলাম। আমাদের মধ্যে আবার মিলন হ'ল। দুঃস্বপ্নের  
এই একটা মন্ত দান।

“কিন্তু লিলি বাঁচল না! চুয়াল্লিশ দিন ভুগে আফোটা ফুলটি গেল  
ক'রে। এবার ওর ছোয়াচে জুলিয়ার হ'ল টাইফয়েড। সারা ও আমি  
আবার তাকে শুশ্রূষা করতে লেগে গেলাম।”

রক্ত বলতে লাগলেন :

“কিন্তু এবার সারার দেহও বইল না। একেই অন্তর্দ্বন্দ্বের তার মা  
হুর্দ্বাল হয়ে পড়েছিল, তার ওপরে প্রায় দু'মাস ধ'রে লিনিয় জন্তে অসহ্য  
রাতজাগা ও উৎকর্ষ। জুলিয়ার অস্থিরের মধ্যেই সে-ও পড়ল।  
ব্রেনফিভার মতন। একটু সেয়ে উঠতেই ডাক্তার বললেন—সমুদ্রতীরে  
পাঠানো দরকার। সারাকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে আমার এক বন্ধর  
সঙ্গে 'দিয়েপ'-এ পাঠালাম একটি ভালো স্থানিটেরিয়ায়। আমাকে  
ফেলে সে প্রথমে যেতে চায়নি, কিন্তু এ-সময়ে বায়ু পরিষ্কার দরকার  
ব'লে অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে ওকে পাঠাই দিয়েপে।

“সারা চ'লে গেল জুলিয়ার জন্তে নাসের ব্যবস্থা ক'রে। আমাকে  
মাথার দিবি দিয়ে গেল যেন জুলিয়ার জন্তে অনর্থক রাত জেগে নিজের  
শরীর না ধারাপ করি—নাস' বখন রইলই। সারার সঙ্গে আমার  
বাওয়ার উপায় ছিল না—কেমনা সারা তবু অনেকটা সেয়ে উঠেছিল  
কিন্তু জুলিয়া শয়োগত। তবু আমি যেতে চেয়েছিলাম—কিন্তু সে শুধু  
মন রাখা প্রস্তাবে সারা রাজি হ'ল না—আমাকে জুলিয়ার শিরের বেধে  
একটি পরিচারিকা সঙ্গে ক'রে চ'লে গেল দিয়েপে।

সারা জুলিয়ার নাসের ব্যবস্থা ক'রে বাওয়া সঙ্গেও সে অস্থিরের সমস্ত  
শুধু আমাকেই চাইত। তার অয়ের সফট অবস্থা সতের দিনের দিনই

কেটে গেল বটে, কিন্তু লিলির বিয়োগ-বাথা তো কাটেনি। কাজেই আমাকে সব কাজ ফেলে তার পাশে-পাশেই থাকতে হ'ত, নানান সাহসনা দিতে হ'ত, নানান গল্প ক'রে তাকে প্রফুল্ল ক'রে তোলাব চেষ্টা করতে হ'ত ইত্যাদি ইত্যাদি।

“কল—অতুমেয়। একেই আমাদের আকর্ষণের তখন ভরা লোভাব—তার ওপর সারা পাশে নেই—আর সবায় ওপর লিখিত যুক্ত। তখনের মধ্যে টানটা দেখতে দেখতে প্রবল আকর্ষণের দিকে মোড় মিল। আর আশ্চর্য্য এই যে, আমাদের এই তুনিরোধ আসক্তির এমন কি আর তেমন অতুতাপও হ'ত না। সারাব কথা বড় একটা কেউই কুলতাম না।

“কিন্তু সারা মাঝে মাঝে চিঠি লিপ্ত ও জুলিয়াকে দিয়েছে নিয়ে আসতে বলত শরীর সারতে। ডাক্তারও এ-প্রকারে মাগ দিলেন, সে-সময়ে দিয়েছে চমৎকার সময় ব'লেও বটে—বাসু-পরিবর্তন সবকার ব'লেও বটে। কাজেই জুলিয়ার বা আমার দিয়েছে যাবার খব ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হ'ল। এখন ভাবি ছায়,—যদি না যেতাম!”

ব'লে তাঁর জানাত স্বরকে যেন ছোর ক'রেই ঐসং সময় ক'রে নিয়ে ব'লে চললেন : “দিয়েছে আমরা তিনজনে একটা ছোট বাড়ি নিলাম। হ'তলা। উপরের তলায় দুটি শোবার ঘর। একটিতে জুলিয়া শুত, অপরটিতে আমরা। নিচে তিনটি ঘর। একটিতে খাওয়া-পাওয়া ও একটিতে বসা। অল্পটি বাগাবর। একটি ছোট বহিরাগতি মতন ছিল—সেটিকে আমার ঠুঁড়িয়ে মতন ক'রে নিয়েছিল্যম। ছনাদের করে ব্রিয়েপের এ-বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হ'ল।

“আশ্চর্য্য এই যে, জুলিয়া ঢের শক্ত অতুখে পড়া সবেও যেনে উঠল তাড়াহাড়ি, কিন্তু সারা যেন সেতেও সাহসত চায় না। তার দেহটা একরকম সুস্থ হ'য়ে উঠলেও মনে হ'ত—মনটার মধ্যে কোথায় যেন

কি-একটা বিকল হ'য়ে গেছে। কেবল আমি দিয়েপে আসার দিন তার গাল দুটিতে বোধ হয় মুহূর্তকালের জন্যে একটু রাঙা আভার মতন দেখা গিয়েছিল—ভীরপরে তার মুখের সেই মৃত্যুপাগুরতা আর কাটেনি—হাসিতে, গল্পে, বেড়ানোতে—কোনো কিছুতেই নয়।

“আমি বুঝতাম অবশ্য—বাপার কি। আমাকে দেখলে জুলিয়ার চোখ-মুখ যে-ভাবে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠত—আমার কথাবার্তা সে যে-রকম উৎকর্ষ হ'য়ে শুনত—আমার রসিকতায় সে যে-রকমভাবে হাসত—সে-সবের কিছুই যে সারার চোখ এড়িয়ে যেতে পারেনি তা আমার নজরে পড়তে বাকি ছিল না; জুলিয়ারও না। অথচ তার এ বিমর্ষ ভাব আমরা যেন দেখেও দেখতাম না, বা নিজেরদের নিভৃত আলোচনায় তার কাতরতা-সম্বন্ধে কোনো কথাই পাড়তাম না। শেষে যখন এ-কথা না-পেড়েই পারা গেল না তখন বলাবলি করতাম যে, এ সারার বাড়াবাড়ি। দু-একদিন তাকে একান্তেও বললাম। মেয়ে কি কারুর মারি খায় না! সারাকে দোষ দিয়ে নিজেরা কোথায় যেন একটু স্বস্তিও পেতাম। অপর মজা এই যে, সারার বিমর্ষতার কারণ যে লিলির শোক ছাড়া আর কিছুই না এটা ক্রমাগত ব'লে ব'লে শেষটায় প্রায় নিজেরাও বিশ্বাস ক'রে বসেছিলাম।” বলতে বলতে মসিয়ে বেনারের ওষ্ঠপ্রান্তে ব্যঙ্গের আভা ফুটে উঠল।

একটু থেমে আবার পূর্ববৎ একটানা ক্রান্ত স্বরে বুদ্ধ বলতে লাগলেন : “কিন্তু শেষটায় এমনই হ'য়ে উঠল যে আমরা তিনজনেই কেমন যেন ভাবি বাধ বাধ বোধ করতে লাগলাম। সারার উপস্থিতিতে মনে হ'ত যেন অনেকটা মৃত্যুর ছায়ার মতনই—যেন একটা মেঘলা শুভ্রের জুকুটির মতন—বর্ষারও না অথচ বনিয়ে উঠে মনের উপরে অস্বাচ্ছন্দ্য আনে বহন ক'রে। আমাদের হাসি-গল্প করতে ইচ্ছা হ'ত—কিন্তু সারা থাকলে তো

হাসি-গল্প জমত না। গান-বাজনা করতে ইচ্ছা হ'ত কিন্তু সারা থাকলে গলাই থুগত না—নাচতে, বায়ছোপে যেতে ইচ্ছা হ'ত—কিন্তু ঐ এক বাধা—সারা। তার বিষন্নতার আবছা রাহ যেন সর্বদাই আমাদের সব আনন্দ-আলোকে করত গ্রাস। না, রাহ বলাটা তুল, ছায়া—একটা রান অথচ অনপনের মেঘের মতন। আলোর সঙ্গে যে বাধ সাধে না ঠিক অথচ তবু আলোর উজ্জলতাকে দেয় যেন নিভিয়ে—ঐ সাগর বুকে দিগন্তের কাছে কুয়াশার মতন।

“অথচ তাকে বেশি কিছু বলারও উপায় ছিল না। ছাত্রকলিন তাকে একটু প্রফুল্ল হ'তে বলায় তার চোখে এমন জল উপ্ছে পড়ে যে তাকে আর পীড়াপীড়ি করতেও সাহস পেতাম না। এ সময়ে এত সহজে তার চোখে জল আসত—দে, খুব সাবধান হ'য়েই কথা কইতে হ'ত।

“কলে কুলিয়ার চাল-চলন, হাত-প্রফুল্লতা ধরণ-ধারণ আমার কাছে আরও কাম্য হ'য়ে উঠল—মরুভূমির অসহ্যতার মাকে বাসিধার মিত্রতার মতন। আমি তার সাহচর্যে আরও বেশি ক'রে দুঃখিতাম মিত্রতা—দেও আমার সঙ্গে র জন্তে বেশি উন্মুখ হ'য়ে থাকত প্রফুল্ল মুখে। এমনিই দাড়িয়ে গেল আপনা-আপনি, যেন সাগরকে আমরা তখনই একটু এড়িয়েই চলতে চাইছি। নিজদের মধ্যে যুগে একথা স্বীকার করতাম না বটে—কিন্তু মনে মনে স্বীকার না করেই পারিনি। সাগরকে আমাদের সঙ্গে নানা জায়গায় বেড়াতে বাধ্য র জন্তে একবার ক'রে ‘চলো সারা’ বলে খুবই সাগ্রহে অগ্ররোধ করতাম বটে—কিন্তু বেশ জানতাম—সে আমাদের অতি-সাদর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেই আমরা বেশি সোয়াস্তি পাব।

“এ-কথাও সারা বুকল বৈ কি ক্রমে ক্রমে। প্রথম প্রথম এক-আধ দিন আমাদের সঙ্গে ও বায়ছোপ, থিয়েটারে গিয়েছিল—কিন্তু গিয়েই



তার হৃদয় সহজবোধ দিয়ে বুঝেছিল যে তার উপস্থিতিতে আমাদের পাট্টা, কি রকম শ্রীহীন হয়ে পড়ছে। তাই ছ-চার দিন বাদে সে আমাদের মৌখিক অনুরোধকে প্রত্যাখ্যান করতে সুরু করল। মানন অস্বহ্য। আমরা অনেকটা ঠাট বজায় রাখতেই প্রথমটায় একটু কিস্ক-কিস্ক করতাম—কিন্তু দু'দিনেই সে ভাবটাও গেল কেটে। আমি ও জুলিয়া তাকে ফেলেই এখানে-সেখানে থিয়েটার, বায়কোপ, পিকনিক প্রভৃতিতে বেতে আরম্ভ করলাম। সারার চায়ামুষ্টি আরও যেন একটু দূরে সরে গেল। তার স্নান অস্ত্রিষের ক্ষীণ সুরটুকু আরও যেন উবে গেল। কলে আমাদের কুণ্ডাটাও ভেতরে একেবারে দূর হয়ে না থাক—বাইরের ব্যবহারে অন্তত কেটে গেল। আমরা যেন ভুলেই গেলাম—সে বেচারি কত একলা।” বুদ্ধ চূপ করলেন—এমনিই।

সন্ধ্যা ধরা গলায় বলল : “তারপর ?”

—“তারপর আর কি ? বা হবার তাই : জুলিয়ার যেনেশে এতদিন ছিল আমার আকর্ষণ পূর্ণ করে—সে চ'ড়ে বসল মস্তিষ্কে। নেশারই বা অপরাধ কি বলা ? জুলিয়া সরে-ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার এমন হৃদয় হয়ে উঠেছিল ! আগেকার চেয়েও হৃদয়। প্রতি হাসিতে তার যেন বিদ্যুৎ পড়ত ঠিকরে—প্রতি কটাক্ষে মাতাল কামনা। এমন কি সারার সামনেও সে অনেক সময়ে তার মিতাচার রক্ষা করে চলতে পারত না। আর তার দরকারও ছিল না হয়তো। কারণ বাইরের ব্যবহারে তাকে সমীহ করে চললেও তাতে করে সারার গোপন বেদনার লাম্বব তো হ'ত না এতটুকুও। হোক বা না হোক, আমরা উদ্ধাম হয়ে উঠলাম। জোয়ারের ওপর বৃষ্টির বজা—বাধ কতক্ষণ থাকে বলা ? তবু শেষ পর্যন্ত বুঝেছিলাম একটা নিহিত সঙ্কোচ-বশে। শেষে যে-দুটো—না, শোনা।”

ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে বড় অন্ন হাসলেন—আপন মনে। কিন্তু সে-হাসি বেন অক্ষরই ছিলনা...মুহূর্ত পরেই যার মসিয়ে.....তিনি পূর্ণবৎ শান্ত উদাস-স্বরে বলতে লাগলেন :

“সেদিন নববর্ষ। দিয়েরে আমার একটি ধনী মকেল বড়র বাড়ীতে ‘বল’। আমাদের তিন জনেরই নিমন্ত্রণ, কিন্তু সারা গেল না। বলল : ‘বড় নাথা ধরেছে পিয়ের, তোমরাই বাও। তা ছাড়া আমার সস্তা তো!—’ বলেই সে থেমে তার শোবার ঘরে গিয়ে দোর দিল। তার কম্পিত ওষ্ঠাধর আমাদের চোখ এড়ায়নি।

“আমি ও জুলিয়া মুখচাওয়া চাওয়া করলাম। কিন্তু সারার একবার ওপর কেউই কোনো মন্তব্য প্রকাশ করলাম না। একবার-সেকবার পানিকটা ভুলেই রইলাম বেন। কিন্তু মনটা কেমন পারাপ হ'য়ে গেল। কিসের-বে একটা ছায়া থমকে!—তাকালেই যার স'বে, অথচ দুই কেরালেই নামে পাখা বিস্তার ক'রে—তাকাবে—একবারে পীশেই!.....

“বল-ডানের হলে গিয়েই কিন্তু মন আমার প্রকৃত হ'য়ে উঠল। আমার অপরাধও ছিল না। পাশে জুলিয়া। দু'জনের সাজে তাকে কী অপরূপই বে দেখাচ্ছিল.....বেন বলতালী!.....সকলেই তার দিকে চেয়ে! গর্বে আনন্দে নেশায় বুকের মধ্যে রক্ত আমার উকাম হ'য়ে উঠল। সারার কথা একেবারে ভুলে গেলাম।

“রাত ছুটায় বাড়ী ফিরলাম। কিন্তু ফিরে ওপরে গেলাম না। ঠুঁড়িগোটাতেই ঢুকলাম। তা ছাড়া এ সময়ে সারা স্তত প্রায়ই একলা তার ছোট্ট বুসোয়ার-ককে। কাজেই ঠিক করলাম শেষ রাতে ফিরব ঘরে। কেউ তো আর পথ চেয়ে নেই আগেকার মতন। ঠুঁড়িগোটাও তার ঘর থেকে দেখা যেত না। স্ততরাং।

“সেদিনও ছিল এমনিই পূর্ণিমা। বেশ মনে আছে : সামনের সমুদ্রের দিগন্তের কোলে অমনি উদাস রঙেই কয়েকটি তারা করছিল ঝিকিঝিকি.....অমনিই পাণ্ডুর...মল্ল...বৈরাগী। সমুদ্রের ওপর অমনিই একটি কোমুদী-স্রুত...নিষর.....অমনিই স্পন্দিত.....উচ্ছল...দীর্ঘায়ত।...আর পরের মধ্যেও এমনিই চাঁদের একফালি নরম আলো গাছের পাতার একরাশ ফিকে ছায়ায় সাথে করছিল লুকোচুরি।...এক একটা রাত আসে যেন স্বপ্নের মতন.....না, স্বপ্ন কথাটার ধার গেছে ক’য়ে...কিছু কী ব’লে বোঝাব? এক একটা রাত আসে যেন আমাদের প্রাণের গানের ছন্দ হ’য়ে...মনের বাগানের আকাশ হ’য়ে...তা-ও না—আমাদের সনত্ত অন্তরের ছবিখানি হ’য়ে।...অথচ”—বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর এমন উদাস শোনায়—“অথচ সবটা যে কত বড় মায়া!...আশ্চর্য্য এই যে, পিছনে যখন অন্ধর সমুদ্র থমকে—তখনও সামনে হাসির ঝালর চলে শোভামাত্রার মতন...মাছদের ইন্দ্রিয়-প্রতীতি ভুল বোঝায় ব’লেই সে পারে হাসতে—” ব’লে থেমে স্বপনের দিকে তাকিয়ে বললেন : “কিছু ভাগ্যে কুল বোঝায়!—ভাগ্যে কল্পনা আমাদের সচরাচর প্রতিমিত হ’য়েই থাকে!...সে জ’লে উঠলে কি বাঁচবার জন্তেও মুখের গ্রাস মাছের মুখে তুলতে পারত—এই বিশ্বজোড়া বুদ্ধজুতার মধ্যে?”

খানিকটা সবাই নিশ্চুপ।...



সন্ধ্যা কথা কইল প্রথম : “তারপর?”

বৃদ্ধের চমক ভাঙল। ওর দিকে চেয়ে বললেন : “কী? ও—

—না, কতদূর বলেছি?”

আনন্ড বলল : “আপনি ও জুলিয়া পাশাপাশি বসলেন সোফাতে।”

বৃদ্ধ বললেন : “হ্যাঁ। আর আশ্চর্য্য এই যে যখন বসলাম পাশাপাশি—তখন দুজনকেই যেন কী-এক নেশায় পেয়ে বসেছে। সামনের জ্যোৎস্না-গর্জিত রাত্রি—ঘরের মধ্যে পুলক-মুর্ছিত স্বকৃত্য।—মনে হচ্ছিল সমস্ত বিশ্ব যেন গেছে মুছে।—একে মায়া বলব না তো বলব কাকে ?”

সন্ধ্যা মুহূর্ত্তের বলল : “তারপর ?”

বৃদ্ধ বললেন : “জুলিয়া হঠাৎ বলল : ‘ঘরের বিজলি বাতি নিভিয়ে দাও না পিয়ের—এমন চাঁদের আলো বাইরে! দেখ তো কপোর যেন ফোয়ারা ছলকাচ্ছে প্রতি গাছের পাতায়।’—নিভিয়ে দিলাম। চাঁদের আলো—চাঁদের আলো—কোরোর ছবি মনে পড়ে গেল। ভুজ্ঞও যে কী অসামান্য হয়ে ওঠে এ-আলোয় জানতেন সেই অপকণ শিল্পী।—‘সত্যি,’ বৃদ্ধের সুর আরও ঘুমেল হয়ে আসে—‘সত্যি—সংসারে যত বকম বড়ের মায়া আছে বোধ হয় নিশীথ রাতে চাঁদের আলোর বড়ের মতন কেউ নয়।—মনকে সে যে কী আবেশে ছেয়ে ধরল—রোমে রোমে কী অপূর্ণ উজ্জ্বাস!—বললাম : ‘জুলিয়া, আস্তে আস্তে গাও না একটা গান।’ সে গাইতে শুরু করল। হঠাৎ বাইরে কি একটা শব্দ শুনলাম। ভাবলাম বাতাসে কোনো জানালা-টানালা পড়ার শব্দ হবে।—হয়ত বাইরে গিয়ে দেখতাম তবু—কিন্তু জুলিয়া ধরল এমন একজনের গান যে, নড়বার আর জো ছিল না।”

সন্ধ্যা বলল : “কার গান ?”

বৃদ্ধ বললেন : “অস্বাভাবিক কেরো দেখি।”

সন্ধ্যা বলল : “কী ক’রে বলব ?”

‘জানা বলল : “ভালেরের নয় তো ?”

বৃদ্ধ বললেন : “তারই। জানি না কেন এ-সনের তারই গান সে গাইল। গানটির নাম ভালের দিয়েছিল : ‘টামিচা-মুকুর’ :

‘আজি কোমুদী-কাস্তা রজনী  
ধরায় ঝরিল ঝঝরি’  
গীতিগন্ধা...

দর্পণে তার দেখে না সজনি :  
তোমারি চোখে সে-অপ্সরী  
ছলছন্দা

অলোক-আলোক-ঝলক-মাধুরী  
তুলে বিদীয়া—বল্লভ !  
তুমি বুঝালে :

তোমারি ললিত-লাঞ্জে নুপুরি’  
কম্পিত ফুল-পল্লব !

ও কী কুটালে—

বিরহে তোমার—আধিমণি তব  
তারায় তারায় !—রূপখণী  
ধরা সরসা

অগ-কৃতজ্ঞ প্রেমে পরাভব  
মাগে বিধু-পাশে—গরবিনী  
নতি-হরষা !

তোমারি মিলনে রাতি’ দোলে সখি,  
বন্ধন-বকে বাসন্তী  
অকুরন্তা !

ও-নীলাবর তোমারে নিরখি’  
রক্ত-রাগিণী-জয়ন্তী  
আলোনন্দা !

স্বপন বলল :—“এ-গান সে গাইল—ঐ সময়ে।”

বুদ্ধ তার দিকে চেয়ে মুহূ হাসলেন—কণিক হাসি। পরে ঊষা উদাস  
সুরে বললেন : “শুধু গাইল না—কী অপূর্ণ ভহিনাতেই যে গাইল !...  
তেনন গান বুঝি ও কোনোদি—ন জীবনে গায়নি। শুধু গান নয়,  
গোহিতে গাইতে হঠাৎ উঠে চাদের আলোয় সুর ক’রে দিল নাচ !...  
গানের সময় বৃকের মধ্যে কেমন বেন খচ ক’রে উঠেছিল আমার ; এই  
কি সেই ভালেরের জুলিয়া—যে—বুঝতেই পারছ—” ব’লে থেমে বলতে  
লাগলেন : “কিন্তু সব ভুলে গেলাম ওর চাদনি-মতো। সত্যিই মনে  
হাত লাগল : যেন সমস্ত চাঁদনি রাতটা তার অকল্পিত প্রতি বোলায়  
হলুকে উপছে ঠিকরে পড়ছে।...নয় বাততে তার ফুলের বালা অন্যরকম  
কণ্ঠে ফুলের হায়, আর উচ্ছ্বসিত বৃকের নাকখানে একটি নীলকান্তমণি  
করছে কিকমিক কিকমিক—তার প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গেই তাল রেখে  
সে বেন রশ্মির তাল ধ্বনির সঙ্গে। সে এক অপূর্ণ অকল্পিত তার  
বর্ণনা হয় না। জীবনে এক একটা রাত আসে বাক ফলাও ক’রে ফুলতে  
সমস্ত প্রকৃতি যেন করে চক্রান্ত।...ভালেরের গানও এ-চক্রান্তে মিল যোগ।  
মনে প্রবল আকাজকা আগল জুলিয়া যে আমার, একান্ত ক’রে আমার,  
এটা অকল্পিত করতে—ভালেরের সে নয় নয় নয়—কখনো ছিল না, কখনো  
হবে না।

“বদিকা নিজেকে কখনো পারতাই—এই আকাজকা হপ্ ক’রে আসে  
ওঠার পরে আর পারলাম না। এতদিনের নানা ছোটোখাটো জটিল  
অসংযমের মধ্যেও নিজেকে ছেড়ে বেইনি—কিন্তু আজ আর নিজেকে  
ব’রে রাখা সম্ভব ছিল না। গানের শেষ চরণের সঙ্গে সঙ্গে

তার দেহবল্লী ধরা দিল আমার বাহবেষ্টনের মধ্যে—যেন আপনা থেকে।

...তখন তার প্রতি অকরেখার চাঁদের শান্ত আলোও জ্বলে উঠেছে বিদ্যুৎ হ'য়ে।...

\* \* \*

হঠাৎ যেন একটা দোরের শব্দ।...বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল।

জুলিয়া বুক মাথা রেখে বলল: “ও কিছু না—বাতাস।”...

\* \* \*

অনেকক্ষণ পরে সন্ধ্যা প্রথম ঘরের নিস্তরঙ্গতা ভঙ্গ করল:  
“তারপর?”

—“তারপর আমরা ভোর রাতে ওপরে গেলাম—যে ঘর ঘরে। শয়নকক্ষে ঢুকে কেন জানি না সন্দেহ হ'ল—চুকলাম সারার বাতাস চুকছে। সে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ি: আমি চিৎকার ক'রে উঠলাম। পাশের ঘর থেকে জুলিয়া ছুটে এল: সারার মুখের ওপর মৃত্যুর নীল ছায়ার স্ফুট ইতিহাস!...জুলিয়া চিৎকার ক'রে সারার মাথা কোলে টেনে নিল। আমি তার বুক মাথা দিয়ে দেখলাম। ক্ষণক্ষণে স্তব্ধ।...জুলিয়াকে তার পাশে রেখে ডাক্তার ডাকতে ছুটলাম। ডাক্তার এসে পরীক্ষা ক'রে বললেন ‘ট্রিকনি।’ ঘণ্টা তিনেক আগে সব শেষ হ'য়ে গেছে। অর্থাৎ ঠিক যখন আমি ও জুলিয়া কাণ্ডজানহীন হ'য়ে সব কুলে ঠুঁড়িয়েতে”...বুকের স্বর গাঢ় হ'য়ে এল—কথার রেশ আপনিই যেন গেল মিলিয়ে।...

\* \* \*

সন্ধ্যা মুহূর্তে বলল : “তারপর ?” বেন শুধু ঘরের নীরবতা ভাঙ  
করবার কত্বেই...

বুদ্ধের মন ছিল অদূরত্বান্বিত...তিনি চম্কে উঠলেন : “তারপর  
আর কি ! তারপর সব শেষ ।” বলতে বলতে তাঁর মুখে এক অশ্রু-  
বিবাদ ফুটে ওঠে আবছায়া হাসির বেশে । হঠাৎ বললেন : “ও—না,  
নব শেষ নয় । তারপর আর-একটু আছে । সারার একটা দীঘ পর ।  
“বালিশের নিচে রেখে গিয়েছিল ।”

\* \* \*

এবার ঘরের নীরবতা ভাঙল স্বপন । অক্ষুট-স্বরে বলল : “চিঠির  
কাবার্খটা কি ছিল শুনতে পারি ?—”

বুদ্ধের মুখে খানিক আগের সেই ভাসা-ভাসা স্বপ্ন ফুটে ফের উঠল ।  
বললেন : “শুধু কাবার্খ কেন ? সবটুকু শুনতে পার । সেটা আমি  
আজ তোমাদের শোনাব বলেই সঙ্গে করে এনেছি ।” বলে দ্রুত  
থেকে সমুপলগ্নে একটি লেফাফা বার করলেন ।

ভালেরের চিঠির মতনই হলদে হয়ে গেছে এবং কাগজ

## স্বপ্নভঙ্গ

বুক শান্ত গাঢ় স্বরে পড়তে লাগলেন :

“পিয়ের,

এ-চিঠি বখন তোমার হাতে পড়বে তখন আমি যে কত বৃদ্ধ...  
কোন এক অজিন লোকে...আলোর কি আধারের...কেউ কি জানে?...  
কিছু হয়তো তুমিও একটাও না...এক নীরব পুসর প্রকৃতির—যেখানে  
নেই চেউ, নেই রেখা, নেই রূপ, নেই রঙ...



“কি জানি—এ কথা ভাবতেও বুকের মধ্যে আমার কেমন ক’রে ওঠে যেন—পুণ্ডারিক বিলাসী আমরা—ডরিয়ে উঠি আলো-আধারী ছাড়া অত কোনো পথছন্দের কথা ভাবতে।—কিন্তু যাক সে কথা—তোমার মন গলাবার জন্তে তো নয় এ-চিঠি—বা দু-একটা কথা বলার আছে ব’লে কথার পালা সাঙ্গ করার জন্তেই। জানি পিয়ের, তোমরা শিল্পী—‘উচ্ছ্বাস’কে বলে অ-শিল্প। কিন্তু আমার এ-চিঠির লক্ষ্য তো শিল্প-কারুণ্য নয়—আটটি হ’তে আমি কলম ধরিওনি—এ কথা মনে রেখে হয়তো আমাকে ক্ষমা করতে পারবে—অমৃত এ-মেরেলি উচ্ছ্বাসে বাক্য হাসি হাসবে না দয়া ক’রে ?

“তবু নারীর স্বপ্নভঙ্গের যে উচ্ছ্বাস তাতে কি বাপা না পেয়ে পারবে তুমি ? শিল্পের নামে যত গদগদই হ’য়ে ওঠে না কেন তোমরা—সত্যিই কি বিশ্বাস করো—শিল্প সেখানে পৌঁছয় যেখানে পৌঁছয় দরদ, মমতা, মেহ, ভালোবাসা ? মন আমার কুণ্ডা সঙ্গেও ভরসা দেয় আমাকে যে, তুমি এতে পাবে বাধা—জীবনের কথা ভেবে—এ-উচ্ছ্বাস শিল্পের বাঁশ কাটিতে নামজুঁব হ’লেও। কি-একটা আশা রণিয়ে ওঠে আমার গহন মনে যে, বাধা পাবে পাবে পাবে—যতই কেননা ঈর্জিয়াতে কুলরাণীর কুলনৃত্য উপভোগ করো। কেন ? কারণ—এখনো যে তুমি আমাকে ভালোবাসো।

“হয়তো বলবে : আমাকে তুমি ভালোবাসো এটা কেনেও কেন তোমায় ছেড়ে অজানা খেয়ায় পাড়ি দিতে ছুটছি এক অনামা পারের পানে ?—উত্তর : না ছুটে পারলাম না ব’লে। তা-ও না : কেন এক শক্তি আমার কাণ্ডারীহীন তরলীকে-যে এই দিকেই দিল ঠেলে। নইলে এ-রূপরঙা মায়া-মাটির কোল থেকে সাধ ক’রে বিহার নিতে কেউ কি পারে ? পারে হয়তো নিশ্চয়ই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, নিশ্চয় না হ’য়েও আমাকে পারতে হ’ল ! আশ্চর্য্য—কিন্তু, তা-ই বা কেন ?—

এই-ই তো সত্যি যে, আমি নির্ভম নই ব'লেই সইতে পারলাম না : তোমাকে ভালোবেসেছিলাম ব'লেই নিতে হ'ল বিদায়।

“তোমাকে আমি বেসেছিলাম ভালো। আর কী নির্বিড় সর্গভয়া ব'লেই যে সে-ভালোবাসা তা তুমি জানো না। তোমার উদার বিপ্লবী কল্পনা দিয়েও—না। কেন? কেননা, পুরুষের কল্পনা যতই উচ্চম হোক না কেন নারীর জগৎকে সে কখনোই পারে না চুঁতে। নারীর জগৎয়ের গতির সঙ্গে স্পষ্টতম কল্পনাও বড় তোর 'সমান্তরাল, বেখার লম্বা কেটে চলে'—ভালোবের ভাষায়—হয়তো অস্থিমে মিলতে। কিন্তু এ-ও যদি মেনে নিই—তবু সে অস্থিমে—এপারে নয়। আমি জুলিয়াস মতন মেয়েকে কথা বলছি না—বাধ্য ছদ্মবেশে পুরুষই। বলছি আমার মতন মেয়ের কথা—যে মনে-প্রাণে, তমুর প্রতি অণুতে, নারী। এমন নারীর বাহিত যে-ভালোবাসা, যে-প্রতিদান—দেবে পুরুষ কোথা থেকে? তার সে-পুঁজিই-নেই যে। প্রেমের রাজ্যে নারী যে বইল চিরবুকে সে তো এইজন্মেই পিয়ের।

“তাই তোমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করা হয়তো আমার উচিত নয়। কিন্তু উচিতের নিদেশ মেনে কি চলে নারীর জগৎ? না : আছে আমার কোন্ তোমার বিরুদ্ধে, আছে আমি। বীরনারী হ'তে চাইব আমি কোন্ বুধে? বীরনারী নই তো আমি। কিন্তু মিথ্যাবাদিনীও নই যে! তাই স্বীকার করব যে, আছে কোন্, আছে পরিতাপ। দুর্জয়তার চিহ্ন এ? বটেই তো। জীবনে যে ভালোবেসেছে তার চেয়ে দুর্জয় আর কে? নিজের বলতে যার কিছু বইল না—যন প্রাণ দেহ সব যে নিঃস্বত্ব হ'য়ে কিনা সর্ব্ব উজাড় ক'রে তেলে দিল পুরুষের পারে—যে চায় না তার পারে—তার চেয়ে নিঃস্বায় কে—এ-জগতে? মিথ্যা বলব না : তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ না হোক—অভিযোগ আমার

আছে। কিন্তু সে-অভ্যুযোগ তোমার ব্যক্তিবস্তুপের বিরুদ্ধে নয় তোমার জাতির বিরুদ্ধে : যে-তুমি পিয়ের রূপে ছুটলে তার বিরুদ্ধে নয়—যে-তুমি পুরুষ হ'য়ে নারীকে ভালোবাসতে চাইলে—তারই বিরুদ্ধে। কথটা বলি যেমন ক'রে পারি, আপসা থেকে গেলে কমা কোরো—তবে যে, এ-সব কথা পরিষ্কার ক'রে বলার মতন মনের অবস্থা আশঙ্কিত নেই আজ—যে-দুশ্চরিত্র টাননি ঠুঁড়িঘোতে এইমাত্র দেখে এলাম তার পরে।—বদিও সেজন্তে তোমার দোষ নেই। কোনো পুরুষই ও-সময়ে 'না' বলতে পারত না। আর 'না' বলবেই বা তুমি কী হুঃখে ? তোমরা তো ঐকান্তিকতার বিশ্বাস করেনি কোনোদিনই : তোমাকে অল্প যে-অপবাদই দেই না কেন—কপট বা মিথ্যাশপথী অপবাদ কোনোদিন দেব না জেনো। কিন্তু শোনো।

“ভাবতে তুমি : বিবাহ না ক'রেও তোমার সহবাস আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল শুধু এইজন্তে যে, ভালোবাসার কথা আমি ঠেলতে পারিনি, নয় ? তুল পিয়ের, তুল। ভালোবাসাকে আমি প্রজ্ঞা করতাম—সত্যি। জীবনে কখনো কাউকে করিনি তেমন প্রজ্ঞা—তোমাকেও না। কিন্তু তাই ব'লে তোমাকে বিবাহ না ক'রেও তোমার শব্দাসক্তিনী হওয়ার কারণ ভালোবাসার বিবাহবিরোধী দৃষ্টান্ত উপদেশ নয়। কারণ এই যে, নারীকে এ-বিষয়ে তোমরা বস্তই চিরকুন্তিতা ভাবো না কেন—এই বিষয়েই সে সব চেয়ে বেশরোয়া।—তাই তো বলছিলাম পিয়ের, যে, পুরুষ কখনো নারীর মন জানে না, জানে নি, জানবে না।—বলবে হয়তো—তা হ'লে বাইরের বাধন চায় কেন সে ?—হায়রে, চায় অবাস্তব কারণে—নইলে যে-নারী ভালো সত্যি বেলেছে বিবাহ যে তার কাছে তুচ্ছ—অকিঞ্চিৎকর। সে চায় বাধন, মানি : কিন্তু আইনের অচলশাসন নয়—প্রেমেরই শৃঙ্খল। আর এই নিগড়ই তার চরণের নুপুর, হৃদয় জল, নয়নের আলো, বুকের নিখবদ—এই প্রেমের প্রতিদান। এ নইলে কি সে বাঁচে পিয়ের ?

“তুমি হয়তো বলবে : প্রতিদান তুমি আমাকে যে দিয়েছিলে এটা আমি গেছি তুলে। তুলিনি। আমি অকৃতজ্ঞ নই : যানব যে, একদিন ছিল—বখন তুমি আমাকে দিয়েছিলে ; অর্থাৎ দিয়েছিলে—বতটুকু পারে পুরুষ দিতে নারীকে। সে-স্বতি আমার আঁধার বুকে এখনো মণিমালা হ’য়ে জলছে কেনো। কিন্তু প্রেমের তুফান কি কতকাল বীকারে মেটে পিরের ? না, জগন্ত কৃপা নিভন্ত স্বতিচারে তুষ্ট হয় ? অতীতের পাওয়া তো বর্তমানের সাধনা নয়—প্রতিদান কামনার দাবি অকুরন্ত যে।

—বেনারী বলে : প্রেমে সে প্রতিদান চায় না, কেনো—হয় সে নারী নয়, নয় সে মিথ্যাচারিণী। আমি নারী : চাইবই তো পূর্ণ প্রতিদান। সেব সব, কিন্তু প্রতিদানে চাইব পেতে—নিজেকে সর্বস্বাস্থ্য ক’রে পেতে—মানি : তবু সর্বগ্রাসী হ’য়ে পেতেই—শুভতার গল্পেরে নিজেকে বিসর্জন দিতে চেয়ে না। তাই তো যাকে বরণমালা দিলাম, তার মালা না পেলে জীবনের সমস্ত রঙের মেলা আমার চোখে যায় পাংশু হ’য়ে। একজন্মে যদি আমাকে দায়ী করতে চাও—কোরো ; কেবল করলে তুল করবে। কেননা সে হবে নারীকে নারী হওয়ার জন্মে দায়ী করা—যেমন আমি তুল করব তোনাকে পুরুষ হওয়ার জন্মে দায়ী করলে। তোমরা—পুরুষেরা—চাপ ধনি প্রতিধ্বনি প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি—প্রেমের রাজ্যে। আমরা—মেয়েরা—চাই এক : ধনিকে।

“হয়তো একটু তুল হচ্ছে। হয়তো জুলিয়ার মতন মেয়ে চায় না। সে হয়তো ধনির সঙ্গে অনেক-কিছু আনুমানিকও চায় তার অতপ্ত—অতপ্তা পিপাসা মেটান্তে। নইলে যে-মেয়ে এক সময়ে ভালোবাসার মতন হাতছাক ভালোবাসত, সে আজ চায় তারই গান গেয়ে তার পরবর্তী প্রদানপ্রার্থীকে উচ্ছিন্ন ঘোবনের দোরে পাত পাততে! ষিক! কিন্তু না : এ-ধিকার দেওয়ারও হয়তো আমার অধিকার নেই, এর মূলও হয়তো আছে আমার

পরাজয়ের অভিমান। ক্ষোভের কলঙ্কে কলঙ্কী-যে—সে অপরাধ কপালে পঙ্কতিলক দেবে কোন্ অধিকারে ?

“কিন্তু পরাজয় ? প্রেমের ক্ষেত্রেও কি আসে প্রতিযোগিতা ? আসতে পারে সত্যি ? প্রেমও কি অল্প সব কিছুই মতন একটা পণ্য—যা পড়বে শুধু তারই হাতে যে তাকে চিনিতে নিতে জানে সব আগে ? জানি না। এ-বিষয়ে নারী তার একলা হৃদয়ের স্পন্দন দিয়ে কতটুকুই বা বলতে পারে বলা ?

“তাই বলাই ভালো এ-সমস্তার কোনো কিনারাই পাইনি আমি। কেমন ক’রে যে নারী তার রূপ-লাবণ্যকে অস্ত্র-হিসেবে ব্যবহার করে—অপরাধ মুখের গ্রাস—কিন্তু না, ফের ঐ ক্ষোভ আসছে। তা ছাড়া কাজ কি এ-আলোচনায়ই বা ? মেনে নেওয়াই ভালো যতো যে, এ-জগৎ এ-জীবন এমনিই—প্রেমকে বজায় রাখতে চাই ও সব আগে জানতে হয় এখানে কাড়াকাড়ির মন্ত্র-তন্ত্র ; শিখতে হয় ‘গানের’ ছন্দ-কলা, এক কথায় পরতে হয় নানান আত্মরক্ষার বর্ম-কবচ। আমার সে সরঞ্জামও নেই—এমন ক’রে যে-সম্পদকে আগলে রাখতে হয় তাকে পাবার লোভও না। তাই তো হারল যে সে আর তোমার পথ আগলে ধইল না—গেল সঁ’রে !

“অথচ আমি সবই বুঝি পিয়ের, বিশ্বাস কোরো। বুঝি যে, এ-পরাজয়ের জঙ্কে ব্যথা বাজে নারীত্বের কোনো গৌরববশে নয়—তার আত্মদানের লাজনার জঙ্কে। এ-ও বুঝি যে, অহুযোগ এক্ষেত্রে যে করে সে আমার হৃদয়,—বুঝি নয়। বুঝি আমার এক্ষেত্রে ভালোবের কথায়ই সার দিয়ে বলে যে, প্রেম যেখানে স্নেহ হ’য়ে এল সেখানে অহুযোগ অহুযোগ কাকূতি মিনতির মতন বিড়ম্বনা আর কী আছে ত্রিভুবনে ? বুঝি আমাকে এ-ও বলে যে, জুলিয়ার প্রতি এ-বিতৃষ্ণাই বা কেন ?—সে না

এলে আসত অল্প কেউ। পুরুষের প্রণয় চার নিত্য-নতন রসকেলি, চার—  
খাপটা, বিছাৎ চমক। তা ছাড়া প্রেমের মূল বন্ধনই যেখানে গেছে আলগা  
হ'য়ে সেখানে ছিন্ন করার উপলক্ষের কখনো অভাব হয়? থাকে সে  
একটি তুচ্ছ দমকা হাওয়ার অপেক্ষার—মূলোয় লুটোতে। আলগা বার  
ভিৎ, গাধুনি—ইমারৎ তার হবে না অপলকা?—না হ'য়ে পারে?

“জানি সবই। কেবল এইটে আমি কোনো মতেই বুঝতে পারিনি  
পিয়ের, যে, প্রেমের বাঁধন একবার গ'ড়ে ওঠার পরেও আলগা হ'য়ে যায়  
কেনন ক'রে? ভালের বলত : ক্যাথলিক না হ'লে এটা বুঝতে এত  
শ্রম পেতে হ'ত না আমাকে। হবে। আমি অতশত বুঝিও না,  
তোমাদের মতন অত তলিয়ে পারিও না ভারতে। তা ছাড়া ভাবনাও  
যে আমাদের তোমাদের মতন মস্তিষ্ক থেকে ছোটো না—ওঠে জয়বস্তিরই  
• তাগিদে। তাইত পুরুষ কখনো নারীর ভাবনাকে পারল না নিতে।  
হৃদয়ের চিন্তা অমূল্যবের উপাদানই যে আলাদা প্রকৃতির, তাই কি? তাই  
কি পুরুষের প্রেম শিথিল হয় হুদিনেই?

“জানি না। কেবল এইটুকু জানি : আমি জুলিয়া নই। জানি :  
দেখা পারল—আনি তা পারতাম না। জানি : আমার প্রেমের গ্রহি  
মারা জীবনের অদর্শনেও শিথিল হ'ত না, তোমাকে-দেওয়া-মালা কিরিয়ে  
নিতো পারতাম না—অল্প কাকর গলায় দিতে। তবে এ ও হয়তো আমার  
ক্যাথলিক শিক্ষাদীকারই দোষ। নইলে হয়তো শুধু জন্মের দীপটুকুর  
শালকা উত্তাপকে সম্বল ক'রে এই হিম জীবনের মরু পার চ'তে ছুটতাম না :  
উলিয়াস মতন নিত্য-নতন পাথরের পথ চেয়ে জীবনকে ক'রে তুলতাম  
হালকা।

“হয়তো বলবে : আমি বুধাই জন্মের জাঁক করি, জন্ম থাকলে  
তবে তোমাকে ছেড়ে যেতে বাধ্যতাই। হয়তো বাক্য হাসবে অদৃশ

বলেও। কিন্তু বিশ্বাস কোরো পিয়ের, যে, হৃদয়হীন বা অব্যবস্থামি  
 ছিলাম না প্রকৃতিতে। তোমাকে বোঝাব কেমন করে বলো—নিজের  
 সঙ্গে কী অস্বস্তি বৃদ্ধ করেছি গত দেড় বৎসর ধরে? নিজেকে কত  
 বোঝাবার চেষ্টা করেছি—জপ করে যে, জুলিয়ার প্রতি তোমার এ-মোর  
 সাময়িক—ছদ্মসেই বাবে উবে—এ শুধু চোখের নেশা বৈ আর কিছুই  
 না। এহুনি আরো কত...কত...কত—ছেলেমানুষি প্রবোধ! ক্ষোভবশে  
 এমন কথাও বলব না যে, আমার প্রতি তুমি আজও একেবারেই উদাসীন।  
 আমি হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারি না কি—আমার প্রতি এখনো তোমার  
 চান কত সত্য? সত্য বলেই তো তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার  
 বিদায়পথে আজও এত বাধা—আশা বধন শুকন তখনও চোখে জল।

“কত যে বাধা তা কি তুমি কল্পনা করতে পারো পিয়ের? যে ক্ষোভ,  
 কলঙ্কটি নেও, চলো,—সেই ক্ষোভই বাধে, জড়ায় পারে পায়ে—  
 অভ্যস্ত চার বিদায় নিতে সেই অভ্যস্তই সাথে হাত ধরে। এ হুঁসি  
 কি বোঝে পুঙ্খ? বুঝতে পারে কখনো? সে বড় জোরে নিয়ে  
 নাটক লেখে বাতে পাঁচজনে দেয় হাততালি। কিন্তু অবোধ বোঝে না যে,  
 এ নিয়ে বধনই সে কল্পনা করেছে তখনই যে সে একে উঠছে  
 ছাড়িয়ে! নারী এ নিয়ে নাটক লিখতে পারেনি কি সাথে? হৃদয়ের  
 নিভৃত বেদনাকে সে চায় না খেলার জিনিষ করতে—চাইলেও  
 পারে কই? অথচ তার এই যে অক্ষমতা—নিজের হৃদয়ের সন্দেহকে  
 নিয়ে হাস্যমি করতে এই যে মর্শাস্ত্রিক বিতৃষ্ণা এর জন্মেও সে  
 তোমাদের কাছে অবজ্ঞাত। কী? না, নারী স্রষ্টা নয়। পিয়ের, এ-  
 প্রজ্ঞ তোমাদের—পুরুষদের—মনে কখনো কি উদয় হয়নি যে, তৃষ্ণার  
 বার আকর্ষণ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে সে পারে না সে-শুকতাকে নিয়ে  
 রামধনু আঁকতে—নটিনী হতে? না। নারী এ পারে না তার

দয় আছে বলেই—তার বৃত্তি নেই বলে না ; লজা আছে বলেই—  
 স্বষ্টি-প্রতিভা নেই বলে না । নটীপনা নারীর নেই—বলি না ; আছে :  
 খেলার ক্ষেত্রে, মোহের ক্ষেত্রে, নাচগানের ক্ষেত্রে । কিন্তু যেখানে  
 প্রেম তার চিদাকাশকে তুলেছে রাঙিয়ে সেখানে সে চায় না তার  
 আলোয় করতে সাজসজ্জা—গ্রাসাধন । তার মধ্যে নানা নাটক আছে,  
 কেবল নেই প্রবৃত্তি—প্রেমকে নিয়ে লীলাখেলার । তোমরা লীলাময়,  
 তাই তাকেও ক’রে তুলতে চাও লীলাময়ী । কিন্তু লীলা তার স্বন্দর তো  
 নয় । জীবনের কেন্দ্রে যে তার প্রাণে—মর্মে । তাই তো পুরুষ নারীকে  
 পেয়েছে বড় জোর সহমর্মণীরূপে—সহমর্মণীরূপে না । কারণ পুরুষের  
 চেতনা বহিমুখী, মনোমুখী—প্রাণমুখী, মর্ম্মমুখী তো নয় ।

“অণ্ড তবু এ-সব না বুঝেই—আমি সত্যিই চেয়েছিলাম তোমার  
 সহমর্মণী হ’তে । পারিনি—সে দোষ আমার প্রকৃতির—ইচ্ছা নয়,  
 সাধনার নয় ।

“কিন্তু অক্ষমতার সাফাই পুরুষে শুনেছে কবে ? তাই তো তোমাকে  
 যেতে হ’ল ছেড়ে ।

“কেন ?—ঐ যে বললাম : না গিয়ে পারলাম না বলে, একমিহ  
 প্রেম নইলে আমি বাঁচতে পারি না বলে । এ দোষও আমার প্রকৃতিরই  
 —প্রবৃত্তির নয় ।

“কিন্তু না—হয়তো ব্যাধাবশে একটু বাড়িয়ে বলছি । ঐকান্তিক  
 প্রেম না হ’লেও হয়তো আমি তোমার পাশে থাকতে পারতাম, কিন্তু  
 তোমার কাছে আর একজন হবে আমার চেয়ে বেশি তুমার বন্ধ—  
 সৌখীন খেলানা নয়, হবে প্রেরণাদাত্রী, গৌরবিনী—এ সর্বকোন্ প্রাণে  
 বলা দেখি ?

“হয়তো একখাটাও ঠিক বুঝবে না । কিন্তু নারী হ’লে বুঝতে দে,



নারী সবসইতে পারে, কেবল তারই সামনে তারই বলভের অপরাধে প্রেম-নিবেদন ছাড়া। মনে কোয়ে না—এ আমার দেহগত সংস্কার। না। দেহ তুমি বাক্যে ইচ্ছে দাও না,—তাতে ব্যথা বাক্যে না পৌঁছে না—তবে প্রেম যেখানে মঞ্জুর—সেখানে নারী তাও সহিতে পারে। সে জানে : পুরুষ নারী নয়। কিন্তু যেখানে তার প্রেমের গোপন-মঞ্জুরার মধ্যে অপরাধ পড়ে দৃষ্টি—তাতেও চায় সে ভাগ বসাতে—সেখানেও সে-অপমান তাকে সহিতে বসে তুমি ? নারীকে ?—যে পুরুষ নয় ?

“নারী যে এ পারে না—তার কারণ তার হৃদয়হীনতা নয় পিয়ের।” সে অব্যবহৃত নয় : শুধু, তার অহুভব এত প্রবল যে, তোমরা বুঝতে পারো না তাকে। নিজের সঙ্গত, নিশ্চিত, স্বচ্ছন্দ, সব-বজায়-রাখা অহুভবের নিকষে কথো—আর বলো : মিলল কই ? যেন অহুভবের, নিবিড়তা একটা এতই সুবোধ্য বস্তু যে, এমন ভালা-ভাসা ভাবে বোঝা বাবে—যেন উপরের বুদ্ধির মাপকাঠি দিয়ে নিচের উদ্বেলতাকে মিলিয়ে দেখার অধিকার আছে কারো। নেই। তাই তোমরা ভুল করে চিহ্নিত—ন নারীকে বিচার করতে গিয়ে : বলো তাকে সেণ্টিমেন্টাল, উচ্ছ্বাসিনী, আরো কত কী। কিন্তু জেনো পিয়ের, এ-বিচার করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় তোমাদের বুদ্ধির দার বেশি ব’লে নয়—দরদের তল কম ব’লে। তাই দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস আমারই চোখের সামনে তুমি অপরাধ সঙ্গে প্রেমলীলার ছের টেনে চলতে পারলে—আমার সঙ্গে শুধু ‘নিখুঁত’ ব্যবহার করে। ভাবতে পারলে যে, বাইরের আচরণ যেখানে অনবত্ত সেখানে মীন-অভিমাণে দুঃখ পাওয়া অসম্ভব। হায় রে, একটিবারও ভেবে দেখলে না যে, নারী চায় না এই বাইরেরকার শোভন ঠাট ও রঙচঙে, চাকচিক্য, চায়—নিঃস্বার্থের অবলম্বন। উপরকার চূর্ণ তরঙ্গে যে-মুখের প্রেমোদয়

বদুদলীলা সাতরঙা বাঁশি বাজায়—তার অগভীর নুহনার নারীর  
মনয়তন্ত্রী বেজে ওঠে না। সে চায় অস্তরের হৃদ—হুরেলা আলাপিনী।  
স্তরের এ-অবলম্বনও বন্ধন তার কেড়ে নাও তোমরা—তখন তার কী থাকে  
—বলো তো? পারের তলার মাটি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে বলো  
তোমরা—সোজা হ'রে দাঁড়াতে। নইলে আর পুঙ্খ—!...

“হয়তো বলবে : এ-ও, আমার নিছক বাড়াবাড়ি, নারীর সেই  
চিরকালে কেনিল আবেগের হা-হতাশ। হা-হতাশই বটে!—আন্তিকেও  
তোমরা বলো শাস্ত হ'তে, মরুকে বলো চলিফু নদীর অভিসার শুধু চোখে  
দেখে দেখে উর্ধ্ব হ'তে।

“তবে একটা প্রশ্ন তোমার মনে জাগতে পারে—মানি : আমি কি  
জগতের কাছে কিছুই পাইনি যে, শুধু আন্তিকেই দেখছি বড় ক'রে?  
জীবনের নানা গভীকে নানা আলো নানা রঙ নানা গন্ধের কোনো তৃপ্তি  
কি আমার ইন্দ্রিয়পথে, আমার অস্তরলোকে প্রবেশ করেনি?

“করেছে। জীবন আমার চিরদিনই শুধু শূন্যকমল ছিল এমন কথা  
ললে সত্যের অপলাপ হবে। এ-কথা সন্তুতজেই অস্বীকার করব, বরাবরই  
ক'রে এসেছি। যে এক সময়ে আমি অনেক কিছুই পেয়েছি : ভালোবাসার  
পৌরুষ, লিলির মেহে, প্রিয়জনের প্রীতিতে, বন্ধুর সখ্যে। শুধু তোমার  
কাছেই হয়েছি বঞ্চিত। কিছুই পাইনি বলি না অবশ্য। তোমার  
শক্তি, তোমার সরসতা, তোমার বন্ধুবাৎসল্য, তোমার সজ্জতা, তোমার  
চিন্তা-ভাসি,—এক কথায় : তোমার মনোরম পরিমণ্ডল আমাকে মুগ্ধ  
করেছে তো কত সময়েই। কিন্তু তাতে তুমি মিল কই? হৃদয় বত চোঁটা  
ক'রেও পূর্ণপথ ক'রে বলতে পারল কই যে, যা সে চেয়েছিল তোমার কাছে  
—তা পেল? না, পাইনি পিয়ার : রাগ কোনো না,—এততে তোমাকে  
সিঁই দিচ্ছি না। কেননা আমি বিশ্বাস করি তোমার দাখিলো,

তোমার ঔনার্যে, তাই জানি যে পারলে, থাকলে তুমি দিতো। কিং  
তোমার ছিলই না যে, তাই না আমি পাইনি!...হয়তো ছিল—  
আমিই পারিনি আহরণ করতে। কারণ বা-ই হোক, শেষ কথা হ'ল  
এই যে, বা আমি চেয়েছিলাম তা পাইনি তোমার কাছে। আর সেই  
এক সর্কার্থসাধিকা তৃপ্তির অমিলন, সর্বকৃতিপূরণী সার্থকতার অভাব—  
সেই এক না-পাওয়া আমার সব পাওয়াকেই ক'রে দিয়েছে ব্যর্থ, রিক্ত,  
শূন্যগর্ভ। যেখানে অন্তরের পিপাসা-গহ্বরই ভরেনি, সেখানে ইঞ্জিরের  
বললীলার বাইরের প্রসাধনে নারী কী পায় বলো তো?

“বলতে পারো কি পিয়ের, কেন এমন হয় এ-জগতে? কেন এতটী  
মাত্র অপ্রাপ্তি সব প্রাপ্তিকে ক'রে দেয় ম্লান—রক্তমঞ্চের বাইরের পান  
প্রদীপ ছেড়ে শুধু পিছনের অন্ধ অন্ধকূপের পানেই আগুন দেখায়?  
কেন একটিমাত্র বন্ধনার ছায়াপাতে সমস্ত জগতের আলো নিভে যায়  
চোপের সামনে—একটি সূর্যের অভাবে যেমন বিশ্বের কোটি ফুল  
অধোমুখী—বৃন্দ তারার আলোও বাদে পারে না জাগাতে? বলতে  
পারো এ-প্রহেলিকার শেষ কোথায়—কিছা এর শেষ আছে কি না?  
বলতে পারো তুফান প্রকৃতি এমন হয় কেন—বাতো আকণ্ঠ পান করেও  
সে মেটে না—সারা জীবনভোর ইকন জোগালেও লেলিহান অহুস্তির  
শিখা বলে—আরো চাই? পারো বলতে?—কেন প্রেমের কাছে বা চেয়ে  
মারুম এত মাথা খুঁড়েছে তার দেবতা শুধু সেইটা ছাড়া আর সবই তাকে  
দেন—মিলনের মধুরতম মুহূর্তেও হৃদয়ের মধ্যে কেন এ বিরহ-ব্যথার নিভ্র  
রপিয়ে ওঠে সমাপ্তিহীন রেশে? জানো কি?”

“হয়তো ঠোঁটের কোণায় তোমার এককালি চিকণ-হাসি উঠবে চমকে  
এত কেনিল উজ্জ্বল পড়তে পড়তে। পুরুষের ওঠেই। তাই তো সে  
নারীর চির-বল্লভ হ'য়েও রইল চির-পদ্মসেনী। তাই তো সে নারীকে নু

করে—একটা চেতনার-মালায়-গাঁথা রাঙা আবেগের ফুলিক—বমন  
ছায়াচিহ্নে নানা ছবি—একটা গতির-বেগ-গাঁথা।

“কিন্তু এ শুধু আমার আজকের আবেগ নয়—নয়ও একটা সাময়িক  
উচ্ছ্বাসের রং ঢং পিয়ের। এ আমার বহুদিনের সঞ্চিত বেদনা—যার  
মধ্যে এতটুকু অভ্যক্তি নেই, অতিরঞ্জন নেই, নেই অশ্লীল-জাগানিয়া  
হ-হতাশ। তোমার কথা বলতে পারি না—কিন্তু আমি তো জানি :  
প্রেমের কাছ থেকে আমি কী চেয়ে হাত পেতেছি, আর কী নকল দানে  
সে দিয়েছে আমার অঞ্জলি ভরে। নইলে কি সে-দান আমার যুতো  
থেকে যেত ফসকে ?—দিতাম যেতে ?

“বলবে হয়তো : মাছবের চাওয়ারও তো ভুল হয়, বা চাইলাম ও বা  
হেলাম তার মধ্যে সমীকরণেরও হয় ভুল, হয়তো বুঝতে পারি না ব’লেই  
সাহস করতে পারি না যে, মুক্তা এসেছিল অঞ্জলির মধ্যে শুষ্করই সঙ্গে—  
কেবল শুষ্কিকে চিনিনি ব’লেই তার সাথে সাথেই অবতলায় মুক্তাকেও  
দিয়েছি বিসর্জন। বলবে কি ?

“যদি বলো তবে আমি বলব যে, এমন হয় না, হ’তেই পারে না।  
বলব : ছোট চাওয়া ও ছোট পাওয়ার মধ্যে মিলোতে ভুল হ’তে পারে,  
কিন্তু যে-চাওয়ার সুর দিয়ে অসুরতম নিঃখাসের ছন্দ তরা, সে-চাওয়ার  
উত্তর যখন আসে তখন প্রেমার্থীর তাকে চিনতে ভুল হ’তেই পারে না।  
শিকারীর ভুল হ’তে পারে—শিকারক উন্মীলীলার ঠিক তালাটি বুঝতে,  
কিন্তু তুকার্ডের ভুল হয় না তুকা মিলে কি না বুঝতে। প্রেমের মধ্যে  
কামনা আমার যতই উদ্দাম হ’রে উঠেছে, আশা কল্পনা যতই রঙীন  
আলপনা এঁকেছে, অতৃপ্তি যে আমার হ’রে উঠেছে ততই নিবিড়,  
ব্যর্থতা ততই পুঞ্জীভূত ! আর এ-দীর্ঘকাল কি আমার আজকের যে,  
ইহ হবে ?

“না। এ অতৃপ্তির তাপ আমার সান্দী ছিল বরাবরই—কেবল আত-  
সে অসহ হয়ে উঠেছে মাত্র। কিন্তু সে বোধ হয় শুধু এইজন্তে যে  
স্বপ্ন-কল্পনার দেবতার কাছে বর পাওয়ার আশা গেছে আমার মুহে—  
নিশ্চিন্ত হয়ে মুছে। নইলে এ অতৃপ্তির অন্তর্দাহ আমার প্রথম থেকেই  
ছিল। যা আমাদের মধ্যে সৃষ্ট হয়ে না বিরাজ করে—তা কি কখনো  
জাগে, না জাগতে পারে ?

“তবে প্রথম প্রথম—বখন স্বপ্নের কাঁজল ঢোপ থেকে সম্পূর্ণ মুছে  
যায়নি তখন—নিজেকে কোনামতে বা বোঝাতে পারতাম,—হয়তো সাদা  
না পেলেও সাহস-কুতক সৃষ্টি করবার ক্রমতা তখনও লুপ্ত হয়নি বলেই।  
কিন্তু তবু সে-সাহসনাও ছিল কণিকের। কেননা ভালোবের কথা যদি কখনো  
সত্য বলে মনে নিতে চেষ্টা ক’রে প্রেমকে মনে করতে চেয়েছি জীবনের  
একটা চলন্ত পাঠশালা মাত্র—অমনি আকুল হুয়ে অন্তর বলে উঠেছে :  
‘চুপ চুপ—ও কী কথা ! প্রেম যদি কণাশ্রয় তবে জীবনের নীড় বলা  
কাকে ?’ নিকন্তর হৃদয়কে বুঝিয়েছি : প্রেমের মধ্যে আজ যা পাচ্ছি না—  
দুদিন বাদে পাবই পাব। পলাতককে আরও বাঁধতে চেয়েছি বাহুবন্ধনে  
—দ্বিগুণ নির্ভরে আশার আগ্রহে—শিশু যেমন বুঝকে বায় ধরতে,  
চাঁদকে-মুঠায় পেতে। প্রেমের মধ্যে অতৃপ্তি বতই তীব্র হয়ে উঠেছে—  
বাথা বতই নিবিড় ; হাসির অন্তরালে অশ্রু বতই উপছে পড়েছে—দীর্ঘশ্বাস  
পুঞ্জিত ; চাওয়ার মর্মে না-পাওয়ার দুঃখ বতই গুরুভার বোধ হয়েছে—  
তার কোভ মানিময় ;—ততই নিজেকে রঙীন সাহসনা দিয়েছি এই বলে যে  
অতৃপ্তি বড় মধুর, বাথা বড় গভীর, অশ্রু বড় পবিত্র। হায় রে, কাব্য-  
কুয়াশার প্রদোষ-পূর্ববী দিয়ে অরুণ-কুণ্ডিত প্রাণকে ভুলিয়ে রাখা ? বাত  
কখনো ?

“কিন্তু হয়তো এরই ছিল আমার প্রয়োজন। কেননা সময়ে সময়ে

কিসের যেন চকিত মিলিক খেলে যার অজ্ঞত-দিগন্তে থাকে চিনি যেন—  
আলোর পূর্ণাভার বলেই। মনে হয় যেন কোন্ এক নেপথ্য-লোকের  
আলো-অধিকার ডাকে আমাকে হাতছানি দিয়ে—যে বলে : মাস্থেত  
প্রেমে এটি চিরন্তন অতৃপ্তি লাগে নয়—বর। কি একটা স্বপ্ন এক একটা  
নিখর মুহুর্তে যেন ঘনিয়ে ওঠে জগদন্তরীয়ে—যে বলে : এই বাসনামুহুর্ত  
প্রেমাশ্রয় দিশা মেলে না বলেই এ-অতৃপ্তির অন্ধকার চেয়ে আসে—  
জাগাতে আলো তুমি; যে বলে : প্রেমে পূর্ণতা-আকৃতি মনের মৌলিকা  
নয়—সে আছে, কেবল এই চেনা বাসনার জানা-পথে মেলে না তার  
উদ্দেশ্য; যে বলে : যা অজ্ঞতের পথের অধিগত আলো, তাকে নিরালা  
আত্মনের দীপশিখাটুকু করে রাখতে চাইলে চলবে কেন? বলে :  
প্রেমকে যে বরণ করতে শেষে নিকামনার নিষ্কিনে শুধু তাইটে পথে সে  
ধরে অতান আলো, নইলে বুঝি সোনারুত্তো অহরহই তাই কাড়ার  
ধুলোমুঠো।.....

• "এই কপাই কি প্রেমের চরম-বাণী?

"জানি না। একদিন ছিল—যখন একপায় যায় দেহনি মন, যখন  
বাসনারটীন জলধরুকেই মনে করতে চাইতাম প্রেমের সোলসীলা। কিন্তু  
আজ কোথায় সে বছরটা রাস তার? কেন দেখি : বাসনার গগনে  
রটীন প্রেমধরু—মাটিরই পক্ষের প্রতিচ্ছায়া—যাকে নিবাসনার অজ্ঞন  
পরলেই চোখ পারে চিনতে নাড়া বলে? কেন মনে হয় : প্রেমের  
অভিসারে লক্ষ উদ্ভাসি অচূর্ণ হানে—শুধু বাসনার লক্ষ উর্দাভাল  
কাটাতে শেখানোর দীক্ষা দিতে?

"জানি না এ-ও উদ্ভাসি কি না। জানি না বাসনা যুক প্রেমের  
যে-কল্পজটা জগতের সীমান্তে আজ উঁকি দিচ্ছে সে প্রবর্তার উর্দাশিলা—না,  
আগেরার চকিত বিবৃতি। জানি না নিজেকে ছাড়িয়ে তবে প্রেম তার

স্ব-স্বরূপটি খুঁজে পায়—আশান এ-কাজন মায়াধ্বনি কি না। তবে এটা মনে হয় যে, এ-দিশার মধ্যে সবটাই মিথ্যা হ'তে পারে না। বা চেয়েছি তা পাইনি এ হ'তে পারে—তার ব্যথাও হ'তে পারে দুঃসহ। কিন্তু তবু কে যেন বলে যে, প্রতি না-পাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ফুটে চায় যেন এক অশরীরী পাওয়ার ক্ষুরদাম। এ-পাওয়ার সাধনাই হয়তো জীবন-সাধনা। জীবনে এ-সাধনার পথ হয়তো তেমন ক'রে খুঁজিনি বলেই মেলেনি। কিন্তু তবু মনে হয় এ-পথের সম্বন্ধে যে-প্রশ্ন উঠছে গভীর মনে সে-প্রশ্ন শুধু এক প্রশ্নাতীত প্রাপ্তি-লোকেরই গুঞ্জন—পূর্বরাগ। কান পেতে এ-জীবনে এই গুঞ্জনকে শুনিনি বলেই হয়তো নুপুর আনার পদে পদে বেজেছে শঙ্খল হ'য়ে।

“তাই তো আমি আজ চিরদিনের তরে কাটলাম এ-শৃঙ্খল—সেই নিঃস্বপ্নবাল্য-পথের পথিক হ'তে—যদি সে থাকে কোথাও। হয়তো জীবনের এ-পরিচিত ঘাটে আরও কিছুদিন খুঁজলে ওপারের সে-বাটের মিলত আরও কিছু জবতর পাথর। কিন্তু সে-শক্তি আর যে নিজের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না পিয়ের! মানুষ ছাড়া কাউকে তেমন ক'রে কোনোদিন চাইনি—তাই হয়তো শেষটায় পেলাম না লোকোত্তর কোনো শক্তি—কোনো দৈব সম্বল। কিন্তু এমন কোনো শক্তি, এমন কোনো সত্তা, এমন কোনো পূর্ণতা যদি থাকেই ওপারে, তবে আমার এ মোহ-ব্রান্তিকে এ-অজ্ঞানতার অন্ধতাকে কি সে কমা করলে না?

“আর যদি এমন কিছু না-ই থাকে কোথাও? যদি ওপারও হয় এপারের মতনই নীরজ তমসার রাজ্য—যেখানে নেই আলো, নেই গন্ধ, নেই রূপ, নেই বস, নেই বসনি, নেই তরঙ্গ—তা হ'লে? যদি ওপারের সব সেনা-পাওয়ার সব, হিসেব-নিকেশ এপারেই লভে চিরসমাপ্তি?—

তাহ'লেই বা দুখ কি পিয়েন? অমৃত তাহ'লে তো অমৃততাকে ভালোবাসতে হবে না?—

• •

জ্যোৎস্নামাত্র গিঙ্কায় তা'ত ক'রে ক'টা থেকে গেল না কেউই।...

স্বপন চমকে ওঠে,—এমনিট : "আর জুগিয়া?"

মসিয়ে বেনার স্তনতে পান নি বোধহয়।

সক্সা শুধায় : "জুগিয়ার কি হ'ল?"

স্বপন চমক ভাঙে এবার : "কে? জুগিয়া? ও হ্যাঁ। সে এক পরেই আমেরিকায় চ'লে যায়। সে তার করেছে গভ ন'হা—তার ওখানেই উঠবে, কালিকণিয়াতে। লিখেছে, তার সব চুল হ'য়ে গেছে তুম্বাকের মতন সাদা—অনিদ্রায় অনিদ্রায়।"

সক্সা জিজ্ঞাসা করল : "কত বয়সের বাদে দেখা হবে তার সঙ্গে?"

স্বপন একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন : "প্রায় সাতাশ।"

• •

হঠাৎ একটি ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস।...

সবাই তাকায় আনার পানে। কিন্তু তার দৃষ্টি দূর-দিককে বন্ধ—  
একটি শাড়ী-পর্যন্ত নান মেঘবালার ছবি-রঙের পাড়ের 'পরে।...

• •



স্বপন ও সন্ধ্যার দৃষ্টি-বিনিময় হয়। সন্ধ্যা চোখ নেয় কিরিয়ে।  
দুটি ফোঁটা মুক্তা টলটল করে পঙ্কপুটে।

\* \*  
\*

সন্ধ্যা ব্লাউসের হাতায় চকিতে অশ্রুগোপন ক'রে মসিয়ে বেনারের  
পানে তাকিয়ে মুখে হাসি টেনে এনে বলে: “কিন্তু কথা দিন ভূ-  
প্রদক্ষিণের সময়ে আমেরিকা থেকে জাপান ঘুরে আমাদের নিমন্ত্রণ রাখতে  
আসবেন বাংলাদেশে?”

বুদ্ধ তার পানে স্তিমিত-প্রেক্ষণে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকেন কিন্তু একটি  
কথাও না।

—“কী? মেবেন না কথা?”

বুদ্ধের শাস্ত মুখে হাসি ওঠে জুটে: “এর পরেও কথা?”

সন্ধ্যা অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাঁর চোখের পানে চেয়ে বলে: “এর পরে  
বলেই তো কথা।...”

শেষ রাত। স্বপন দেখে স্বপ্ন : আনা যেন কী একটা বোমটা  
 মুখ থেকে চলেছে। ও খুলতে বলে—খোলে না। হঠাৎ কোথা থেকে  
 সন্ধ্যা এসে টপ্ ক'রে খুলে দিল। —এ কী! চমকে ওঠে স্বপ্ন! এম্—  
 ...আনার তো নয়...খানিকটা সন্ধ্যার, আর খানিকটা যেন কার? মনে  
 পড়ে...পড়ে...পড়ে না ঐ—পড়েছে—ইসা—ইসাবেলার না? স্বপ্ন  
 মুখখোর : “এ কে তুমি?”

মুখি বলে : “দিনতে পারছ না—যুগে যুগে আমাকেই খুঁজেছ—  
 একজনকেই—নানা নারীর মধ্যে দিয়ে তুমিও, চাওও, মসিয়ে—!”.....

যুম ভেঙে যায়। স্বপনের বৃকের বক্তা ফুট বয় যেন...এ কী রকম  
 স্বপ্ন! কই!! সন্ধ্যা!!! বৃকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে। হাত বাড়িয়ে  
 ওকে পাশে তো খুঁজে পায় না? রক্ত চ'য়ে বিছানায় উঠে বসে।

অনুরে থস্ থস্ শব্দ! ঐ না? ব্যালকনির কাছে সোফায়—কিকমির  
 ককছে চাঁদের আলো তার রাউন্ডের পরে? ঐ তো?

ছবিতে উঠে গিয়ে বসে সন্ধ্যার পাশে। সে চাঁদের-আলোয় উজ্জ্বল  
 সাগর-বৃকের দিকে তিমিতনেয়ে চেয়েছিল, চমকে ওঠে : “মা গো!”

স্বপ্ন ওকে বাতবন্ধনে টেনে নেয়। ...ও স্বপ্নের বৃকে মুখ লুকায়।...

চাঁদের আলো পড়ে ওর চোখের পরবে।

—“এ কী সন্ধ্যা? চোখে কল?”

—“ন-ন-ন। পাশেই—ঐ দেখ।”—

আনা একটা অগ্নির কেমারায় উজ্জ্বলী হ'য়ে শুয়ে—তার খোল  
 ব্যালকনিতে।

একটা হাত মাথার পিছনে, একটা কোলে। থেকে থেকে চাঁদের  
কণে-নেভা-কণে-ফোটা আলো পড়ছে ওর গালে, বুকে, বাহমূলে, অংসে।

স্বপনের বকের রক্তে লাগে দোলা। কিসের যে...

—“কী স্বপ্নের ও! না, সিসি?”

স্বপন কণা কয় না।

—“সিসি?”

স্বপন তাকায়।

—“ও কী ভাবছে?”

—“আমি কি জানি?” স্বপন ঘান হাসে।

—“জানো। আমিও জানি।”

স্বপন চোখ রাখে ওর চোখের 'পরে।

—“ভাবছে—কেন এমন হয়?”

—“কেন?”

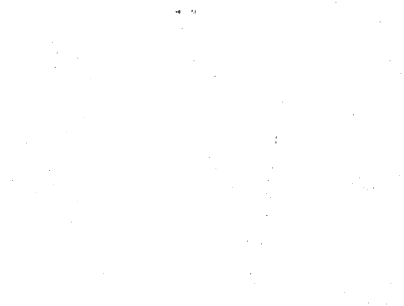
—“তা-ও হবে বলতে?”

স্বপন মুখ নিচু করে।

—“কেন এমন হয়?—সিসি?”

স্বপন আকাশের দিকে তাকায়: “কেউ কি জানে?” স্বর ওর এত  
মৃদু... শোনাই যায় না যেন, ...সজ্জা ওর পানে চেয়ে থাকে খানিক, পরে  
তাকায় ওর দৃষ্টি অহুসরণ করে দূর দিগন্তে।

চাঁদ গেছে ঢেকে—ছাই-রঙের মেঘে। এই খানিক আগেই তো  
হাসছিল! ঐ ঐ কের দেখা দেয়—বহু চাঁদ—টলটলে...নিটোল। এ  
বুঝি আর নিভবে না... আকাশের আঁকাশে... আশা: ঐ ঐ  
ঢেকে গেল.....



## শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	১৭	কষ্ট হাসি	কাষ্ট হাসি
১৩	২॥১৭	ফালন ॥ জারি	ফালন ॥ জারি
১৪	১২	একবার	যাবে একবার
২২	১৯	ঠেকেছে	ঠকছে
৪৮	১৭	পশ্চাত্তাপের	পরিতাপের
৪৯	৪	সতীর মধ্যে অসতীর স্থান	সতীর মধ্যেও অসতীর
		নেই	স্থান আছে
৫০	২২	কর্তার এক পরিভ্রম ...	পরকীরের গোরবছায়া
		নির্ম্মল...ফুটে না	সমান নির্ম্মল হ'য়ে ফুটে
৫১	৩॥২৪	নিবন্ধ ॥ ঠেকিয়েছি	নিবন্ধ ॥ ঠেকিয়েছি
৫৫	৫	উৎসায় মরে কেঁদে	অপঘাত
৬৬	১০॥১১	একটু ॥ দরকার একটুও না	এইটুকু ॥ দরকার না
৯১	১৩	বহিষ্ঠাকচিকো	চেকনাইয়ে
১০৯	১৪	মাছুষ	মাছুষে
২৩৩	২৩॥২৪	অপরের ॥ কি	অপরার ॥ কী
২৪৪	২॥৯	করো ॥ ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে	কোরো ॥ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে
২৫২	১১॥১২	কেন । ॥ আমার	কেন? ॥ প্রাণ ধ'রে আমার
২৫৬	২০	তার...যে, জীবনের	—বার...জীবনের
	২১	চকলতা ।	চকলতা !



## শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	১৭	কষ্ট হাসি	কাষ্ট হাসি
১৩	২১১৭	খালন ॥ সাবুদ	ফালন ॥ জারি
১৪	১২	একবার	বাবে একবার
২২	১৯	ঠেকেছে	মকছে
৪৮	১৭	পশ্চাত্তাপের	পরিতাপের
৪৯	৪	সতীর মধ্যে অসতীর স্থান	সতীর মধ্যেও অসতীর
		নেই	স্থান আছে
৫০	২২	কর্তার এক পরিব্রাজক ...	পরকীরের গোরবছায়া
		নির্মূল...ফুটে না	সমান নির্মূল হ'য়ে ফুটে
৫১	৩১২৪	নিবন্ধ ॥ ঠেকিয়েছি	নিবন্ধ ॥ ঠেকিয়েছি
৫৫	৫	উৎসায় মরে কেঁদে	অপবাত
৬৬	১০১১১	একটু ॥ দরকার একটুও না	এইটুকু ॥ দরকার না
৯১	১৩	বহিষ্ঠাকচিকো	চেকনাইয়ে
১০৯	১৪	মাগুব	মাগুবে
২০৩	২৩১২৪	অপরের ॥ কি	অপরার ॥ কী
২৪৪	২১৯	করো ॥ হু'ফিয়ে হু'ফিয়ে	কোরো ॥ হু'পিয়ে হু'পিয়ে
২৫২	১১১১২	কেন ॥ আমার	কেন? ॥ প্রাণ ধ'রে আমার
২৫৬	২০	তার...যে, জীবনের	—যার...জীবনের
	২১	চকলতা।	চকলতা!

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অনুবাদ	মুদ্র
২৭২	২	যেয়ে	খেলে
২৭৩	৬	তবে	তবে!
	৯	স্বপন-পসারীর কূলে	স্বপ্নলোকের রক্তকূলে
২৭৭	২২	হাওনাটি...সিকবান নাবিক	সিকবান হাওনাটি.
		হবার	হকাকতু হবার
২৭৮	৯	অলক্ষণের	অলক্ষণার
২৮০	১৬	কোরে	কোরো
২৮৬	২২	না দু'পথে	না দুজনে দুপথে
২৮৯	১৪	অগ্ন্যুৎপাতের	অগ্নিকাণ্ডের
৩০৩	২০	ইসা,—দে, চাঃ	ইসা—চাঃ
৩১৫	২২	তা ছাড়া	তবে বোধহয়
৩৩০	৮	সুখমাতরা	সুখমিতা
৩৩১	২১	শাখে	শাখে
৩৫৫	৮	প্রেমে—অপণ্ডিত	প্রেম-অনানি
৩৭১	১১	ব'লে।	ব'লে মহাত্মা!
৩৭৫	২০	বাঁহিরের	বাহুবীর
৩৯৫	১১২০	কথার ৥ স্মৃতি বলে	কথার ৥ স্মৃতি-বলে
৪০১	৭	কিছু প্রেমের	প্রেমের
৪১৮	৮	বিনষ্ট	বিনষ্ট
৪২৪	২০	সত্য	সত্য
৪৩৫	২	শোনার ?	শোনার —!...
৪৪১	১৬	আলো	চমক
৪৬০	৪	চলে না	না চলে—



পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৬৭	৫৥৭	ওর ॥ স্বল্পতর	আর ॥ স্বল্পতর—
৪৬৯	১৪	ওটি	গুটি
৪৮৭	১০	স্বপ্নের	শিখর-স্বপ্নের
৪৯২	১০	চেউ যে	লহর
৪৯৬	১৯	হয় বে	হয় সে
৫৪৫	২১	চায় তাকে	চায় না তাকে
৫৫৫	৮	মেয়ে যে	মেয়ে—বারা
৫৬৩	২১	সে	তারা
৫৬৪	৬	প্রকারান্তে	প্রকারান্তরে
৫৮০	৮	আসক্তির	আসক্তির জন্ত
৫৯৭	২২	প্রসাদপ্রার্থীকে	প্রসাদপ্রার্থীকে ডাকতে
৬০০	১৩	হাত ধরে	হাতে ধ'রে









